বৃহৎ বঙ্গ

[সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত]

রায় বাহাদুর

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্. (অন্),

কবিশেখর-প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৪১

উৎসর্গ

মহামহিম পঞ্চশ্রীযুক্ত শ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য
বাহাদুরের শ্রীকরকমলে

মহারাজ!

একদা তরুণ জীবনে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র পাণ্ডুলিপি হাতে লইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের নামে পুস্তকখানি উপহৃত করিবার অনুমতি ও উহা প্রকাশের ব্যয়-প্রার্থনার জন্য রাজদর্শন-মানসে আগরতলায় গিয়াছিলাম। ১৮৯১ সনের মে মাস—গ্রীষ্ম কাল,—হস্তিপৃষ্ঠে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশ ভ্রমণের কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই। ছোট ছোট পাহাড়ের উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র বন-রাজি-নীলা পল্লীগুলি "ধারা-নিবদ্ধ কলঙ্ক-রেখা"র ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল; হস্তীটী কাক-চক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল-সলিলা কত দীঘির পদ্মনাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের কোরক-নিঃসৃত শীত সুগন্ধ জলবিন্দু স্বীয় বিরাট্ দেহে উৎক্ষেপ-পূর্ব্বক পার্ব্বত্য পল্লী-পথে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে চলিয়াছিল; কখনও বা পশ্চিম-গগনে ধূসররক্ত মেঘমালা স্বর্ণরেণুযুক্ত নীলাঞ্জনের ন্যায় সূর্য্যাস্তের লোহিত ছটা পরিয়া সন্ধ্যাকে চন্দনরঞ্জিত করিতেছিল। তখন আমার বয়স পঞ্চবিংশতি মাত্র; সেই ভ্রমণের কথা এবং তৎসঙ্গে-জড়িত সাহিত্যিক জীবনে প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রথম স্বপ্ন আজিও আমার মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত আছে,—আর মনে আছে, প্রশান্ত ও সৌম্য মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের দীর্ঘ বীরমূর্ত্তি। তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আমার উভয় প্রার্থনাই মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তদবধি ত্রিপুরেশ্বর-গণের অকুণ্ঠ বদান্যতায় আমি নানাভাবে উপকৃত হইয়া আসিতেছি। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ও মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য আমাকে দুঃসময়ে কতবার যে আনুকূল্য করিয়াছেন, তাহা আর কি লিখিব? আমার প্রিয়বন্ধু স্বর্গীয় কর্নেল মহিমচন্দ্র তাহা জানিতেন।

সেই প্রথম সময় হইতে আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আমি শ্রীশ্রীযুতের করকমলে আমার বহুশ্রম-সমাহিত "বৃহৎ বঙ্গ" উৎসর্গ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। তরুণ বয়সেই শ্রীশ্রীযুত মহারাজের প্রতিভা ও মহানুভবতার যশ সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছে। মহারাজ এই দীনের কুটিরে পদার্পণ করিয়া তাহাকে সুস্নিগ্ধ আপ্যায়ন ও আনুকূল্য করিয়াছেন এবং এই পুস্তক উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। আমার প্রথম গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এবং (সম্ভবতঃ) এই শেষ গ্রন্থ "বৃহৎ বঙ্গ" ত্রিপুরেশ্বরদ্বয়ের নামের সঙ্গে সংযোজিত করিতে পারিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমার সাহিত্যিক জীবনের উদয়-অস্ত ত্রিপুর-সিংহাসনের উৎসাহ ও আনুকূল্যের রশ্মিপাতে বিদ্বৎ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি শ্রীশ্রীযুতকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়া ভারতবর্ষের এই মহা-অর্থসঙ্কটের দিনে প্রজাহিত-সঙ্কল্পে নিয়োগ করুন।

স্নেহমুগ্ধ এবং চিরাশ্রিত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভূমিকা

১৯১৬ সনের ১৪ই অক্টোবর তারিখে বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রোনাল্ডসের (বর্ত্তমানে মারকুইস অব জেটল্যাণ্ড) প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ডব্লিউ. আর. গুরলে, আই. সি. এস. আমাকে একখানি চিঠি লিখিয়া জানান যে, তিনি বাঙ্গলা দেশের একখানি সংক্ষিপ্ত এবং বিশুদ্ধ ইতিহাস সঙ্কলন করিতে ইচ্ছুক। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গলার ইতিহাস ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল,—উহা মূলতঃ মুসলমান-রাজত্ব সম্বন্ধীয়; গোলাম হুসেনের ইতিহাসখানির ইংরাজী অনুবাদ ১৯০২ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস গোলাম হুসেনের গ্রন্থের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। মার্সম্যানের ক্ষুদ্র ইতিহাসখানি ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের একখানি বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণয়ন করেন; ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মার্সেল সাহেব এই বঙ্গানুবাদের ইংরেজী একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বার্টন সাহেব তাঁহার ক্ষুদ্র এবং সুন্দর ইতিহাসখানি প্রকাশিত করেন। এই সকল ইতিহাসের কোনখানিই এখন সহজ-লভ্য নহে।"

বাঙ্গলার ইতিহাস-রচনা সম্বন্ধে গুরলে সাহেবের সঙ্কল্প ও প্রস্তাব।

গুরলে সাহেবের মতে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন যুগের ইতিহাসসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের সমবেত চেষ্টায় একখানি ইতিহাস সঙ্কলন করিবার এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি লেখক-সঙ্ঘ গঠন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে সঙ্কল্প করেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ক অধ্যায়টি লিখিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়।

প্রস্তাবিত লেখক-সঙ্ঘ

প্রথম খণ্ড

১ম অধ্যায়—হিন্দুরাজত্ব, খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দ পর্য্যন্ত—লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২য় অধ্যায়—গুপ্তরাজত্ব, খৃঃ পূঃ ১৫০ হইতে ৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত—লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যায়—পাল ও সেন-রাজত্ব, ৬০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ—লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

ব্রিটিশ অধিকার

স্তবলে লেখকের ইচ্ছা ছিল, সরকার হইতে এই পুস্তকের ব্যয় পাওয়া যায় কি না—প্রথমতঃ তজ্জন্য চেষ্টা করা, এই চেষ্টা সফল না হইলে 'থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং'কে তজ্জন্য অনুরোধ করা।

উল্লিখিত লেখকবর্গ লইয়া লাট-প্রাসাদে তিনটি সভা হইয়াছিল, এবং কেহ কেহ অংশবিশেষ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই কতকগুলি অপরিহার্য্য কারণে বাঙ্গলার ইতিহাস লেখার প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গলার সেই বিশেষজ্ঞ ঐতিহ্য-গুরুগণের মধ্যে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছেন—"একে একে নিবিল দেউটি." সেই বৈদ্যুতিক আলোগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র একটি মেটে প্রদীপের মত আমি এখনও কোন ক্রমে টিঁকিয়া আছি।

বাঙ্গলার একখানি ইতিহাস লেখার কল্পনা সেই সময় হইতে আমার মনে বলবতী

হইয়াছিল। এ দেশের অধিকাংশ ইতিহাসই মুসলমানগণের রচিত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস; তাহাতে জয়-পরাজয়ের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিজয়ী মুসলমানদিগের কীর্ত্তিই সমধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে। সামাজিক, নৈতিক, শিল্প ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত—ক্রম-বিকশিত সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ সকল সময়েই খুব গুরুতর হয় না। বহু শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী জাতি যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে—এদেশে তাহার কোন উল্লেখ-যোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। কিন্তু দশজন কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকের সমবেত চেষ্টায় যাহা সম্পাদিত হইবার পরিকল্পনা হইয়াছিল, আমার ন্যায় অকৃতী ব্যক্তির দ্বারা একক তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? তথাপি আমি এতদর্থে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছি। এজন্য আমি ১০।১২ বৎসরের চেষ্টায় এবং ৬।৭ হাজার টাকা ব্যয়ে বঙ্গের প্রাচীন শিল্পের অনেক নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছি। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি এই শিল্প-সংগ্রহটি যথাযথভাবে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। এত যত্ন ও কষ্টলব্ধ ভালবাসার জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার কথা আমার মনে উদয়ই হইতে পারে নাই। এই মূল্যবান্ সংগ্রহটি আমি ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের করকমলে উপহৃত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে আমি এই সদয় আশ্বাস পাইয়াছি যে তিনি এই জিনিষগুলি আগরতলার রাজ-প্রাসাদে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। বলা বাহুল্য, এই পুস্তকে যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহার অধিকাংশই আমার স্বীয় চিত্র-শালা হইতে গৃহীত। এই পুস্তকখানি ত্রিপুরেশ্বরের নামে উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া এবং এই পুস্তকের ছবির ব্লক প্রভৃতির জন্য তিনি আংশিক ভাবে আর্থিক আনুকূল্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

"বৃহৎ বঙ্গ"।

'বৃহৎ বঙ্গ' নামটি আমার স্বকপোল-কল্পিত বা আধুনিক নহে। ১৯০৩-০৪ সনের আরকিওলজিকাল রিপোর্টে উদ্ধৃত (২৭৭-২৮৫ পৃঃ) হীরানন্দ শাস্ত্রীর গৃহীত পাঠে আমরা গোয়ালিয়র-প্রশস্তিতে "বৃহদ্বঙ্গান্" কথাটি পাইয়াছি। একসময়ে বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় বলিতে সমস্ত পূর্ব্ব-ভারতকে বুঝাইত। "পঞ্চ গৌড়," "গৌড়ীয় রীতি," "গৌড় ব্রাহ্মণ"—এই সকল শব্দ প্রাচীন কালের গৌড়দেশের প্রসার ও মহিমা-দ্যোতক। দুঃখের বিষয় পঞ্চ গৌড়মণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী—এদেশের অন্যতম প্রধান

উড়িষ্যা।

কেন্দ্র—উড়িষ্যাসম্বন্ধে আমরা এই পুস্তকে কিছু লিখিতে পারিলাম না। বাঙ্গলার স্থাপত্য, বাঙ্গলার কলা-শিল্প ও বাঙ্গলার রাষ্ট্র-ইতিহাসের সঙ্গে উড়িষ্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। গঙ্গাবংশীয় রাজাদের কেহ কেহ "পঞ্চ-গৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন পর্য্যন্তও রাঢ় অঞ্চলের অনেকটা কলিঙ্গ-নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। গঙ্গাবংশীয় রাজারা বাঙ্গালী ছিলেন, এই মত এখন অনেক ঐতিহাসিকই গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা অক্ষর ও উড়িষ্যার অক্ষরে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না (এই পুস্তকের ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। বঙ্গভাষা ও উড়িয়া ভাষার যে পার্থক্য, তাহা একই ভাষার প্রাদেশিক রূপান্তর ভিন্ন কিছুই নহে। সিংহল-বিজয়ী বিজয়-সিংহের সময় হইতে উড়িষ্যাবাসীরা বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সিংহ-

বাঙ্গালা নাম। উড়িষ্যার রাজ-কন্যা ছিলেন। কুলজীগ্রন্থে উভয় দেশীয় লোকের আদান-প্রদানের সম্বন্ধে উল্লেখ বহু স্থানে দৃষ্ট হয়—এই আদান-প্রদান তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। মেদিনীপুর রাঢ়ের সিংহপুর একসময়ে কলিঙ্গের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল (৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এই সময়ের উড়িষ্যার কলা-শিল্প যে বাঙ্গালী-শিল্পের মোহরাঙ্কিত এবং সেই শিল্পের জন্মস্থান যে বাঙ্গলা দেশ, তাহা এখন পণ্ডিতগণের অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন (৪০৭-০৮ পৃঃ); উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি কোণার্ক মন্দির বাঙ্গালী শিল্পেরই মহিমা-দ্যোতক। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—"হিন্দুদিগের চারিটি স্থাপত্য-যুগের সৌন্দর্য্যের সার লইয়া মন্দিরটি সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা বাঙ্গলা শিল্পের চরম শোভা প্রকট করিয়া দেখাইতেছে, মুসলমান ঐতিহাসিকগণও অনিচ্ছার সহিত এই মন্দিরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন" ("It concentrates in itself the accumulated beauties of the four architectural centuries of the Hindus...it forms the climax of Bengal art and wrung an unwilling tribute even from the Mohamodens"—Hunter's Orissa, Vol. I, p. 291). অনেকের মতে অশোকের সুপ্রসিদ্ধ কলিঙ্গ-যুদ্ধের শত্রুপক্ষ ছিল—মেদিনীপুরবাসী বাঙ্গালীরা। উত্তরকালে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দরুন উড়িষ্যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়তর হইয়াছিল; উড়িষ্যা-পল্লীর ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর বিগ্রহ বিরাজিত থাকিয়া এই সম্পর্ক অতি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও পরোক্ষে উড়িষ্যার রাজাগুলির সমস্তই মহাপ্রভুর ভক্ত এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের মন্ত্রশিষ্য। স্বয়ং চৈতন্য-প্রভু উড়িষ্যার যাজপুরবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ মধুকর মিশ্রের প্রপৌত্র। উড়িষ্যার [illegible] বাঙ্গালীদের সমুদ্র-যাত্রার প্রধান বন্দর ছিল। আমরা সময় ও অর্থাভাব-নিবন্ধন এই বৃহৎ বঙ্গে উড়িষ্যার স্থান দিতে পারিলাম না। "বৃহৎ বঙ্গ" নামটি সম্বন্ধে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবে "গৌড়" নামে কাহারও আপত্তি হইবার কারণ নাই, কারণ কলিঙ্গ "পঞ্চগৌড়ের" অন্যতম ছিল, এবং পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গঙ্গাবংশের কেহ কেহ "পঞ্চ-গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন। এখন কতকগুলি লোক সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতে চেষ্টিত। যাঁহারা এক সময়ে এক ভাষা ও একই অক্ষর ব্যবহার করিতেন এবং এক রাজার প্রজা ছিলেন—তাঁহাদের মনে যেন ভেদ-বুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ না জন্মে—আমার এই প্রার্থনা। ঐক্যবদ্ধ হইলেই আমরা বাঁচিব, নতুবা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে ভারতবর্ষ হিন্দুর শ্মশান-শয্যায় পরিণত হইবে।

আমি নূতন লেখকগণের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন নাম-শব্দগুলির কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না, ইহা আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। 'হিউন সাঙ্গ', 'আবাঞ্জেব', 'মোগল', 'সিরাজুদ্দৌলা', 'মুর্সিদাবাদ', 'মোক্ষমূলর' প্রভৃতি শব্দের আমি সুচিরাগত প্রাচীন রূপ বহাল রাখিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ বিজ্ঞান-সম্মত উচ্চারণের দোহাই দিয়া এই সকল শব্দের নানারূপ উচ্চারণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধেও আবার সকলে একমত নহেন, শুদ্ধ করিবার চেষ্টা ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়া পড়িতেছে।

নামগুলির উচ্চারণ

প্রত্যেক ভাষারই একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা genius আছে। ইংরেজেরা গঙ্গাকে 'Ganges,' বঙ্গদেশকে 'Bengal,' ব্রাহ্মণকে 'Brahmin,' কলিকাতাকে 'Calcutta' প্রভৃতি ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তো এই সকল উচ্চারণ শুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হন না,—এমন কি যোড়াসাঁকোর বাবুরা যে পবিত্র 'ঠাকুর' শব্দটার অদ্ভুত রকমের বিকৃতি ঘটাইয়া "Tagore" শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরেজীতে নাম লিখিতে গেলে তাঁহারা কোনই কথা শুনিবেন না, সেই 'ট্যাগোর' শব্দটি ব্যবহার করিবেনই। গ্রীক ও রোমানেরা চন্দ্রগুপ্তকে "স্যাণ্ড্রাকোটাস," সিন্ধুকে "Indus" প্রভৃতি ভাবের বিকৃত উচ্চারণ দ্বারা পরিচিত করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রাচীন ইতিহাসগুলিতে তাহাই চলিয়া আসিতেছে। চীনদেশীয় লোকেরা অনাদিকাল হইতে ভারতীয় নামগুলির যে বিকৃতি-সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের ভাষায় তাহা সেই ভাবেই চলিতেছে। জাতীয় ভাষার ছন্দ রক্ষা করিয়া প্রাচীনেরা যেরূপ উচ্চারণ করিতেন, তাহার ঘন ঘন পরিবর্তন করিলে সাধারণের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, বিশেষ, কোন ভাষার স্বভাবানুগ ছন্দ হারাইয়া ফেলিলে নাম-শব্দগুলি সেই দেশবাসীর স্মৃতির অনুকূল হয় না। কিন্তু সুধী-সমাজ যদি আমার অবলম্বিত রীতি দোষাবহ মনে করেন, তবে আমি ভবিষ্যতে সাবধান হইব।

বাঙ্গলায় আর্য্য-সভ্যতার ধারা

এই পুস্তকে মগধের সঙ্গে—তথা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের সঙ্গে—বাঙ্গলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে—বিশেষ করিয়া মগধে—যে সকল রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় তাহার অনেকগুলি চলিয়া আসিতেছে। আর্য্য-সভ্যতা এবং দেশীয় আচার ও রীতির ধারা-বাহিকত্ব বাঙ্গালীরা যে পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

কুমারীদিগকে বাজারে বিক্রয়।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষে যে সকল কুমারীর পিতামাতা দারিদ্র্য-নিবন্ধন তাহাদিগকে যোগ্যবরের সঙ্গে বিবাহ দিতে অসমর্থ, তাঁহারা সদ্যোযৌবন-প্রাপ্ত কন্যাদিগকে বিবাহার্থে বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।" ("Strabo tells us that those who are unable from poverty to bestow their daughters in marriage, expose them for sale in market-places in the flower of their age" Robertson's India, p. 65)। সেদিন পর্য্যন্তও বৈষ্ণবেরা রামকেলী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষুণীদিগকে বাজারে বিক্রয় করিত,—সাধারণতঃ এইরূপ মেয়েদের এক এক জনের মূল্য ছিল ১।০ (পাঁচ সিকে)। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যাওয়ার পর এই প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ অবশেষ বোধ হয় এখনও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি দাশরথি এই প্রথাকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন:—"গোসাঞীকে পাঁচ সিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, আত্যংশে কুলীন বড় নেড়া।"

খৃঃ-পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক পুরুষজাতীয় ধর্ম্ম-মহামাত্রদিগের সঙ্গে স্ত্রীধর্ম্ম-মহামাত্রও নিযুক্ত করিয়া ঘরে ঘরে 'সদ্ধর্ম্ম' প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সেদিন পর্য্যন্তও "মা-গোসাঞী"গণ ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে আনাগোনা করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচার করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'আত্মজীবন-চরিতে' লিখিয়াছেন, তাঁহার 'দিদিমা' এই "মা-গোসাঞী"-গণের যাতায়াত পছন্দ করিতেন না। এই "মা-গোসাঞী"গণ খুব সম্ভব সেই অশোকের সময়ের "স্ত্রীধর্ম্ম-মহামাত্র"গণের ধারাটি বজায় রাখিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন রীতি, ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠানগুলি অধস্তন বৈষ্ণব সমাজই এই দেশে বেশী রক্ষা করিয়াছেন, যেহেতু প্রাচীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলি অধুনা বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গেই বেশী মিশিয়া গিয়াছে। জন-সাধারণের মধ্যেই প্রাচীন ধর্ম্ম ও রীতি-নীতি অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যায়, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সেই জন-সাধারণকে আত্মসাৎ করিয়াই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্ত্রীধর্ম্ম-মহামাত্র ও মা-গোসাঞী।

পালি সামঞ্ঞ-ফল-সুত্তে পুরণ কস্সপ, মক্খলিপুত্ত গোশাল, অজিত কেশকম্বল, ককুদ কচ্চয়ন, নিগন্থ জ্ঞাতি-পুত্র, সঞ্জয় বেলেট্‌ঠি প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতের যে সকল মত আমরা উল্লিখিত দেখিতে পাই, সেই সকল মত, কোথায়ও পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হইয়া, কোথায়ও বা উচ্চতর আদর্শে নীত হইয়া, বঙ্গীয় সহজিয়া ও বাউলদের মধ্যে এখনও প্রচারিত হইতেছে। অক্ষয়-কুমার দত্ত প্রণীত 'ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায়,' বাউলদের সম্বন্ধে বিবিধ পুস্তক এবং বর্ত্তমান গ্রন্থের ৭৬৯-৭৮২ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে পাঠক এই কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে যে নৈশ মিলন-সমিতি হইত, যাহার উল্লেখ আমরা খৃঃ-পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত পালি "কথাবত্থু"নামক পুস্তকে পাই, তাহাই বঙ্গদেশে সহজিয়াদের নৈশ-সভায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা "একাভিপ্পায়ী" নামে পরিচিত ছিল এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিব্বত রাজা চ্যাংচুব তদীয় দূত 'নাগচো'র মুখে দেশের যে অবস্থা দীপঙ্করকে জানাইয়াছিলেন তাহাতে সম্ভবতঃ এই দলেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহারা নীল আলখাল্লা পরিতেন এবং দেশময় ব্যভিচারের স্রোত বহাইয়া দিয়াছিলেন; রাজা স্বয়ং ইহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগের ভূমিকা এবং ঐ পুস্তকের ৩১৯-৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "চারু দর্শন" নামক পুস্তকে এদেশের সহজিয়াদের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, আমি তৎপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি (এই পুস্তকের ৭৭৩ পৃঃ)।

প্রাচীন একাভিপ্পায়ী দল—অধুনা সহজিয়া দেতায় পরিণত।

শুধু মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নহে,—প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের চিত্রাঙ্কন-প্রচেষ্টা, যাহা সিঙ্গানপুরে প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গেও বাঙ্গলার কুটির-শিল্পের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। পাহাড়পুরে দেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের যে সকল নিদর্শন আছে,—তাহাতে মনে হয় বাঙ্গলায়

সুচিরাগত শিল্প।

কলালক্ষ্মী যেন অতল জলধিতল হইতে তাঁহার প্রথম নিষ্ক্রামণের পদ-চিহ্ন সেখানে রাখিয়া গিয়াছেন। অজন্তার চিত্রগুলি যে বাঙ্গালী চিত্রকরের করস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ গ্রন্থভাগে (৪১৬-৫২ পৃঃ) প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় জগৎ-প্রসিদ্ধ শিল্প-কেন্দ্রগুলির আদর্শ এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গপল্লীতে আর্য্যসভ্যতার শেষ রেণু-কণা আমরা যে পরিমাণে কুড়াইয়া পাইয়াছি, আর্য্যাবর্ত্তের অন্যত্র তাহা সুলভ নহে। এদেশের কুটির-শিল্পে আমরা মহেঞ্জোদারো, অজন্তা, অমরাবতী প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রের তীর্থ-রেণু প্রচুররূপে পাইতেছি। পাষাণের গায়ে, কাষ্ঠে, বস্ত্রে, তুলট কাগজে, তিরুট ও তালপত্রের পুঁথির মলাটে, উপাধানের আচ্ছাদনে, কাঁথা— শিকা— আলপনা— মেঠাই — দেয়াল-চিত্রে, ঘটিতে, বাটিতে, পালঙ্কে, পানের ডিবেতে, দেব-বিগ্রহে, কাঠের রথে, সিংহাসনে, মন্দিরের পোড়া ইটে, মাদুর ও পাটীতে, হস্তিদন্তের ও ধাতব তৈজস-পত্রে, এমন কি বিছানা বাঁধিবার দড়ি, পুঁতির লাঠি, নারিকেলের মালায় রচিত নর-মুণ্ড, অস্ত্রের বাঁট, থলে আসন প্রভৃতি শত শত নিত্য-ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে চারুকলার যে সকল নিদর্শন পাইতেছি তাহা সুচিরাগত বৌদ্ধ শিল্পের ধারাটি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। গত এক শত বৎসরের মধ্যে এই স্রোত মন্দীভূত হইয়া বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা জন্মাইতেছে। বাঙ্গলার শিল্প-কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা পাঠকের দৃষ্টি এই পুস্তকের ২৩৫-৪৮, ৪০৬-৫২ পৃষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি; নানা কারণে আমরা অনুমান করিয়াছি, বাঙ্গলাদেশই মগধের প্রধান চিত্র-শালা ছিল।

শিল্পের আর একটি শাখাসম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করিব। আমাদের দেশে পটুয়ারা নানারূপ পৌরাণিক উপাখ্যানের চিত্র আঁকিয়া এখন পর্য্যন্তও দূর পল্লীগ্রামে প্রদর্শন করিয়া থাকে। এক একটি উপাখ্যানের চিত্র কাগজে বা পত্রে অঙ্কিত হইয়া সুদীর্ঘ মানচিত্রের মত জড়ান থাকে এবং তাহাতে সেই বিষয়ের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি এরূপ সুসম্বদ্ধভাবে পর পর প্রদর্শিত হয় যে, পটুয়ারা যখন এক একটি দৃশ্য দেখাইয়া তৎসম্পর্কিত পয়ার আবৃত্তি করিয়া যায়, তখন দর্শক ও শ্রোতারা সমস্ত গল্পটি কবিত্বের ভাষায় ও মনোরম চিত্র-সাহায্যে উপভোগ করিবার সুবিধা পান। এই চিত্রপট-প্রদর্শনের রীতিটা বিক্রমপুরে "পট নাচানো" নামে পরিচিত। বঙ্গের কোন কোন স্থানে এই শ্রেণীর পটুয়াদিগকে 'পটিদার' বলে। এই রীতিটি খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত। বৌদ্ধগণ এইরূপ চিত্র দ্বারা জাতকের গল্পগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেন—ইঁহাদিগকে প্রাচীন কালে 'মঙ্করী' বলিত এবং চিত্রগুলিকে কখনও কখনও 'যমপট' বলা হইত, যেহেতু চিত্রের উপসংহারে ধর্ম্মরাজের সভা ও পাপের দণ্ড প্রদর্শিত হইত। শেষোক্ত প্রথাটা এখন পর্য্যন্তও বিদ্যমান। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকে এইরূপ চিত্র-প্রদর্শনের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদিগের অনুকরণে খৃষ্টানেরাও এইরূপ চিত্র দেখাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, রোমে ভ্যাটিকানে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'পেপিরাস' (Papyrus) পত্রে অঙ্কিত এইরূপ কয়েকখানি ছবি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রাচীন ধারাটি সেদিন পর্য্যন্তও বাঙ্গালী চিত্রকরেরা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।

মঙ্করী।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক পট উদ্ধার করিয়াছেন এবং পটিদারেরা ... গীতি গাঁথিয়া তাহাদের ছবির ব্যাখ্যা করে, তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর চিত্রকরদের সম্বন্ধে পুস্তকের ৪৩৯-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে, বাঙ্গালী যে পথে চলিয়াছে, সেই পথেই তাহার লক্ষ্য 'ভূমা'। এই আদর্শের মধ্যে কোন সীমা-রেখা, সঙ্কোচ বা দ্বিধার ভাব দেখা যায় না; বাৎসল্য, দাম্পত্য, বা লৌকিক ধর্ম্মসংস্কার দ্বারা এমন কি সুরুচির অনুরোধেও এই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। দাতাকর্ণের গল্পটি খুব প্রাচীন; এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালাতেই বঙ্গের নানা জেলা হইতে সংগৃহীত দাতাকর্ণের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত প্রায় অর্দ্ধশত পুঁথি রক্ষিত আছে। মেদিনীপুর হইতে রংপুর, এবং শ্রীহট্ট হইতে ত্রিবেণী—এই বৃহৎ প্রদেশের সর্ব্বত্রই দাতাকর্ণের পুঁথি পাওয়া যাইতেছে। একসময়ে ঘরে ঘরে প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলেকেই এই পুস্তক পড়িতে হইত, ইহা বাঙ্গালী ছেলের নিত্যপাঠ্য "শিশুবোধক" বইখানির অন্তর্গত ছিল।

বাঙ্গলাদেশ আদর্শের কোন বিভাগেই অল্পে সন্তুষ্ট নহে,—বাঙ্গালীর লক্ষ্য 'ভূমা'।

অতিথি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিবেন এই সত্য-রক্ষার ব্যপদেশে কর্ণ ও তাঁহার সীমন্তিনী তাঁহাদের একমাত্র পুত্র বৃষকেতুর মস্তক করাত দিয়া কাটিতেছেন এবং রাণী সেই পুত্রের মাংস অতিথির জন্য রন্ধন করিতেছেন। এই গল্পটির কথা গ্রন্থভাগে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

দাতাকর্ণ।

উপাখ্যানটি আর্ট হিসাবে একবারে অসঙ্গত ও নির্ম্মম—এমন কি বীভৎস। আর্টের প্রচেষ্টা—ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, এমন কি সাহিত্য-রীতিকেও কতকটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করা। সে হিসাবে গল্পটি ব্যর্থ,—ইহার লক্ষ্য দান ও আতিথ্যের আদর্শ-প্রদর্শন, এই আদর্শ একেবারে ভোলানাথ দিগম্বরের ন্যায়—সম্পূর্ণ নিরাভরণ, এমন কি ছাই-ভস্ম-মাখা। ইহার বিশেষত্ব এই,—সেই আদর্শ অপর সকল কথা ভ্রূক্ষেপে ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের রাজ্ঞী শৈব্যা অশ্রুজলে শ্মশানের চিতা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের এই আদর্শটি মাতৃকরুণার জন্য পর্য্যন্তও একটু মাত্র অবকাশ রাখে নাই। একটি নিঃশ্বাস বা একফোঁটা অশ্রু পড়িলে সঙ্কল্প বিফল হইবে। পল্লী-গীতিকার (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৭৩-১১৮ পৃঃ) কাঞ্চনমালার গল্পও এই একই সুরে বাঁধা। কাঞ্চন তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীকে স্বীয় চিরশত্রু রত্নমালার হস্তে চিরতরে সমর্পণ করিয়া যাইতেছেন; যে মুখ একবার মাত্র দেখিবার জন্য তিনি শত শত জীবনের কষ্ট তুচ্ছ করিতে পারেন, সেই স্বামীকে আর দেখিতে পাইবেন না,—এই মহা-ত্যাগের সময়ে তাঁহারও একবিন্দু অশ্রু বা একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িতে পারিবে না,—ইহাই সর্ত্ত, তবেই স্বামী অন্ধচক্ষে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহার এই পরীক্ষা সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রঞ্জাবতীর শূলের উপর প্রাণ দেওয়ার উৎকট পরীক্ষাকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। বিশেষত্ব এই, দাতাকর্ণের গল্পে যাহা

কাঞ্চনমালা।

নাই, সেই সাহিত্যিক শিল্পজ্ঞান পল্লীকবি-রচিত "কাঞ্চন-মালা"য় আছে। এই গল্প ত্যাগের সর্ব্বোচ্চ শেখরে দাঁড়াইয়াও কাব্যোচিত শিল্প ও সংযম রক্ষা করিয়াছে, এরূপ মহান্ দৃশ্য সাহিত্যে বিরল। ধর্ম্ম-মঙ্গলের কালু ডোম ভ্রাতৃ-স্নেহের আতিশয্যে তাঁহার ঘোর শত্রু ছোট ভাই ধূর্ত্ত-শিরোমণি ইন্দার কাছে প্রতিশ্রুত হইল, সে যাহা চাহিবে—তাহা দিবে। ইন্দা শত্রু-পক্ষের চর—সে কালুর মাথাটা চাহিয়া বসিল। সিংহবিক্রান্ত বীরবর সত্যরক্ষার জন্য কি অদ্ভুত সংযমের সহিত প্রাণ দিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্ম-মঙ্গল-কাব্যগুলিতে লিখিত আছে। অনেক ইতিহাসে বর্ণিত আছে, প্রতাপাদিত্য কল্পতরু সাজিয়া সিংহাসনে বসিলে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মহারাজ্ঞীকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের ন্যায়পরতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে, অনেকে ইহাকে নিছক বর্ব্বরতা মনে করিবেন। কিন্তু ত্যাগের মহান্ আদর্শ ভিন্ন অন্য কোন দিক্ দিয়া বিচার করিলে এই সকল গল্পের গুণাগুণ বুঝিতে পারা যাইবে না। বঙ্গের লক্ষ্য—ভূমা। বাঙ্গালী অল্পে সন্তুষ্ট নহে। মিউজিয়ামের চিত্রশালায় তিব্বত, রেঙ্গুন প্রভৃতি দেশের অল্পদরের ভাস্কর-নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তির চেপটা মুখ, খর্ব্ব নাসিকা ও কোটরগত চক্ষু অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের নিদর্শনই হউক, অথবা হীন কারিগরের গড়া মূর্ত্তিই হউক, সমস্ত বৌদ্ধমূর্ত্তির একটা পরিচিত ছাপ আছে—তাহা বৌদ্ধমূর্ত্তি-ব্যূহের সাধারণ লক্ষণ—তাহা নির্ব্বাণের ভাব, তাহা সকল মূর্ত্তিতেই আছে। সেইরূপ এই সকল গল্প—সুরচিত বা কুৎসিতই হউক—ভূমার প্রতি লক্ষ্যই ইহাদের বিশেষত্ব। বাঙ্গালী কোন জিনিষ বাদ দিয়া গ্রহণ করিবে না; সে দিবে, সর্ব্বস্ব দিবে;—ত্যাগ করিবে, কপর্দ্দকও রাখিবে না; সে সত্যরক্ষা করিবে,—বাৎসল্য, দাম্পত্য বা সাংসারিক কোন বাধার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। তাহার ভাব-প্রবণতার স্রোতে ঐরাবতের ন্যায় বাধা তৃণের মত ভাসিয়া যায়। জড়বাদীরা বলিবেন, এ সকল গল্পে কতকটা অসংযত আতিশয্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহারা 'ভূমা'কে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্করদের মতই সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহাদের অবাধ রাজ্যে তিল-প্রমাণ বাধার অবকাশ নাই। তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইবার নহেন। সংস্কারাধীন ক্ষুদ্রদরের সমালোচকের টিট্‌কারীতে তাঁহাদের কি হইবে?

এই ভূমার প্রতি যে বাঙ্গালীর লক্ষ্য—তাহা সামাজিক জীবনের মধ্যেও স্বীয় বিদ্রোহী সত্তা বুঝাইতেছে। সহজিয়ারা দাম্পত্য-প্রেমকে অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং প্রশ্ন তুলিয়াছে,—"সীতা-সাবিত্রীর প্রেম যৌন-সম্বন্ধের আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবার দাবী রাখে কিনা?" উত্তরে তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছে, ইহাদের তথাকথিত স্বামি-প্রেমের মধ্যে কতটা সামাজিক প্রশংসালাভের ইচ্ছা, কতটা ইহকালে সুখে থাকা এবং পরকালে স্বর্গ-সুখের লোভ অলক্ষ্যভাবে বিদ্যমান, তাহা অবধারণ করা সহজ নহে; কিন্তু 'পরকীয়া' প্রথম হইতেই কলঙ্কের তিলক মাথায় করিয়া সর্ব্বপ্রকার কষ্টের জন্য প্রস্তুত হইয়া একমাত্র প্রেমকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। নিন্দা, দণ্ড, সর্ব্বস্বত্যাগ—ইহাই এই প্রেমের পুরস্কার। এই

প্রেম যদি **একনিষ্ঠ ও ইন্দ্রিয়জয়ী হয়**—তবে তাহাই আদর্শ প্রেম। চণ্ডীদাস এইরূপ প্রেমের প্রসঙ্গেই লিখিয়াছিলেন,—"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না চিনয়ে তারে। প্রেমের আরতি, যে জন জানয়ে সেই সে চিনিতে পারে।" চৈতন্য-চরিতামৃতকার এই প্রেমের অজস্র প্রশংসা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—"পরকীয়া-ভাবে সর্ব্ব রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নহে বাস।" পৃথিবীতে ইহা দুর্লভ—চণ্ডীদাসও ইহাই বলিয়াছেন, ইহা মানব-সমাজে কচিৎ দৃষ্ট হয়—"কোটিকে গোটিক হয়।" তৎপরে, সমাজে সাধারণ নরনারীর পক্ষে ইহা অপকারী হইবে এই আশঙ্কা করিয়াই যেন বলিয়াছেন, যিনি মাকড়সার জালের সূতা দিয়া সুমেরু-শেখর আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, এবং ভেককে কাল-সাপের মুখের মধ্যে নৃত্য করাইয়া অক্ষতদেহে ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তিনিই যেন এই পথের পথিক হন। এই অসম্ভব পথের পথিক বাঙ্গালী সাধক হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তও চারু-দর্শন নামক পুস্তক-পাঠে জানা গিয়াছে (৭৭৩ পৃঃ)। আশ্চর্য্যের বিষয় ১৭১৭ সনে বৈষ্ণব-সমাজের তাৎকালিক নেতারা আলিবর্দ্দী খাঁর প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রকাশ্য সভায় বিচার করিয়া স্বকীয়া হইতে যে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ—এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দলিলখানি পাওয়া গিয়াছে (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৩৮-৩৯ পৃঃ)। পূর্ব্ববঙ্গের গীতিকার "আঁধারবঁধু" নামক গাথাটি (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৮৫-২০৭ পৃঃ) এই প্রেমের অসামান্য ত্যাগ ও অনাবিল আদর্শ অতিশয় নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার সহিত প্রমাণ করিয়াছে; সমাজে এত বড় বিদ্রোহীর সুর আর কোন জাতি দেখাইতে পারিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

ভাব-প্রবণতা।

বাঙ্গালীর ভাব-প্রবণতাসম্বন্ধে বেশী লেখা বাহুল্য! এখনও হয়ত এরূপ দুই একটি বৈষ্ণব পাওয়া যাইতে পারে, যিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া গঙ্গামৃত্তিকা-দর্শনে কাঁদিয়া অধীর হন, যেহেতু সেই মৃত্তিকায় যে খোল তৈয়ার হয়,—সেই খোল সংকীর্ত্তনের সময়ে বাজিয়া কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে। "ক দেখি কাঁদহে বাপু কিসের কারণ?" যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি বাঙ্গালী প্রহ্লাদ; চৈতন্য-ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে এক বাঙ্গালী অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দশরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সত্যসত্যই পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (আদি খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়)। এই ঘটনা পঞ্চদশ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, অভিনেতা রাম-বনবাসের সময়ে এতটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, লুপ্ত-চৈতন্য আর ফিরিয়া পান নাই।* বিদ্যাপতি-রচিত পুরুষ পরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের সভায় উমাপতি ধর প্রভৃতি মন্ত্রীর সাক্ষাতে এক অভিনেতা উত্তর-চরিত অভিনয় করিতে যাইয়া এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ধর্ম্ম-জগতে এই ভাব-প্রবণতা যে কিরূপ অপূর্ব্বভাবে

* "পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।
রাম-বনবাসে এড়িলেন কলেবর॥"

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চৈতন্য-লীলায় প্রকাশ পাইয়াছে—সে লীলার আদ্যন্ত স্বপ্ন ও স্বর্গের সুষমাময়। এখনও খোল বাজিয়া উঠিলে ইহসংসার ও অধ্যাত্মলোকের মধ্যে যে ব্যবচ্ছেদ-রেখা বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ভাব-প্রবণতা—যাহা বাঙ্গালী জাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী করিয়াছে—তাহা নীরস ও শুষ্ক জড়বাদীরা নিন্দা করিয়া থাকেন। যুগে যুগে আদর্শ ভিন্ন হয়; এক যুগে যাহা সর্ব্বজন-প্রশংসিত, অন্য যুগে তাহার গুণাগুণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে, এমন কি তাহা নিন্দিত হয়। সুতরাং আদর্শের বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে যুগেই বাঙ্গালী যে আদর্শের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, সে তাহার পিছনে এতদূর চলিতে পারিয়াছে যে তাহা অপর জাতির বিস্ময়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়ে বাঙ্গালী অসীমকে লক্ষ্য করিয়াছে। সেই অসীম মহান্ হইতেও মহান্ এবং অণু হইতেও অণু—"মহতোঽপি মহীয়ান্ অণোরপি অণীয়ান্।" বাঙ্গালীর গল্প-সাহিত্যের পুনরায় উল্লেখ করিব। গল্পগুলি নিছক কল্পনা ও মিথ্যা হইলেও ইহারা জাতীয় চরিত্রের দিগ্‌দর্শন। রাজগৃহে "রমণী-বিলাসী"র পরীক্ষা,—সে পরমসুন্দরী ষোড়শী রমণীর সঙ্গে শয়ন করিয়া পরদিন জানাইল, ছাগের গন্ধে সে রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে নাই; অনুসন্ধানে জানা গেল, অপোগণ্ড অবস্থায় সেই রমণী কয়েক মাস ছাগ-দুগ্ধ খাইয়াছিল। উৎকৃষ্ট দুগ্ধফেননিভ বহুমূল্য শয্যায় শুইয়া "শয্যা-বিলাসী" অভিযোগ করিল, চুলের জন্য রাত্রে তাহার ঘুমে বিঘ্ন ঘটিয়াছে—জানা গেল, সপ্ততল গদীর শেষটির নীচে একগাছি চুল ছিল। রাজার অতিথি-শালায় অলসদের পরীক্ষা। তিনি অলসদিগকে ভরণ-পোষণ করিবেন—এই ঘোষণা করিয়াছিলেন। শত শত অলস ব্যক্তি আসিয়া অতিথিশালা ভর্ত্তি করিয়া ফেলিল। পরীক্ষার দিনে মধ্যরাত্রে রাজা গৃহে আগুন ধরাইয়া দিলেন, অতিথিরা যে যে পথ পাইল—পলাইয়া গেল, মাত্র রহিল তিন জন। এই তিন জন **প্রকৃত অলস** ব্যক্তি প্রজ্বলিত অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে উদ্যত হইল, তবু নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা মাত্র করিল না। একজন আগুন দেখিয়া বলিয়া উঠিল 'কত রবি জ্বলে?' দ্বিতীয় ব্যক্তি আরও অলস, সে বলিল 'কে বা আঁখি মেলে?' চোখ চাওয়াও তাহার নিকট শ্রম-সাধ্য; তৃতীয় ব্যক্তি বাক্যব্যয় করিতেও প্রস্তুত নহে—সে অতি সংক্ষেপে বলিল 'ফি শো' (ফিরিয়া শোও)। এই সকল তুচ্ছ গল্পের দ্বারা বুঝা যায়, বুদ্ধি ও অনুভূতিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অতি প্রখর করিবার যে তপস্যা, তাহাতে বাঙ্গালী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই সকল আজগুবী গল্পের বহুল প্রচার দ্বারা মনে হয়, বাঙ্গালী সর্ব্বদা একটা অসম্ভব আদর্শ চোখের সামনে রাখিয়াছে। বাঙ্গালী যাহা করিবে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িবে। সাহিত্যরথ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জাতীয় চরিত্র বুঝাইবার জন্য তাঁহার একখানি পুস্তকে এইরূপ দুই একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'কৃপণ' নামক প্রাচীন যুগের একটি গল্পে শুধু দুইটি পয়সা বাঁচাইবার জন্য একজন কৃপণ ধনী কি অসাধ্য সাধন করিয়াছিল, তাহা লিখিত আছে। অবশেষে সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সে চিতায় যাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। যখন চিতায়

গ্রাম্য-গল্পে অসীমের প্রতি লক্ষ্য।

অগ্নি-সংযোগ করা হয়, তখনও সে নিজেকে বাঁচাইবার কোন উদ্যোগই করে নাই। এই অবস্থায় ভগবান্ সদয় হইয়া ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া তাহাকে চিতা হইতে উঠাইয়া বলিলেন—"আমি তোমার অনন্যব্রত একনিষ্ঠ কার্পণ্যে বিস্মিত হইয়াছি, তুমি যাহা চাও আমি তাহাই তোমাকে দিব, তুমি বল কি বর চাও।" কৃপণ বলিল, "এই বর দাও, যেন আমাকে সেই দুইটি পয়সা না দিতে হয়।" হীরেন্দ্রনাথ বসু নামক এক নবীন লেখক তাঁহার "মুস্কিল-আসান" নামক একখানি পুস্তকে এই সুপ্রাচীন গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালী কি চায়, তাহার কি সাধনা, তাহা এই সকল ক্ষুদ্র অলীক গল্পগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়।—সে সূক্ষ্ম কাজ করিবে,—তাহা একেবারে মস্‌লিন; সে সূক্ষ্ম চিন্তা করিবে—তাহা একেবারে নব্যন্যায়। বিলাতের তাঁতি বাঙ্গালী তাঁতির নিকট মসলিন্ তৈরী করিবার কৌশল শিখিতে চাহিয়াছিল। বাঙ্গালী সে বিদ্যা গোপন করিল না, তাহাকে শিখাইয়া দিল। কিন্তু নানারূপ কসরত করিয়া বিলাতী তাঁতি হতাশ হইয়া বলিল, "আমরা এরূপ সূক্ষ্ম সূতো তৈরী করিতে পারিব না,—আমাদের আঙ্গুল মোটা।" মোট কথা বাঙ্গালী যাহা করে তাহা শুধু দৈহিক শ্রম নহে, তাহা আধ্যাত্মিক তপস্যা। তপোবল-হীন ব্যক্তি তাহা পারিবে না। এই একশত বৎসরের মধ্যে আমাদের সেই তপস্যা টুটিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর প্রেম-তপস্যা যে কিরূপ, তাহা গোবিন্দদাসের একটি পদে দেখা যায়। *

বাঙ্গালীর দেহশ্রী।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর দেহশ্রী সম্বন্ধে বড়লাট মিণ্টো বলিয়াছিলেন,—এরূপ লাবণ্যপূর্ণ সুগঠিত মুখশ্রী ও দেহ-সৌষ্ঠব তিনি জগতের অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখেন নাই। "I never saw so handsome a race; these (the Bengalis) are tall masculine athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features are of the most classical European models with great variety at the same time."—Lord Minto's letter to the Hon'ble A. M. Elliot, Sep. 20, 1807. ওয়ালটার হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন, "ইহাদের দেহশ্রী কি আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন? আমি আপনাদিগকে দুইটি বাঙ্গালীর সহিত [illegible] করিয়া দিব,—ইহারা আমার সঙ্গে বিলাতে আসিয়াছেন, ইহারা মন্দিরের চূড়ার মত [illegible] ডিঙ্গাইয়া উঠিয়াছেন, ইহাদের মূর্ত্তি যেমনই দীর্ঘ তেমনই সুগঠিত। ইহারা আমার

* "কণ্টক গাড়ি, কমল সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
[illegible] বারি ঢারি করি পিছল পথ, চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি—দূরতর পন্থ, গমন ধনি সাধয়ে, মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী, তিমিরে পয়ানক আশে।
মণি কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচনে বধির সম মানই, আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে বধির সম হাসই, গোবিন্দ দাস পরমাণ॥"

খর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া আমোদের সহিত একটু হাসিয়া থাকেন। ("Is their physique so inferior? I will introduce to you two Bengalis who have come with me to England. They tower above me and they are as well-proportioned as tall, they smile on my small stature.") একশত বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গালীর চেহারা লোকের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিত, তাহা মিস বেলনস্ অঙ্কিত ছবিগুলি ও ৮৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মল্ল-বীরের চিত্রটি দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। বেলনসের আঁকা ছবিগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া চরকের দৃশ্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন, সেই সকল মূর্ত্তির কবাট-বক্ষ ও সুগঠিত দেহ-লাবণ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখন কলেজের ছাত্রদের মূর্ত্তি একেবারে হতশ্রী হইয়া গেলেও পাড়াগাঁয়ে কৃষক ও অপরাপর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালীর সেই অতীত-যুগের পুরুষোচিত দেহ-সৌষ্ঠব মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাঙ্গালীর বীরত্ব।

বাঙ্গালীর বীরত্ব যে এক কালে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা বাহিরের ইতিহাসে মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়, আমরা আত্ম-বিস্মৃত- জাতি—আমাদের অতীত গৌরবের কথা আমরা কিছুই লিখিয়া যাই নাই, কিন্তু তথাপি পরকীয় ইতিহাসে মাঝে মাঝে সে গৌরবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একদা এই প্রাচ্য ও গঙ্গা-রাঢ় দেশের বিক্রান্ত যোদ্ধাদের ভয়ে জগজ্জয়ী আলেক্‌জেণ্ডারের সৈন্যেরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল,—আলেক্‌জেণ্ডার সাশ্রুনেত্রে মিনতি করিয়াও তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে মহাকবি ভার্জ্জিল তাঁহার Georgics (III, 27) কাব্যে বাঙ্গালীদের বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, "স্মৃতি-মন্দিরের দ্বার-দেশে হস্তিদন্ত ও স্বর্ণের অক্ষরে আমরা এই গঙ্গারিডিদের * যুদ্ধের কথা ও বিজয়ী কুইরিনিয়াসের সৈন্যের সমর-কৌশল চিত্রিত করিয়া রাখিব।" (On the doors will I represent in gold and ivory the battle of the Gangaride and the arms of our victorious Quirinius.) দ্বাদশ শতাব্দীতে কল্‌হণকবি কাশ্মীরের ইতিহাসে কতিপয় বাঙ্গালী সৈন্যের রাজভক্তির অতুলনীয়

* ভার্জ্জিল প্রভৃতির উল্লিখিত 'গঙ্গারিডি' শব্দদ্বারা গাঙ্গুরস্ব অর্থাৎ গঙ্গার এই সীমান্ত প্রদেশকেই বুঝাইতেছে। কেহ কেহ 'গঙ্গারিডি' শব্দ গঙ্গা-রাঢ়ী শব্দের রূপান্তর মনে করেন। এই শব্দের সঙ্গে একটি নদী ও তৎতীরবর্ত্তী স্থানের নামের বিশেষ ঐক্য দেখা যায়। উহা 'গাঙ্গুড়' বা 'গাঙ্গুড়ী'। গাঙ্গুড় নদী মনসা দেবীর ভাসানের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। এই নদী দিয়া বেহুলা স্বামীর শবের সহিত ভাসিয়া গিয়াছিলেন। "পরম সুন্দর লখাই দীর্ঘ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ লয়্যা গেল গাঙ্গুড়ির কূল" (বিজয় গুপ্ত)। এই নদীর তীরে উপনিবিষ্ট কনোজিয়া ঠাকুরেরা গাঙ্গুলী নামে পরিচিত। এখন বাঙ্গলার স্থানবিশেষের নামে (যথা—চাটুতি, বাড়ুরী, মুখটি) সংস্কৃত উপাধ্যায় শব্দের যোগে 'চট্টোপাধ্যায়' 'বন্দ্যোপাধ্যায়' 'মুখোপাধ্যায়' প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়াছে। এগুলি যে গ্রামের নাম তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও 'গাঁই' শব্দ দ্বারা তাহার স্পষ্ট উল্লেখ সূচিত হইতেছে। কৃত্তিবাসের সময়েও (চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী) নামের এই সংস্কৃতাত্মক পরিবর্ত্তন হয় নাই, কবি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে 'মুখুটি' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কি ভাবে তাহারা পরিহাস-কেশবের মন্দিরের পার্শ্বে প্রাণ দিয়াছিল, তাহা উচ্ছ্বসিত কবিতার ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন (২২৬ পৃঃ)। কলহণ লিখিয়াছেন, "এই মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী সৈন্য সেদিন যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিল, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও বুঝি তাহা পারিতেন না।" অথচ কবি এই বাঙ্গালী বীরদের ঘোর শত্রু ছিলেন। রঘুবংশে লিখিত আছে, "বঙ্গীয় নৃপতিগণ রণতরীতে আরোহণপূর্ব্বক" রঘুর দিগ্বিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধ এরূপ ঘোরতর হইয়াছিল যে, যুদ্ধ জয় করিয়া রঘু "গঙ্গামধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন।" (রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ।) যে সমুদ্র-গুপ্ত আসমুদ্র হিমাচল জয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও বঙ্গদেশ জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তিনিও এই দুরূহ কার্য্য সমাধা করিয়া সাগর-সঙ্গমে একটি স্মারক জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। কাব্যে, তাম্রশাসনে এবং অপরাপর বহুসূত্রে আমরা বঙ্গের বিজয়ী রণতরীর উল্লেখ পাই। ধর্ম্মপাল বঙ্গীয় দিগ্বিজয়ী সৈন্য লইয়াই তাঁহার অপ্রতিহত সমরাভিযান সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

একশত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী রণক্ষেত্রে দুর্দ্দান্ত ছিল। ইণ্ডিয়ান জারন্যালের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশপ হিবার লিখিয়াছিলেন, "যে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া লর্ড ক্লাইভ এরূপ আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিল।—"That little army with which Clive did such wonders was raised chiefly from Bengal." ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ঐতিহাসিক বলটন লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালীরা বহু রণক্ষেত্রে দেখাইয়াছে, তাহারা সাহসিকতায় য়ুরোপীয় সৈন্যদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।"—"The Bengalis have on many occasions shewn themselves in no way inferior to European troops in personal courage." ওয়ালটার হ্যামিণ্টন লিখিয়াছেন, "আমাদের ভারতীয় যুদ্ধগুলির ইতিহাসের আদিপর্ব্বে বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ আমাদের সৈন্যশ্রেণীর বহু দল সংগঠন করিয়াছিল এবং যুদ্ধে সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।" "At an early period of our military history in India they (the Bengalis) almost entirely formed several of our battalions and distinguished themselves as brave and active soldiers." ইহার পরে বোধ হয় বলা অন্যায় হইবে না যে, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর বাহুবল ও জগৎ শেঠ-প্রমুখ বাঙ্গালীদের অকুণ্ঠ অর্থ-সাহায্য ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিল। এখনও পুলিস ডিপার্টমেন্টে শত শত বাঙ্গালী কোন কোন সময়ে বন্ধু-বান্ধব ও [illegible]জনের ঘোর দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করিয়া—এমন কি বহু সময়ে প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহকারিতা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভারতের ছোটলাট ও বড়লাটগণ বারংবার [illegible] প্রশংসার সহিত তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেদিনও (২৬ শে নভেম্বর, ১৯৩৮) বড়লাট নয়া-দিল্লীতে ইনস্পেক্টর জেনারেলদের সম্মেলনে বলিয়াছেন,—"আমি এই সুযোগে বাঙ্গলা ও কলিকাতা পুলিসের বিশেষ সুখ্যাতি করিতেছি। আশা করি এ সম্বন্ধে আপনারা সকলেই আমার সহিত একমত হইবেন। যদিও আপনাদের সকলকেই বিপজ্জনক অবস্থা নিবারণ করিতে হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গলার ন্যায় অপর কোনও

প্রদেশে পুলিস-বাহিনীকে দুর্দ্দান্ত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ শত্রুর সহিত এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে হয় নাই। আমি এবং আমার গবর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিয়াছি যে, সম্প্রতি অবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বাঙ্গলা পুলিসের অবিচলিত রাজভক্তি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ক্রমাগত চাপ প্রদান···করিবার ফল।"—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ নভেম্বর, ১৯৩৪।

বাঙ্গালীরা যুদ্ধকালে দুর্দ্দান্ত হইলেও প্রভুভক্তিতেও তাহারা অসামান্য। বাঙ্গলার রাজরাজড়াগণই বিদ্রোহী হইয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের প্রভুভক্তির তুলনা নাই।

বাঙ্গলার রাজভক্তি।

শ্রীহট্টে নবাব হরেকৃষ্ণ ষড়যন্ত্রকারীর হাতে নিহত হইলে সেই শোকে (১৭০৯-১১ খৃঃ) তাঁহার প্রভুভক্ত সেনাপতি রাধানাথ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালীরা নিজেদের কথা নিজেরা লিখিয়া যান নাই, তখন বিদেশীদিগের প্রদত্ত অতি সামান্য বিবরণ এবং কাব্য-কথার প্রমাণই আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে লক্ষ্যা-ডুমুনী রাজার জন্য যাহা করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা রাজভক্তির উচ্চতর নিদর্শন জগতের ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য। পুত্রদের আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দিয়া রাজার জন্য রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সেই অভিযানে শাকা-শুখার মৃত্যু হইলে এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ না করিয়া স্বামীকে তাঁহার নিশ্চেষ্টতার জন্য গঞ্জনা করিয়া তাঁহাকেও সেই অসম সমরে প্রেরণ করিয়াছেন। বহু ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে এই একই কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এই ইতিহাস-মূলক কাব্যে এই ঘটনাগুলি নিছক গল্প বলিয়া মনে হয় না। আর এগুলি যদি শুধু গল্পই হয়, তথাপি রাজভক্তির আদর্শটা যে বাঙ্গালীর কত বড় ছিল তাহা গল্পগুলি পাঠে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

বাঙ্গালীর সামুদ্রিক অভিযানসম্বন্ধে দেশময় শত শত রূপ-কথা ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এক সময়ে ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি জাতির বিচার দ্বারা লৌকিক মতে আভিজাত্য

বাঙ্গালীর বিদেশে অভিযান।

নির্ণীত হইত না। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র দুইই পদ-প্রতিষ্ঠায় প্রায় সমকক্ষ ছিলেন; গুপ্ত ও পাল-রাজত্ব বৈশ্য-প্রাধান্যের যুগ, তখন বণিকেরাই প্রধান ছিলেন। চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর কাব্যের নায়ক ছিলেন। ইহাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব খুব বেশী ছিল না,—বণিকেরা ব্রাহ্মণের টোলে কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিতেন। ধনপতি সদাগর এক ব্রাহ্মণকে শুভদিন ধার্য্য করিতে আদেশ করেন, কিন্তু পুরোহিত-কথিত শুভদিনটি তাঁহার মনের মত হয় নাই, এজন্য ক্রুদ্ধ সদাগর "নফরে আদেশ করি মারে তাকে ধাক্কা।" অবশ্য পাল-রাজত্বের শেষদিকে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বৃদ্ধি পায়;—উহা দণ্ডপাণি, বৈদ্যদেব প্রভৃতির যুগ। এই বণিকদের সমুদ্রযাত্রা কেন নিষিদ্ধ হইল এবং সমাজে তাঁহারা কেন হীনতা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। নৈতিক অবনতি না হইলে কোন ব্যক্তি বা জাতির অধঃপতন হয় না।

এই অবনতির সূচনা আমরা কাব্য ও রূপকথায় পাইতেছি, তাহা ইতিহাসগ্রাহ্য না হইলেও খাটি সামাজিক চিত্র। ধনপতির স্ত্রী খুল্লনাকে লইয়া বণিক্-সমাজে যে ঘোঁট হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়—সেই সমাজের আদর্শ অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। মুরারি শীলের যে চিত্র কবিকঙ্কণ দিয়াছেন—তাহা প্রতারক ধূর্ত্তের। রূপকথায় বণিক্‌দের প্রতারণাসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে—

"কোনহ বেনে দারচিনি দিতে দরমুজ বাহির করে।
কোনহ বেনে কাহণের বস্তু বেচে সিকার দরে॥
কোনহ বেনে 'খাণ্ডারা' পাথর ঝাঁপিতে ভরিয়া থোয়।
ওরে মহামাণিকা, সাতামাণিক্য কয়ে লোকেতে বিকোয়॥"

(ঠাকুরদাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ, ২৯০ পৃঃ)

বাঙ্গালীর যাভা, বালী, সুমিত্রা প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অভিযানসম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা গবেষণা দ্বারা সুসংবদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গলা অক্ষর, বাঙ্গলা শিল্পাদর্শ, বাঙ্গালীর মত নাম এবং জাতীয় উপাধি ঐ সকল দ্বীপে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাস বালী দ্বীপে বাঙ্গলা গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি—অবিকল এদেশের ন্যায়—দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। জাপানী কাকাসু ওকাকুরা তাঁহার সুবিখ্যাত "Ideals of the East" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "Down to the days of the Mahamuden conquest went by the ancient highways of the sea the intrepid mariners of the Bengal-coast founding their colonies in Ceylon, Java and Sumatra binding Cathay (China) and India in mutual intercourse." [মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহসী বঙ্গীয় নাবিকগণ বিশাল সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়া সিংহল, যাভা, সুমিত্রা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্ব্বক চীন দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।] যে সকল কারণে এদেশে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকের ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। যে মর্ম্মান্তিক অত্যাচারের ফলে কূর্ম্ম স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহার পৃষ্ঠে দৃঢ় আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে, হিন্দুরাও সেইরূপ অত্যাচারে বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর ত্যাগ।

বাঙ্গালী সেই বুদ্ধদেবের সময় হইতে নিবৃত্তিমূলক ত্যাগের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছে। ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২২ জনই বৃহৎ বঙ্গের (সমেৎশেখরে) পার্শ্বনাথ পাহাড়ে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ও তাঁহাদের সমাধি সেইখানেই এখনও বিদ্যমান (১৩৪ পৃঃ)। ইঁহারা সকলেই রাজপুত্র ছিলেন এবং ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। আমরা ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও বাঙ্গালীরা যে অপূর্ব্ব ত্যাগ-মহিমা দেখাইয়াছেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজা বৃদ্ধ বয়সে রাজত্বের ভার

যুবরাজ মহেন্দ্রের উপর সমর্পণ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন (২৭৯ পৃঃ)। রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কথা সর্ব্বত্র বিদিত (২৭৪ পৃঃ)। বৈষ্ণব অধ্যায় বঙ্গের ত্যাগী মহাজনদের কাহিনীতে পূর্ণ। সপ্তগ্রামের ধনকুবের ও রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ দাস রাজভিখারীদের অগ্রণী (৭২১ পৃঃ)। তিনি শুধু সন্ন্যাসী ছিলেন না, অতি অল্প বয়সে রাজৈশ্বর্য্য ও "স্ত্রী অপ্সরা সম" ত্যাগ করিয়া যে কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অতি উচ্চ আদর্শ। সনাতন ও রূপ—দুই অতুল বৈভবশালী ভ্রাতা এবং তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব—রাজ-বৈভব পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা তিক্ত-কষায় বনফল খাইতেন এবং চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—তাঁহারা জঙ্গলের কোন একটি বৃক্ষের নীচে শুইলে পাছে সেই স্থানটির প্রতি আসক্তি জন্মে, এই জন্য নিত্য নূতন বনবৃক্ষের নীচে শুইতেন ("একৈক বৃক্ষের নীচে একৈক রাত্রি শয়ন"—৭১৭ পৃঃ)। আর একজন রাজ-সন্ন্যাসী নরোত্তম দাস—তিনি রাজসাহীর অন্তর্গত খেতুরির রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র ছিলেন। অতি অল্পবয়সে কৃষ্ণানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজত্ব দিয়া তিনিও রঘুনাথ দাসেরই মত কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন (৭৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)। বন-বিষ্ণুপুরের দস্যুরাজ বীর-হাম্বির তাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের পদে সমস্ত রাজ্যভার ফেলিয়া দিয়া তাঁহার রাজ্ঞী সুদক্ষিণাদেবীর সহিত ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর সংযমব্রত পালন করিয়াছিলেন (৭৫৩ পৃঃ)। গড়মারের রাজা চাঁদ রায়ও প্রথমতঃ দস্যুবৃত্তি করিতেন, তৎপরে গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন (৭৬০ পৃঃ)। বৈষ্ণব-অধ্যায়ে এইরূপ ধনকুবের ও রাজরাজড়াদের ত্যাগের কথা পথে-ঘাটে—সর্ব্বত্র। চৈতন্যের সহচর, নিত্যানন্দগতপ্রাণ স্বর্ণবণিক্-কুলগৌরব ক্রোরপতি উদ্ধরণ দত্ত এই দলের অন্যতম (৭১১ পৃঃ)। একশত বৎসর পূর্ব্বে পাইক-পাড়ার লালাবাবু এইরূপ ত্যাগ দেখাইয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। অতি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বঙ্গদেশ এত জন রাজ-সন্ন্যাসীর পুণ্যজীবন প্রকটিত করিয়া দেখাইয়াছে যে, তাহাতে স্বতঃই মনে হইবে,—এদেশ ত্যাগের দেশ—তপস্যার দেশ।

পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী লেখকেরাও সংস্কৃত হইতে মালমসলা কুড়াইয়া তাঁহাদের নিজের ছাঁচে ঢালিয়া পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

কথা-সাহিত্যে মৌলিকত্ব ও ভক্তযুগের ধারা।

তাঁহারা পূর্ব্বকাল হইতে বহু শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কোনটিই আক্ষরিক অনুবাদ নহে। তাঁহারা নিজেদের ছন্দে ঢালাই করিয়া তাহা স্বদেশের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাদের এই মৌলিকত্বের প্রমাণ দৃষ্ট হয়। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটায় যুদ্ধাস্ত্রগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তদ্দারা ভক্তির ফুল-হার নির্ম্মিত করা হইয়াছে, রণক্ষেত্রকে কীর্ত্তনভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে উড়িষ্যার কবিরা বাঙ্গালী কবি কবিচন্দ্রের এই নূতন ছাঁচে-ঢালা লঙ্কাকাণ্ডের অনুকরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর বৈষ্ণব কবিতার মৌলিকতাসম্বন্ধে গ্রন্থভাগে (৯৮৮-৯৫ পৃঃ) অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীরা যে গুপ্তযুগের ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার অজস্র নিদর্শন আমরা বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যে পাইয়াছি। বাঙ্গালীর প্রেমের আদর্শ যে গুপ্ত-যুগের কবি-দিগকেও স্থানে স্থানে ছাপাইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গুপ্তযুগের কবিরা অভূত-পূর্ব্ব প্রতিভা সত্ত্বেও কতকটা অলঙ্কার-শাস্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, রাজ-প্রাসাদ বা ঋষির আশ্রম ছাড়া তাঁহারা কদাচিৎ নিম্নে নামিয়া আসিয়াছেন—নিম্নশ্রেণী তাঁহাদের কাব্য ও নাট্যে অগ্রাহ্য। কিন্তু বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যে শ্রেণী-ভেদ, পদ-বৈষম্য এরূপ কোন গণ্ডী আদৌ নাই। এই কবিদের সাম্রাজ্য নর-হৃদয়,—সেই হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি, সৎসাহস, সংযম, ত্যাগ প্রভৃতি গুণের ভিত্তির উপর তাঁহাদের কবিত্ব-সৌধ প্রতিষ্ঠিত। কবিরা সমস্ত সামাজিক নিয়ম ও আইন কানুন অগ্রাহ্য করিয়া দুর্জ্জয় সাহসের সহিত স্বভাবের পথে চলিয়াছেন, চণ্ডালের বাড়ী অথবা বেদের নৌকা তাঁহারা অশুচিস্থান বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন নাই; বিবাহিত জীবন—তাঁহাদের প্রেমের বেড়া দিয়া আকাশ-বাতাস রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের রচনা অদ্ভুতরূপে মৌলিক হইলেও কবিরা কোন দম্ভ প্রকাশ করেন নাই; সেই লেখা অনাড়ম্বর, স্বাভাবিক ও অবাধ-গতি—তন্মধ্যে আদৌ প্রচার নাই। এই সকল গুণে আকৃষ্ট হইয়া ডা ষ্টেলা ক্র্যামরিস মহুয়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন,—সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে এই গল্পের জোড়া নাই; ডা সিল্‌ভ্যান লেভি লিখিয়াছেন, ফরাসী দেশের শীত-প্রধান আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া তিনি এই সকল গল্প পড়িবার সময়ে মনে করিয়াছেন, তিনি চির-বসন্তের রাজ্যে বিহার করিতেছেন, এবং সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী রোদনষ্টাইন বলিয়াছেন,—অজন্তা ও অমরাবতীর যে সকল অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছেন, এই সকল গল্পের নায়িকারা যেন সেই রমণীদেরই জীবন্ত লেখমালা। শ্রীমতী হেগ এই সকল গল্পের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা মন্দিরে উচ্চারিত স্তব-স্তুতির মতই শোনায়। তিনি ফরাসী দেশের সর্ব্বপ্রধান লেখক মাদাম দি লাফেয়েত্যি (Madam de Lafeitye) এবং মেটারলিঙ্কের রচনার খুঁৎ বাহির করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যের নায়িকারা একেবারে নিখুঁৎ এবং এই গল্পগুলির নায়িকারা সেক্সপীয়র ও রেসাইন-এর (Jean Racine) নারীচরিত্রের মত, য়ুরোপের ঘরে ঘরে পঠিত হওয়ার যোগ্য। "ইহারা জগতের চিরস্থায়ী গ্রন্থগুলির সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আসনের দাবী করে। যুগে যুগে পাঠকগণ এই গল্পগুলির নব নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবেন" (৩৪৮-৪০৬ পৃঃ)।

বাঙ্গলার স্থাপত্য ও শিল্পসম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিবার নাই; এক মসলিনই বঙ্গের শিল্প-কৃতিত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়বার্ত্তা বহন করিতেছে। বাঙ্গলা ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলির মন্দিরগুলিতে যে সকল শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হণ্টন লিখিয়াছিলেন:—

শিল্প ও স্থাপত্য।

ইহাদের একটি যদি য়ুরোপে থাকিত, তবে তাহা দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে কত যাত্রী ভিড় করিত, কত লেখক বড় বড় পুস্তক লিখিয়া, ইহাদের রচকের নাম, ধাম, আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যয় ও কর্ম্মীদের প্রতিভা সম্বন্ধে যশ ঘোষণা করিতেন; কিন্তু এই অসাধারণ

প্রতিভাশালী শিল্পিগণ নাম-গোত্র হারাইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অমানুষী কীর্ত্তি অরণ্যে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতেছে (৯২০-২১ পৃঃ)।

বাঙ্গালীর মনস্বিতা সর্ব্বজন-সম্মত। আমরা ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিবার পর তাঁহারা আমাদের যে গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

মনস্বিতা।

মেদিনীপুরের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের ন্যায় বঙ্গদেশে তখন অনেক বিদ্বান্ ছিলেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, "ইনি বিদ্যা-গৌরবে আমাদের ডা° জনসনের তুল্য।" মার্সম্যান লিখিয়াছেন—"ইনি আধুনিক যুগের সর্ব্ব-প্রধান পণ্ডিতদের অন্যতম।" প্রতাপাদিত্য-চরিত-লেখক রাম বসু সম্বন্ধে কেরি লিখিয়াছেন, "ইঁহার অপেক্ষা বিদ্যানুরাগী লোক আমার চোখে পড়ে নাই।" রাজা রামমোহন-সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ অ্যাডামস্ সাহেব লিখিয়াছেন, "জগতে ইঁহার তুল্য ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জন্মেন নাই, কখনও জন্মিবেন না।" বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সভার সভাপতি রামমোহনকে অভিনন্দন দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভূপর্য্যটক নাবিকগণ দক্ষিণ-মেরুর 'স্বর্ণক্রুস'-আখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ সর্ব্ব-প্রথম দেখিয়া যেরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন, আপনাকে দেখিয়া আমাদের সেইরূপ বিস্ময় হইয়াছে। আজ যদি প্লেটো, সক্রেতিস, মিল্টন কিংবা নিউটন সশরীরে এখানে আবির্ভূত হইতেন, তাঁহাদিগকে আমরা যেরূপ ভক্তির অর্ঘ্য ডালি দিতাম, আপনাকে তাহাই দিয়া এই অভিনন্দন করিতেছি।" সেদিনও গোখ্‌লে ভারত-ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে জে. সি. বোস এবং পি. সি. রায়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক, রাসবিহারী ঘোষের ন্যায় আইনজ্ঞ ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি আর কোথায় পাইব?"—কিন্তু এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিভাশালী লোক বঙ্গের ইতিহাস-সিন্ধুর সিকতাভূমির কয়েকটি বালুকা-কণা মাত্র। দীপঙ্করসম্বন্ধে তিব্বতের লোকগণ বলিয়াছিল, "স্বয়ং বুদ্ধদেবও এতটা সম্মান পান নাই, যতটা ইনি পাইলেন" (৩৩৩ পৃঃ)। বাঙ্গালীর নব্যন্যায় সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতার সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পার্ব্বতী তর্কতীর্থ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে একজন জার্ম্মান ও একজন ইংরেজ প্রায় দুইবৎসর কাল এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া—ইহা অতীব জটিল ও তাঁহাদের বুদ্ধির দুরধিগম্য মনে করিয়া পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী যেরূপ জ্ঞানে বড়—হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিতে সে তদধিক বড়। তাহার হৃদয়ের কোমলতামিশ্র দার্ঢ্য বুঝাইতে যাইয়া একখানি চিত্রের প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমরা নিরস্ত হইব,—তাহার সম্বন্ধে প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়া আমরা অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দিব না। সমস্ত প্রশংসা ও উচ্ছ্বাস চৈতন্যদেবের পাদ-পীঠের নীচে পড়িয়া থাকিবে।

বাঙ্গালী রমণীর অদম্য সাহস ও একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া শত বৎসর পূর্ব্বে হটন সাহেব লিখিয়াছিলেন, "তাঁহাদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও প্রাণ-সমর্পণ অনন্ত চিন্তার শিখাকেও অতিক্রম করিয়া স্বর্গের নিকটতর হইয়াছে" (৯১৪ পৃঃ)।

"তোমাকে কি ভাঙ, সিদ্ধি বা অন্য কোন নেশা খাওয়াইয়াছে? এলোচুলাদি অগ্নি-ক্ষয়

গায় লাগিলে ফোস্কা পড়ে এবং অসহ্য যন্ত্রণা হয়, আর সমস্ত দেহটা পুড়িয়া ছাই হইবে, তখন তোমার আর্ত্তনাদ ও 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' চীৎকার ঢক্কা-নিনাদে চাপা পড়িবে—কেহ শুনিতে পাইবে না, তোমার শরীর দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা থাকিবে—তোমার পলাইবার পথ থাকিবে না—অবস্থাটা কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ ?" বঙ্গের লাট হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গী এক পাদ্রী এদেশের একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া রূপবতী যুবতীকে সহমরণের সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার জন্য এইভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রমণী প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার কানে এসকল কথা পৌঁছিল কি না পৌঁছিল, তাহা যেন প্রথমতঃ বুঝাই গেল না। তার পর যখন রমণীর কাণ ঝালাপালা হইতে লাগিল, কিছুতেই পাদ্রীর বক্তৃতা থামে না, তখন তিনি একটা বাতি আনাইলেন ও নীরবে সেই বাতিটার মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। যেরূপ ভাবে মোম গলিয়া যায়, অঙ্গুলীটি সেই ভাবে পুড়িয়া গলিয়া গেল, অগ্নি কব্জি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। ভীত ও বিস্মিত ভাবে লাট হ্যালিডে লিখিয়াছেন, একটা রাজ-হাসের পালকের কলম যেরূপ পুড়িয়া ছাই হয়, সেই ভাবে সমস্ত আঙ্গুলটি পুড়িয়া গেল। রমণী নিবাতনিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় বসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার মুখের ভাবে কোন সামান্য পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিলাম না। পাদ্রী ভয় পাইয়া রমণীর হাতের আগুন নিবাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালী রমণীর একনিষ্ঠ সতীত্বের যে সকল নিদর্শন এক শত বৎসর পূর্ব্বে দেখা যাইত, অনেক উচ্চমনা সাহেব অকুণ্ঠিত ভাবে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। সহমরণোন্মুতা এক রমণী স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন বলিয়াছিলেন, "আপনাকে কেহ বাঁধিতে পারিবে না, আপনি চিতা হইতে উঠিতে চাহিলে আপনার কোন বিঘ্ন জন্মান হইবে না, এইভাবে আপনি প্রাণ দিতে পারেন ?" রমণী তাহাই করিলেন,—বাসর-শয্যায় যেরূপ তিনি স্বামীর সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, সেইভাবেই তিনি তাঁহার চিতা-সঙ্গিনী হইলেন। এই সকল দৃশ্য হটনের চোখের সামনে ছিল, এইজন্য তিনি লিখিয়াছিলেন—ইহাদের প্রেম ও ত্যাগ জলন্ত চিতার শিখাকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গের দ্বারে পৌঁছিয়াছে (১৯১৩-১৪ পৃঃ)।

সহমরণ।

সেদিন পর্য্যন্তও জগৎ শেঠেরা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন, ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। জড় জগতের ঐশ্বর্য্য বাঙ্গালী প্রমত্ত হইয়া ভোগ করে, এবং যখন সময় উপস্থিত হয় তখন অপ্রমত্ত হইয়া তৃণের ন্যায় তাহা ত্যাগ করিতে পারে ; বাঙ্গালী ঘটিকা-যন্ত্রের দোলন-দণ্ডের ন্যায় দুই বিরুদ্ধ সীমার মধ্যে অতি সহজে আনাগোনা করে। বাঙ্গালী চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। আজ চিত্তরঞ্জন বিলাসী বাবু, ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, কাল চিত্তরঞ্জন বিরাগী ফকির। নিজের বাস-গৃহখানি পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন।

আমার কার্য্যের ক্ষেত্র বিরাট্। এই বইখানি লিখিতে যাইয়া আমার বারংবার মনে হইয়াছে—এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও ভারতীর

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য-সমূহের তন্ন তন্ন অনুসন্ধান হয় নাই; এখনও এদেশের এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহের শিলালেখ ও তাম্রশাসন প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার পায় নাই; এখনও শ্যাম, কাম্বোডিয়া, যাভা, বালী, সুমিত্রা এবং অপরাপর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে যেথায় যেথায় বাঙ্গলার উল্লেখ আছে, এবং সেই সেই দেশের ভাস্কর্য্যে এতদ্দেশীয় শিল্পাদর্শ কি পরিমাণে বিদ্যমান, ভাল করিয়া তাহার খোঁজ হয় নাই; বাঙ্গলা অক্ষর কোন্ কোন্ দেশে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল, এখনও তাহা আমরা সূক্ষ্মভাবে সন্ধান করিয়া দেখি নাই; চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধান করিতে এখনও বিলম্ব আছে,—এমন কি এদেশের অতি সান্নিধ্যে নেপাল, তিব্বত, ভুটান, রেঙ্গুন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাঙ্গালীরা যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আভাসে মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে; এখনও খাস বাঙ্গলা ও উড়িষ্যাদেশে বহু ঢিপি, ভগ্ন প্রস্তর, ইষ্টকগৃহের অবশেষ ও প্রাচীন বহুসংখ্যক সুবৃহৎ দীঘি ঐতিহাসিকের দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া আছে। এখনকার ঘোর অর্থনৈতিক সমস্যা উত্তীর্ণ হইয়া যদি বাঙ্গালী জাতি জগতে টিকিয়া থাকিতে পারে, তবেই ভবিষ্যকালে এদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সম্ভাবনা হইবে, আমি দিন-মজুরের খাটুনি খাটিয়া মাত্র কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিদায় লইতেছি। কাম্বোডিয়াতে বাঙ্গলার রূপকথা অনেকগুলি প্রচলিত আছে; এবং তান্ত্রিক 'হেবজ্র' যে বাঙ্গলা দেশ হইতে কাম্বোডিয়া ও যাভা গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ডাঃ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়ের কাম্বোডিয়া সম্বন্ধীয় পুস্তক দ্রষ্টব্য। *

প্রাদেশিক ইতিহাস।

সম্প্রতি যাভা, সুমিত্রা, রেঙ্গুন এবং ব্রহ্মদেশের স্থাপত্যে যে বাঙ্গলাদেশের বিশেষ প্রভাব ছিল, এমন কি বাঙ্গালী স্থপতিরাই ঐ দেশগুলির মন্দিরাদির গঠন-প্রণালী তত্তদ্দেশের লোকদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। যাভার প্রম্বনমের নিকটবর্ত্তী চণ্ডীলোন, সেরয়াঙ্গ এবং চণ্ডীসিউ মন্দিরের গঠন ঠিক পাহাড়পুরের সম্প্রতি-আবিষ্কৃত মন্দিরের ন্যায়। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এরূপ স্থাপত্য-রীতি দেখা যায় না। এদিকে যাভার ঐ সকল মন্দির ৮ম-৯ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু পাহাড়পুরের স্থাপত্য ৫ম কি ৪র্থ শতাব্দীর, অর্থাৎ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের। কে. এন. দীক্ষিত বলেন যে, এতদ্দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রম্বনমের মন্দিরগুলির পূর্ব্বাদর্শ—বাঙ্গালী স্থপতির এই নির্ম্মাণ-পদ্ধতি। (দীক্ষিত মহাশয় লিখিত গবর্নমেণ্ট আরকিওলজিকাল রিপোর্ট,

* Images of Hebajra have been quite recently discovered from Angkor Hom (as the writer heard from Mr. Finot). This is a Tantrik divinity of the Buddhists (which is Saiva in its attributes) introduced into Tibet and Nepal from Bengal during the Pal-period."
—Indian Influence on Cambodia, p. 261.

১৯২৬-২৭ খৃঃ)। শ্রীযুক্ত এ. কে. কুমারস্বামী তাঁহার 'India and Indonesia' নামক পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশের পেগান-মন্দির-সমূহের কারুকার্য্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং দেওয়ালের গায়ে আঁকা চিত্রগুলি বাঙ্গলা এবং নেপালের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। গৌড়েশ্বর পাল-রাজদের আশ্রয়ে নালন্দা ও বিক্রমশিলা-বিহারের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। নালন্দা-বিহার সমস্ত প্রাচ্য এসিয়ার কেন্দ্র-ভূমি-স্বরূপ ছিল। এই কেন্দ্র হইতে বাঙ্গলার শিল্প ও স্থাপত্য দেশে দেশে অভিযানপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল।

এই ভূমিকার প্রথমে যে কয়েকখানি বঙ্গের ইতিহাস লিখিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাদেশিক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, ইহাদের অনেকগুলি আমার নিকট আছে। তন্মধ্যে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিত 'যশোর-খুলনার ইতিহাস,' অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি লিখিত 'শ্রীহট্টের ইতিহাস,' যতীন্দ্রমোহন রায় কৃত 'ঢাকার ইতিহাস,' যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস,' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গলার ইতিহাস,' কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত 'ময়মনসিংহের ইতিহাস,' শুক্রেশ্বর, বাণেশ্বর এবং অপরাপর বহু লেখক প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'রাজমালা,' (কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত), শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস,' কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত 'রাজমালা,' আশুতোষ চৌধুরী প্রণীত 'ত্রিপুরার কথা,' রাধারমণ সাহা প্রণীত 'পাবনার ইতিহাস,' এচ. ডব্লিউ. বি. মরেনো প্রণীত 'পাইকপাড়া রাজ এবং কান্দিরাজ' (ইংরেজী), রায় বাহাদুর কালিকাদাস দত্ত প্রণীত 'কুচবিহারের ইতিহাস' (ইংরেজী), আনন্দচন্দ্র রায় প্রণীত 'বারভুঞা' এবং 'ফরিদপুরের ইতিহাস,' নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত পঞ্চ-খণ্ডে প্রকাশিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,' 'ময়ূরভঞ্জের ইতিহাস' ও 'কামরূপের ইতিহাস' (শেষোক্ত দুই ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিত), মুকুন্দ পালচৌধুরী প্রণীত 'মণিপুরের ইতিহাস,' বরেন্দ্র অনুসন্ধান সোসাইটি প্রকাশিত 'গৌড়ীয় লেখমালা,' রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস,' সুজননাথ রায় প্রণীত 'উলা বা বীরনগর,' আশুতোষ চৌধুরী প্রণীত 'চট্টল ভূমি,' নিখিলনাথ রায় প্রণীত 'মুরশিদাবাদের কাহিনী,' তমোনাশ দাস সম্পাদিত ও অনূদিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ,' অভয়পদ মল্লিক প্রণীত 'বিষ্ণুপুরের ইতিহাস,' মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা প্রণীত 'রাজাবলী' (পঞ্চম সংস্করণ, ১৮১০ খৃঃ), প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মহানাদ,' নগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত 'নদীয়া কাহিনী,' কালিদাস দত্ত রচিত সুন্দরবন সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ, রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'সেকাল আর একাল,' হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'লোহাগড়ের কাহিনী,' খগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'মহেশ্বরপাশা,' বিজয়চন্দ্র নাগ প্রণীত 'নাগবংশের ইতিহাস,' হেমলতা সরকার প্রণীত 'স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র' (ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাস), অরুণচন্দ্র সেন এবং বিমানচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'সোনার বাংলা,' কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'বঙ্গের রত্নমালা,' মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত 'চাষী পোদদের ইতিহাস', বিনয়চন্দ্র সেন প্রণীত 'বৌদ্ধজাতক' (ইংরেজী), বেভারিজ সাহেব কৃত 'বাখরগঞ্জ জেলার

ইতিহাস,' প্রভাসচন্দ্র সেন প্রণীত 'বগুড়ার ইতিহাস,' হরগোপাল দাসকুণ্ডু প্রণীত 'সেরপুরের ইতিহাস ও মহাস্থানের ইতিহাস,' অধ্যাপক জে. এন. দাসগুপ্ত প্রণীত '১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর বাঙ্গলা' (ইংরেজী), রাজকুমার মহিমানিরঞ্জন প্রণীত 'বীরভূম-বিবরণ,' মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত বহু বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের জীবন-চরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালিক বঙ্গীয় সমাজ,' চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত 'বাঙ্গলার বীর,' অমূল্যধন রায় ভট্ট প্রণীত 'দ্বাদশ গোপাল,' স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত 'সুবর্ণগ্রামের (সোনার গাঁয়ের) ইতিহাস,' নবীনচন্দ্র ভদ্র প্রণীত 'ভাওয়ালের ইতিহাস,' রাজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'বাঙ্গালীর বল,' উপেন্দ্রচন্দ্র কর প্রণীত 'বিশ্বজননী ভারতমাতা,' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'বঙ্গদেশে লুপ্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের চিহ্ন' (ইংরেজী), হলায়ুধ মিশ্র কৃত 'সেক শুভোদয়া,' সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত 'রামচরিত,' রোহিণীকুমার সেন প্রণীত 'বাকলার ইতিহাস,' খোসালচন্দ্র রায় প্রণীত 'বাখরগঞ্জের ইতিহাস,' গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট প্রণীত 'বল্লালচরিত,' পীরমহম্মদ কৃত 'সমসের গাজীর গান,' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত 'সিরাজুদ্দৌলা,' দুর্গাচরণ সান্যালের 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস,' 'ইসা খাঁ,' 'ফিরোজসাহ,' 'সুজা বাদসাহ' প্রভৃতি বহু পল্লীগীতি, উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'জাতিতত্ত্ব-বারিধি', সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি,' ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক প্রণীত 'উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাস,' ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস' (ইংরেজী), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবাবী আমল,' ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও রমাপ্রসাদচন্দের বঙ্গের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ ও মৌলিক প্রবন্ধ, ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় প্রণীত 'উত্তর-ভারতের রাজাদের বংশাবলী' (ইংরেজী) এবং ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত 'প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস' (ইংরেজী), মণীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত 'সহজিয়া-সংক্রান্ত পুস্তক' (ইংরেজী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু যিনি বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার ইতিহাস সম্পর্কে এই যুগে অনেক কিছু করিয়াছেন, তাঁহার কথা আমি এপর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের জন্য চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাস এদেশের ঐতিহাসিকগণের অপরিহার্য্য সঙ্গী হইবার দাবী রাখে; তাহাতে বিজ্ঞানসঙ্গত এত মালমসলা সংগৃহীত হইয়াছে যে বইখানি পড়িলেই বুঝা যায়, অপর্য্যাপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণ তাঁহার লেখনী-মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—শৃঙ্খলার অভাবে সেগুলি সুসংবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায় নাই। পুস্তক দুই খণ্ড পড়িলেই অনুমিত হইবে, গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক বেশী জানিতেন এবং তিনি যাহা জানিতেন, তাহাও সুবিন্যস্ত করিয়া লিখিবার তিনি সময়-সুবিধা পান নাই। তাঁহার অল্পস্থায়ী জীবন মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, বাঙ্গলা ও কলিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বিদ্যুৎ-চমকের দীপ্তি দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে,—তাহা আমাদিগকে একটা অপর্য্যাপ্ত ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে, স্থির ও নিশ্চিত আলোকে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার সুবিধা দেয় নাই। [illegible] কথায়

রাখালদাস।

তাহার উদ্‌ঘাটিত দৃশ্যাবলী—"ভাল করি পেখন না ভেল, মেঘ-মালা সঞে তড়িৎ লতা জনু"—[illegible]কে বহু সম্ভাবনার আশা দিয়া গিয়াছে। তাঁহার ইতিহাসগুলি জন-সাধারণের পাঠ্য হয় নাই, উহা শুধু ঐতিহাসিকদিগেরই পাঠ্য।

আর একখানি ইতিহাসের কথা এখানে লিখিব,—ইহা জয়চন্দ্র মুন্সী কৃত কুচবিহারের ইতিহাস। এই পুস্তকখানি ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ফুলস্কেপ কাগজের কোয়ার্টো আকারে ৪৬৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রথম ভাগটা কতকগুলি গল্পের সমষ্টি হইলেও ৩৩ পৃঃ হইতে ৪৬৯ পৃঃ পর্যন্ত ইহার প্রদত্ত বিবরণী বিশ্বাসযোগ্য ও বিচারসহ। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহার একমাত্র হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে।

জয়চন্দ্র মুন্সী।

উপসংহারে বাঙ্গলার ইতিহাসসম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নাম অতীব শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করিব। রিক্ত-হস্তে কোনরূপ স্কুল-কলেজের শিক্ষা না পাইয়া এই ক্ষণজন্মা পুরুষ দেশের ইতিহাসের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাতে মানুষ একনিষ্ঠ তপস্যা-দ্বারা কিরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহা উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কতকগুলি সন্দেহজনক কুলজি লেখকের উপরে অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিয়া, তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি যদি মাঝে মাঝে বিকৃত না করিতেন, তবে তিনি ঐতিহাসিক জগতে চক্রবর্ত্তীর আসন দাবী করিতে পারিতেন। প্রসিদ্ধ লেখক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন; বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলিব, "আমরা সই, যে জয়া তার সঙ্গী হই।" আমাদের ইহাই অমোঘ রাজনীতি।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

ইতিহাস বিভাগে বঙ্গের সুসন্তান রাজকুমার শরৎকুমার রায়ের নাম সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। ইনি কোন আড়ম্বর ও প্রতিষ্ঠার লোভী না হইয়া বাঙ্গলার ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন—এবং বহু অর্থ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া জাতীয় ইষ্টের প্রতি স্থিরলক্ষ্য হইয়া অপর লোকের আড়ালে কাণ্ডার চালাইয়াছেন এবং অকুণ্ঠিত ভাবে নিজের প্রাপ্য যশের ভাগ অপরকে দিয়া মহাপ্রাণতা দেখাইয়াছেন।

শরৎকুমার।

বর্ত্তমান কালে কে. এন. দীক্ষিত, দেবদত্ত ভাণ্ডারকার, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, হেমচন্দ্র রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ননীগোপাল মজুমদার, বিনয়চন্দ্র সেন, রাধাগোবিন্দ বসাক, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বিজনরাজ চ্যাটার্জ্জি, বিমানচন্দ্র মজুমদার, কালিদাস নাগ, প্রবোধ-চন্দ্র বাগচী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মনীষী ঐতিহাসিক উচ্চস্তরের গবেষণার দ্বারা এদেশের ভাবী ইতিহাসের পথ সুগম করিতেছেন। শিল্পের ইতিহাসে ষ্টেলা ক্র্যামরিশের প্রচেষ্টা তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহা স্বর্ণমূল্যে বিকাইবে।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ।

আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লইয়া জীবন কাটাইয়াছি, ইতিহাস-ক্ষেত্রে আমি অপরিচিত

পূর্ব্বোক্ত কৃতী অধ্যাপকের দল পদে পদে আমার ত্রুটি পাইবেন। তাঁহারা দোষগ্রাহী হইলে আমার অনিচ্ছা-কৃত ও অজ্ঞানতা-প্রসূত অপরাধ সহজেই আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

এই পুস্তকের বিষয় ও আমার অক্ষমতা।

এই পুস্তকে সিংহলী ও বঙ্গভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি (৬৫-৬৭ পৃঃ); জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছি (১২৮-৫২ পৃঃ); নব্য-ন্যায় ও স্মৃতির মত জটিল ও একান্ত দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজের অসামর্থ্য বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি (৩৫৩-৭১ পৃঃ)। বৌদ্ধ বিহার (৩০০-০৪ পৃঃ), নবদ্বীপের টোল (৩৪৬-৫২ পৃঃ), বাঙ্গলার গণিত, মসলিন, রেশমের ব্যবসায়, কৃষিতত্ত্ব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম (৫৬৮-৮৯ পৃঃ), তন্ত্রশাস্ত্র (৫৭৯ পৃঃ), সহজিয়া, মস্করীদের চিত্র, শঙ্খ-ব্যবসায় (৯২৮ পৃঃ), কৌলীন্য (৫৯৬ পৃঃ) ও শিল্পসম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা (৪৩০, ৬৬৬, ৮৮৮-৯২ পৃঃ) দীপঙ্কর, জয়দেব, মহাপ্রভু চৈতন্য ও তাঁহার বহুসংখ্যক পার্শ্বদগণের জীবনী, এবং নানা প্রাদেশিক ইতিবৃত্ত (পরিশিষ্টাংশ) লইয়া আমি চর্চ্চা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এমন দেবতার নৈবেদ্য নাই, যাহাতে চঞ্চুর আঘাত না করিয়াছি। এজন্য আমাকে অনেক পুস্তক পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ বা সাহায্য আমি খুব কমই পাইয়াছি। আমি যে সকল বিষয় লইয়া আজীবন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে কিছু নূতন তথ্য পাঠকগণ সম্ভবতঃ পাইবেন। এক্ষেত্রেও আমার মনস্বিতা বা প্রতিভার দাবী নাই, দিন-মজুরের পারিশ্রমিকের দাবী। পুস্তকখানি আমি নানারূপ গুরুতর সমস্যা-দ্বারা জটিল করি নাই; নানারূপ বিভিন্ন মতের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের কোন চেষ্টা করি নাই, আমার সেরূপ পাণ্ডিত্যও নাই। ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বা উপগল্প, তাহার যে মূল্যই থাকুক না কেন, তাহা আমি বাদ দিই নাই। তাহা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের বিচারাধীন করিয়াছি; কারণ জাতীয় ইতিহাস-গঠনের প্রাক্কালে সামান্য খড়কুটোরও কিছু মূল্য আছে,—কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে;—যাহা আজ উপেক্ষিত হইতেছে, হয়ত ভাবী আবিষ্কারের আলোকপাতে কালে তাহার একটা মূল্য দাঁড়াইতে পারে।

এই পুস্তকের ভাষা হয়ত ঠিক বিজ্ঞান-সঙ্গত, ওজন করা, নির্লিপ্ত ঐতিহাসিকের ভাষা হয় নাই। আজ বঙ্গের শ্মশানের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী লেখক যদি মাঝে মাঝে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন, কিংবা কিছু বিচলিত হইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন—তবে আশা করি তিনি ঐতিহাসিকগণের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

বিজ্ঞান-সঙ্গত উচ্ছ্বাস-হীন যুক্তিমূলক ভাষা।

বিশেষ এই পুস্তক শুধু ঐতিহাসিকগণের জন্য লিখিত হয় নাই, বঙ্গের জনসাধারণের মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগ্রৎ করা আমার অন্যতম লক্ষ্য। নীরস ও শুষ্ক গবেষণায় তাহারা আকৃষ্ট হইবে না—এজন্য যদি রস-সঞ্চারের অভিপ্রায়ে ভাষায় মাঝে মাঝে কিছু রং ফলাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাতে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপের লেখকগণ ক্রাইষ্টের জন্ম ও তৎকৃত অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে সাধারণতঃ নীরব, নিজেদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের

শুচিতা তাঁহারা রক্ষা করেন,—আমাদের ঐতিহাসিক বিষয়গুলির অধিকাংশ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত জড়িত, সেই বিশ্বাসে হানা দিতে তাঁহাদিগের একটুও বাধে না,—এই জন্য আমাদের ইতিহাসের আলোচনা-কালে তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক হইয়া বসেন। হুইলার সাহেব যখন লিখিলেন, কৌশল্যা নিশ্চয়ই দশরথকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিলেন, তখন তৎকৃত ইতিহাসখানি বাঙ্গলার স্কুলে স্কুলে পাঠ্য করিতে কাহারও আপত্তি হইল না—ইহাই বিজ্ঞান-সঙ্গত আলোচনা। আমাদের মূক জনসাধারণের একটা প্রখর অনুভূতি আছে—এই ভাবের গবেষণা তাহাদের মর্ম্মান্তিক হয়; কিন্তু তুলসীতলা হইতে হাতের নোয়া পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, গবেষণার সময়ে হিন্দু লেখকের তাহা একটু মনে রাখিলে ভাল হয়—তাহা না হইলে জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ-সূত্র ছিন্ন হইবে। আমাদের জনসাধারণ একান্ত অবজ্ঞার যোগ্য নহে, তাহাদের গোঁড়ামি সত্ত্বেও তাহারা বঙ্গের নিজস্ব ভাব, ধর্ম্ম ও শিল্প কতটা বজায় রাখিয়াছে, তাহা এই পুস্তকের পাঠক অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন। ইহাদের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক পাদ্রী লিফ্রয় তাঁহার ভারতীয় অগাধ অভিজ্ঞতার বলে জানাইয়াছেন, "হিন্দুচাষা অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক ও নীতিঘটিত আলোচনা করিতে পারে। এই চাষারা একেবারে নিরক্ষর ও দরিদ্র।" ("A very competent and independent witness Dr. Lefroy has testified from his long personal experience to the extraordinary aptitude with which the poorest and the most illiterate Hindu peasant will engage in discussion in the deepest philosophical and ethical questions." হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, "The Indian painters though illiterate in the western sense are the most cultured of their class in the world." (Introduction, xix, Ideals of the Indian Art, E B. Havell.) ভারতবর্ষের পটুয়ারা পাশ্চাত্য-মতে মূর্খ, কিন্তু জগতের চিত্রকরদের মধ্যে তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা সকলের উপরে। এ সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য যে বাঙ্গলার লেখকবর্গ এদেশের ইতিহাস লিখিতে গিয়া একটু শ্রদ্ধার সহিত লিখিলে ভাল হয়, এই পুস্তকের ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় সাহেবদের রামায়ণ ও মহাভারতাদি সম্বন্ধে যে মতামত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অসার ও অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক মতগুলির তাঁহারা যেন প্রশ্রয় না দেন। মুসলমানদের জাতীয়তা অনেক বেশী, তাঁহাদের বিশ্বাসসম্বন্ধে কেহ কিছু লিখিতে সাহসী হন না। ইংরেজ রাজার জাতি—তাঁহাদের ইতিহাস লইয়া কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না। একমাত্র হিন্দু সমাজই এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় গবেষণাশীল লেখকদের যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন।

আমার এই পুস্তক ভাবী ঐতিহাসিকগণের পক্ষে একখানি পাদপীঠরূপে গণ্য হইলে ধন্য হইব। তাঁহারা ইহার উপর দাঁড়াইয়া বঙ্গ-জননীর যে মহিমান্বিত প্রতিমা গড়িবেন, সেই শুভ-স্বপ্ন আমার সমস্ত শ্রমকে সার্থক করিয়াছে, এই পরিকল্পনা আমার লেখনীকে বলযুক্ত

ও আশান্বিত করিয়াছে। আমি বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা পুণ্যতীর্থ জানি না, বাঙ্গলা ভাষা যাহা আমি মাতার নিকট শিখিয়াছি, যাহাতে আমার স্ত্রীপুত্রকন্যা কথা বলিয়া আমার শ্রবণে অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন, সেই ভাষার মত এমন সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য আর কোন ভাষা আমি জানি না; আমার কর্ণে কোকিল-পাপিয়া-কণ্ঠে এরূপ কল-তান নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের মত এমন ভাব ও কবিত্বের খনি আমি কোথাও পাই নাই। আমি বিশ্ব-প্রেমিক নহি, আমি একান্ত ভাবে প্রাদেশিক, তাহাতে কেহ যদি মনে করেন, আমি যুগোপযোগী নহি,—আমি ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু অগ্রগতিশীল সভ্যতার পশ্চাৎ-ভাগে কূপমণ্ডুক হইয়া পড়িয়া আছি,—তবে সেই অভিযোগের আমি প্রতিবাদ করিব না, আমি তাহাই। আমার এক মাত্র গর্ব্ব আমি মায়ের ছেলে—তাঁহার হাতের ধান-দূর্ব্বা ও আশিসের অপেক্ষা আমার কাছে বড় কিছুই নাই।

কেন বৃটিশ অধিকারের ইতিহাস লিখিত হইল না।

এই পুস্তকে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত লিখিয়া ইহা শেষ করিলাম, পরিশিষ্ট-খণ্ডে প্রাদেশিক রাজ্যগুলির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পরের ঘটনাগুলি দোষগুণে নানা জটিলতা-যুক্ত হইয়া আছে। এই সময়ে তাহার যথাযথ বিবরণ দিতে পারিলাম না। এখন এই দেশ একটা উত্তেজনার মধ্য দিয়া চলিতেছে। সরকার সন্দিগ্ধ, এবং দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত। এ দেশের লোকের পক্ষে অন্নই জীবনের প্রধান সম্বল, কিন্তু জ্বর হইলে চিকিৎসক অন্ন বন্ধ করিয়া দেন, সেইরূপ যদিও ঐতিহাসিকের পক্ষে সত্যই সর্ব্বদা অবলম্বনীয়, এই বিকৃত ও উত্তেজিত যুগে সত্য কথা এখন নিরাপদ্ নহে। আশা করি, অচিরে এই রাজনৈতিক ঘনঘটা কাটিয়া যাইবে, তখন বৃটিশ-অধিকারে আমাদের কত দিক্ দিয়া কত উপকার হইয়াছে, এবং জাতীয় সম্পদ্ কোন্ দিকে বাড়িয়াছে, এবং কোন্ দিকে কমিয়াছে—তাহার একটা হিসাব-নিকাশ করার সময় হইবে। তখন যদি আমার সামর্থ্য থাকে ও আয়ুতে কুলায়, তবে "বৃটিশ-অধিকারে বাঙ্গলা" শীর্ষক এই পুস্তকের পরবর্ত্তী খণ্ড প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইংরেজেরা আমাদের একটা জিনিষ দিয়াছেন, যাহা অমূল্য—তাহা চোখের দৃষ্টি। কে ছিল অশোক, কে ছিল দীপঙ্কর, এমন কি কে ছিল শিবাজী ও রণজিৎ সিং—কে ছিল প্রতাপাদিত্য ও কে ছিল সীতারাম, কোথায় ছিল নালন্দা ও বিক্রমশিলা,—এক কথায় এই বিরাট্ ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের কাছে বঙ্গদেশও অন্ধকারময় ছিল। ইংরেজের কাছে চক্ষুদান পাইয়া আমরা আজ জাগিয়া উঠিয়াছি। এই চক্ষুদান অপেক্ষা বড় দান কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। তাঁহারা আমাদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছেন—এ বিষয়ে কোন মতান্তর হইতে পারে না।

সুফী প্রভাব।

বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এদেশের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপর সুফী-সম্প্রদায়ের চিন্তা-ধারার প্রভাবসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। আমার ছাত্র ডা° এনেমল হক্, এম. এ., পি. এচ. ডি. মহাশয়কে এ বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া এই পুস্তকের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভ লিখিতে

অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি তদনুসারে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া আমায় দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী।

অবশ্য তুর্কী-বিজয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে আরব-দেশীয় লোকেরা বাণিজ্য-অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশে আনাগোনা করিতেন, কিন্তু সেই আদিকালে তাঁহারা এদেশে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ডা° হক্ আদি-যুগের বঙ্গপর্য্যটক কয়েকজন মুসলমান সাধুর উল্লেখ করিয়াছেন—

১। সুলতান বায়িয়ীদ বিস্তামী—ইনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের পাঁচ মাইল উত্তরে নসীরাবাদ গ্রামের একটি টিলার উপর তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন আছে—ইনি ৮৭৪ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন।

২। সাহ সুলতান রুমি—ইনি কনষ্টান্টিনোপলের লোক (১০৫৩ খৃঃ)। কথিত আছে, ইনি ময়মনসিংহের অন্তর্গত মদনপুর গ্রামে এক কোচ-রাজাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নেত্রকোনার অন্তর্গত মদনপুরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে, এবং তথায় তাঁহার সমাধি আছে।

৩। সাহ সুলতান বলখী—ইনি মধ্য-এসিয়ার বলখের রাজা ছিলেন, শেষে সাধু হন। বগুড়া জেলায় মহাস্থানের পরশুরাম রাজা ও তদীয় কন্যা শিলাদেবীকে ইনি যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তথায় ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

৪। সাহ জালালুদ্দিন তব্‌রিজি—ইঁহার সম্বন্ধে এই পুস্তকের ৫১৩-১৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাণ্ডুয়ায় ইঁহার মসজিদ আছে।

ইঁহাদের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্ম বঙ্গে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হক্ সাহেব লিখিয়াছেন, "নানা কারণে তাঁহারা সুফী-মতকে বঙ্গে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন নাই।"

ইঁহাদের পরে যাঁহারা আসেন,—(তখন বঙ্গ-বিজয় শেষ হইয়াছে)—তাঁহারাই ধর্ম্ম-প্রচারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে (১) সিরাজুদ্দীন বদায়ুনী (১৩৫৭ খৃঃ) গৌড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। (২) নুরুদ্দিন কুতুব-ই-আলাম (১৪১৫ খৃঃ) গণেশের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করেন। (৩) সফীউদ্দীন শহীদ খাণ্ডুয়ার পাণ্ডুরাজাকে পরাস্ত করিয়া সেই দেশে ধর্ম্মপ্রচার করেন (১২৯৫ খৃঃ)। (৪) শাহ ইসমাইল ঘায়ী উত্তর বঙ্গে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন (১৪৭৪ খৃঃ)। (৫) সাহজালাল মুজর রদ ইয়মনী শ্রীহট্টে ১৩৪৬ খৃঃ অব্দে দেহ-রক্ষা করেন, এবং তাঁহার শিষ্য মজলিস ওয়ালিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করেন।

কিন্তু এই বিদেশী প্রচারকেরা দেশের হৃদয় ছুঁইতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে বঙ্গ-দেশী মুসলমান সাধুরাই—স্থানীয় হিন্দুধর্ম্মের কোমল দিক্‌টার উপর জোর দিয়া তাঁহাদের

মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইহারা প্রেমের ক্ষেত্রে সুফী-সাহিত্য হইতে বাঙ্গালী হৃদয়ের অনুকূল স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়া ছিলেন। হক্ সাহেবের মতে বাঙ্গলার রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সাহিত্যে সুফী-সাহিত্যের রস-ধারা প্রবাহিত হওয়ায় ইহাতে চিন্তাশীলতার এতটা উদ্দাম অবাধ গতি দিয়াছে। সহজিয়া নেতাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি মুসলমান ছিলেন, তাহা আমরা ৮৯২-৯৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। এই শ্রেণীর মধ্যে যে স্বাধীন চিন্তা দেখা যায় তাহা ইস্লামিক শিক্ষার ফল বলিয়া লেখক দাবী করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে সুফীদের মধ্যে এক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁহারা পুরুষ হইয়াও রমণী-জনোচিত অলঙ্কার পরেন এবং স্ত্রীভাবে ভগবান্‌কে ভজন করেন। ইহাদের অনুকরণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে সখীভাবের সাধনা প্রবেশ করিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের নাম "সদা-সোহাগ"-সুফী। প্রবন্ধ-লেখক এই ভাবে অন্যান্য বিষয়েও সুফী-সাহিত্যের সহিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সুফী-প্রভাবের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

সদা-সোহাগ-সুফী ও বৈষ্ণবের সখীভাব।

সখীভাবে সাধনা এখনও বাঙ্গলাদেশের অনেক বৈষ্ণবই করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের নোলক-বাবাজী এবং নবদ্বীপের ললিতা সখী এখনও স্ত্রীজনোচিত শাড়ী ও অলঙ্কার পরিয়া সাধনা করেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে **এই সখীভাবের ভজনা, হজরত মহম্মদের দৃঢ় পুরুষোচিত বিশ্বাসের অনুকূল নহে।** এখনকার পণ্ডিতমণ্ডলী প্রমাণ করিয়াছেন ও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে সুফীরা মুসলমান হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্মমতের অস্থি-পঞ্জর সমস্তই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বারা গঠিত। গ্রন্থভাগে আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি যে সহজিয়াদের ধর্ম্মমত,—তাঁহাদের বিচিত্র স্বাধীন চিন্তাধারা—বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল। তিব্বত-রাজ লাঃ লামা ছুডের সময়ে নীল আলখাল্লা-পরিহিত এক শ্রেণীর বৌদ্ধভিক্ষু-নেতা নর-নারীর অবাধ মিলন এবং ব্যভিচারী চিন্তা অতি উগ্রভাবে প্রচার করিতেছিলেন। হজরত মহম্মদের বহু পূর্ব্ব হইতে তামিল ভাষী শৈবগণ ধর্ম্ম-মন্দিরের অনুষ্ঠানের ব্যর্থতা প্রচার করিয়া গীতি রচনা করিয়াছিলেন (৫৭৮ পৃঃ)। এই শৈব ও বৌদ্ধগণই মুসলমান দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও প্রাচীন মতগুলি ছাড়িতে পারেন নাই। বাঙ্গলার এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং হিন্দুগণ উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাদের প্রাচীন দীক্ষায় প্রভাবান্বিত ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার দার্শনিক স্বাধীনতা তাহারা ইসলাম হইতে পায় নাই, শেষ দিক্‌কার বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই তাহা পাইয়াছিল। ইসলামের সামাজিক সাম্য ও উদারতা নিম্নশ্রেণীর সহজিয়া ও বাউলদের ধর্ম্মভাবকে যে কতকটা প্রভাবান্বিত না করিয়াছিল, তাহা নহে, কারণ নূতন ধর্ম্ম অবশ্য কতক পরিমাণে তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু এদেশের জনসাধারণ কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই দেশজ সুচিরাগত বৌদ্ধ-সংস্কার ও বিশ্বাসই বিশেষ ভাবে সমাশ্রয় করিয়াছিল।

ভাষার 'বরোবদর' শব্দটি লইয়া অনেক পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু

এটি যে একটি খাঁটি পূর্ব্ববঙ্গের শব্দ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। বুদ্ধের এক নাম 'বজ্র'। 'বজ্রাসন', 'বজ্র-যোগ', 'বজ্রতন্ত্র' প্রভৃতি শব্দ সুপরিচিত। এই বজ্র শব্দ হইতে বাজ, বজর ("বজর পড়িয়া গেল" চণ্ডীদাসের পদ), এবং বদর শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। গয়ার "বাজাসন", ঢাকার সুয়াপুর গ্রামের "বাজাসন" প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল।

বজ্র, বজর, বদর।

পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিরা সর্ব্বত্র নৌকা বাহিবার সময়ে "বদর" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, ঝড়-তুফানের সময় উহারা 'বদর' 'বদর' বলিয়া সেই বজ্রের শরণ লয়। মুসলমান হওয়ার পর সেই মাঝিরা বুদ্ধকে ভুলিয়া গেল, কিন্তু 'বদর' যে আকাশের দেবতা তাহা ভুলিল না; নামটির সঙ্গে পীর লাগাইয়া তাহারা মুসলমান-গ্রাহ্য একটা ব্যাখ্যা দিল। হয়ত 'পীর বদর' বলিয়া কেহ ছিলেন, কিন্তু এমনও হইতে পারে যে মুসলমানগণ বুদ্ধকেই "পীর" নাম দিয়া তাহাদের একটা পূর্ব্বাগত অস্পষ্ট ধারণার সূচনা করিতেছে; কিন্তু এই বদর যে 'বজর' শব্দের স্বগণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরের বিখ্যাত গ্রাম এখন "বজ্রযোগিনী" নাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু চিরকাল ইহার নাম ছিল "বদর যোগিনী"—এখনও বৃদ্ধগণ ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহাকে "বদর যোগিনী" বলিয়াই জানে। 'বর বদর' অর্থ 'বড় বজ্র'। ঐ শব্দে 'বৃহৎ বুদ্ধ-মন্দির' বুঝায়।

২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠায় সাভারের রাজা মহেন্দ্রের যে অনুশাসনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় উক্ত রাজা তাঁহার রাজ্যে বহু চন্দনতরু রোপণ করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ী

রাজা মহেন্দ্রের চন্দনতরু।

সাভারের নিকট, কিন্তু সাভারের অতি নিকটবর্ত্তী তেঁতুল-ঝোড়া গ্রামনিবাসী সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্প্রতি আমাকে জানাইয়াছেন যে, সেই অঞ্চলে এখনও অনেক চন্দন-বৃক্ষ জঙ্গলে জঙ্গলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কথা শিলা-লিপিকে সমর্থন করিয়া মহেন্দ্রের সেই কীর্ত্তির স্মৃতি-সৌরভ এখনও বহন করিয়া আনিতেছে।

এদেশে রাজাদের যে প্রত্যেকের সভাতেই রূপকথা ও গীতিকথা শুনাইবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকিত, ৫২৯ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই রীতি রামায়ণের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে; প্রত্যেক রাজারই কীর্ত্তিকথা ইহারা গান করিত। যোগী পাল, মহী পাল প্রভৃতি রাজন্যবর্গের গীতি হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের বাখরগঞ্জের কীর্ত্তিপাশা গ্রামের জমিদার রাজা রাজকুমারের সম্বন্ধে পালা-গান গীত হইয়া আসিতেছে। মুতক্ষরীনে পাওয়া যায়—আলিবর্দ্দি খাঁ দিনের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়—রূপকথা শুনিতেন। মীরন যে রাত্রে কোন জঙ্গলের এক শিবিরে বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত

রূপকথা।

হন, সে রাত্রেও তাঁহার সঙ্গে রূপকথা শুনাইবার লোক ছিল। তাহাদেরও এক সঙ্গে মৃত্যু হইয়াছিল। সেদিনও ভাওয়ালের মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির সাক্ষ্যে জানা গিয়াছে যে "টোনা" নামক নমঃশূদ্র, একটা [illegible] ও ক্ষেত্রমোহন নামক এক ব্যক্তি কুমার রমেন্দ্রনারায়ণকে রূপকথা শুনাইত।

(আনন্দবাজার, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১।) অনেক সময়ে রমণীরাই এই রূপকথার ভাল গল্প বলিতে পারিতেন, কোন কোন স্থানে তাহাদের নাম ছিল "আলাপিনী"। এই রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত লোকেদের উৎসাহে তাঁহাদের অন্তঃপুরে আলাপিনীরা যে রূপকথা শুনাইত, তাহার শীলতা, কথার গাঁথুনী, এবং আদর্শ অতি উচ্চদরের হইত, মালঞ্চমালা প্রভৃতি গল্প এই অপূর্ব্ব কথা-শিল্পীদের রচনা। আমরা এই শ্রেণীর লোকদিগকে হারাইয়াছি।

আমি প্রুফ দেখিতে পটু নহি, এজন্য এই পুস্তকে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৩২ ছত্রে ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়কে আমি কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি; তিনি ব্রাহ্মণ। আশা করি ব্রাহ্মণোচিত ঔদার্য্য-গুণে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। ৫৬৪ পৃষ্ঠার ১৮ ছত্রে শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে আমি শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছি, তজ্জন্যও আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ৫১৭ পৃষ্ঠার ২৮ এবং ৩০ ছত্রে দুইবার হাতী ঘোষ স্থলে হাড়ী-ঘোষ ছাপা হইয়াছে, ইহাও প্রুফ দেখার ত্রুটী।

ভ্রমস্বীকার।

৪৮৮ পৃষ্ঠার ২৮ ছত্রে "মাতা" স্থলে "স্ত্রী" হইবে। ৫৪২ পৃষ্ঠার ২৬ ছত্রে tunnel শব্দ স্থলে canal ছাপা হইয়াছে এবং ৭৮৮ পৃষ্ঠার ৮ ছত্রে "মছলান্দি" স্থলে "মসনদ আলি" লেখা হইয়াছে, ইসাখাঁর কামানের উপর ও রাজমালায় "মছলান্দি" শব্দই পাওয়া যাইতেছে। ৩০৬ পৃষ্ঠার ৩১ ছত্রে "নয়পাল" স্থলে "নরপাল" এবং ৪১৮ পৃষ্ঠার ১৫ ছত্রে "নলিয়া" শব্দ "নালিয়া" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ১০০৯ পৃঃ ৪ ছত্রে "মজলিস কুতুব" স্থলে ভুলক্রমে "সমসের কুতুব" ছাপা হইয়া গিয়াছে। ২৮৩ পৃষ্ঠার ২৩শ ছত্রে "বল্লালের পুত্র" স্থলে "বল্লালের প্রপৌত্র" হইবে।

৮৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় আমি "রায়বেঁশে" নৃত্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে কিছু ভুল হইয়াছে। আমি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রায় ছয় মাস পরে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, অথচ তাহাতে উদ্ধৃত করার চিহ্ন ব্যবহার করাতে মনে হইবে যেন উহা দত্ত মহাশয়েরই উক্তি, কিন্তু তাহা নহে, স্মৃতির ভ্রমবশতঃ তাহা যথাযথ হয় নাই। প্রথমতঃ যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা সিউড়ীর বাৎসরিক মেলার উপলক্ষে নহে, সিউড়ী হইতে ১২ মাইল দূরে রাজ-নগরের দাতব্য-চিকিৎসালয়ের দ্বার-উদ্ঘাটন উপলক্ষে প্রদর্শনীটি হইয়াছিল। ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫ম ছত্রে "মুসলমান" শব্দ স্থলে "বাউরি" হইবে। এইরূপ আরও কিছু কিছু ভুল আছে, মোট কথা উহা ঠিক দত্ত মহাশয়ের মুখের কথা নহে, স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া কয়েকমাস পরে লিখিত। এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বলা দরকার, বৃহৎ বঙ্গের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় ঘটাইবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তন্মধ্যে দত্ত মহাশয়ের স্বার্থত্যাগ ও প্রচেষ্টা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গলাদেশের অপূর্ব্ব 'রায়বেঁশে' নৃত্য আজ ভারতের সর্ব্বত্র এমন কি য়ুরোপীয় অনেক মহামনা ব্যক্তির মধ্যেও আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। পুঁথিপত্রে কেহ কেহ এই [illegible]

নৃত্যের উল্লেখ পূর্ব্বেই জানিতেন, কিন্তু এই নৃত্য যে এদেশে এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যমান তাহা দত্ত মহাশয়ই আবিষ্কার করিয়াছেন; কাঠিনৃত্য ও জারিনৃত্য, যশোর জেলার যুদ্ধনৃত্য, ঢালি সম্বন্ধেও তাঁহারই চেষ্টার ফলে লোকে জানিতে পারিয়াছে ও শিক্ষিত লোকেরা গ্রহণ করিতেছেন। জারি গানের কথা অনেকে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সুঠাম সুন্দর জারিনৃত্য দত্ত মহাশয়েরই আবিষ্কার। ঝুমুরনৃত্য অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। কিন্তু আজ উহা শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। দত্ত মহাশয় নানা প্রবন্ধে কীর্ত্তন ও বাউল-নৃত্য বিশ্লেষণ করিয়া উহার সহজ সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

রায়বেঁশে ও অপরাপর নৃত্য।

ইহাছাড়া তিনি বঙ্গের নিজস্ব চিত্র-শিল্প পট, পুঁথির পাটার ছবি, চালচিত্র, সরার অঙ্কন, পীড়িচিত্র, কাঠের মধ্যে নানারূপ কারুকার্য্য, ইট ও পাটির কাজ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ও তৎসংক্রান্ত প্রদর্শনী খুলিয়া দেশের লোকের অনুরাগমূলক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় প্রভৃতি শিল্প-গুরুগণ এবিষয়ের অগ্রদূত, কিন্তু তাঁহারা তুলি লইয়া ব্যস্ত। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই সকল বিষয়ে গবেষণার দ্বারা এবং নানাস্থানে বাঙ্গলার খাঁটি শিল্পসম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা বাঙ্গলার নিরুদ্ধ চিরাগত শিল্প-রীতির উৎসমুখ বিমুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

এখনও বঙ্গদেশ সেই সুপ্রাচীন যুগের ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। খৃষ্ট জন্মিবার ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বের মস্করিদের কাজ সামান্য ভাবে এখনও চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি (৪১১ পৃঃ)। এখনও বীরভূমে জহরী পটুয়ার এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ, তাহার সহযোগী মটরু, যাদব, গণেশ ও কার্ত্তিক সেই শিবের শলতা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, এই আহিতাগ্নিদের হোমাগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। ফরিদপুরে ষষ্ঠীচরণ আচার্য্য ও বামাচরণ আচার্য্য—প্রাচীন চিত্রকরদের ধারা বজায় রাখিয়াছেন। ষষ্ঠীচরণের বয়স ৮৫ বৎসর। কালীঘাটের কোন কোন পটুয়ার কৃতিত্বও সামান্য নহে। কুমারটুলীর নিতাই (এন. সি) পালের নাম এখন ভারতের সর্ব্বত্র বিদিত। কৃষ্ণনগরের যদুলাল শিল্পীর গড়া মৃত্তিকার মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে ফ্রান্সদেশের রাজা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ফরিদপুরের নলিয়া-বাসী গোপাচরণ পাল প্রাচীন মডেল অনুযায়ী যে সিংহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অশোকস্তম্ভের সিংহকে স্মরণ করাইয়া দেয়। "রায়বেঁশে" নর্ত্তকদের মধ্যে বীরভূমের যোগেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "চড়ক গম্ভীরা" বা দশ-অবতার নৃত্যে, বিশ্বেশ্বর দাস (উপাধি 'বালা'—বা নৃত্যে শ্রেষ্ঠ) ফরিদপুর জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহার নৃত্যের এক একটি ভঙ্গী দশ অবতারের নিঃশব্দ অভিনয় দ্বারা প্রত্যেকটির এমন রূপ বিজ্ঞাপ্তি করে যে, তাহাতে বেদ-উদ্ধরণ হইতে সমস্ত ভাগবত লীলা উৎকৃষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হয়। আমাদের আলিপনা-লক্ষ্মীদের কত নাম করিব। সে চিত্রে

নিম্নশ্রেণীরা প্রাচীন শিল্প রক্ষা করিয়াছে।

পর্য্যন্তও ঘরে ঘরে এই লক্ষ্মীরা বিরাজ করিতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ চিত্রগুরুগণ এই আলপনা হইতে চিত্র-শিল্পের প্রেরণা পাইয়াছেন। একটি দুইটি নাম দিয়া কি করিব? লক্ষ নামের তালিকা দিলেও উহা সম্পূর্ণ হইবার নহে। ফরিদপুরের বগলা দেবী, নগেন্দ্রবালা দেবী প্রভৃতি অশীতিপর বৃদ্ধারা এখনও যদি পিঠালী বা চালের গুঁড়া লইয়া বসেন, তবে তাঁহাদের অবলীলাক্রমে অঙ্কিত আলপনার কাছে শিল্পাচার্য্যগণও হার মানিয়া যান। খুলনা জেলায় সেনহাটী-বাসিনী 'কমলার মার' খ্যাতিও আমরা শুনিয়াছি। ব্রত-নৃত্যে ফরিদপুরের মায়া দেবী, কালী ও নির্ম্মলা দেবী, সুবাসিনী, মোক্ষদা দেবী প্রভৃতি তরুণীরা প্রাচীন ধারাটি প্রশংসনীয় সাফল্যের সহিত অভ্যাস করিতেছেন। সামান্য চেষ্টা করিলে আমরা ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জারি, ঝুমুর, যশোহরের ঢালি ও ব্রত-নৃত্যকারীদের নাম সংগ্রহ করিতে পারি। এখনও খুলনা, শ্রীহট্ট ও যশোরে দুই একজন এমন রমণী আছেন, কাঁথা শেলাই কার্য্যে যাঁহাদের কৃতিত্ব অসাধারণ। এই সকল শিল্প বাঙ্গলা দেশে অজন্তা, বরোবদর, খেজুরাহ, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের শিল্প-কলা হইতেও প্রাচীনতর। কোন্ অতীত যুগের হরিদ্বারে, ইহাদের উৎস-মুখ, তাহা কোন্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নির্ণয় করিবেন? হয়ত তাঁহাকে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার যুগে গতিবিধি করিতে হইবে, হযত মহাভারতের সময়েরও বহু পূর্ব্বেই বঙ্গদেশের শিল্পের অপোগণ্ড ঘুচিয়া গিয়াছিল—এইগুলিই আমাদের বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। দুঃখের বিষয় স্বদেশী নেতাদের বিচিত্র কর্ম্ম-বিভাগের মধ্যে ইহাদের কথা কেহই একবার স্মরণ করেন না। এই শিল্পীরা নিঃস্বার্থভাবে—বিষম দারিদ্র্য ও নিরুৎসাহের মধ্যে শত সহস্র বৎসর যাবৎ তাঁহাদের নিজস্ব জিনিষ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ঝিনুকের জীব যেরূপ শুক্তির মধ্যে মুক্তা রক্ষা করে এবং তজ্জন্য প্রাণ দেয়—এদেশের শিল্পীরা চিরকাল সেইভাবে তাহাদের নিজস্ব বিদ্যা রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু আর বুঝি তাহারা পারে না, দেশের লোকের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া এইবার দেশী শিল্প মরিতে বসিয়াছে!

বাঙ্গলার চিত্রশিল্প-সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি (২২৮-৪০, ৪০৬-৫২, ৫৫৭-৫৮, ৮৮৭-৯২ পৃঃ)। হিন্দু রাজত্বকালে শিল্পী যে প্রভূত পুরস্কার ও উৎসাহ পাইত, গত সাত শত বৎসর যাবৎ সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মোগল ও রাজপুত শিল্পের মার্জ্জিত ও পরিণত রূপ সে কোথায় পাইবে? কালীঘাটের চিত্রের মূল্য ছিল দুই পয়সা। আরাঙ্গেবের নিষেধাত্মক বিধিতে শিল্পীরা দিল্লী-দরবার হইতে প্রস্থান করিয়া রাজপুতনায় আশ্রয় লইয়াছিল, সেখানে ঐ শিল্প পরিচ্ছন্নতা ও কায়দা-কানুনের দিক্‌টা কতকটা হারাইয়া হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু দুই দিকের প্রভাবে পড়িয়া উহা একটা মিশ্র রকমের সামগ্রীতে দাঁড়াইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানসিংহ

বাঙ্গলার খাঁটি চিত্রের বিশেষত্ব।

এই জয়পুরী আদর্শ বাঙ্গলায় চালাইয়াছিলেন; তদবধি বাঙ্গালী শিল্পী বাঙ্গলার বড় মানুষদের ফরমাইস মত জয়পুর-শিল্পের অনুকরণ করিয়াছে, তাহাতে সোণারূপার প্রাচুর্য্য, দরবারী কায়দা-কানুন ও পোষাকের আড়ম্বর বেশী।

কিন্তু নিম্নস্তরের শিল্পী সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক ছিল, ব্যাসের শাপে তাহার পেটে ভাত ছিল না (বিশ্বকর্ম্মার প্রতি অভিশাপ—"তোর গুণধর, যত কারিগর, হইবে দুঃখী বেগার।" অন্নদা-মঙ্গল)। রং, বাটালী, এমন কি সূচটি পর্য্যন্ত সে অতিকষ্টে সংগ্রহ করিত। সে কলা-লক্ষ্মীর নৈবেদ্য ক্ষুদ দিয়া সাজাইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিদুরের ক্ষুদ, এবং নিশ্চয়ই দেবীর তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গলার (মুসলমান-যুগের) ছুতার, পটুয়া, মস্করী, সীবনরতা কন্থা-কারিণী প্রভৃতির কাজে বাঙ্গলার নিজস্ব রূপটি বজায় আছে। সেখানে বাঙ্গালী শিল্পী বরোবদর, কাম্বোডিয়া, খেজুরাহ, অজন্তা, অমরাবতী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন শিল্পীদের সহোদর, তাহাদের পরম্পারের সংস্কার-সূত্র ছিন্ন হয় নাই। এই শিল্পীদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সেখানে রমণীদের দেহের উত্তরার্দ্ধ অনাচ্ছাদিত—পূত মাতৃস্তন অনাবৃত। পুরুষের দেহেও পোষাক অতি অল্প, যখন কোন বিদেশীকে আঁকিতে হইবে, তখন চিত্রকর তাঁহাকে পোষাক-পরিচ্ছদে আড়ম্বর-পূর্ণ করিয়া প্রদর্শন করেন। অজন্তার প্রসিদ্ধ চিত্র 'পুলকেশীর দরবারে বিদেশী রাজদূত'এর প্রতি দৃষ্টি করুন, পুলকেশী ও বিদেশী রাজদূতের পরিচ্ছদের বৈষম্য সহজেই ধরা পড়ে। ময়ূরভঞ্জের একটি প্রস্তর-ফলকে বহু রমণী নানা ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে; প্রত্যেকের দেহের উত্তরার্দ্ধ অনাবৃত। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত ফরিদপুরের একখানি কাঠে-গড়া মাতৃমূর্ত্তির ছবি দেওয়া হইয়াছে, ফটোগ্রাফে ছবিখানি একেবারেই ভাল উৎরায় নাই, আসল মূর্ত্তি অতি সুন্দর,—জননীর একটি স্তন শিশু আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, অন্যটি অপর হস্তে খুঁটিতেছে। এখনও বাঙ্গলার কুমারেরা কোন কোন স্থানে এইরূপ মাতৃমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, কিন্তু নব-রুচির আনুগত্য করিয়া বস্ত্রের ঘটাটা একটু বেশী করে; আমার নিকট বহু রমণীমূর্ত্তি আছে, তাহাদের বক্ষ অনাবৃত, কিন্তু তাহাতে আদৌ শীলতার অভাবের কোনও ইঙ্গিত নাই।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, চিত্রের জীবন্ত ভাব ও গতির দ্রুততা। এখানে বাঙ্গালী চিত্রকর ও ভাস্কর শ্রেষ্ঠতম সাফল্য দেখাইতেন। ২৫০ বৎসর পূর্ব্বের একখানি কাষ্ঠ-সিংহাসনের কতকগুলি মূর্ত্তি আমার নিকট আছে, তাহা প্রায় ধ্বংসের মুখে, তাহাতে গাভীগুলির গতির দ্রুততা যে ভাবে দেখান হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। শ্রীযুক্ত পার্সি ব্রাউন এবং ফ্রেঞ্চ সাহেব এই কাষ্ঠ ফলকের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। ফ্রেঞ্চ সাহেব এই ফলকখানি লইয়া প্রায় একমাস রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এখানকার কোন ফটোগ্রাফার সেই নষ্ট-প্রায় কাষ্ঠ ফলকের যথাযথ প্রতিলিপি তুলিতে পারেন নাই, এজন্য শেষে উহা ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অশ্বারোহীর একখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে পোড়া ইটের উপর উৎকীর্ণ মূর্ত্তি হইতে গৃহীত। অশ্বারোহীর চিত্রটি অনেকাংশে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু কি অদ্ভুত গতিশীলতা অশ্বের প্রতি অঙ্গে খেলিতেছে। হরিণের কি শঙ্কটাপন্ন অবস্থা—একদিকে ঘোড়ার বজ্র-কামড়, অপর দিকে তাহার দুই পায়ের মধ্যে পড়িয়া হরিণের উৎকট মুমূর্ষু রূপ। কুকুরটির দেহের প্রায় সবটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি শুধু অবশিষ্ট কয়েকটি রেখার

তাহার নৃশংস ধাবন-ক্রততা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু মূলের এই অংশ ছবিতে যথাযথভাবে উঠে নাই।

বাঙ্গালা চিত্রকরের মনোভাব-জ্ঞাপনের শক্তি অসামান্য, পটুয়ার তুলি এই বিষয়ে এত পটু যে তাহার গড়া মূর্ত্তি ও ছবি যেন কথা কহে। কালীঘাট-চিত্রাবলীতে স্বামি-স্ত্রীর ছবিটি লক্ষ্য করুন। (এ সম্বন্ধে ৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) যতগুলি ভঙ্গীতে পটুয়া রমণীমূর্ত্তি আঁকিয়াছে, তাহার সবগুলিই সুস্পষ্ট, কোন জটিল রেখাপাতে ছবিগুলি দুর্ব্বোধ হয় নাই।

জয়পুরী চিত্রের সঙ্গে বাঙ্গালী পটুয়ার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়িবে। বাঙ্গালী পটুয়া অনেক সময়ে বড়-মানুষদের মন জোগাইয়া দেব-দেবীর ছবি আঁকিয়াছে। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত একখানি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ চুঁচুড়ায় শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বাড়ীতে আছে, উহাব প্রত্যেক পত্রে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত আছে। চিত্রগুলি গ্রাম্য এক আচার্য্য-চিত্রকরের অঙ্কিত এবং অনেকাংশে খাঁটি বাঙ্গলা ছবি। কোথাও কৃষ্ণ রাধার পা ধরিয়া সাধিতেছেন; কোথাও কৃষ্ণ রাধার পদতলে পতিত, রাধা হাতে ধরিয়া আদরে কৃষ্ণকে তুলিতেছেন; কোথাও রাধাকৃষ্ণ আলিঙ্গনবদ্ধ, কিংবা গাঢ় অনুরাগে পরস্পরের বিম্বাধর চুম্বন করিতেছেন। বঙ্গের বাহিরে এই ঘনিষ্ঠতা বিরল। জয়দেবের সময় হইতে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই গূঢ় মিলন-রহস্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চৈতন্যের সময় হইতে সমস্ত বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যে কে বড় কে ছোট তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং প্রেমের বন্যায় জগদীশ্বর ও ক্ষুদ্র জীব এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান লইয়াছেন—কূপ ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছে। ভক্তিজগতে ভক্তি ও প্রেমের এই উদ্দাম-লীলা-চঞ্চল চিত্র আর কোন প্রদেশের তুলিতে উঠিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। জয়পুরী রাধা আঁচল ও পোষাকের গৌরবে ডগমগ হইয়া কৃষ্ণের বাম দিকে যেন অরুচিকর অকায়দা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কতকটা সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কৃষ্ণ নানা বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া মকর-মুখ স্বর্ণমণ্ডিত বাঁশী বাজাইতেছেন—কাহাকে ডাকিতেছেন, তিনিই জানেন।

কবি রামপ্রসাদ সেন ও তাঁহার পত্নীর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি হালি-সহর-বাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ. মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। একখানি স্বর্ণ-খচিত সমুজ্জল চণ্ডীমূর্ত্তির দুই পার্শ্বে ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতীর ছবি দুইটি দেওয়া হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই ছবি যখন অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে রামপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তখন হালিসহর অঞ্চলটা রামপ্রসাদের স্মৃতিময়, যে পটুয়া ছবি আঁকিয়াছিল, তাহার বাড়ী হালিসহর কুমার-পাড়া, এই স্থানটি রাম-প্রসাদের গৃহ ও 'পঞ্চমুণ্ডী' হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে, এক পাড়া বলিলেই হয়। গোপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীও এক মাইলের মধ্যে এবং তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ ছবি আঁকাইয়াছিলেন। সেখানকার লোকের মুখে শুনিয়াছি উক্ত পার্শ্বচর ভক্তদ্বয়ের ছবি রামপ্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রীর অনুরূপ। এখন যেমন কালীমূর্ত্তি আঁকিতে যাইয়া অনেক সময়ে পরমহংস দেবের ছবিও তৎপার্শ্বে আঁকা হয়, রামপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার প্রতিকৃতি

পটুয়া যে ভক্ত আঁকিতে যাইয়া রামপ্রসাদ ও তাঁহার পত্নীর ছবি আঁকিবে, তাহাও তেমনই স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের পত্নী কালিকা-দেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন, একথা কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন। রামপ্রসাদকে যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছিলেন, জীবনী-লেখক অতুলবাবু তাঁহাদের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন—"রামপ্রসাদের বাবরি চুল ছিল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন, গলায় স্ফটিক মিশানো রুদ্রাক্ষ-মালা ছিল, অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন।" (অতুল মুখোপাধ্যায়-কৃত রামপ্রসাদের জীবন, ২৫৪ পৃঃ।) দাড়ী ছিল না বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু লোকের দাড়ী কখনও থাকে, কখনও থাকে না, অন্যান্য বিষয়ে এই বর্ণনার সঙ্গে চিত্রের খুব সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

এইখানে গ্রাম্য-শিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। বঙ্গের পল্লীতে ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ হইত, ঠাকুরের সিংহাসন ও শ্রীবিগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া রথ পর্য্যন্ত নানা শিল্পখচিত দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য শত শত সূত্রধর, ধাতু ও প্রস্তর-শিল্পী ও চিত্রকরেরা বৎসর ভরিয়া বঙ্গদেশে খাটিত; প্রধান প্রধান নগরে উহা সমারোহ ব্যাপার ছিল। প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট গ্রামেই রথ টানা হইত, ঢাকার তাঁতি-বাজার ও শাঁখারী-বাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জন্মাষ্টমীর যে মিছিল বাহির করিত, তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ দুর্গোৎসব উপলক্ষে সেই সময়ের সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বঙ্গের প্রত্যেক নগরীতে বড় বড় রথ তৈরী হইত। বাউলি, আন্দুল, ধামরাই, মহিষাদল, বাঁশবেড়িয়া, মহেশ প্রভৃতি শত শত গ্রামে যে সকল অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় অর্দ্ধ-ভগ্ন কিংবা কথঞ্চিৎ পরিচালনা-যোগ্য রথ পড়িয়া আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ধনাঢ্যদের মধ্যে এই পূজা-পার্ব্বণোপলক্ষে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। শত বৎসর পূর্ব্বেও সংবাদ-ভাস্কর, প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকা কোন্ বাড়ীর পূজা ও সমারোহ কিরূপ হইল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইন্ধন যোগাইত। বড় বড় নগরে কতদিক দিয়া যে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাইত, তাহার অবধি নাই; ছোট ছোট গৃহস্থও এই সময়ে সাধ্যানুসারে ব্যয় করিতেন। এই সকল উপলক্ষে বার মাস কামার, কুমার, ছুতার, 'বিদ্যুৎ-বাজীকর', ফুলওয়ালী, মালী, ঢাকী, সানাইবাদক, ঢুলী, জেলেডিঙ্গি ও বড় ডিঙ্গির মাঝি, তাঁতী প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর লোকই আনন্দের সঙ্গে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জন করিত। আমরা উৎসবগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ধর্ম্মই এদেশে শিল্পীকে জীবিত রাখিয়াছিল, এখন পূজার মন্দির ও দালান ধ্বসিয়া পড়িয়াছে; শিল্পীদের দাঁড়াইবার জায়গা কোথায়? প্রত্যেক ধর্ম্মেরই উৎসব আছে, পুরাতন উৎসবগুলি যুগোপযোগী বিবেচিত না হইলে তৎস্থলে নূতন উৎসব প্রবর্ত্তিত হউক। বাঙ্গলা দেশে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে শিল্পীদের কিছু কিছু অন্নসংস্থান হইতেছে। ধর্ম্মভিন্ন অন্য কোন প্রেরণা এ দেশকে জাগাইতে পারিবে না। যন্ত্রজাত শিল্পের সঙ্গে নিতান্ত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলিয়া দিলে গ্রাম্যশিল্প ভাসিয়া যাইবে। শিল্প—

ভক্তি ও প্রেম—এই দুই দেবতার সঙ্গী। ভক্তি গিয়াছে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে এখন প্রেমের স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই চলিতেছে, এদেশে স্বর্ণকারের আর দরকার নাই, রমণীরা অলঙ্কার চান না। ভারতবর্ষের এই দুই দেবতার আসন টলিয়াছে, কাহার বাহু আশ্রয় করিয়া শিল্প দাঁড়াইবে? গান্ধীজীকে (আমি তাঁহার ক্ষুদ্র ভক্ত) স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে ধর্ম্ম বাদ দিয়া শিল্পকে তিনি বাঁচাইতে পারিবেন না। ধর্ম্ম শুধু আত্মায় নহে, মন্দিরে তাহার বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তবেই শিল্প রক্ষা পাইবে। জাপানী-যন্ত্রের, স্বল্প-মূল্য সোনার গিল্টী সেপ্টিপিন বা ব্রূচ পরিলে দেশী শিল্প কেমন করিয়া মাথা তুলিবে? ৫৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের পৈতা প্রাচীন কালে সর্ব্বদা অপরিহার্য্য ছিল না। যজ্ঞোপবীত যজ্ঞের সময়েই ধারণ করার বিধি ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বালীদ্বীপে যখন হিন্দুর উপনিবেশ হয়, তখন সেই প্রাচীন রীতিই প্রচলিত ছিল, এবং এখন পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন রীতি সে দেশে পণ্ডিত-সমাজে বিদ্যমান। ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাসের প্রবন্ধে লিখিত আছে "পণ্ডিতকে (বালীদ্বীপের) জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার পৈতা কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন—'আমরা শুধু পূজা অর্চ্চনার সময়ে উহা ব্যবহার করিয়া থাকি, অন্য সময়ে নহে' " (প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক, ১৩৪১, বাং সন, ৪০ পৃঃ)।

ভূপর্য্যটক মহাশয় বালীদ্বীপের অধিবাসীদের গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বলিদের (বালীদ্বীপ-বাসীদের) গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি ঠিক বাঙ্গালীর মত। সাত-সমুদ্র পার হইয়া কিরূপে আমাদের গৃহ-নির্ম্মাণপ্রথা ওরা অবলম্বন করিয়াছে, তাহার ঠিক সিদ্ধান্তে এখনও আসিতে পারি নাই।" দূরদূরান্তরে বাঙ্গালীরা যে তাহাদের ধর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও রীতিনীতি লইয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সে কথা বিশ্বাস মহাশয় জানেন না, অন্ততঃ পালরাজত্বের ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িলে তিনি এবিষয়টা কতক জানিতে পারিতেন, কিন্তু এখনও সে ইতিহাস-লেখার সময় আসে নাই। এখন ইতিহাস-লক্ষ্মী ঈষৎ দ্বারোদ্ঘাটন-পূর্ব্বক বাঙ্গালীর সেই কীর্ত্তি-কাহিনীর আভাস দেখাইতেছেন। ডক্টর ষ্টেলা ক্র্যামরিশ্ আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন: "The great importance of East Indian Art and Architecture within India itself is but one of its aspects. The other, equally important, shows the art and architecture of this province as the prime source of Indian influence in further India and Indonesia. The indigenous and original character of Bengal art has become known mainly in its paintings (*pata* and book-covers) and but recently also in its sculpture (Paharpur. Seventh Century). Its connection and leading rôle in image-making with the rest of Aryabarta is amply illustrated by the sculptures of the Pal and Sen age at that place. It influenced the further East, and Paharpur must be considered as the most convincing monument preserved; unmistakably it proves that the temples of Khmer

greatness are unthinkable without this prototype." [ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলের মহৎ স্থাপত্য ও শিল্পপ্রভাব ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে অতীব গুরুতর; কিন্তু এই প্রভাব স্থানান্তরেও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-ভারতের এই প্রভাব সুদূর পূর্ব্বে—ভারতীয় দ্বীপসমূহেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়াছে। বাঙ্গলার শিল্প চিত্র-বিস্তার (পট ও পুঁথির মলাটের ছবি প্রভৃতিতে) মধ্যেই স্বীয় মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য বেশী দেখাইয়াছে; ইদানীং স্থাপত্য-শিল্পেও (পাহাড়পুর, সপ্তম শতাব্দী) তাহা প্রচুর পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাল ও সেন-রাজত্বের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের আদর্শের সঙ্গে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্বন্ধ ও বাঙ্গলার শিল্পের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে; পাহাড়পুরের শিল্প ও স্থাপত্যের আদর্শ পূর্ব্বভারতের দ্বীপ-পুঞ্জে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। খ্মের-(Khmer) মন্দির সমূহের মহৎ স্থাপত্য শিল্পের আদি খুঁজিতে গেলে আমাদিগের পাহাড়পুরের আদর্শ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।]

পরিশিষ্টাংশের প্রাদেশিক রাজ্যগুলির ইতিহাসের প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এইসকল ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে, প্রজারা মেষবৎ নিরীহ এবং রাজভক্ত ছিল না। অনেক সময়ে ইহারা রাজাদের হননকারী ও ভাগ্য-বিধাতা ছিল।

প্রজাশক্তি।

প্রজাদের অসন্তোষে ত্রিপুর-রাজ প্রতাপমাণিক্য (১৪৩৩ খৃঃ), জয়মাণিক্য (১৫৯৬ খৃঃ), অহংরাজ সুহেন ফা (১৪৯৩ খৃঃ), সুজিন ফা (১৬২৭ খৃঃ), ভগারাজা (সুরান ফা) ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে এবং লক্ষ্মণসিংহ ১৭৮০ খৃঃ অব্দে নিহত হন। পাঠক মনে করিবেন না, প্রাদেশিক রাজগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রাজগণই মাত্র স্বীয় বিদ্রোহী প্রজা ও সৈন্যের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আমরা বাহুল্যভয়ে এই তালিকা বাড়াইলাম না। পাঠক ইতিহাস খুঁজিলে এই হতভাগ্যদের দলে আরও অনেক রাজা পাইবেন।

প্রজা-কর্ত্তৃক রাজ-নির্ব্বাচন।

প্রজারা কিছুতেই অত্যাচার সহ্য করে নাই। রাজার বংশধর না থাকিলে রাজোচিত গুণের পরিচয় পাইয়া ইহারা রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছে। যে যে স্থানে তাহারা রাজাকে হত্যা করিয়াছে, পরবর্ত্তী রাজাকেও তাহারাই মনোনয়ন করিয়াছে। ত্রিপুর-রাজ যশোমাণিক্যের পরে রাজবংশের কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না;—"রাজ পুত্র পৌত্র নাহি, নাহি রাজ-ভ্রাতা। কাহাকে করিব রাজা জানিয়া সর্ব্বথা॥ সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিয়া তখন। কাহাকে করিব রাজা না দেখে লক্ষণ॥ মহামাণিক্য-বংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি। যশোধর-কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি॥ করেছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান্। সেই রাজযোগ্য হয় দেখ বিদ্যমান॥ এসব চিন্তিয়া সেনা-পাত্র-মিত্রগণ। কল্যাণ নাম সেনাপতি বসে সিংহাসন॥" এই ব্যক্তিও পালবংশীয় গোপালের ন্যায়ই নানা যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়া স্বীয় রাজযোগ্য গুণাবলীর পরিচয়-প্রদানানন্তর প্রজাদের কর্ত্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনিই একমাত্র প্রজানির্ব্বাচিত রাজা ছিলেন না। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের মহারাজ ধর্ম্মপালও এইভাবে প্রজাদের মনোনয়নে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আসামের বৈকুণ্ঠের রায়

লক্ষীসিংহ মহারাজ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নিহত হইলে, বৈষ্ণবেরা মোয়ামারির বড় গোস্বামীর পুত্র বনাগণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বনাগণের পিতা পুত্রকে সাংসারিক প্রতিষ্ঠার লোভী হইতে দেন নাই। এই সকল প্রাদেশিক ইতিহাস হইতে জানা যাইতেছে, আমাদের জনসাধারণের রাজনৈতিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল এবং তাহারা তাহাদের ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া রাষ্ট্রব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত ছিল। এদেশের জনসাধারণ অবজ্ঞার যোগ্য নহে। ইহারা অজগরের মত এক ঋতুতে ঘুমায় এবং এক ঋতুতে জাগে।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব যে কি ভীষণ, তাহা আসামে যেরূপ দৃষ্ট হয়, বৃহৎ বাঙ্গালার অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ দেখা যায় নাই। চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখা যায়, নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে কোন লোক চন্দন ও সিন্দূরলিপ্ত বিল্বপত্র ও চণ্ডীপূজার ফুল রাখিয়া গিয়াছিল, এজন্য বৈষ্ণবদের সে কি ক্রোধ! এই অপবাধে সেই ব্যক্তি নাকি কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়াছিল! নরোত্তম-বিলাসে দৃষ্ট হয়, শাক্তেরা বৈষ্ণব-গুরু নরোত্তমের মৃত্যু হইলে, তাঁহার শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাততালি দিয়া ঠাট্টা-করিতে করিতে গিয়াছিল (নরোত্তম-বিলাস দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবেরা কালীর নাম করিত না, এজন্য দোয়াতের কালিকে 'সেহাই' বলিত। শক্তিপূজার উপকরণের নাম করিতে নাই, এজন্য জবা পুষ্পকে "ওড় ফুল" বলিত, "কাটা" কথা তাহাদের অভিধানে নিষিদ্ধ, এজন্য তরকারী কোটাকে "বানান" বলিত।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

কিন্তু আসামের শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কাছে উহা কিছুই নহে। দুর্গাপ্রতিমাকে প্রণাম না করাতে শঙ্কর-শিষ্য নারায়ণের দক্ষিণ হস্ত রাজা নরনারায়ণের আদেশে ভৃত্যেরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, এবং এই নারায়ণ দাস ও অপর শিষ্য গোকুল দাসের উপর রাজার আদেশ হইল, ইহাতেও যদি তাঁহারা দেবীকে প্রণাম না করেন, তবে তাঁহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এইরূপ ভীষণ অত্যাচারের ফলে নিরীহ বৈষ্ণবেরা শেষে মরিয়া হইয়া শিখদের মত বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা জপমালা ফেলিয়া দিয়া খড়্গ-হস্ত হইয়া রাজা লক্ষীসিংহকে হত্যা করিয়াছিলেন (১৭৮০ খৃঃ), আসামে বৈষ্ণববাহিনী দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।

এই সকল প্রাদেশিক ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বোত্তর পার্ব্বত্য-অঞ্চলে হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইয়া দেশগুলি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। যদিও ত্রিপুরার রাজারা সুলোচনের (যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলিয়া কথিত) সময় হইতে চতুর্দ্দশ দেবতার উপাসক, তথাপি ক্রমশঃ হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি রাজা ও প্রজাদের অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর্দ্দশ দেবতার পুরোহিত চন্তাইদের প্রভাব হইতেও তাহাদের দেশে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা বেশী হইয়াছিল। বিজয়মাণিক্য প্রভৃতি ত্রিপুরেশ্বরগণ নিয়বঙ্গে অবতরণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য স্বর্ণ ও ভূমি দান করিয়াছিলেন,—"সহস্র সুবর্ণধ্বজ আরোপিলা ভূপে। উৎসর্গিয়া দিলা ধ্বজ ব্রাহ্মণ-সমীপে॥ উৎসর্গ সুবর্ণ যত ব্রাহ্মণেরা লুটে। বিজয়মাণিক্য-কীর্ত্তি [illegible]

পার্ব্বত্য প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম-বিস্তার।

* * * সেই পঞ্চদ্রোণ ভূমি ব্রাহ্মণকে দিল। সেই হনে পঞ্চদ্রোণা গ্রাম-নাম হৈল।" (রাজমালা।) ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরেশ্বর কল্যাণমাণিক্য তাঁহার প্রাসাদে তুলাদান উপলক্ষে বৃন্দাবন, মথুরা ও সেতুবন্ধ হইতে ৫০,০০০ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। অমরমাণিক্যের রাজ-সভায় সর্ব্বদা ২০০ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া সেই সভা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা মুখরিত করিতেন (রাজমালা।) কোচরাজ প্রাণনারায়ণ (১৬২৫-৬৫ খৃঃ) "ব্যাকরণ, স্মৃতি ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় দ্রুত-কবি ও শ্রুতিধর ছিলেন।" কথিত আছে, তাঁহার প্রাসাদে দ্বারী ও ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা বলিত। অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরমাণিক্য (১৬১১-২৩ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তদবধি খোল ও করতালের কল-স্বনে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য রাজ্য মুখরিত হইয়া আসিতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ বীর-চন্দ্রমাণিক্য যে সকল বৈষ্ণব-পদ রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি লালিত্য ও ভাব-গৌরবে বৈষ্ণব মহাজনগণের যোগ্য। রাজধরমাণিক্যের সময়ে আটজন কীর্ত্তনীয়া দিনরাত্রি অবিরাম রাজ-প্রাসাদে কীর্ত্তন গাহিত (রাজমালা)।

এই সকল রাজাদের বংশলতায় দেখা যায়, ইঁহারা ক্রমশঃ অনার্য্য উপাধি ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সংস্কৃতাত্মক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামের রাজা রুদ্রসিংহ এরূপ গোঁড়া হিন্দু হইয়াছিলেন যে, তিনি গঙ্গার খানিকটা অংশ পাইবার লোভে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল-বাদসাহের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। এই রুদ্রসিংহকে (রাজত্বকাল ১৬৮৬-১৭১৪ খৃঃ) অহম্-রাজদের চিরাগত সমাধি-রীতির পরিবর্ত্তে শ্মশানে দাহ করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা এই আদেশ করিয়াছিলেন।

খাস বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যেরূপ বাঙ্গলা-ভাষার প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং শাস্ত্র-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদকারীদিগকে অভিসম্পাত করিতেন—উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের রাজাদের আশ্রিত ব্রাহ্মণেরা ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণেরা এতকাল জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতের প্রচারের দ্বার আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব-পাহাড়-বেষ্টিত রাজ্যগুলিতে এই প্রতিকূল সাম্য-বিরোধী হাওয়া বহিবার অবকাশ পায় নাই। কোচবেহারের রাজা নরনারায়ণ (১৫৫৪-৮৭ খৃঃ) অনন্ত কন্দলী নামক প্রসিদ্ধ কবিদ্বারা রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। নোয়াখালি অঞ্চলের রাজা জয়চন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিজ ভবানী কর্ত্তৃক রামায়ণের ভাব-অনুবাদ সঙ্কলিত করাইয়াছিলেন। কবি জানাইয়াছেন, এই কার্য্যের জন্য তিনি রাজার নিকট (সেই সময়ে যখন টাকার মূল্য অনেক বেশী ছিল) প্রতিদিন দশ টাকা হিসাবে দক্ষিণা পাইতেন।

বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ।

ত্রিপুরার রাজাদের অনেকেই মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন, রাজমালায় তাহার উল্লেখ আছে। ধন্যমাণিক্য (১৪৬৩-১৫১৫ খৃঃ) অনেক সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন, তৎপত্নী বিদুষী কমলাদেবীরও এ বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল। "শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা কমলার পতি। উৎকলখণ্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি॥ জ্যোতিষের যাত্রা-রত্নাকর-নিধি আর। পাঁচালী

রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার।" ধন্যমাণিক্য রামকবি দ্বারা শ্রেষ্ঠ-চতুর্দ্দশীর বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এই পুস্তকখানি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল (১০২৯ পৃঃ)। প্রাচীন কালের কোন ত্রিপুরেশ্বরের আদেশে রচিত বৃহন্নারদীয় পুরাণের বঙ্গানুবাদ আমার নিকট ছিল। বোধ হয় এই পুস্তক এক সময়ে আগরতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, যেহেতু মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য এই পুস্তকে স্বহস্তে আমার নাম লিখিয়া একখানি উপহার দিয়াছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র-প্রকাশের জন্য বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে এক লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। অহম্-রাজ সুদর্শননারায়ণ ১৭০৮ খৃঃ অব্দে রাজ-মাতা চন্দ্রপ্রভার আদেশে নারদীয় পুরাণের আর একখানি অনুবাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই তালিকা বাড়াইবার দরকার নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বিগত ৪।৫ শত বৎসর যাবৎ প্রাদেশিক রাজাদের প্রায় প্রত্যেকে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরা পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা ও শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। *

দেখা যাইতেছে, শুধু ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, আসাম, কাছাড়, কোচবেহার নহে—গৌড়ীয় ভাষার শ্রীসাধন-কল্পে আরাকান প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য সীমান্তেও বাঙ্গলা ভাষা আদৃত হইয়াছিল। লোর চন্দ্রানীর লেখক দৌলত কাজী এবং পদ্মাবতীর লেখক সৈয়দ আলোয়াল প্রভৃতি কবিরা আরাকান-রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বঙ্গভাষায় কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ—হিন্দু কবিদ্বয়ের দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইঁহারা হুসেন সাহা ও তৎপুত্র নসরত সাহার প্রতিনিধিস্বরূপ চট্টগ্রামে থাকিয়া ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহাদি চালাইতেন। স্বয়ং নসরত সাহা পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়ের পূর্ব্বে অপর কোন পণ্ডিতের দ্বারা একখানি অনুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন। ("শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান। রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১১৬ পৃঃ।) মুসলমান সম্রাটের আদেশে গুণরাজ খাঁ ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ শেষ করেন (১৪৭০-৮০ খৃঃ)। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগে হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ ছিল না, ধর্ম্ম ভিন্ন হউক, কিন্তু মাতৃভাষা এক ছিল; একদিকে লৌহিত্য নদী, আরাকান ও নিতাই লগতাক্ হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী মণিপুর—অপরদিকে ঢাকা ও পদ্মাতীরস্থ পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীসমূহ অবধি সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ বঙ্গভাষার আদর করিয়াছে। আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি

* নিম্নলিখিত বিবরণ-পাঠে জানা যায় জনৈক ব্রাহ্মণ (অনন্তরাম শর্ম্মা) বাঙ্গলা মহাভারতের একখানি নকল প্রস্তুত করিয়া আজীবন সংসার-নির্ব্বাহের ব্যয় ও তাহা ছাড়া কিছু দক্ষিণা গোবিন্দরাম রায় নামক গৃহস্থের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন (১৭১৪ খৃঃ)। "এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের, একোন পঞ্চ অধ সাত শত ঊনসত্তরই সমাপ্ত হইয়াছে। এ অক্ষরবিদং শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মণঃ ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামাজ্যা ক্রমে অন্ন-বস্ত্রে প্রতিপাল্য হৈয়া সন্তুষ্ট হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তারপর যোলকাহন বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আজ্ঞা হইল। ততমত শকাব্দা ১৬৩৬।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৩ পৃঃ।

পূর্ব্ববঙ্গই বঙ্গভাষার গৌরবের আদি-লীলাভূমি; মহাপ্রভু নিজে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হইয়াও পশ্চিম-বঙ্গে যে ভগবদ্‌ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, তাহাতে শেষে সমস্ত বঙ্গ, বিশেষ করিয়া পশ্চিম-বঙ্গ, ভাসিয়া গিয়াছিল, তদবধি বঙ্গভাষা-চর্চ্চার কেন্দ্র পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে। আমার মনে হয়, বৌদ্ধাধিকারের শেষের দিকে রাজ-দ্বারে বঙ্গভাষা সম্মানিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেন-রাজদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া বঙ্গভাষা দ্বারা শিক্ষা-বিস্তারের পথ নিরোধ করা হইয়াছিল! কিন্তু সেন-রাজদের অধিকার-বহির্ভূত পূর্ব্বোক্ত দেশগুলিতে বঙ্গভাষা রাজদ্বারেও আদৃত ছিল—এই ভাষা ঐ সকল দেশের কোন কোন স্থানে গৌরব-জনক "সুভাষা" নামে পরিচিত ছিল (১০১৬ পৃঃ)।

আমরা গ্রন্থভাগে ডোম-সৈন্যের উল্লেখ করিয়াছি। ত্রিপুরাধিপ ধন্যমাণিক্যের সময়ে (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) তাঁহার সেনাদলের মধ্যে হাড়ি-সৈন্য অতি দুর্দ্ধর্ষ ছিল।

হাড়ি ও ডোম সৈন্য।

খাসিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধকালে হাড়ি-সেনাপতিদের ভয়ে খাসিয়া-রাজ রণক্ষেত্রে না যাইয়া ত্রিপুরেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। "দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া। হাড়িয়া ডগর বাদ্য চলে বাজাইয়া।......উত্তরের হাড়ি চলে আগে লৈয়া বানা। বঙ্গদেশী হাড়ি সব মধ্যে থাকে থানা। দক্ষিণ দিগের হাড়ি চট্টগ্রাম আদি। তার সেনা মাঝে চলে মহাশঙ্খ বাদি। ডেমস ডগর বাজে নাচে ঊর্দ্ধ হাতে। শূকর-খেদান লাঠি পাকাইয়া মাথে।" ডোম-সেনাপতি কালুর যে বিস্ময়কর বীরত্বের বর্ণনা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, তাহার অনেকখানি কল্পনা-মূলক। কিন্তু রাজমালায় উল্লিখিত হাড়ি-সৈন্যের কথা নিছক ঐতিহাসিক সত্য। আজ আমরা হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতিকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে 'ছি! ছি!' করিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে তাড়াইয়া দিতেছি—আমাদের সমাজের ইহারাই এককালে ভিত্তি রক্ষা করিতে যাইয়া অকাতরে প্রাণ দিয়াছে। এই অকৃতজ্ঞ সমাজের প্রতি বিরূপ হইয়া যদি তাহারা এখন প্রতিশোধ লয়, তবে আমরা কি বলিতে পারি? ক্ষুদ্রতম কীটও জন্মে জন্মে পদ-দলিত হইয়া শেষে সর্পে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রের মধ্যেও অনন্ত শক্তির বীজ লুক্কায়িত আছে, আমরা আপনার লোকদিগকে পর করিয়া দিয়া জাতীয় শক্তির কতটা হানি করিতেছি, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

উত্তরবঙ্গের উপান্ত-ভাগে পার্ব্বত্য পল্লীতে হেবজ্রের যে মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহার ক্ষুদ্র প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহারের অনুগ্রহে আমরা এই পুস্তকে দিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে যুগলের বড় আদর্শ ভারতীয় শিল্পে আমরা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হেবজ্রের কাষ্ঠ ও প্রস্তর-নির্ম্মিত অনেকগুলি মূর্ত্তি আমরা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে দেখিয়াছি,

হেবজ্র।

কিন্তু নাহার মহাশয়ের সংগৃহীত মূর্ত্তিটিই সর্ব্বোত্তম। বাহিরের আত্যন্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পুংচিত্রের মুখে যে অনবদ্য আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কামগন্ধ নাই, তাহা অনাবিল ধ্যান-লোকের আধ্যাত্মিক আনন্দ। বৈষ্ণবদের চিত্রশালায় যে আনন্দ এখনও অনাগত, চিত্রকরকে

তাহা আঁকিতে হইলে এই চিত্রের জড় অংশ বাদ দিয়া বিশুদ্ধ প্রেমের অংশটুকু আদর্শ করিলে ভাল হয়।

* বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে আনন্দ-হীনের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করাতে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আপত্তি করিয়াছেন। মাধ্যমিক মহাযান বাদীরা কয়েক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে উপনিষদের গা ঘেঁসিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টিত; "নির্ব্বাণ"কে তাঁহারা যে ভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে উহা কতকটা "ভাব-সমাধি"রই মত হইয়া দাঁড়ায়। নিরীশ্বর বৌদ্ধ-ধর্ম্মে বুদ্ধই কালক্রমে ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিলেন; জাপানের হরিউজি মন্দিরে রক্ষিত "সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক" গ্রন্থে বুদ্ধকে স্বয়ম্ভূ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই ভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রথমোদ্যম সূচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-তন্ত্রে আদি-বুদ্ধ-আদি-প্রজ্ঞার সঙ্গে এবং বজ্রসত্ত্ব শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া তন্ত্রোক্ত হরগৌরীর যুগলমূর্ত্তি সংবলিত শৈবধর্ম্মের,—তথা তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম্মের গোড়া পত্তন করিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে; ধর্ম্মপালের সময়ে (অষ্টম-নবম শতাব্দী) "মহাসুখবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, বুদ্ধ যে আনন্দ-স্বরূপ এই মতবাদ তাহা প্রকাশ করে। বাঙ্গালী টঙ্কদাস হেবজ্রতন্ত্রের টীকা লিখেন। এই মহাসুখবাদ' হইতেই বজ্রযান ও কালচক্রযানের মতাদি উদ্ভূত হয়।" (যামিনীকান্ত [illegible]ন—'দেশ', শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪১ সন, ৮৬ পৃঃ।)

আনন্দহীনের ধর্ম্ম।

বুদ্ধদেবের দুঃখবাদে ক্লান্ত হইয়া, ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উপনিষদের দিকে অগ্রসর হইতে ছিল। কালচক্রযান ও বজ্রযানে যে ভক্তিবাদ সূচিত, শৈবধর্ম্মে ও বৈষ্ণবধর্ম্মে তাহার পরিণতি, এজন্য ডাঃ কারন (Dr. Kern) লিখিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে এদেশে ভক্তিবাদের উৎপত্তি।

এইভাবে ভারতীয় বৌদ্ধগণ এক যুগে উপনিষদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও বলিতে হইবে, এই আনন্দ ও সুখবাদ বুদ্ধদেবের আদর্শ হইতে অনেকটা উল্টা পথ ধরিয়াছিল।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মে তপস্যার জন্য অতিরিক্ত শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে (১১৬ পৃঃ)। এ সম্বন্ধে মহাভারতের নির্দ্দেশ বহুপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, "অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্যা, কেবল শরীর-শাসন করিলেই তপস্যা হয় না" (মহাভারত, শান্তি, ৭৯ অঃ)।

আমরা এই পুস্তকের ৭১, ৮৮ এবং ৮৯ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, বঙ্গদেশ হইতে এক সময় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে ও দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ পাল-রাজগণ তাঁহাদের রাজত্বের আদি কালটায় বড়ই গোঁড়া ছিলেন, ইঁহাদের উৎপীড়নেই গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা দেশ-ত্যাগী হইয়া সমস্ত পূর্ব্বভারতকে হিন্দু-গণ্ডীর বহির্ভূত বলিয়া শাসন প্রচার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি যে সকল [illegible] হইয়াছে, তদ্দারা নবম-দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের বিদেশে [illegible]

পট্টীকৃত হইয়াছে। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় (Vol. XXI, p. 260) প্রকাশিত কোলাগাল্লুর [মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ রেলওয়ের গুণ্টাখালির হুগলি (Hugli)-অঞ্চলের] অনুশাসনে দৃষ্ট হয়, রাষ্ট্রকূটরাজ খোট্টিগ ৮৮৯ শকে (৯৬৭ খৃঃ অব্দে) গদাধর নামক গৌড়াগত ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণকে "বারেন্দ্র দ্যোতকারিণা" বিশেষণ দ্বারা বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জানা যাইতেছে। ইনি "বিদ্বান্-গৌড়চূড়ামণিগুণী" এবং ইহার জন্মস্থান'তাড়া' (Pada) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এরূপ আরও তাম্র-পট পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে এদেশের ব্রাহ্মণগণের ভিন্ন দেশে উপনিবেশ সূচিত হইয়াছে। এই ভাবে বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, শূরবংশীয় রাজার যজ্ঞের জন্য ভিন্ন দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করার দরকার হইয়াছিল। তাগা ও গৌড় ব্রাহ্মণদের বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনের সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত প্রবাদ আছে (Indian Antiquary, Vol LX, PIT)। এই পত্রিকার (Vol. XII, pp. 248-51) রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের,সাঙ্গলী প্লেটে দৃষ্ট হয়, উক্ত রাজা কেশব দীক্ষিত নামক এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে লোহাগ্রাম নামক পল্লী দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্রের কাল ৮৫৫ শকাব্দ (৯৩৩ খৃঃ)। কেশব দীক্ষিতের পিতার বাড়ী ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণে অকাট্য ভাবে এই কথা সমর্থিত হইয়াছে যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরা পালরাজাদের সময়ে দেশ-ত্যাগী হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কামরূপ ও মগধাদি দেশের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।

গুজরাটে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত অন্য একটা দিক্ দিয়াও আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমাদের অনুমান হয় যে গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা আদিকালে বাঙ্গালী ছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দ, ডি. আর. ভাণ্ডারকার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাঙ্গলার বহুসংখ্যক লোক গুজরাট ব্রাহ্মণদের স্বগণ। ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল কোয়ার্টারলির (১৯৩০ খৃঃ) এক সংখ্যায় ভাস্করবর্ম্মণের তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত নাগর ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে ছিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, "We made an attempt to prove by means of epigraphic and other evidences that Nagar Brahmins existed in Bengal so far back as the 5th century". অধ্যাপক ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়েরীতে (১৯১১, ৪১-৭২ পৃষ্ঠা) প্রমাণ করিয়াছেন যে, নাগর ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলায় নানা জাতির সঙ্গে খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সেন্সাস রিপোর্টে (1931, Vol. Pt. 1, Chap. XII, Para. 543, ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠা) এই উক্তি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। মালদহে নাগর শ্রেণীর চাষারা 'কৃষ্ণ উরা' ও 'প্রিক্ষু উরা' এই দুই নামে প্রসিদ্ধ (ইহারা সাধারণতঃ কানাই এবং পলসা এই দুই নামে কথিত হইয়া থাকে)। আশ্চর্য্যের বিষয়, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণের মধ্যেও কৃষ্ণ উরা ও প্রিক্ষু উরা এই দুই শ্রেণী আছে। এই ভাবের নানা প্রমাণ Indian Culture, Vol. I, No. 3 সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধ-লেখকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাট হইতে

বাঙ্গলা দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন. আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক বিপরীত, বাঙ্গলা হইতেই নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাটে গিয়াছিলেন।

আমরা ৭১ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছি, বাঙ্গলা দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ গুজরাটে গিয়াছিলেন। এই নাগর ব্রাহ্মণেরাও সম্ভবতঃ সেই দলের। সুঙ্গ ও গুপ্ত রাজগণের সময় নাগর ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলায় ছিলেন—খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দী পর্য্যন্ত। তারপর তাঁহারা বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ দেশত্যাগী হইয়া গুজরাট এবং অন্যান্য প্রদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন। তখন বঙ্গদেশ অভিশপ্ত দেশে পরিণত হয়। তখন যে সকল নাগর ব্রাহ্মণ স্বদেশে ছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধাচারী হইয়া পতিত হন। এজন্য তাঁহারা নানা শ্রেণীতে মিশিয়া গিয়া কোথাও কায়স্থ কোথাও সৎচাষী প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হন। বিগত সেন্সাসে দৃষ্ট হয়, একমাত্র মালদহে ১৪,৩৪৬ জন নাগর শ্রেণীর লোক আছে, বৃহৎ বঙ্গে এই নাগরদের সংখ্যা অনেক বেশী। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহাদের এক শ্রেণীর নাম "ভাটনাগর"। গুজরাটেও "ভট্টনাগর" নামক এক শ্রেণীর নাগর ব্রাহ্মণ আছেন, হিন্দু-রাজত্বকালে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গলা দেশে সৎব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা পরে এত অধোগতি পাইলেন কিরূপে? এই সকল কারণে মনে হয় বাঙ্গলা হইতে গুজরাটে যাইয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা গোঁড়ামীর একটা বড় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এদিকে পাল অধিকারে তাঁহারা অনাচারী ও পতিত হইয়া বাঙ্গলা দেশে নিম্নতর জাতির সঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

নাগর ব্রাহ্মণগণের আদি বাস বাঙ্গলা বলিয়াই মনে হয়। এই অনুমান যদি সর্ব্ববাদি-সম্মত নাও হয়, তথাপি পালদের সময় যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার বিবিধ অকাট্য প্রমাণ নানা প্রদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে।

Indian Museumএর আরকিওলজিকাল শাখার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কে. এন. দীক্ষিত মহাশয় তাঁহার অধুনাতন রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত স্থানটি এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। বাক্‌পতি মুঞ্জের নরওয়াল তাম্রপত্র বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল, ইহা নবম-দশম শতাব্দীর।

"এই তাম্রশাসনগুলির প্রধান গুরুত্ব এই যে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সেই কালে ব্রাহ্মণগণ মালবে আসিয়া পরমার রাজকুমার হইতে ভূমি দান পাইয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। কতকগুলি স্থলে দেখা যায়, দূর বাঙ্গলা প্রদেশের অনেক ব্রাহ্মণ মালবে উপনিবিষ্ট হইয়া এইভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা মনে হয়, এই যুগে বাঙ্গলা দেশ বেদ-বিদ্যার একটা কেন্দ্র ছিল। দেখা যায়, দক্ষিণ-রাঢ়ান্তর্গত বিষগবাস নামক গ্রামবাসী দোনক নামক এক ব্রাহ্মণ ৭৮টি অংশের মধ্যে একাই ৫টি অংশ দান পাইয়াছিলেন। আর একজন ব্রাহ্মণ কোলঞ্চবাসী ছিলেন, এই কোলঞ্চ এবং গোলক,—দান-প্রাপক কয়েক জন ব্রাহ্মণের আদি-ভূমি; ইহারা আসাম, উত্তর-বিহার এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। আমি অনুমান করি, কোলঞ্চ—উত্তর-বঙ্গের বগুড়া জেলার ঐ নামে অভিহিত গ্রাম। সাবথিদেশ নামে আর একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস,

এই সাবথি অথবা সাবথিকা কতক পরিমাণে বগুড়াকেই বুঝায়। ইন্দ্রপাল নামক আসামের এক রাজার এক প্রশস্তিতে এই 'সাবথি'র উল্লেখ আছে—এই স্থানটি শ্রাবস্তিরই অপভ্রংশ। ইন্দ্রপালের প্রশস্তিতে এই স্থানের মধ্যে বাইগ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটি তাম্রশাসন সম্প্রতি বাইগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হওয়াতে এই স্থান-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধাই নাই, বগুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিমে বাইগ্রাম এখনও অবস্থিত। বগুড়ার উত্তরাংশের অনেকটা স্থান যে সাবথি বা সাবথিকা দেশ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তাম্রপটের 'দারত্থরিকা' এবং 'মিত্তলি-পাড়কা'—বর্ত্তমান 'দাদা' (পঞ্চবিবি থানার অন্তর্গত) এবং 'মিতাই' বা 'মিত্তাল-পাড়া' বলিয়া মনে হয়। উভয় গ্রামই বগুড়া জেলায়। মালব-রাজ হইতে ভূমি-দান-প্রাপ্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই সামবেদী, ছান্দোগ্য-শাখাভুক্ত। বাঙ্গলা দেশেই সামবেদী সম্প্রদায় বেশী, সুতরাং উপরি উক্ত সম্প্রদায়-নির্দ্দেশে বাসস্থানের ইঙ্গিত বিশেষ করিয়া পাওয়া যাইতেছে।" *

এই পুস্তকখানি প্রথমতঃ ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল,—বিলাত হইতে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে সে চুক্তি ভাঙ্গিয়া গেল। বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই ব্যাপারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত

* "The most important information contained in these plates is regarding the migration of Brahmins from various parts of the country to Malwa where they were recipients of donations at the hands of Paramara prince. In several instances the donees seem to have migrated all the way from Bengal which thus appears as a country where Brahmins studying different Vedas were flourishing. Thus we find a Brahmin named Donaka hailing from village Vilvagabasa falling within the Southern Radha country who recieved so many as five shares. Another person is said to have migrated from Kulancha which in the form of Golancha and Kroḍancha occurs as the original place of Brahmins who recieved grants in Assam, North Bihar and Orissa. I propose to identify this with Kulancha in Bogra District of North Bengal; another locality mentioned in these plates is Sāvathikā which is surely a tract more or less corresponding to Bogra District in Bengal. An inscription of Indra Pāla, a king of Assam, refers to this Sāvathi which is apparently the same as Sravasti and mentions the presence of a place called Vaigram in it. The identity of the latter has now been completely established by the find of a copper plate of the Gupta period at Vaigram which is at the North-west corner of the Bogra District in which a place is mentioned as Vāyigrām. There can be no doubt that the Sāvathi or the Sāvathi desa included the northern part of Bogra District. In the present case the two villages in the tract are Dardurika and Mitilapāthaka which it is possible to identify with Dādrā in Panchbibi Thana of the Bogra District and Mitail or Matialpara, both of which are in the Bogra District. A large majority of the Brahmins mentioned in these places from Bengal just referred to are stated to have belonged to the Chhandogo Sakha of the Sama Veda which is significant in view of the preponderance of the adherents of this Veda among the Brahmins of Bengal."

যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও প্রেস-কমিটির সদস্য শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপার বন্দোবস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে হইয়াছে। কিন্তু ছবি-সংগ্রহ এবং ব্লক-প্রস্তুত করিবার বিপুল ব্যয়ের অধিকাংশ আমাকে বহন করিতে হইয়াছে। পুস্তক সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আমি নিম্নলিখিত মহোদয়গণের সহায়তা পাইয়াছি :—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রেস- সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, খড়্গপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত, শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি। শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রেসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাস অনুগ্রহ করিয়া সূচিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আরকিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্ট আমাকে তাহাদের কতকগুলি ছবি ছাপাইবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। সেই সকল ছবি আমি * চিহ্নিত করিয়া দিলাম। ইহাদের সর্ব্বস্বত্বের মালিক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের আরকিওলজিকাল শাখা। অর্থাভাবে আমার বিখ্যাত চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রগুলির প্রতিলিপি আমি প্রচুর পরিমাণে দিতে পারি নাই। ব্লকগুলি সস্তাদরে করিতে বাধ্য হওয়ায় সেগুলি অনেক সময় মনের মত হয় নাই। ফরিদপুর হইতে দুই শত বৎসরের প্রাচীন মাতৃমূর্ত্তিটি অতীব সুন্দর, কিন্তু ব্লকটি একেবারেই তেমন হয় নাই। মেদিনীপুর হইতে শ্রুতিনাথবাবু আমায় যে মাদুরখানি দিয়াছেন, তাহা বি. এন আর. পাঁশকুড়া ষ্টেশনের চার মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত রঘুনাথবাড়ীর জনৈক কারিগর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। দুঃখের বিষয়, এই মাদুরের কাঠিগুলি যেরূপ ভাবে সূক্ষ্ম ক্ষীণ সূত্রের মত তৈরী করিয়া নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে, তাহা ব্লকটিতে আদৌ উঠে নাই। আমার সংগৃহীত কাঁথাগুলির মধ্যে মাত্র ১২খানির কিছু কিছু নমুনা দিয়াছি। যাঁহারা শিল্প-সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী, তন্মধ্যে শ্রীহট্ট জেলা-স্কুলের সুযোগ্য হেড পণ্ডিত মহাশয়ের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও আমি মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছি, তথাপি কবি জসীমুদ্দিন কাঁথা-সংগ্রহে আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বঙ্গবাসী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর নিকট আমি নানা বিষয়ে ঋণী। আমার শিল্প-সংগ্রহ শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ মাণিক্য বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে এই ভূমিকার প্রথমাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিস্তৃত ইতিহাস ও তৎসংক্রান্ত চিত্রাদি সম্বন্ধে আমি যাঁহাদের সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না—তজ্জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ত্রিপুরা ষ্টেট ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য কয়েকখানি ব্লক পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য উঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অনুক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায় ১-৮৯ পৃঃ

তৃতীয় অধ্যায় ১১৯-৫২ পৃঃ

চতুর্থ অধ্যায় ১৫৩-৭৩ পৃঃ

একাদশ অধ্যায় ৩০৫-৩৩৪ পৃঃ

দ্বাদশ অধ্যায় ৩৩৫-৪৫৭ পৃঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায় ৪৫৮—৫০৩পৃঃ

ষোড়শ অধ্যায় ৭৮৩-৯৩৮ পৃঃ

বৃহৎ বঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আনুগঙ্গ প্রদেশ

"বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ো নহি দূরতরস্থঃ।
অযুতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ করিবরকোটীশ্বরো নৈব হি নৃপতিঃ॥"

সিন্ধুনদের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র স্মরণাতীত কালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে মূলতঃ সিন্ধুনদেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তরকালে সম্ভবতঃ সমুদ্র দেখিয়া তাঁহারা উহা সিন্ধুনদের মতনই বিশাল কোন নদ মনে করিয়াছিলেন—তাই সমুদ্রের অপর নাম সিন্ধু। এই সিন্ধু নদ হইতেই হিন্দ্, হিন্দু, হিন্দুস্থান প্রভৃতি নাম হইয়াছে।

মকরের উপর গঙ্গাদেবী। খুলনা জেলার [illegible]পুরে প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে গৃহীত। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

রামায়ণে আমরা গঙ্গার যে প্রথম বর্ণনা পাই, তাহা যেন একটা নূতন বিস্ময় ও আনন্দের ভাব প্রকাশ করিতেছে। গঙ্গার জলরাশি কোথাও বায়ুবেগে চূর্ণ হইয়া সুন্দরীর বেণীর ন্যায় দুলিয়া উঠিয়াছে; কোথাও জল আবর্ত্ত-শোভিত, কোথাও বেণু-বীণার ন্যায় তরঙ্গের সুর-লহরী; কখনও জলের গম্ভীর নিঃস্বনে দিক্ প্রতিশব্দিত; কোথাও নির্ম্মলবালুকাময় তটভূমি শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রিয়দর্শন; কোথাও তটভঙ্গ-শব্দে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত; কখনও জলের অট্টহাস্য-শব্দে সিকতাভূমি কলস্বনা,—কোথাও বা মালার ন্যায় তীরুরুহ বৃক্ষরাজি সমলঙ্কৃতা; কখনও শুভ্রফেনরাশি যেন স্মিতবদনার হাসির ন্যায় মনোহর (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৪০ অঃ, ১৩-২৫ শ্লোক)। রামায়ণে গঙ্গার এবংবিধ বর্ণনা [illegible] ও [illegible]আবিষ্কারের আনন্দ সূচনা করিতেছে।

যতই আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে যাইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতীয় নিবি অরণ্যের মধ্যে দিশে-হারা আর্য্য-পথিক কোথায় যাইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইলেন। মূল আর্য্যসমাজের সং যোগ যাহাতে ছিন্ন না হয়,—প্রত্যেক আর্য্যের বাসস্থান যাহা এরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে, যাহাতে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সমাজের আহ্বানে সকলে সাড়া দিতে পারেন,—সীতাকে অন্বেষণ করিতে যাইয়া সুগ্রীবকে যেরূপ সমস্ত পৃথিবী মানচিত্র ঘাঁটিতে হইয়াছিল,—আর্য্যসমাজের কোন পথ-ভ্রান্ত পরিবারকে যাহাতে তেমন উৎকট ভাবে সন্ধান করিতে না হয়, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সমাজ ব্যস্ত ও চেষ্টিত হইলেন।

গঙ্গার মহিমা ও তাহার কারণ।

রামায়ণে গাঙ্গেয় প্রদেশের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্টই ধারণা হ আর্য্যগণ সেই স্থানটিই উপনিবেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন। রামায়ণের বর্ণ গঙ্গা শিব-জটা-জূট-ভ্রষ্টা, কিন্তু শিবপত্নী নহেন, তিনি সাগর-মহিষী; "শঙ্করস্য জটা-ভ্র গঙ্গা সাগরমহিষী।" (অযোধ্যাকাণ্ড)

রামায়ণেরও পূর্ব্বে হইতে আর্য্যগণ গাঙ্গেয় তটভূমিকে বসবাসের জন্য মনোনীত কর লইয়াছিলেন। ক্রমে এই গঙ্গার মাহাত্ম্য নানা পুরাণে কীর্ত্তিত হইল। সিন্ধু, যমু গোদাবরী প্রভৃতি শত শত নদ-নদী এই প্রদেশ অলঙ্কৃত করিতেছে। কিন্তু শিব যে গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়াছেন, সেই গঙ্গার পাবনী শক্তি বর্ণনা করিতে যা পুরাণকারেরা কতই না উপকথার সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা গঙ্গাতীরবাসী তাঁহা জন্য অক্ষয়-স্বর্গ পরিকল্পিত হইয়াছে; শত শত ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গার জল অ সম্পদের ন্যায় ভারে ভারে বাহিত হইয়া লইয়া যাওয়া হইত। সোমনাথ বিগ্রহ প্রতি সেই সদ্যঃ সংগৃহীত গঙ্গানীরে অভিষিক্ত হইতেন। এজন্য শত সহস্র লোক গুজরাট হ সারি দিয়া গঙ্গার উপকূল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিত; এক এক কলসী জল শত শত ে অতিক্রম করিয়া হাতে হাতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে মন্দিরে আনীত হ ভারতের দূরদূরান্তরে কেহ কেহ দীঘি খনন করাইয়া গঙ্গাজলে উহা পূর্ণ করিবার করিতেন। তখনকার দিনে, যখন যাতায়াত বহু বিঘ্ন-সঙ্কুল ও বিপজ্জনক ছিল, তখন এ কার্য্য যে কত কৃচ্ছ্রসাধ্য ও ব্যয়জনক ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। গঙ্গা মরিবার ইচ্ছা হিন্দুর স্বাভাবিক, উহা অপরিহার্য্য সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। কত আসন্ন ধনবান্ হিন্দু বহুদূর হইতে গঙ্গাতীরে আনীত হইতেন। রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম, শীতের প্রা ও প্রচণ্ড ঝড় সহ্য করিয়া চিরদিন আরামে পালিত ধনী ব্যক্তি মুমূর্ষুকালে অম্লানচিত্তে পর দিন গঙ্গাতীরে অতি অসুবিধাজনক স্থানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। *

* এই সংস্কার হিন্দুর হৃদয়ে কতটা বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংরাজী সভ্যতার পক্ষপাতী ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী ঢাকা-নবগ্রাম নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পার্ব্বতীচরণ রায় ম

হিন্দুর গঙ্গাভক্তির উদাহরণ সকলেই জানেন। ইহার বহু উদাহরণ সকলেই দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা এই সংস্কারটি সৃষ্ট করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি মূলতঃ ধর্ম্মমূলক ছিল? আমার মনে হয়, এই গঙ্গাজলকে পাপী, তাপী, আর্ত্ত ও মুমূর্ষুর অনন্যশরণ পরিকল্পনা পূর্ব্বক স্মৃতিকার আর্য্যসমাজের উপনিবেশ একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া জাতীয় ঐক্য দৃঢ়বদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সংস্কারের জন্য গঙ্গার দুই তীর আর্য্যনিবাসে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গাতীরে বাস পরম শ্লাঘার বিষয়, এই বিশ্বাসে ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু পুণ্য অর্জ্জন করিবার আশায় গঙ্গাতীরে বাসের জন্য এতটা লোলুপ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক টুকরা অস্থি যে গঙ্গার জল স্পর্শ করিলে মৃতের আর নরক-ভোগ অসম্ভব হয়, এমন নদীকে কে উপেক্ষা করিবে? এমন কি পাঠান দরাফ্ খাঁ পর্য্যন্ত সংস্কৃতে গঙ্গাস্তব লিখিয়া গিয়াছেন।* পাদটীকায় উল্লিখিত বিধর্ম্মী পার্ব্বতী রায় লণ্ডনে বাস করিয়া এক ফোঁটা গঙ্গার জলের জন্য মৃত্যুকালে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং আলিবর্দ্দি খাঁ মৃত্যুকালে কিরীটেশ্বরীর পাদস্পৃষ্ট গঙ্গাজল পান করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই বহু-ব্যাপক সংস্কারের ফলে আর্য্যসমাজের বাসস্থান একটি গণ্ডীতে বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। গঙ্গার দুই তীর ঘুরিলে মূল আর্য্যসমাজের একটা প্রধান

পেন্সন লওয়ার পরে জীবনের শেষ ভাগ বিলাতে যাপন করেন; সেই বয়সে তিনি বিপত্নীক হইয়া বিলাতে এক মেম বিবাহ করেন। কিন্তু এই সময় স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে দূরে যাইয়া তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে প্রীতি সজাগ হইয়া উঠে। তিনি ইংরাজীতে "From Hinduism back to Hinduism" (হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া ঐ ধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ) নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। যে সময়ে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাঁহার বিদেশিনী পত্নীকে অনুনয় করিয়া বলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যাহাতে একবিন্দু গঙ্গাজল পান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা না করিলে তাঁহার মৃত্যু সুখকর হইবে না। এই রমণী বিলাত হইতে রায় মহাশয়ের আত্মীয়গণের নিকট এক শিশি গঙ্গাজল পাঠাইবার জন্য কাকুতি মিনতি করিয়া যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার আত্মীয় সুলেখক শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনের নিকট ছিল। আমি সেগুলি পড়িয়াছি, তাহাতে "Poor dear cries for a drop of Ganges water"—"আমার প্রণয়াস্পদ স্বামী এক ফোঁটা গঙ্গার জলের জন্য কাতর হইয়া পড়িয়াছেন" প্রভৃতি ভাবের কথা ছিল। এরূপ সাহেবী ভাবাপন্ন স্বদেশত্যাগী ব্যক্তির মনের এইরূপ সংস্কার কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? আমি বেহালায় থাকি; কোন কোন সময় দেখিয়াছি, ১০।১৫ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া লোকেরা দক্ষিণদিক্ হইতে শব কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে—গঙ্গাতীরে দাহকার্য্য করিবার জন্য।

* দরাফ্ খাঁ-কৃত গঙ্গাস্তব হইতে নিম্নে চারিটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"সুরধুনিমুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তম্।
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতি-বিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্।
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্।"

শাখার সন্ধান পাইতে কোনও কষ্টই হয় না। নতুবা এক সময়ে যে ঝারিখণ্ড বন সি

আমুগঙ্গ প্রদেশে আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা।

ব্যাঘ্র ও অপরাপর হিংস্র পশুসঙ্কুল ছিল, যে প্রাগ্জ্যোতিষ অতি দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইত, পুরা উপগল্প কথঞ্চিৎ মানিয়া লইলে, সগরের অসংখ্য বংশধর যে র স্থাপন করিতে যাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন—সেই কিরাত, মেচ, কু হাজাং, চাকমা প্রভৃতি জাতি-অধ্যুষিত আরণ্য প্রদেশে কে ভরসা করিয়া আসি গঙ্গা শুধু তাঁহার স্বীয় উপকূল নহে, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত জন-বিরল স্থানে আর্য্যসমা আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। এই জন্য কালীঘাটের মরাগঙ্গার কর্দ্দম-জলে অব করিবার জন্য নিত্য শত শত লোকের ভিড় হয়,—অথচ এককালে যে সকল নদী গঙ্গার ও শাখা ছিল, ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধাধিকারে দূষিত মনে করিয়া যাহাদের মহিমা লুপ্ত ক দিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গের সেইরূপ বড় বড় নদীর এখন আর আদর নাই।

যাহাদের পক্ষে নানা কারণে গঙ্গাতীরে বাস করা অসম্ভব হইয়াছিল, সামাজি

দূরে অবস্থিত হিন্দুদিগকে ঘন ঘন গঙ্গাতীরে আহ্বান।

তাঁহাদিগকেও ঘন ঘন গঙ্গাতীরে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছি পঞ্জিকা হাতে লইলেই দেখিবেন, কোন্ কোন্ যোগে গঙ্গ গৃহস্থের পক্ষে অবশ্যপালনীয়; সেই সেই যোগে এবং গ্র উপলক্ষে গঙ্গাতীরে যে ভিড় হয় উহা সামলাইয়া লইতে ব স্বেচ্ছাসেবক গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন।

গঙ্গাভক্তি আর্য্যসমাজকে ঐক্যের অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল। গঙ্গা স সমুদ্রে পড়িয়াছেন; আমাদের বঙ্গদেশ—শুধু বঙ্গদেশ নহে, সমস্ত পূর্ব্বভারত আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে। এই গঙ্গার উপকূলে শত শত মঠ উত্থিত হইয়া এব ভারতীয় সভ্যতার দিক্‌প্রদর্শন করিয়াছিল। গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ—মঠ, মন্দির, অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদে সমলঙ্কৃত হইয়া এবং কৃষকের হলচালনে উৎকৃষ্ট উর্ব্বর ভূমি বহন করিয়া লক্ষ্মীর পদাঙ্ক-লাঞ্ছিত হইয়াছে। যেখানে গঙ্গা স্বয়ং পারেন নাই, প্রাচীন কালের এক রাজর্ষি দীর্ঘজীবনের তপস্যার দ্বারা প্রশস্ত খা করিয়া বহু-যোজন-ব্যাপক সেই মহাদেশে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন; সেই পু মহাজনের কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের প্রবচন-সম্রাট্ ডাক বলিয়াছেন, "মরুবি যদি মরু খাদে" (যদি মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে ভগীরথের খাদে মরাই শ্রেয়ঃ)।

সিন্ধু ও সরস্বতীর যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে পুরাণে গঙ্গা-স্তোত্রের একটা ভেদ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩য় সূক্ত, ষষ্ঠ মণ্ডলের

অপরাপর নদ-নদীর সঙ্গে গঙ্গার পার্থক্য।

৬৪ সূক্ত, সপ্তম মণ্ডলের ৩৬ ও ৯৫ সূক্ত পাঠ করিলে পাইবেন, ঋগ্বেদের ঋষিরা সিন্ধু ও সরস্বতী সম্বন্ধে যে সক লিখিয়াছেন, তাহা উচ্ছ্বসিত কবিতা ভিন্ন আর কিছু বিশালতোয় জলরাশির অপরূপ রূপ, মধুপুষ্পপ্রসূ তরুলতাসমলঙ্কৃতা তটভূমি

শাখাসেবিত তরঙ্গভঙ্গ দর্শনে বৈদিক কবি বিস্ময় ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন। বাল্মীকিকৃত গঙ্গাবর্ণনা (রামায়ণ, অযোধ্যা) কতকটা সেইরূপ বটে, কিন্তু পুরাণের প্রশংসা অন্যবিধ, তাহাতে গঙ্গাতীরে বাস হিন্দু স্মৃতির অনুশাসনের অন্তর্গত হইয়াছে। সেই সকল শ্লোক কবিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া সামাজিক বিধিতে পরিণত হইয়াছে,—তাহাদের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট।

আমাদের বাঙ্গলাদেশ যে মহাপ্রাকৃতিক শক্তির পুণ্য-প্রভাবে ধনধান্যশালী, শ্যামশ্রী-মণ্ডিত ও সভ্যতার শেখরাসীন হইয়াছিল—সেই সুরতরঙ্গিণীকে ভগীরথের পূর্ত্তকৌশল যেদিন শাখা-প্রশাখা-সমৃদ্ধ করিয়া এ দেশে বহমান করিয়াছিল, সেইদিন একসঙ্গে এদেশে আর্য্যসভ্যতা এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রবেশপথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। গঙ্গার এক স্তোত্রে ভক্তিমান্ কবি লিখিয়াছেন যে, হে মাতঃ গঙ্গে! তোমা হইতে দূরে অবস্থিত কোন রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া অপেক্ষা তোমার জলের ক্ষুদ্রতম মৎস্য বা কচ্ছপ হওয়াও আমি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৃহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ

"অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল
গান্ধার হ'তে জলধি শেষ
তুই কিনা মাগো তাদের জননী,
তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।" —দ্বিজেন্দ্রলাল।

বৈদিক ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বভারত অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যনিবাসে পরিণত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রগণকে বিশ্বামিত্রের সন্তান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, চন্দ্রবংশীয় অমূর্ত্ত নামক এক নৃপতি ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগ্জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণে দৃষ্ট হয়, বিদেঘমাধব নামক কোন রাজা মিথিলায় আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, "পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি দেশীয় মহাত্মারা শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।" হরিবংশে লিখিত আছে, পুরুর পঞ্চপুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ—ইহারা ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। সাগর-সঙ্গমের নিকট 'কপিলাশ্রম' অতি প্রাচীন আর্য্যতীর্থ। সাগর-সঙ্গমের এই কপিলাশ্রমে এখনও বৎসর বৎসর সাগরে স্নান উপলক্ষে অসম্ভব জনতা হইয়া থাকে। ভগীরথ এইখানে

প্রাচ্য ভারতে আর্য্য-নিবাস।

গঙ্গার নবশাখা খনন করিয়া সমুদ্রের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন; কপিল, ভগীরথ ও গঙ্গার বিগ্রহ এখনও তথায় পূজিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরার চতুর্দ্দশ দেবতা-পূজক চন্তাইগণ সেই হইতে তথায় যাইয়া বঙ্গের দূরতর সীমায় আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ তীর্থও অতি প্রাচীন। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে বহু প্রাচীন তীর্থ আছে, সেগুলি স্মরণাতীত কাল হইতে বিদ্যমান। আমরা পরে তাহা আলোচনা করিব (পরিশিষ্টে শ্রীহট্টের ইতিহাসাংশ দ্রষ্টব্য)।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্বভারতে আর্য্যসভ্যতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের বিষয় নহে। তৎপরে কৃষ্ণের জ্ঞাতি ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আসিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহের ভাব শিক্ষা দেন; তিনি এই সকল দেশে জৈনধর্ম্ম বিশেষ করিয়া প্রচার করেন। মগধাধিপতি জরাসন্ধ, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের নরক, ভগদত্ত, পৌণ্ড্র বাসুদেব প্রভৃতি পূর্ব্বভারতের রাজারা কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন; ত্রিপুরাধিপতি ত্রিপুর নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম-বন্যায় পূর্ব্বভারত ভাসিয়া গিয়াছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণেরা এই দেশকে তাঁহাদের গণ্ডীর বহির্ভূত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত পূর্ব্বভারতকে কলঙ্কলাঞ্ছিত করিয়াছিলেন; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এমন কি সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বৃহৎ জনপদকে তাঁহারা আর্য্যগণ্ডীর বহির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"যাঁহারা তীর্থ-যাত্রার উপলক্ষ ভিন্ন এই সকল দেশে গমন করিবেন তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে।"

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেঽপি চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

কিন্তু শ্লোকটির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই সুবৃহৎ নিষিদ্ধ জনপদে আর্য্যগণ-পূজিত অনেক তীর্থ বহুপূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। এক কালে যে সকল স্থানে ঋষিরা তীর্থস্থান করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে উহারা নিষিদ্ধ রাজ্যে পরিগণিত হইল কেন? আদি-যুগে এ রাজ্য আর্য্যগণের অধ্যুষিত হইয়া পরে তাঁহাদের এক বৃহৎ শাখা দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল কেন? ইহার উত্তর এই,—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের হাওয়া বহিয়া হিন্দুর চক্ষে এ দেশকে দূষিত করিয়াছিল। তীর্থঙ্করচূড়ামণি পার্শ্বনাথ পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি প্রদেশে চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক কল্পসূত্রের শিক্ষা দিয়া যজ্ঞ ও কর্ম্মকাণ্ডময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই জন্য হিন্দুদিগের দ্বারা এই দেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই নিষেধবিধি পূর্ব্বভারতে আর্য্য-উপনিবেশের আধুনিকত্ব প্রমাণিত করে না,—আর্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখার দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করে মাত্র। যে মগধ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ ভারতের ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, তাহাদিগকে অনার্য্য বলিয়া ঘোষণা করা ঘোর অসূয়ার ফল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিদ্বেষে পূর্ব্বভারত নিগৃহীত।

বৃহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ

গৌড় সভ্যতা অতি প্রাচীন। পরবর্ত্তী গৌড়েশ্বরগণ "পঞ্চগৌড়েশ্বর" অথবা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর এই গৌরবান্বিত উপাধি ধারণ করিতেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটা প্রাচীন রীতির প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণ।

রামায়ণ ও মহাভারতকে আমরা বর্ত্তমান যুগের নির্দ্দেশ অনুসারে ঠিক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পুরাণগুলি সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তথাপি এই সকল কাব্য-পুরাণে যে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাদের কাব্যাংশ ও ধর্ম্মতত্ত্ব, ভক্তি-ব্যাখ্যা ও উপকথা ছাড়িয়া দিলেও ইহারা যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের এক একটি দিগ্দর্শনস্বরূপ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উপকথা-বহুল ঐতিহাসিক উপকরণ পাশ্চাত্ত্য দেশে অগ্রাহ্য হয় নাই। সে দেশে ভারতবর্ষের ন্যায় এত তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপিও পাওয়া যায় নাই। মূলকথা এই উপকরণগুলি হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির করিতে হইলে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির আশ্রয় লইতে হইবে। তাম্রশাসন যে বিশ্বস্ততার প্রতীক, তাহাও আমরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারি না। তাহাতেও তোষামোদ-জীবিগণের অতিরঞ্জন ও সত্যের অপলাপ আছে। সর্ব্বত্রই বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হয়।

যখন আমরা মহাভারত ও হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে নরক, ডিম্ভক, মুর, ভগদত্ত, জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব প্রভৃতি বহুবিধ আর্য্যরাজন্যকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে দেখিতে পাই, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতযুদ্ধের প্রাক্কালে পূর্ব্বভারত অনেক পরিমাণে নব-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। এই বিরুদ্ধতা উত্তরকালে বৌদ্ধ ও জৈন প্রাধান্যের যুগে পূর্ব্বভারতকে কয়েক শতাব্দী কাল নবযুগের হিন্দুদিগের নিকট বর্জ্জনীয় করিয়া তুলিযাছিল। হিন্দুবিদ্বেষের জন্যই আমরা এই দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে এত অজ্ঞ ছিলাম। কৃষ্ণের প্রবল সহায়তায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, সেই পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্ম জৈন-বৌদ্ধদিগের উজ্জ্বল অধ্যায় এদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছিল। বৌদ্ধবিহারের নাম শুনিলে হিন্দুগণ কাণে আঙুল দিতেন, এই পাপ নাম উচ্চারণ করিতে নাই—শিশুরা এই শিক্ষা পাইয়াছিল। হিউনসাঙ্গ-বর্ণিত সমতটের রাজধানী কাম্‌তা নগরে (কর্ম্মান্ত, আধুনিক সময়ে কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী কাম্‌তা) যেখানে সঙ্ঘারাম ছিল বর্ত্তমানে উহার নাম "বিহারমণ্ডল"—উহা বড় কাম্‌তা গ্রামের কিছু উত্তরে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন, "পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ কখনও ভোরের বেলায় সেই গ্রামের নাম লয় না, পুবের গ্রাম কি পশ্চিমের গ্রাম ইত্যাদি বলিয়া দরকার হইলে ইহার উল্লেখ করিয়া থাকে" (প্রতিভা, তৃতীয়বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১২৫ পৃষ্ঠা)। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম্. এ., পি-এচ্. ডি, মহাশয় "ছদ্মবেশে দেবদেবী" নামক তাঁহার একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের

প্রাচীন ইতিহাস বিলোপের কারণ।

সর্ব্বত্র আরাধ্য হিন্দুদেবতার অনেকগুলিই বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ দেবদেবীগণ হিন্দুর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বেমালুম নিজস্ব করিয়া বৌদ্ধঋণ অস্বীকার করিয়াছেন; এমন কি তারা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাদিগকে আমরা যেভাবে পূজা করিয়া থাকি, তাহা বৌদ্ধ তন্ত্রের অনুগত। তিনি দেখাইয়াছেন, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা প্রভৃতি সাতটি দেবতা তারার রূপান্তর, এবং তারা দেবীর উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে; ইহার মাথায় "অক্ষোভ্য," পাঁচটি মুদ্রা ও 'একজটা' নাম সমস্তই বৌদ্ধতারা হইতে গৃহীত। পরবর্ত্তী হিন্দু তান্ত্রিকগণ "অক্ষোভ্য" অর্থে শিব এবং 'একজটা'ও হিন্দু দেবতার বিভূতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু অক্ষোভ্য প্রকৃতপক্ষে ধ্যানী বুদ্ধ; একজটা বৌদ্ধ দেবতা, এবং মুদ্রাগুলিও বৌদ্ধ তন্ত্রানুগ। হিন্দু তন্ত্রের যেগুলিতে অনুরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটিই সপ্তম শতাব্দী হইতে অধিক প্রাচীন নহে; এবং বৌদ্ধ তন্ত্রে এই সকল লক্ষণও যেরূপ দৃষ্ট হয়—হিন্দু তন্ত্র ব্যাখ্যায় তাহা নাই; তাহা কোনরূপ গোঁজামিল মাত্র। সরস্বতী অবশ্য বৈদিক দেবতা, কিন্তু বঙ্গদেশে ইঁহাকে ভদ্রকালী বলিয়া পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। বিনয়বাবু বলেন, "সরস্বতী বৈদিক দেবতা, পুরাণেও তাঁহার পূজা আছে এবং পুরাণগুলি প্রায়ই তান্ত্রিক যুগের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সে সকল কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই..........কিন্তু যখন ভদ্রকালীর সঙ্গে সরস্বতীর যোগ হইয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে আমরা যে সরস্বতীর পূজা করিতেছি তিনি (বৌদ্ধ) তারার একটি রূপভেদ" (হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনা-লেখমালা, ১৮-২৮ পৃঃ)। কালিদাস শিবের বিবাহকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে কালীদেবীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তখনও তিনি হিন্দু দেবমন্দিরে বিশ্বমাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত হন নাই।

এই ভাবে দৃষ্ট হয়, হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু নষ্ট করিয়া ছাড়েন নাই, তাঁহারা দুহাতে বৌদ্ধ-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের উপর নিজ নিজ নামাঙ্কের ছাপ দিয়া উহা সর্ব্বতো-ভাবে নিজস্ব করিয়াছেন। হিন্দুর পরবর্ত্তী ন্যায়-দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই ঋণের পরিচয় আছে—কোথাও ঋণ-স্বীকার নাই। এইভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। বঙ্গের পশ্চিমোত্তর উপান্তে প্রিয়দর্শী অশোক প্রভৃতি যত বড় বড় রাজা জন্মিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের নিকট তাঁহারা নামে মাত্রও পরিচিত ছিলেন না। বঙ্গগৌরবের মধ্যমণি বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের নাম পর্য্যন্ত বিক্রমপুরবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর ও সুবর্ণ বিহারের নামই বা কে শুনিয়াছিল? কেবল আমরা যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের নাম লইয়া গর্ব্ব করিতে শিখিয়াছিলাম; কেবল ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। বাড়ীর কাছে কলিঙ্গের যে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ সৈন্য হত্যা করিয়া রাজা অশোক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রণ মহাযুদ্ধের কথাও আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু কবে কোন্ যুগে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা তাঁহার উদরস্থ হইয়া কর্ণরন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়াছিল এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপলক্ষে মারুতি কবে কোন্

দিক্ দিয়া গন্ধমাদন শৈল কাঁধে করিয়া লঙ্কাক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল, স্মরণাতীত কালের সেইরূপ উপকথা আমরা পয়ার ছন্দে পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। বগুড়া জেলায় ভীম কৈবর্ত্তের জাঙ্গালকে আমরা দ্বিতীয় পাণ্ডবের কীর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া ভক্তিতে গদ্গদ হইয়াছি এবং ঢাকা জেলার সাভারের বৌদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষকে পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের বাড়ী মনে করিয়া সশ্রদ্ধ হইয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ত্রিপুরা জেলার ময়নামতী পাহাড়ে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড লোকে শুম্ভ-নিশুম্ভের অস্থি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। জৈন ও বৌদ্ধ দেবতার বিগ্রহ বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু তাঁহারা যে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মের অন্তর্গত তাহা কে কবে মনে করিয়াছিল? কোন কোন স্থানে দিগম্বর তীর্থঙ্কর শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। এক স্থানে দেখিয়াছি বোধিতরুর নিম্নে উপবিষ্ট বুদ্ধ বিগ্রহের নাম পাণ্ডারা দিয়াছে 'জটাশঙ্কর,'—বুদ্ধের শিরের ঊর্দ্ধে বোধিতরুর পত্রপুঞ্জ জটাস্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছে। বুদ্ধমূর্ত্তিকে সিন্দুর-মণ্ডিত করিয়া গ্রাম্য পুরোহিতেরা তারা মূর্ত্তিজ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়া মাতৃপূজার বাঞ্ছা চরিতার্থ করিয়াছেন, এরূপ সংবাদও আমরা জানি। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন, "ত্রিপুরায় বড় কামতা গ্রামে বিহার মণ্ডলে বৌদ্ধ জম্ভলমূর্ত্তি কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে" (প্রতিভা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৫ পৃঃ)। অনেক স্থলে অশোক-স্তম্ভ 'ভীমের গদা' নামে অভিহিত।

বুদ্ধমূর্ত্তিকে হিন্দুদেবতা-রূপে পূজা।

হিন্দুদের ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নাই, যাঁহারা এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণেরা এতই বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই সকল পাপ-কথা যেন কেহ না শুনে এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি লোপ করিয়া দিয়াছিলেন। সত্যবটে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে জয়দেব কয়েকটি ছত্রে বুদ্ধের বন্দনা করিয়াছেন। আরও দুই এক স্থলে হিন্দুরা এইরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। অগাধ অপ্রমেয় হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে পরবর্ত্তী কালের সেই সকল পংক্তি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কি ভীষণ অত্যাচারের সহিত ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম ভারত হইতে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা শঙ্কর-বিজয় নামক পুস্তকের নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায়:—

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রতি অত্যাচার।

"দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যাননেকবিদ্যা-প্রসঙ্গভেদৈ-র্নির্জিত্য তেষাং শিরাংসি পরশুভিশ্ছিত্বা বহুষু উদূখলেষু নিক্ষিপ্য কঠভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমতধ্বংসমাচরন্ নির্ভয়ো বর্ত্ততে।" জৈনদের প্রতি আরও যে সকল অমানুষী অত্যাচার হইয়াছিল তাহা পরে লিখিব (জৈন শব্দসূচি দ্রষ্টব্য)।

বৌদ্ধধর্ম্মের নেতারাই শুধু এই ভাবে নিপীড়িত হন নাই, শূন্যপুরাণে দেখা যায় অতি নিম্নস্তরের বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মমতাবলম্বীরা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়াছিল। "বেদ-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল এবং তাহারা সদ্ধর্ম্মীদের যথাসর্ব্বস্ব

কাড়িয়া লইয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। তাহাদের কাতর প্রার্থনায় ধর্ম্মের (বুদ্ধের) আসন টলিল, তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধর্ম্ম যবনরূপী হইয়া মাথায় টুপি পরিয়া কামান হাতে লইলেন। দেবতাগণ ইজার পরিয়া ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ব্রহ্মা মহম্মদ হইলেন; বিষ্ণু পয়গম্বর এবং আদম শিব হইলেন।" এই অবতারের তালিকা খুব দীর্ঘ, তাহাতে গণেশকে গাজি, কার্ত্তিককে কাজি, ঋষিদিগকে ফকির এবং ইন্দ্রকে আমরা মৌলানা-রূপে দেখিতে পাই। চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি দেবতারা পদাতিক হইয়া সামরিক বাজনা বাজাইতে লাগিলেন। শূন্যপুরাণে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক পরিচ্ছেদে এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

মালদহ জেলার কোন স্থানে হয়ত মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণের উৎপীড়নে উল্লসিত হইয়া উৎপীড়িত সদ্ধর্ম্মাশ্রয়িগণ এই ব্যাপারে দৈব প্রতিশোধের পরিকল্পনা করিয়াছিল।

সদ্ধর্ম্মীর দলন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে 'বুদ্ধদেবের অবতার' বলিয়া নিজকে প্রচার করিয়া বৰ্দ্ধমানবাসী রামানন্দ ঘোষ নামক একব্যক্তি একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ অতি তীব্র ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুরা বৌদ্ধ ও ডোম পণ্ডিতদিগের বৃত্তি লোপ করাইয়া তাহাদের হস্ত হইতে দেবমন্দিরের পূজার অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ডোমাচার্য্যদিগের নাম বৌদ্ধ-সাহিত্যে পরিচিত। যে সকল বৌদ্ধ পুরোহিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিয়া অতি হেয় জিনিষ ভক্ষণ করিতেন তাঁহারাই সম্ভবতঃ 'মেথর' শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিলেন। শব্দটি 'মহত্তর' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। হিন্দু স্মৃতির বিধানে চণ্ডালেরা মেথরদের বর্ত্তমান কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু কালে যখন চণ্ডালেরা হিন্দুর নিতান্ত অনুগত ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর গণ্ডীভুক্ত হইয়া পড়িল, তখন বিজিত শত্রুগণের মধ্যে যাঁহারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির দরুন নিতান্ত হেয় জিনিষ ঘাঁটাঘাঁটি করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, তাঁহারাই চণ্ডালের কাজের ভার লইতে বাধ্য হইলেন। ইঁহারাই ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। এদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ে বিজিত বৌদ্ধদিগের প্রতি যেরূপ কঠোর নিপীড়ন চলিয়াছিল, তাহাতে বৈষ্ণবেরা যদি সেই সকল হতভাগ্যের জন্য স্বীয় সমাজের দ্বার উদ্ঘাটন না করিতেন, তবে সেই শ্রেণীর সকলেই মুসলমান হইয়া যাইত। কেবল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি নহে, জৈনদিগের প্রতিও ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষ প্রজ্বলিত ছিল, 'হস্তিনা পীড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈনমন্দিরম্' এই একটি কথায় সেই বিদ্বেষ বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে শৈবেরা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মস্তক ছেদন করিয়া কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের মতের ধ্বংস করিয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে লিখিত হইবে।

যাহা হউক বিদ্বেষ ও উৎপীড়নাদি সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনের সারাংশ ব্রাহ্মণেরা নিজেদের শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়া শেষে এই দুই ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এ দেশের বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের ঋণ তাহার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় [illegible]।

বৌদ্ধ-ইতিহাস ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছায় ও ঘোর শত্রুতা করিয়া লুপ্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের

রাজ্যে যে কোন কালে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রধান ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের এরূপ আশ্চর্য্য লীলা হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র যাহাতে না থাকে তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া তাহাই করিয়াছেন, এজন্য আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পথে এত আঁধার।

শুধু হিন্দুরা নহেন, মুসলমানেরাও বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বিলোপসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। মগধের রাজধানী ওদন্তপুরে তুরস্কগণ বঙ্গবিজয়ের কিছু পূর্ব্বে বহু বৌদ্ধভিক্ষু ও শ্রমণের প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন এবং তথাকার সুবিস্তৃত পাঠাগার জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ নেপাল, চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশে পলায়ন করিয়া তাঁহাদের জীবন ও জীবনাধিক প্রিয় ধর্ম্মগ্রন্থগুলি কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন; তৎপরে ব্রাহ্মণ্য ক্রোধে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলি জনসাধারণের ভাষা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে,—যে জনপদে এক কোটীর অধিক বৌদ্ধ এবং ১১,৫০০ ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ ৩০ বৎসরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। বুদ্ধ—বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ ক্বচিৎ উল্লিখিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীদের নাম ও ধর্ম্মমত বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে; শুধু নৈয়ায়িকেরা বৌদ্ধমত-খণ্ডনোদ্দেশ্যে তাঁহাদের গ্রন্থাদির কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু সে সকল ন্যায়ের গ্রন্থ এখন অল্পই পঠিত হয়। যে পূর্ব্বভারত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল, তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে" (Discovery of Living Buddhism in Bengal, ১ পৃঃ)।

বৌদ্ধ-বিজয়ের পর বাঙ্গলা যখন নব ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষিত হইল, তখন ভুলিয়া গেল যে এককালে এই দেশের সীমান্তে নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিহার ছিল, দীপঙ্করের প্রতিভা দেশ-বিদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিল, এদেশ হইতে বাঙ্গালী বীরেরা যাইয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন এবং এদেশের ধীমান্ ও বিতপাল অর্দ্ধ এসিয়ার চিত্রগুরু হইয়া শিল্পজগতে এক অভূতপূর্ব্ব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচ্য ভারতের গৌরব

"প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।" —রবীন্দ্রনাথ।

"বসিত রাজেন্দ্র যথা স্বর্ণ-সিংহাসনে,
ফুকারে শৃগাল তথা বিকট নিঃস্বনে।

লুপ্ত গৌড়, সমতট, কর্ম্মান্তের চিহ্ন,
কোথা হরিকেল কোথা করণ-সুবর্ণ!
পথে পথে রাজধানী—ফুলের বাগান,
এতো নহে বঙ্গ—এযে বঙ্গের শ্মশান!"

বাঙ্গলাদেশের সীমা-নির্দ্দেশ করা কঠিন। প্রাচীনকালে কতবার যে এ দেশের রাষ্ট্রীয় সীমার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। পুরাকালে চীন, ব্রহ্ম, কলিঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, আরাকান, ত্রিপুরা প্রভৃতি নানাদেশ এই ভূভাগের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া এ দেশের রাষ্ট্রীয় কলেবরকে যুগে যুগে বহুধা-বিভক্ত ও বিচিত্র বর্ণে লাঞ্ছিত করিয়াছে।

বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার অনিশ্চয়তা।

এক সময়ে যেমন গৌড়-সাম্রাজ্য বুঝাইতে বিন্ধ্যোত্তরসীমায় কনোজ, সারস্বত গৌড়, মিথিলা ও উৎকল—এক কথায় গোটা আর্য্যাবর্ত্তটাকে বুঝাইত, সেইরূপ আবার বঙ্গদেশ বলিতে "দ্বাদশ বঙ্গ" অর্থাৎ বার খণ্ডে বিভক্ত বাঙ্গলা,—পূর্ব্বে রেঙ্গুনের পশ্চিম সীমা হইতে ছোটনাগপুরের সীমা, উত্তরে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও দক্ষিণে তমলুক ও সুন্দরবন,—এই সমস্ত অঞ্চলটাই এক রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। পালদের প্রাধান্যের সময়ই "পঞ্চগৌড়" কথাটার সৃষ্টি। তখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে মাঝে গৌড়েশ্বরের পদানত থাকিত, এবং এদেশের রাজারা "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তিত্বের দাবী করিতেন,—এই সময়েরও বহুপূর্ব্বে এদেশের সংস্কৃত ভাষায় "গৌড়ীয় রীতি" প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে।

ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগে জরাসন্ধ আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বা রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। পৌণ্ড্র বাসুদেব, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নরক ও চেদির শিশুপাল ইঁহার সামন্ত-রাজা ছিলেন। এক সময়ে পৌণ্ড্র বাসুদেব অনেকটা জরাসন্ধের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নরক, মুর ও ভগদত্তের সময় এই দেশটা প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে বাঙ্গলাদেশের অনেকটা তমলুকের অন্তর্গত ছিল; সম্ভবতঃ অশোক যে মহাসমরে দুর্জ্জয় কলিঙ্গদিগকে জয় করিয়া-ছিলেন, সেই যুদ্ধে মেদিনীপুর জেলার তমলুকবাসী বাঙ্গালীরাই কলিঙ্গ সৈন্যের অগ্রণী হইয়াছিল ("মেদিনীপুর" দ্রষ্টব্য—পরিশিষ্ট)।

দ্বাদশবঙ্গ।

বাঙ্গলা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে অনেকস্থলে 'দ্বাদশবঙ্গ' বা বার-ভূঞার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজচক্রবর্ত্তীদের অভিষেককালে দ্বাদশ মাণ্ডলিকগণের উপস্থিতি অপরিহার্য্য ছিল; অভিষেকসংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ইঁহাদের কতকগুলি কৃত্য ছিল। ইঁহারা রাজার সিংহাসনারোহণের সময়ে তাঁহার মাথায় জলধারা বর্ষণ করিয়া অভিষেক করিতেন। ইঁহারা প্রায়ই রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন, রাজার নিকটেই ইঁহাদের আসন থাকিত। উত্তরকালে এই দ্বাদশ-মণ্ডল-স্বামী, 'বারভূঞা'

নামে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহে রাজ-দরবারের বর্ণনায় প্রায়ই "বারভূঞা বসি আছে বুকে দিয়া ঢাল" এইভাবে রাজার পরাক্রান্ত পার্শ্বচরদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যে সামন্তচক্র গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই 'দ্বাদশ মাণ্ডলিক' অবশ্যই সেই বীরদিগের অগ্রণী ছিলেন।

পাঠানশক্তির বিলোপকালে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বারভূঞার প্রতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বারটি ভূঞা রাজা বাঙ্গলায় বারটি শার্দ্দূলের মত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভুলুয়ার ভূঞা রাজা দুর্লভনারায়ণ সুর নিখিল পূর্ব্ব-দেশাধিপতি ত্রিপুরেশ উদয়মাণিক্যকে রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'ত্রিপুরারাজ্য আমার, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বিজয়মাণিক্য আমার প্রজা ছিলেন' (রাজমালা—অমরমাণিক্য খণ্ড)। অমরমাণিক্য ইঁহার বিরুদ্ধে স্বয়ং এক বিপুল বাহিনীর সহিত যাত্রা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, এই যুদ্ধজয়ের ফলে পরবর্ত্তী ভুলুয়ার ভূঞা রাজা বলরাম সুর ত্রিপুরেশকে অমর দীঘি খনন কালে ১,০০০ কুলি পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সুবিখ্যাত দীঘি তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় খাত হইয়াছিল (১৫৭৮-৮১ খৃঃ); এবং বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত ভূঞা রাজারাই এতদুপলক্ষে ত্রিপুরেশ্বরের আনুগত্য করিয়াছিলেন। জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁ ও বিক্রমপুরের কেদার রায়ের নামও আমরা এই সামন্তরাজগণের তালিকাভুক্ত দেখিতে পাই। শুধু শ্রীহট্টের ফতে সিং কোন সাহায্য করেন নাই। কুমার রাজ্যধর ও ঈশা খাঁ ত্রিপুরার এক বিপুল বাহিনীর নেতা হইয়া শ্রীহট্টে গমনপূর্ব্বক তথাকার নবাব ফতে সিংএর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। রাজমালায় দৃষ্ট হয় ত্রিপুররাজ বিজয়মাণিক্য ষোড়শ শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ে অভিযান করিয়া সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে স্বীয় রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজমালায় পুনঃ পুনঃ এই "দ্বাদশ বঙ্গের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মোগলেরা সামন্তরাজার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁহারা সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় মুষ্টির ভিতর রাখিয়া তাঁহাদের অধীন রাজাদিগকে মাত্র একটা ফাঁকা সম্মান দিতেন। কিন্তু বঙ্গের দ্বাদশ শার্দ্দূল এই অবস্থা দুঃসহ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে মোগলদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অনেকেই প্রাণ দিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের কদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁ, ভুলুয়ার মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র রাজিৎ—মোগলদের বিদ্রোহী ছিলেন। ইঁহারা জানিতেন পাঠান ও মোগলে অনেক ফাৎ—পাঠানেরা অবনতি স্বীকার করিলে শত্রুকে স্বীয় রাজ্যের অখণ্ড আধিপত্য দিতেন—াগলেরা ফাঁকা সম্মান দিয়া আসল ক্ষমতা কাড়িয়া লইতেন। মোগল সম্রাটের ফৌজদার-দর সম্বন্ধে সিয়ার মুতক্ষরিণে লিখিত আছে, "ফৌজদারদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল, জমিদারদের ক্তি খর্ব্ব করা, তাঁহারা যেন যুদ্ধাস্ত্রাদি সংগ্রহ না করেন, বন্দুক ও বারুদ প্রভৃতি যেন াহারা বেশী না রাখেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পুরাতন দুর্গগুলি সংস্কার না করেন, কিংবা তন কোন দুর্গ নির্ম্মাণ না করেন। কিন্তু যদি কোন ফৌজদারের মনোযোগের ত্রুটির বিধা পাইয়া জমিদার এই ভাবের উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া ক্ষমতাপন্ন হইতে চেষ্টা করেন,

তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিদায় করিয়া, যুদ্ধোপকরণসমূহ সমাট্‌-সরকারে সমর্পণ করিতে হইবে; ইহাতে কিছুমাত্র অবাধ্যতা করিলে তাঁহাকে তাঁহার বাসস্থান হইতে দূরে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। ইহাতে যদি তিনি ষড়যন্ত্রের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহার দুর্গাদি ভূমিসাৎ করিয়া, তাঁহাকে এমন কঠোর শাস্তি দিতে হইবে যে জমিদার যেন একটা নগণ্য প্রজার অবস্থা প্রাপ্ত হন।" কিন্তু মোগলদিগের কঠোর শাসনসত্ত্বেও বাঙ্গলার খণ্ডরাজ্যগুলির ক্ষমতা কোন কালেই একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আকবরের সময়ে ভুরসুটের রাণী পাঠানদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, ইনি "রায়বাঘিনী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন (বঙ্গবীরাঙ্গনা, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ১৫০-৫১ পৃঃ)। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়েও মেদিনীপুরের চকলিয়ার জমিদার জীবন রায় তাঁহার পাইক সৈন্য দ্বারা সারজেণ্ট বাসকোম্ব প্রভৃতি ইংরেজ সেনাপতির অসংখ্য সিপাই হঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের শিবির লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ডবলিউ. কে. ফারমিঙ্গার লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালী পাইকেরা পশ্চিমা সিপাই হইতে সৈন্য হিসাবে উৎকৃষ্ট' (E. G. Galzier's Bengal District Records, Vol. 1, p. 9)। নলডাঙ্গার রাজাদের পূর্ব্ব-পুরুষ রণবীর দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদিগের হাত হইতে এই রাজ্যটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। রাজসাহীর জমিদারের রাজ্য ভাগলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, চাকলা রাজসাহী এই অধিকারের অন্তর্গত ছিল এবং ইহার রাজস্ব ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। বৰ্দ্ধমানের রাজাও খুব প্রতাপশালী ছিলেন, ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে ইঁহারা জন কোম্পানীর অনেক উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নোয়াখালির চৌধুরীরা কিরূপ দুর্দ্দান্ত ছিলেন, এবং একটি বেগম স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া কিরূপ অসম্ভব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লীগীতিকায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে (পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। পাঠানেরা সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, তাঁহারা সমস্ত দেশটার খুঁটিনাটি খবর রাখিয়া প্রত্যেক দেশের উপর বিজয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া পদানত করিতে চাহিতেন না। তাঁহারা এদেশে বাস করিয়া কতকটা এদেশের লোকের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন। হিন্দু জমিদারেরা এবার বুঝিয়াছিলেন যে, মোগলেরা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা হরণ করিতে আসিয়াছেন—এজন্য তাঁহারা জীবনপণে বাধা দিয়াছিলেন। এই ভূঞা রাজাদের অনেকেরই সমস্ত বঙ্গদেশের অধিকারের উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি অনেকেই সেই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন—প্রতাপে কেহ তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, এবং "ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ" হইতেন। এদিকে উত্তরে ত্রিপুরার ধন্যমাণিক্য এবং পশ্চিমে বনবিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর মুসলমানদের সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া বঙ্গদেশে অধিকার বাড়াইতে চেষ্টিত ছিলেন। ঈশা খাঁর বংশধর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ যে মোগল সম্রাটের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় একটি পল্লীগীতিকায় বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে (পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৪৩৫-৭৮ পৃঃ)।

এই পুরুষসিংহদের অনেকেই আকবরের সেনাপতিদিগকে যেরূপ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহারা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঈশা খাঁ দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, অপরাপর ভূঞাগণ মোগলবাহিনীকর্তৃক নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই দ্বাদশ মণ্ডলাধিপতি যদি একত্র হইয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, তবে মনে হয় বঙ্গদেশ কখনই মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে পারিত না। কোন্ কলহের উপগ্রহ বঙ্গের রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়ে ভেদনীতির বীজ বপন করিয়া অখণ্ড বঙ্গদেশকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছিল তাহা জানি না,—দেখা যাইতেছে বাঙ্গালী তখনও একজাতি হইয়া গড়িয়া উঠে নাই,—এখনও বোধ হয় তাহা হয় নাই। আমাদের কবিরা সাতকোটি লোককে বৃথাই "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্" বলিয়া আহ্বান করিতেছেন, উহা শুধু একটা কবিত্বের উচ্ছ্বাস মাত্র।

এই দ্বাদশ মাণ্ডলিক বা বারভূঞা-নিয়োগ শুধু বাঙ্গলার রীতি নহে, সমস্ত আর্য্যজগতে রাজচক্রবর্ত্তীদের দ্বাদশটি সামন্ত-রাজা নিয়োগের রীতি পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। রাজপুতানার রাজাদের মধ্যে দ্বাদশ সামন্ত-নায়ক নিযুক্ত করিবার প্রথা আছে। সেদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজারা দ্বাদশ মণ্ডলাধিপ নিযুক্ত করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতেন। বঙ্গের এই দ্বাদশ মণ্ডলাধিপের অনেকেই হিন্দু ছিলেন। ঈশা খাঁ মুসলমান হইলেও তিনি হিন্দুর পুত্র ছিলেন।

এই গঙ্গার সিকতাভূমির উপর প্রভুত্ব লইয়া যুগে যুগে হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের, হিন্দুর সহিত হিন্দুর, পাঠানের সহিত পাঠানের, মোগলের সহিত মোগলের এবং হিন্দু, পাঠান ও মোগলের কতই না যুদ্ধ হইয়াছে! এইজন্য এদেশের রাষ্ট্রীয় সীমা নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেদিনও উড়িষ্যা ও বিহার বাঙ্গলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

সুতরাং প্রকৃতি ইহার যে সীমা আঁকিয়া দিয়াছেন, মূলতঃ আমরা তাহাই অবলম্বন করিব। ইহার উত্তরে আকাশস্পর্শী হিমাদ্রি-শৃঙ্গ, দক্ষিণে তমলুক-প্রান্তসমাশ্রিত বিশাল বারিধিবক্ষ, পূর্ব্বে আরাকানের নিবিড় ...র সীমান্তে ছোটনাগপুরের কান্তারভূমি—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী বিপুল ..., নিত্য-নূতন-শ্রী, শস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার,—কুন্দ, অপরাজিতা, সন্ধ্যা-...ও পদ্মের রাজ্য—"পদ্মোৎপলঝষাকুলা" শত দীর্ঘিকার পুণ্য তীর্থ—... দীপঙ্কর, রামকৃষ্ণ, শঙ্করদেব প্রভৃতি নরদেবতার পদরজঃপূত এবং ...গুপ্ত, ধর্ম্মপাল, রামপাল, মহীপাল প্রভৃতি সিংহবিক্রান্ত নৃপতিদের ... সদাগর, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বিশ্ববণিক্-সম্প্রদায়ের বাণিজ্যকেন্দ্র—তুম্রাক্ষ, ...পাল, স্থিরপাল প্রভৃতি কীর্ত্তিমান্ শিল্পীদের নিকেতন—চন্দ্রনাথ, ...ভৃতি ভারত-বিশ্রুত তীর্থভূমি—জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নব্যন্যায় ও ... মহাদেশই আমাদের বৃহৎ বঙ্গ। আমরা কলিঙ্গ ও মিথিলার

১৩। বঙ্গের সীমা।

ইতিহাস এই মহাদেশের অন্তর্গত করিতে পারিলাম না; ইহা আমাদের অক্ষমতা ও স্থানাভাবের জন্য। বস্তুতঃ পূর্ব্বভারতে শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ ও ভাষা প্রায় একইরূপ। এই সমগ্র দেশটার ইতিহাস এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং ইহা এতই একভাবাপন্ন যে ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর রেখা টানিলে তাহা কতকটা কৃত্রিম হইবে।

পদ্মার ভাঙ্গুনী পাড়ের মত, এ দেশের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের কোনই নিশ্চয়তা নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে মগধ, রাজগৃহ, ওদন্তপুর, তমলুক (তাম্রলিপ্ত), দন্তভুক্তি, মহাস্থান, কর্ণসুবর্ণ (রাঙামাটি), সোনারগাঁ, সাতগাঁ, বিক্রমপুর, গৌড়, ঢাকা (দবাক্, বাঙ্গলা), পাটিকারা, কর্ম্মান্ত, বিজয়নগর, সিংহপুর, সাভার, মহানাদ প্রভৃতি নানাস্থান এই দেশের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্ররূপে যুগে যুগে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছে। মুসলমানদের সময়েও কতবার এই কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! গৌড়, লক্ষণাবতী, রমতী, তাণ্ডা, পাণ্ডুয়া, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল প্রভৃতি কতই না স্থানে খামখেয়ালী রাজারা রাজধানী পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বভারতের ভাষা অনেকটা এক রকমের ছিল। মণিপুর, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কাছাড়, ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশের রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষা সমাদৃত ছিল; তথাকার রাজকীয় দলিলপত্র ও তাম্রপটে বাঙ্গলা ভাষাই ব্যবহৃত হইত। রাজাদের যশোগান প্রজারা বাঙ্গলা ভাষাতেই গাহিত। সেনরাজাদের সময়ে সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদেশের যে সকল স্থান সেনদের সীমা-বহির্ভূত ছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংস্কৃতের প্রভাব স্বীকৃত হইলেও বাঙ্গলা ভাষা অনাদৃত ছিল না। বাঙ্গলা ভাষাকে রাজমালায় "সুভাষা" বলা হইয়াছে; এই উপাধি দ্বারা কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের মতে ত্রিপুরা জেলার কাম্‌তা গ্রাম এক সময়ে খড়্গবংশের রাজধানী ছিল। উক্ত বংশের রাজারা সমতটে রাজত্ব করিতেন। খড়্গবংশীয় রাজাদের সঙ্গে আরাকান রাজাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল, সমতটের রাজপুত্র এক সময়ে আরাকান শাসন করিতেন, তাহাও নলিনী ভট্টশালী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৌদ্ধ-প্রাধান্য-যুগে পূর্ব্ব-ভারতের রাজাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। আরাকানের রাজসভায় সেদিন পর্য্যন্তও "বঙ্গভাষা আদৃত ছিল এবং আরাকানবাসীরা বাঙ্গল[illegible] ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিতেন।" এ সম্বন্ধে চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (১৯৩৩, ৪ঠা জানুয়ারীর) চিঠিতে জানাইয়াছেন :—

"অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি দৌলত কাজির একখানা ছেঁড়া পুঁথি [illegible] বৎসর পূর্ব্বে আরাকানের রাজসভায় বঙ্গ ভাষার চর্চ্চা হইত। আ[illegible] রাজা সুলতান সুজাকে আশ্রয় দিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়াছিলেন, আলওয়[illegible] তখন উপস্থিত ছিলেন। আলওয়ালের সেকেন্দরনামায় উল্লেখ আছে

এই মতে সুখে গোয়াইনু বহুকাল।
বৃদ্ধ বয়সে অবশেষে দটিল জঞ্জাল॥

শাহ সুজা সঙ্গে যদি আইমু দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাত্র সব দিল হতমতি ॥
আপনার দোষ হস্তে পাই অবসাদ।
এক পাপী আমারেও দিল মিথ্যাবাদ ॥
কারাগারে গৈমু আমি না পাই বিচার।
যত ইতি বসতি হইল ছারখার ॥

এই চন্দ্রসুধর্ম্ম নরপতির বহুপূর্ব্বেও আরাকানের রাজসভায় বঙ্গভাষার চর্চ্চা হইত।

চন্দ্রসুধর্ম্মের পিতার নাম—থেডো
থেডোর পিতা—নরপতিজি
নরপতিজির পিতা—মাংছানি
মাংছানির পিতা—শ্রীসুধর্ম্ম।

এই শ্রীসুধর্ম্ম আরাকানের একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি ১৬২২-১৬৩৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া ফায়ারের ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীসুধর্ম্ম অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় নরপতি ছিলেন। তিনি "শ্বেত-তুষার-বরণী" রমণী পরিবৃত হইয়া রাজসভায় আসিতেন। পূর্ব্ববর্ণিত কবি দৌলতকাজি শ্রীসুধর্ম্মের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।" যে রাজসভায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলওয়াল তাঁহার "পদ্মাবৎ" কাব্য ও দৌলতকাজি "লোর চন্দ্রাণি"র মত বিশুদ্ধ সংস্কৃতাত্মক বাঙ্গলায় কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী সময়ের কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার মতই বাঙ্গলা ভাষার উৎসাহ ও আশ্রয়দাতা ছিল বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গলা ভাষা বর্ত্তমান বঙ্গদেশের গণ্ডী ছাপাইয়া পূর্ব্বদিকে গিরিকান্তার-সমাকীর্ণ আরাকানের সীমা অবধি প্রসার লাভ করিয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণ করিতে পারা যায়।

বাঙ্গলাভাষার প্রসার।

এই দেশে শুধু ঘন ঘন রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহার ভাষাও মূলতঃ অর্দ্ধমাগধী এবং একলক্ষণাক্রান্ত—তথাপি সেই ভাষার উপর, প্রাদেশিকত্বের ছাপ মারিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশকে তফাৎ করা হইয়াছে। ত্রিপুরা, মণিপুর, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রভৃতি প্রদেশে বহুকাল বাঙ্গলায় দলিলপত্র, এমন কি তাম্রশাসন পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে।* ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উড়িয়া-সাহিত্যের ভাষার সহিত

* In the north-east the Bengali alphabet was adopted in Assam, where not only in the Kamauli grant of Vaidyadeva, but also in other inscriptions, Bengali characters have been exclusively used. In the Assam plates of Vallabhadeva of the Saka year 1107 (1188 A.D.), we find archaisms which lurked in the backwoods of civilization. In the East, the Bengali script was also being used in Sylhet where similar archaisms are to be met with

বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষার যে সান্নিধ্য, তাহা ত্রিপুরা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশের কথিত ভাষার সহিত আধুনিক কালের লিখিত বাঙ্গলার অপেক্ষা ন্যূন নহে। গঙ্গা-বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সম্প্রতি,—একশত বৎসরও হয় নাই, আসামী ভাষাকে বাঙ্গলা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলাই আসামের রাজ-দরবারে ও বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত ছিল। কয়েকজন মিশনারী আসামের নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষায় কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ও তদুপযোগী অক্ষর (যথা পেট কাটা 'র'—ৰ) তৈরী করিয়াছিলেন—তারপর যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, আসামের ভদ্রসাহিত্য অন্যরূপ—তাহা বাঙ্গলা, তাহাতে ঐরূপ নিম্নশ্রেণীর ভাষা চলিবে না, তখন তাঁহারা সেই নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষা তদ্দেশে চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন—তাঁহাদের সামান্য ক্ষতিপূরণের ব্যপদেশে আসামের কথিত ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। প্রাদেশিক অভিমান সৃষ্টি করা সহজ,—পৃথিবীতে যত জাতি বিরোধ এই ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে। যখন ভাষার এই পরিবর্ত্তন হয়,—তখন তথাকার সদাশয় ইংরেজ স্কুল-ইনস্পেকটর ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন—স্কটলণ্ড, আয়রলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কথিত ভাষায় নানারূপ পার্থক্য ও বৈষম্য বিদ্যমান, তথাপি বিশাল ইংরেজী সাহিত্য সেই প্রাদেশিকত্বগুলি উপেক্ষা করিয়া একভাবাপন্ন হইয়াছে ; এমন কি ওয়েল্‌সের ভাষার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার মজ্জাগত কোন সাদৃশ্য নাই, তথাপি সে দেশেও ইংরেজী প্রচলিত হইয়াছে। এখনও যদি রাঢ়দেশের কথিত ভাষা ও ঢাকার কথিত ভাষার উপর প্রাদেশিকত্বের জোর দেওয়া যায়, তবে সাহিত্যে দুইটি ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে ; একটা অখণ্ড দেশের পাঁচ মাইল দূরে দূরে যদি ভাষার সূক্ষ্ম বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তবে প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন ভাষায় চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়, এবং একই দেশের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ হারাইয়া ভাষাক্ষেত্রে অনায়াসে একটা ব্যাবেলের মঠ প্রস্তুত করিতে পারে।

এই ভারতবর্ষে এক সময়ে গান্ধার হইতে ব্রহ্মদেশ এবং হিমালয় হইতে রামেশ্বর—এমন কি সিংহল, জাভা, বালি ও সুমিত্রা পর্য্যন্ত বৃহৎ জনপদে—একই সংস্কৃত ভাষার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, এজন্য সংস্কৃত ভাষা এরূপ অপূর্ব্ব বৈভবশালিনী হইয়াছে। এখন যদি উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে পুনরায় এক ভাষা স্বীকৃত হয় তবে তাহা—'বাঙ্গলা ভাষা,'

in the Sylhet grants of Kesavadeva and Ishanadeva. In the south the Bengali script was used throughout Orissa. We find the proto-Bengali script in the Ananta-Vasudeva temple-inscriptions of Bhatta Bhabhadeva at Bhuvaneswara and the modern Bengali alphabet in the grants of the Ganga Kings, Nrisingha Deva II, and Nrisingha Deva IV. The modern cursive Odya script was developed out of the Bengali after the 14th century A.D., like the modern Assamese." R. D. Banerjee's "Origin of the Bengali Script," pp. 5-6.

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক সময়ে এই বিশাল প্রদেশে শুধু বাঙ্গলা ভাষা নহে, বাঙ্গলা অক্ষরও প্রচলিত ছিল। প্রাদেশিক বিভাগের ফলে বাঙ্গলা ভাষার অধিকার সঙ্কুচিত করা হইয়াছে।

'উৎকল ভাষা' অথবা 'আসামী ভাষা' যে কোন নামেই পরিচিত হউক—জাতীয় জীবনে উহা একটা অবিসংবাদিত লাভের বিষয় হইবে ; কিন্তু এককালে যাহা সহজ ছিল, এখন আর তাহা তেমন সহজ নহে। কাটা জিনিষকে জোড়া দেওয়া সহজ ও সম্ভবপর নহে।

যাহা হউক আমরা প্রচীন কালের কথা বলিতে যাইয়া সমস্ত পূর্ব্বভারতকেই লক্ষ্য করিব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার বঙ্গ-বন্দনায় অশোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনি অন্যায় করেন নাই। এক সময়ে মগধই সমস্ত পূর্ব্বভারতের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। * বঙ্গদেশের শিক্ষাদীক্ষার মূল প্রস্রবণ—এই গঙ্গার আদি-উৎস হরিদ্বার-স্বরূপ—মগধ-কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত ছিল ; মগধের উচ্চশিক্ষা, মগধের শিল্পকলা সমস্তই উত্তরকালে পূর্ব্বদিক্ আশ্রয় করিয়া গৌড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করা চলে না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে মগধকে বাদ দেন নাই।

শিক্ষাদীক্ষার সীমা।

যদি ভারতীয় মানচিত্রের পূর্ব্ব-সীমানায় কতকটা অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে উত্তর সীমান্তে দার্জ্জিলিং, কালিম্পং প্রভৃতির নিকটে নেপাল উপত্যকায় গোরক্ষপুরের অতি সান্নিধ্যে কপিলাবস্তু ও লুম্বিনীবনের সাক্ষাৎ পাই, তারপর সমেৎ-শেখরে (বর্ত্তমান মানভূমজেলায়) অবতরণ করুন, আরও দক্ষিণে নবদ্বীপ এবং তৎ পূর্ব্বোত্তরে রঙ্গপুর, বিক্রমপুর ও প্রাগজ্যোতিষপুর চিহ্নিত করুন ; একটু পশ্চিমে ভাগলপুর এবং মগধ। এই যে ক্ষুদ্র একটা সীমানা দেওয়া হইল, সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্রে তাহা অতি নগণ্যস্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় সীমানা ইহা নহে। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমির সীমা টানিলে এই বিভাগ মানিয়া লইতে হইবে। এই সকল স্থান পরস্পরের অদূরবর্ত্তী, আকৃতিতে এবং পরিমাণে পৃথিবীর মানচিত্রে এই বিভাগ নগণ্য হইলেও ইহা অন্য হিসাবে নগণ্য নহে। এই বিভাগে আমরা বুদ্ধকে পাইয়াছি, তাহার অর্দ্ধ মানবজাতির একতৃতীয়াংশের আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্রাট্ এই বিভাগের লোক। যিনি জগতের রাজন্যকুলের শিরোভূষণ—সেই অশোক এই বিভাগের নিবাসী। এই বিভাগে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, জগদ্দল, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি জগতের আদর্শ শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিকে পাইয়াছি। এই বিভাগে ধীমান্ ও বিতপাল চিত্রকলার সম্রাট্, তাঁহারা যে রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নেপাল ও তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীন-জাপানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই বিভাগে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর সমস্ত মাধ্যমিক

একটি ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে কতগুলি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

* দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" গানটিতে বুদ্ধ, অশোক, বিজয় প্রভৃতি সকলকে বঙ্গবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সে সময় বিহার জেলাটা বঙ্গের একাংশ ছিল। কবি কালিদাস রায় লিখিয়াছেন, "এই গানে ডি. এল্. রায় 'বঙ্গ আমার' লিখিয়াছিলেন,—দিলীপবাবু পুনর্মুদ্রণ-কালে 'বঙ্গ' উঠাইয়া দিয়া 'ভারত' করিয়াছেন।"

মহযান-বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপাস্যদেবতা, বুদ্ধের নীচেই তাঁহার স্থান। বিক্রমপুরের শান্তরক্ষিত ও শীলভদ্র একসময়ে সমস্ত বৌদ্ধ জগতের শিক্ষাকেন্দ্রের গুরু ছিলেন। সুবিখ্যাত জৈন গুরু ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দীর্ঘকাল রাঢ়, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্ত দেশে তাঁহার চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ৭৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মানভূমে সমাধিলাভ করেন; এই মানভূম জেলায় আরও অনেক তীর্থঙ্করের সমাধিস্থান রহিয়াছে। রঙ্গপুর অঞ্চলে এবং ত্রিপুর দেশে বঙ্গাধিপ রাজা গোবিন্দচন্দ্র মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্বিতীয় রামচন্দ্রের ন্যায় দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকথা আসাম হইতে পাঞ্জাব এবং কলিঙ্গ হইতে বোম্বে প্রেসিডেন্সী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এখনও গীত হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশে এখনও গোপীচাঁদের সন্ন্যাস রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং সেদিনও সুবিখ্যাত রাজ-চিত্রকর রবিবর্ম্মা বঙ্গের রাজা গোপীচাঁদের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে।

মগধের সুবিখ্যাত সম্রাট্‌গণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। গুপ্ত, পাল ও সেন সম্রাট্‌গণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার অবকাশ এখানে নাই। কিন্তু উত্তরকালে সাঙ্গোপাঙ্গ-সহকারে মূর্ত্তিমান্ হরি-নাম-স্বরূপ যিনি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে আসিয়াছিলেন—তিনি এই দেশের ইতিহাসে একা। তিনি প্রেম-ভক্তি-গগনের পূর্ণচন্দ্র। এদেশকে গঙ্গা যে উর্ব্বরতা ও শ্যামলশ্রী দান করিয়াছেন মহাপ্রভুও বঙ্গের আধ্যাত্মিক রাজ্যে তদ্রূপ সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য দিয়া গিয়াছেন। আমি সূক্ষ্ম ন্যায়-শাস্ত্রের বঙ্গীয় গুরুদের নাম এখানে করিলাম না। তাঁহারাও প্রত্যেকে এক একটি দিক্‌পাল-সদৃশ। আসামের শঙ্কর, বঙ্গদেশের রূপ, সনাতন, নরোত্তম, শ্রীনিবাস, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্যামানন্দ বৈষ্ণব-জগতের গুরুকুলের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আসীন।

এখানে আমরা ভারত-মানচিত্রের পূর্ব্বাংশের যে সীমা প্রদান করিলাম, তাহাতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জগতের আর কোথাও কি এইরূপ একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এত বেশী মহাজনগণের আবির্ভাব হইয়াছে? বসোরা যেরূপ গোলাপের জন্মভূমি, এই সীমা-নির্দ্দিষ্টগণ্ডী তেমনিই ধর্ম্মবীর ও সাধকগণের লীলাক্ষেত্র। এই পূর্ব্বভারত পবিত্র হইতেও পবিত্র। বাঙ্গলাদেশ বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শাক্ত—হিন্দুধর্ম্মের এই কয়েকটি শাখা-প্রশাখার প্রধান কেন্দ্রভূমি। উত্তরকালে ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এইদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই শক্তিশালী দেশকে গ্রাস করিবার উপযোগী প্রতিভা কোন বিদেশীর নাই। কিন্তু যে কেহ এই দেশে আসিয়াছেন, তিনি যাহা কিছু ভাল আনিয়াছেন, এ দেশ-লক্ষ্মী তাহা রাজেশ্বরীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। বিদেশীরা ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান নৈতিক ও অধ্যাত্ম-সম্পদ্ বাঙ্গালীরা গ্রাস করিয়াছেন। যে মহাক্ষেত্রে এতগুলি শক্তির সংঘর্ষ হইয়াছে, সে দেশ,—সে সমাজ এঁধো পুকুরের মত আবর্জ্জনা-পূর্ণ হইয়া থাকিতে পারে নাই, স্বাধীন চিন্তা সে দেশের পক্ষে স্বাভাবিক। এ দেশের লোক নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে শিখিয়াছে। বিভিন্নশক্তির

জগতের ইতিহাসে বাঙ্গলার স্থান।

সংঘর্ষে আসিয়া ইহারা সংস্কার-জয়ী হইয়াছেন। ইহাদের উদারতা ও শিক্ষার প্রসার যে কত বড়, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া যাইব। যখনই বিদেশীয়গণ তাঁহাদের দুর্দ্ধর্ষ শক্তির বলে রাষ্ট্র-প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বন্যার মত এদেশে আসিয়াছেন, তখনই হয়ত কিছুকালের জন্য আত্মরক্ষার্থে আমাদের সমাজ তাঁহাদের প্রধান সম্পদ্‌কে অতিরিক্ত মাত্রায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। কচ্ছপ যেরূপ মাংস-লুব্ধ হিংস্রজন্তু হইতে নিজের কোমল দেহ রক্ষা করিবার জন্য বাহিরে একটা কঠিন আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে, হিন্দুসমাজ সেই ভাবে সময়ে সময়ে একটা অতিরিক্ত গোড়ামির গণ্ডী স্থাপন করিয়া পররাজ্যাধিকার-লোলুপ জাতিগুলি হইতে নিজকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রভাব সাময়িক। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম সেইরূপ একটা আত্মরক্ষার আবরণে বেষ্টিত, কিন্তু ইহার ভিতরে ভিতরে এখনও যে চিন্তার প্রসারতা ও মানসিক স্বাধীনতা আছে, অন্য দেশের সহিত তাহার তুলনা হয় না। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে তাহা দেখাইব। এখন পুনরায় দুর্জ্জয় রাষ্ট্রশক্তি ও নব্যসভ্যতার সংস্পর্শে সেই কঠিন আবরণ ধসিয়া পড়িতেছে; আশা করি অচিরাৎ আমরা বাঙ্গালী জাতির স্বরূপ আবিষ্কার করিবার সুবিধা পাইব।

পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বখণ্ড নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের গৌরব, নাম ও সীমার কিছুই ঠিক ছিল না। বহুধা-বিভক্ত এই দেশের যে রাজা যখন প্রবল হইয়া উঠিতেন, তাঁহার রাজ্যের গণ্ডী কিছুকালের জন্য তখন বাড়িয়া যাইত। আমরা এই অধ্যায়েই দেখিয়াছি এক কালে গৌড় দেশের নামে সারস্বত কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বিন্ধ্যোত্তর প্রদেশ পরিচিত হইত, গৌড়ের নামে প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত নামাঙ্কিত ছিল। গৌড়ের শ্রেষ্ঠ রাজারা 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করিয়া সার্ব্বভৌম সম্রাটের সম্মানের দাবী করিতেন। এককালে সপ্তধা-বিভক্ত ব্রিটনের প্রধান রাজা যেরূপ "ব্রিটওয়াল্ডা" উপাধি গ্রহণ করিতেন, 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধিও সেইরূপ গৌড়দেশের মহিমব্যঞ্জক ছিল। এই পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধি কালে গৌড়ের রাজন্যবর্গের কৌলিক উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল; এমন কি যখন গৌড়রাজ্যের সীমা একান্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তখনও প্রাচীন সংস্কারবশতঃ গৌড়রাজকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি দ্বারাই সম্মান করা হইত। রাজা গণেশকে কৃত্তিবাস 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং দ্বিজমাধব ও বিজয়গুপ্ত গৌড়াধিপ হুসেন সাহারও ঐ নামেই পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গৌড়ের আরও ছোট ছোট নৃপতিকে তোষামদ-জীবিগণ ঐ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি এখনও পুরীর রাজার এক উপাধি 'পঞ্চ-গৌড়েশ্বর।' সিংহপুরের রাজারা উড়িষ্যা বিজয় করিয়া "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কোচবেহারের প্রাচীন ইতিহাসে তথাকার রাজাদিগেরও এই উপাধি দৃষ্ট হয়। (জয়চন্দ্র মুন্সীর 'রাজাবলী' দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু এই গৌরবময় উপাধিটি সর্ব্বদাই কবি বা রাজ-সেবিগণের অতিরঞ্জন ছিল না। 'গান্ধার হ'তে জলধি শেষ' পর্য্যন্ত রাজ্য—আমাদের এই গৌড়দেশ—বহুকাল আর্য্যাবর্ত্তে

প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। যুগ-যুগ-ব্যাপী মর্য্যাদা পরবর্ত্তী লোকেদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে পৌঁছায়। এক সময়ে এই গৌরব নামেমাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা যে এ দেশের প্রাচীন গৌরব-কাহিনীর স্মারক তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে দেশের সীমানা যুগে যুগে অসংখ্যবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ভৌগলিক সীমা লইয়া একটা অধ্যায় লিখিতে আমরা স্বতঃই দ্বিধাবোধ করিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বাধ্যায়

"অনারতং বিনিঘ্নন্তো মহাস্ত্রৈঃ শস্ত্রঘাতিভিঃ।
ন হন্যামো বয়ং তস্য ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বলম্ ॥"

—মহাভারত, সভা—১৪ ; ৩৫।

এক সময়ে আর্য্যবর্ত্তের পূর্ব্বভাগ—মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌জোতিষপুর প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বৃহৎ ভূভাগ পরস্পরের অতিসান্নিধ্য হেতু এবং যুগে যুগে একচ্ছত্র সম্রাটের শাসনাধীন থাকার দরুন শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতায় ঐক্যলাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় বিভাগ—প্রবল-স্রোতা নদীর চরের মত ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল—তাহার উপর আমরা জোর দিব না; এই রাজ্যের সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্দ্রভূমিগুলির প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হইব। লোকেতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করিতে গেলে বোধ হয় এই পন্থাই সমীচীন।

বৈদিক সাহিত্যে এই দেশের নাম অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল নামোল্লেখ এবং ভৌগলিকগণের ভূতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা এদেশের অস্তিত্ব কোন্ যুগে হইয়াছিল তাহা লইয়া গবেষণা করিব না। সে বিদ্যা আমার নাই এবং আমি প্রত্নতাত্ত্বিক নহি।

মহাভারতের সময় হইতেই আমরা আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশের বিশেষরূপ উল্লেখ পাই। সেই উল্লেখই আমাদের আলোচনার ভিত্তিভূমি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে আমরা এই ভূভাগের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কীর্ত্তি অবগত হই। মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, অঙ্গরাজ কর্ণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি নরক ও ভগদত্ত এবং বঙ্গাধিপ চিত্রসেন ও সমুদ্রসেন।

কর্ণ অঙ্গদেশে* রাজত্বলাভ করিয়া পূর্ব্বভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা ও শৌর্য্য-বীর্য্যের লীলাক্ষেত্র ছিল হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কুরুক্ষেত্র। মহাভারতের এক বৃহৎ অংশ তাঁহার গুণগরিমায় পূর্ণ, সেই কীর্ত্তিকথা লইয়া পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেদের গৌরব করিবার কিছুই নাই; কিন্তু আমাদের দেশে তাঁহার পরিচয় অন্যবিধ। তিনি পরশুরামের শিষ্য, অদ্বিতীয় বীর, দুর্য্যোধনের প্রিয়সখ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁহার প্রধান অবলম্বন, এ সকল কথা লইয়া আমরা গৌরব করিব না। মহাভারতে অতি সংক্ষেপে তাঁহার আর একটি গুণের উল্লেখ আছে—

অঙ্গ-গৌরব কর্ণ।

"তিনি প্রার্থিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন, তিনি যাচকদিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছিল, তিনি ব্রাহ্মণের জন্য জীবন দানেও উদ্যত হইতেন।"—কর্ণপর্ব্ব, ৯৫ অঃ, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

কৌরবকুলের বর্ম্ম-স্বরূপ মহারথ কর্ণ, যাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে ব্যাস লিখিয়াছেন, "নদীসমুদয়ের গতি রুদ্ধ হইল, দিক্‌বিদিক্‌সকল ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল...... মহার্ণবসকল সংক্ষুব্ধ ও ঘূর্ণায়মান হইল, বুধগ্রহ তির্য্যক্ ভাবে অভ্যুদিত হইলেন। অনল সদৃশ উল্কাপাত হইতে লাগিল. এবং বসুন্ধরা আর্ত্তনাদ করিয়া কম্পিত হইল" (কর্ণপর্ব্ব, ৯৫ অঃ)। আমাদের এই অঞ্চলে কর্ণ এতাদৃশ পুরুষ-সিংহরূপে বিশেষভাবে পরিচিত নহেন। আমরা তাঁহাকে উপাধি দিয়াছি 'দাতাকর্ণ'। এই উপাধি যে তাঁহার যোগ্য, তাহা মহাভারতের পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দ্বারা প্রমাণ হইবে। 'দাতাকর্ণ' নামক পুস্তকে যে একটা উপগল্প বর্ণিত হইয়াছে সেই অলৌকিক কাহিনীতে কর্ণের হৃদয় যে কত উচ্চ, তাঁহার দানশক্তি যে অপরিসীম সেই কথা অতিরঞ্জনের ভাষায় কথিত হইয়াছে; যেমন আমরা অসীম শক্তি দেখিয়া কোন মহাবীরের বহু হস্ত, বহু চক্ষু কল্পনা করিয়া তাঁহার কর্ম্ম-শীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি সাধারণকে রূপক দিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছি—রাবণ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, শিশুপাল প্রভৃতি রাজাদের সম্বন্ধে ঐভাবের রূপ বর্ণনা করিয়াছি—কর্ণ সম্বন্ধে উপগল্পটিও তদ্রূপ একটি রূপকমাত্র। কিন্তু এদেশে তাঁহার দানশীলতার কথা এখন পর্য্যন্তও প্রবাদবাক্যের ন্যায় সুপরিচিত হইয়া আছে। বোধ হয় ইন্দ্রপ্রস্থ বা কুরুক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে তাঁহার 'দাতাকর্ণ' নাম কেহ জানেন না।

* প্রাচীন অঙ্গ—মুঙ্গের সহ ভাগলপুর প্রদেশ। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ যে ১৬টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, অঙ্গ তাহার অন্যতম (অঙ্গুত্তর, বিনয়সুত্ত, দীঘনিকায়, গোবিন্দসুত্ত)। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা,—এই রাজ্যের ফুল, ফল বঙ্গে সুপরিচিত। এখনও চাঁপা ফুল, চাঁপা কলা প্রভৃতি শব্দ অঙ্গ দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লোমপাদ রাজা এবং পরবর্ত্তী কালে কর্ণ এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। বার্ডউড সাহেবের মতে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা প্রাচীন অঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল এবং কাহারও কাহারও মতে সাঁওতাল পরগনাও অঙ্গের অংশ। সর্ব্ব প্রথম অথর্ব্ব-সংহিতায় অঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (পঞ্চম কাণ্ড, ১৪ অনুবাক্)। নন্দলাল দের ভারতবর্ষের ভৌগলিক অভিধান দ্রষ্টব্য (৭-৮ পৃঃ)।

কিন্তু এদেশে এই নাম চিরপরিচিত। স্ত্রীলোকেরাও কথায় কথায় উপমা দেওয়ার সময় ঐ পরিচয়ের প্রবাদবাক্য ব্যবহার করে। 'দাতাকর্ণ' পুস্তকখানি লইয়া এদেশের বহু কবি কবিতা লিখিয়াছেন। বোধ হয়, এই বিষয় লইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন কবিরা যত কবিতা লিখিয়াছেন, অন্য কোন বিষয়ে এত অধিক কবিতা লিখিত হয় নাই। আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায়ই ভিন্ন ভিন্ন কবি-রচিত ৩০।৩৫ খানি 'দাতাকর্ণের' পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় বালকগণের নিত্যপাঠ্য শিশু-বোধক এবং অপরাপর পুস্তকে দাতাকর্ণের উপাখ্যান একটি অপরিহার্য্য বিষয় ছিল। কর্ণ যে বাঙ্গালীর কত প্রিয়, তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য ও অপরাপর অসাধারণ গুণের জন্য নহে, শুধু দানশীলতার জন্য, তাহা এই প্রসঙ্গে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া—এমন কি স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াও দানের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। এই কথাটি বাঙ্গালী কবি পুনঃ পুনঃ তাঁহার পাঠক-গণকে গল্পচ্ছলে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। দুর্য্যোধনকে বাক্যদান করিয়া তিনি সহোদর-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া বাগ্‌দানের মহিমা দেখাইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কর্ণকে তদ্দেশবাসীরা এক ভাবে দেখিয়াছেন, অঙ্গ-বঙ্গের লোকরা তাঁহাকে আর এক ভাবে বুঝিয়াছেন। পাল-রাজগণের কাহারও কাহারও তাম্রশাসনে কর্ণের দান-শীলতার কথার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও এদেশের লোকেরা হৃদয়ের ঔদার্য্য, মহানুভবতা ও ত্যাগধর্ম্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছে। কর্ণের প্রসঙ্গে এদেশের সেই বৈশিষ্ট্যের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক। বাঙ্গলার তাম্রশাসনগুলিতে আমরা পুনঃ পুনঃ কর্ণের এই দানশীলতার উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতে কর্ণের এই গুণটির অতি সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ আছে। ভার্গবের প্রিয় শিষ্য, অজেয় যোদ্ধা এবং বীরদের অগ্রণী কর্ণ অঙ্গ-বঙ্গে 'দাতাকর্ণ।' তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল কর্ণের মত দাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে "স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতা-গুণে 'চম্পকেশ কর্ণের' সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কর্ণ সম্বন্ধে এই ভাবের উল্লেখ বাঙ্গলার আরও দুই একখানি তাম্রশাসনে আমরা পাইয়াছি। বাঙ্গলার কোন তাম্রশাসনেই কর্ণের বীরত্বের উল্লেখ নাই। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত কর্ণকে যে ভাবে দেখিয়াছে বাঙ্গলাদেশ সেভাবে দেখে নাই। এদেশ ক্ষমতার পূজক নহে,—হৃদয়ের মহান্ গুণের পূজক ; এই জন্যই এদেশের কৃষ্ণ শঙ্খচক্রগদাধারী নহেন—তাঁহার একমাত্র অমোঘ অস্ত্র একটা বাঁশের বাঁশী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃহৎ বঙ্গের প্রধান পুরু! জরাসন্ধ। মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে এই অদ্বিতীয় বীরের কাহিনী বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

মগধ-গৌরব জরাসন্ধ।

একদা নারদ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "পাণ্ডু স্বর্গবাসী, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বলিবেন। এই যজ্ঞ পূর্ণ করিতে পারিলে আমার স্বর্গবাস স্থায়ী হইবে।"

সমস্ত যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ রাজসূয়। সর্ব্বপ্রধান সম্রাট্ না হইলে এই যজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে। নারদ বলিলেন, 'তুমি রাজাধিরাজ, ভ্রাতৃগণের সহায়তায় তুমি কৃতকার্য্য হইবে।' যুধিষ্ঠির ভাবিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভ্রাতৃগণকে ডাকাইলেন; তাঁহারা কেহ গাণ্ডীব, কেহ গদা, কেহ অপরাপর অস্ত্রের গৌরব করিয়া এই কার্য্যে তখনই হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ দিলেন। মন্ত্রী ও সভাসদেরা একবাক্যে বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এই যজ্ঞ একান্ত সহজ ব্যাপার।' তাঁহারা অনতিবিলম্বে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিতে রাজাকে ধরিয়া বসিলেন। রাজা দ্বৈপায়ন ব্যাস ও ধৌম্য প্রভৃতি ঋষিবর্গের মত লইলেন, তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি এ কার্য্যের যোগ্যপাত্র।'

এই সকল অনুকূল মত পাইয়াও ধীর-বুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের সমস্ত দ্বিধা ঘুচিল না; তিনি যদুপতি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, 'যদিও আমার ভ্রাতৃবৃন্দ-প্রমুখ সমস্ত আত্মীয়, মন্ত্রিগণ এবং শ্রেষ্ঠ ঋষিরা এই কার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন, তথাপি আমি কৃষ্ণের মতানুসারেই পরিচালিত হইব।' সারথি ইন্দ্রসেনকে সঙ্গে করিয়া দ্বারকা হইতে দ্বারকানাথ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "এত শীঘ্র এই কথার মীমাংসা চলে না।" তৎসময়ের ক্ষত্রিয়গণের একটা ইতিহাস তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, কংসবধের পর এখন বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্; সে তোমাদের এই কার্য্যে প্রতিবাদী হইয়া তোমাদের সমস্ত উদ্যম পণ্ড করিয়া দিবে। তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিলে তোমাদের এ কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত নহে। যাঁহারা তোমাদের ও যদুকুলের আত্মীয়, তাঁহারাও ভয়ে জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছেন। শুধু তোমাদের পূজ্য ও স্নেহভাজন মাতুল পুরুজিৎ জরাসন্ধের অনুগামী হন নাই, কিন্তু তোমাদের পিতৃসখ যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত, যদুকুলের পরম আত্মীয় ভীষ্মক ইঁহারা সকলেই তাঁহার বাধ্য। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি ভীষ্মক জরাসন্ধের ভয়ে আত্মীয়তা সত্ত্বেও আমাদিগের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হন নাই। হংস ও ডিম্ভক এই দুই মহাপরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের অনুচর। চেদি-অধিপতি শিশুপাল যুদ্ধকালে জরাসন্ধের সেনাপতি হন। মহাপরাক্রান্ত, বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি পৌণ্ড্র বাসুদেব ইঁহার অন্তরঙ্গ সখা। যে সকল রাজা জরাসন্ধের প্রতিকূলতা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় দেশ পরিত্যাগ করিয়া বনাচারী হইয়াছেন, নতুবা অন্যত্র বাস করিতেছেন। উত্তরদেশবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। ইঁহার ভয়ে শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, সকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শাল্বায়নবংশীয় রাজগণ, দক্ষিণ-পাঞ্চালের রাজারা, এবং কোশলবাসী নৃপতিগণ পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন, মৎস্য প্রভৃতি দেশীয় রাজগণ অতিশয় ভীত হইয়া উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। শিবের মন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য এই দুষ্ট সম্রাট্ ৮৬জন

জরাসন্ধের পরাক্রম।

রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আর ১৪জন নৃপতি হইলেই একশত সংখ্যা পূর্ণ হইবে, তখন ইনি যজ্ঞ করিয়া ইঁহাদিগকে বলি দিবেন।

দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধ বহুবার মথুরা অবরোধ করিয়াছিলেন; ইঁহার অমিত পরাক্রম এবং অসংখ্য সৈন্যবলের নিকট যদুকুল দাঁড়াইতে পারে নাই; অবশেষে ভীত ও আর্ত্ত হইয়া আমরা প্রিয় জন্মভূমি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম গিরিরাশি-সংরক্ষিত রৈবতকের নিকট রাজধানী পরিবর্ত্তিত করিয়া কথঞ্চিৎ নির্ভয়ে বাস করিতেছি। এই দুর্জ্জয় শত্রু কিছুতেই তোমাদের রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে দিবেন না।

"যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্রদ্বারা তিনশত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। (মহাভারত, সভা, ১৪ অঃ) সুতরাং জরাসন্ধ থাকিতে কিছুতেই তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারিবে না। রাজসূয় যজ্ঞ একেবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" (সভা, ১৫ অঃ)।

কৃষ্ণের এই কথায় জরাসন্ধের প্রতাপের কতকটা আভাস পাওয়া গেল। হরিবংশে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরা আক্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—তাহা আরও বিস্তৃত। পুরাণকার যেন ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গের ছবি-সংযুক্ত একখানি বিশাল পটে জরাসন্ধকে রাজরাজেশ্বর মহাসম্রাট্স্বরূপ আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, এই একখানি চিত্র দিয়া হরিবংশ-পুরাণের অনেকাংশ পূর্ণ করা হইয়াছে।

জরাসন্ধের দুই দুহিতা অস্তি ও প্রাপ্তিকে কংস বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসের মৃত্যুর পর ইহারা জরাসন্ধকে তাঁহাদের স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করেন।

অস্তি ও প্রাপ্তি।

জামাতৃবধের শোকে প্রতিহিংসাবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া জরাসন্ধ মথুরাপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন, একবার দুইবার নহে—সপ্তদশবার। প্রথমবারের আক্রমণকালে ভারতবিশ্রুত প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের রাজা সম্রাট্ জরাসন্ধের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। হরিবংশ ৩৫জন রাজার নাম বলিয়া "অন্যান্য" শব্দদ্বারা অধিকতর সংখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই ৩৫জনের মধ্যে আমরা

যদুকুলের বিরুদ্ধে অভিযান।

গান্ধার ও কাশ্মীর হইতে প্রাগ্জ্যোতিষপুর পর্য্যন্ত এবং হিমাচলের উপত্যকা হইতে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন দেশের নাম পাইয়াছি। এই মহতী চমূর মধ্যে পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব, অঙ্গ-বঙ্গ দুই দেশের অধিপতি, চেদিরাজ শিশুপাল, কাশী, মদ্র, গান্ধার প্রভৃতি দেশের রাজার উল্লেখ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যাঁহারা মথুরা অবরোধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দ্রুপদ রাজা ও সভ্রাতৃবর্গ দুর্য্যোধনের নামও পাইতেছি। যদুবংশের দ্বারা সুরক্ষিত মথুরার চারিটি দ্বার জরাসন্ধ অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন রাজগণের মধ্যে পশ্চিমদ্বার রোধ করিয়া ১০জন রাজচক্রবর্ত্তী, উত্তরদ্বারে ১৯জন এবং পূর্ব্বদ্বারে ১৩জন পরাক্রান্ত রাজা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, স্বয়ং জরাসন্ধ, শিশুপাল ও তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ কয়েকজন মহাযোদ্ধার সঙ্গে দক্ষিণদ্বার অবরোধ করিয়াছিলেন।

এই মহাসৈন্য ও রাজাধিরাজগণ-পরিবৃত্ত সম্রাট্ জরাসন্ধ যে তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রাজা ছিলেন, তাহা মহাভারতাদি পুরাণে পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায়। যে রাজধানীতে উত্তরকালে অশোক প্রভৃতি মৌর্য্যবংশীয় রাজগণ আসীন ছিলেন, তৎপূর্ব্বে নন্দবংশ, এবং মৌর্য্যবংশের রাজত্বের অবসানে, অন্ধ্রবংশ ও গুপ্তসম্রাটেরা অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই রাজধানীর সর্ব্বপ্রথম গৌরব জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ পত্তন করিয়াছিলেন এবং সেই গৌরব-শিখা জরাসন্ধের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়াছিল। জরাসন্ধের পতাকা-নিম্নে শত শত শ্বেত রাজচ্ছত্র একত্র দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছিলেন, 'মনে হইতেছে মথুরার আকাশে শত শত বলাকাপঙ্‌ক্তি উড়িতেছে।' এই মহাসৈন্য হইতে ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় একটা গভীর কলরব উত্থিত হইয়াছিল; হরিবংশকার বলিতেছেন, এই সময় তর্জ্জনী হেলনপূর্ব্বক এক সমুচ্চ মঞ্চ হইতে জরাসন্ধ বলিলেন "চুপ"। তখন হিমাদ্রিতুল্য স্থির কোন যোগিবরের ন্যায় জরাসন্ধকে দেখা যাইতেছিল। তাঁহার সেই আদেশবাণী ইঙ্গিতে প্রচারিত হওয়ামাত্র মহাসৈন্যসমুদ্র অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল, উত্তাল মহাসাগর যেন প্রশান্ত মহাসাগরে পরিণত হইল; রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি সম্রাটের যোগ্য গম্ভীর কথায় জ্বালাময়ী এক বক্তৃতা করিলেন।

এক সময়ে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতাপে জরাসন্ধের এই বিপুল সৈন্য প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ত্বরিতগতিতে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "হে ক্ষত্রিয়গণ, তোমরা পলায়নোদ্যত হইয়াছ কেন? তোমাদিগকে ধিক্। বেশ, তোমরা যুদ্ধ করিও না, এইখানে দাঁড়াইয়া থাক, আমি স্বয়ং এই দুইটি রাখালকে (কৃষ্ণ-বলরাম) একাই বধ করিব। তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখ।"

এই কথায় লজ্জিত হইয়া পলায়নপর সৈন্য ফিরিয়া আসিয়া আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

প্রবল দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের পরও যদুকুল পরাস্ত হইল না, বহু সৈন্য ক্ষয় হইল; কিন্তু জরাসন্ধকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এদিকে তাঁহার প্রিয় কন্যা অস্তি এবং প্রাপ্তির বিলাপ ও উত্তেজনায় তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার যদুকুল ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প অটল হইয়া রহিল, তিনি পুনঃ পুনঃ মথুরা আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

যদুকুল বিশেষরূপে বুঝিলেন, পরিণামে তাঁহারা জরাসন্ধের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। তাঁহার জনবল এবং অধীন নৃপতিবর্গ অনেক বেশী; বালির বাঁধ দিয়া এই মহাস্রোত তাঁহারা কতদিন ঠেকাইয়া রাখিবেন? তাঁহারা পরামর্শ করিয়া প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দূরদূরান্তরে বাস করিয়া নিরাপদে থাকাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। যদিও সমস্ত ধন-সম্পত্তি লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইল না, তথাপি কতক কতক মূল্যবান্ সামগ্রী লইয়া তাঁহারা পশ্চিমদিকে পলায়নপর হইলেন, এবং তথায় রৈবতক পর্ব্বত-বেষ্টিত রমণীয় কুশস্থলীতে বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারিবে।"

অবশ্য ভীমার্জ্জুনের সাহায্যে ছলনা করিয়া কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন; তাঁহারা কপট স্নাতকবেশে যাইয়া জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে মগধের দীপ্তি কতকদিনের জন্য নিবিয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিতে লিখিয়াছেন—"হিন্দুরাজত্বকালে অধিকাংশ সময়েই আধিপত্য মগধাধিপতির ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও মগধাধিপতি উত্তরভারতের সম্রাট্।·········কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয়পক্ষের মোট অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। একা জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা ছিল বলিয়া উল্লিখিত।"

এই সকল সৈন্য-সংখ্যা ও প্রতাপের বর্ণনায় কতকটা অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই আছে, তথাপি মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের কিছু পূর্ব্বে জরাসন্ধ পূর্ব্ব-গগনের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড ছিলেন। তাঁহার মত বলশালী ও প্রবল নৃপতি তখন ভারতবর্ষে অন্য কেহ ছিলেন না।

কিন্তু এই পর্ব্বভারতে শুধু জরাসন্ধ নহেন, তখন আরও অনেকগুলি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে স্থাপিত করিবার স্পর্দ্ধা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে জরাসন্ধের পরেই পৌণ্ড্র বাসুদেবের* নাম করিতে পারি। সেই সময়ের পৌণ্ড্র দেশ বঙ্গদেশের অনেকাংশ জুড়িয়াছিল, চৈনিক পরিব্রাজকগণ ও প্রাচীন ইতিবৃত্তকারেরা অনেকেই এই পৌণ্ড্র দেশের গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন। হয়ত পুরাকালে ইহার দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে মহানন্দা, উত্তরে কোচবিহার ও করতোয়া নদী ছিল; উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং ও পাবনা জেলার পূর্ব্বাংশ ব্যতীত এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ এই পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন পৌণ্ড্রের অনেকাংশ এখন পাবনা ও বরেন্দ্রভূমির মধ্যে পড়িয়াছে। সম্প্রতি দীক্ষিত সাহেব মহাস্থান হইতে যে মৌর্য্য-লিপি-সংযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পাইয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে অশোকের সময় মহাস্থানই পৌণ্ড্র দেশের রাজধানী ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে এই ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন বাসুদেব। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্র বাসুদেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই দুরাত্মা মহাবল ও পরাক্রান্ত, আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মোহবশতঃ আমার শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করে, এই রাজা জগতে

বঙ্গগৌরব পৌণ্ড্র বাসুদেব।

(পৌণ্ড্র বা বঙ্গদেবের ... লোক ... (মহা, সভা ১৪অ২০)।

* পৌণ্ড্র দেশ—পাণ্ডুয়া। মহাভারতোক্ত পৌণ্ড্র বাসুদেবের সময় হইতে এই দেশ বঙ্গদেশের একটী বিখ্যাত এবং সুবিস্তৃত অংশ ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী গৌড় হইতে কুড়ি মাইল উত্তরপূর্ব্বে ও মালদহ হইতে ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। অধ্যাপক উইলসনের মতে রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মালদহ, বগুড়া এবং ত্রিহুত এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পুরাকালে মহানন্দা এবং করোতোয়ার স্রোত পাণ্ডুয়ার পাদদেশ ধৌত করিয়া বহিয়া যাইত। ফার্গুসন সাহেব বলেন, দিনাজপুর, বগুড়া ও রঙ্গপুর এই রাজ্যের প্রধান অংশ ছিল। এককালে পৌণ্ড্র দেশ বলিতে সমস্ত উত্তরবঙ্গ বুঝাইত।

বাসুদেব নামে বিখ্যাত এবং বঙ্গ, পৌণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি" (সভা, ১৩ অঃ)। হরিবংশের ভবিষ্যপর্ব্বের ৯৩ অধ্যায়ে পৌণ্ড্র বাসুদেবের দ্বারকা আক্রমণ সম্বন্ধে বিস্তৃত এক বর্ণনা আছে। নরককে কৃষ্ণ হত্যা করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বাসুদেবের প্রতিহিংসা বৃত্তি জাগিয়া উঠে। তিনি তাঁহার অধীন রাজগণকে আহ্বান করিয়া বলেন, "এই গোপনন্দন কৃষ্ণ কোন্ সাহসে আমার নাম গ্রহণ করিয়াছে? জগতে একমাত্র আমিই 'পুরুষোত্তম বাসুদেব'; এই উপাধি এবং চিহ্ন সে কেন গ্রহণ করিয়াছে? হে রাজগণ, আমার সুদর্শন অতি তীক্ষ্ণ, আমার সহস্রার মহাঘোর চক্র, আমারই শার্ঙ্গ নামক মহারব ধনু ও কৌমুদিকী নামক বৃহৎ গদা—আমিই গদাধর—এই উপাধি গ্রহণের আর কাহারও অধিকার নাই। হে রাজগণ। যদি তোমরা আমাকে 'শঙ্খচক্র-গদাধর' না বল, তবে তোমাদের প্রত্যেকের শতভার স্বর্ণ ও বহু ধান্য দণ্ড করিব।"

কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ও মৃত্যু।

এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী পৌণ্ড্র বাসুদেব অষ্টসহস্র রথ এবং বহু সহস্র গজারোহী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশ হইতে দ্বারকা অবরোধ করিবার জন্য একলব্য প্রভৃতি পরাক্রান্ত সামন্ত রাজাদিগকে সঙ্গে করিয়া অভিযান করিলেন; অবরোধকারীদের শত শত দীপশলাকার আলোকে সমস্ত দ্বারকাপুরী উজ্জ্বল হইয়াছিল; এই ভীষণ যুদ্ধে বহুসংখ্যক যদুবীর নিহত হইয়াছিলেন। সাত্যকির সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধে যখন পৌণ্ড্ররাজ একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন কৃষ্ণ আসিয়া ক্রূর যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করিলেন, কিন্তু তিনি পৌণ্ড্রকের অসাধারণ বীরত্বে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহার কি আশ্চর্য্য বীর্য্য, কি দুঃসহ ধৈর্য্য!"

ইহার পর আমরা নরকবধের উল্লেখ করিব। হরিবংশে প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি * নরকের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ইনি ভূমিপুত্র,—কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন না। নানারূপ উপগল্প হইতে নিছক সত্যটুকু গ্রহণ করা বড়ই কঠিন, তবে একথা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, দেব-মাতা অদিতির দুইটি বহুমূল্য কুণ্ডল ইনি বলপূর্ব্বক লইয়া আসেন। প্রধানতঃ এই কারণেই ইন্দ্রাদি দেবতার প্রার্থনায় কৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে নরক রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। নরক রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। নিশুম্ভ, পঞ্চনদ, মুর ও হয়গ্রীব নামক সেনাপতিরা ইঁহার অসংখ্য সৈন্যের পরিচালনা করিতেন। এই প্রতাপশালী মিত্র-ব্যূহের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া নরক সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে অপরাজেয় এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিমান্ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইনি যখন কৃষ্ণের আহ্বানে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন,—তখন হরিবংশকার লিখিয়াছেন, স্বর্ণদণ্ড-সংলগ্ন শত শত মণিখচিত পতাকা-বেষ্টিত ইঁহার স্বর্গীয় রথ লোক-চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছিল,—এই রথ অষ্ট লৌহচক্রসংযুক্ত এবং বহুমূল্য হীরকখচিত যুগে আবদ্ধ বহু অশ্বদ্বারা

প্রাগ্জ্যোতিষপুরের (আসাম) অধিপতি নরক। 'মধুমুরনরকবিনাশন" কৃষ্ণ-স্তোত্র—জয়দেব।

* কামরূপ।

বাহিত হইত। রথটি লৌহজালে রক্ষিত ছিল; পুরাণকার লিখিয়াছেন, এই উজ্জ্বল রথে সমাসীন রাজচক্রবর্ত্তী নরককে সান্ধ্যগগণের সূর্য্যের মত দেখা যাইতেছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহার গৌরব অস্তমিত হইবে, এইজন্য তাঁহাকে সান্ধ্যগগনের সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণ অতি কঠোর যুদ্ধের পর তীক্ষ্ণ ভল্লক্ষেপে নিশুন্দের মস্তক ছিন্ন করিলেন—ক্রমে মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তিনি বাণদ্বারা হয়গ্রীবের বক্ষ ভেদ করিলেন—শক্তিশেলে মুরকে সংহার করিয়া এবং কঠোর যুদ্ধে পঞ্চজনের নিধন সাধনপূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ করিয়া তাঁহার বৈজয়ন্তী আকাশে উড়াইয়া দিলেন। ইহার পর স্বয়ং নরকের সঙ্গে তাঁহার সঙ্ঘর্ষ। হরিবংশে এই যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ একটি বর্ণনা আছে। কৌতূহলী পাঠক নিজে তাহা পাঠ করিবেন। আমাদের এই পূর্ব্বদেশের রাজারা যে কিরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন, এই সকল বর্ণনাতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। নরকের মৃত্যুর পর তাঁহার শোকার্ত্তা জননী ভূমি বিলাপ করিতে করিতে অদিতির সেই কুণ্ডল দুইটি লইয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'হে কৃষ্ণ। তোমার লীলা কে বুঝিবে? বালক যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে, তোমার খেলাও সেইরূপ। তুমি যাহাকে দিয়াছিলে, তাহাকে তুমি আজ নিজহস্তে হত্যা করিলে। যাহা হউক এই কুণ্ডল দুইটির জন্য তুমি নরককে হত্যা করিয়াছ, এই দুইটি কুণ্ডল গ্রহণ কর এবং নরকের সন্তানদিগকে রক্ষা করিও।' জয়দেবের বন্দনায় 'মধু-মুর নরক-বিনাশন' পংক্তিতে মুর ও নরকের উল্লেখ আছে।

মহাভারতে দৃষ্ট হয়—আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্ব্ব হইতে পরাক্রান্ত রাজগণ-অধ্যুষিত ছিল। বাসুদেব, নরক, মুর প্রভৃতি খাস্ বাঙ্গলার রাজা। চিত্রসেন ও সমুদ্রসেন বঙ্গের অতি প্রবল রাজা ছিলেন, ইঁহারা ভীমের দিগ্বিজয়ে যাত্রায় বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান হুগলী জেলার রাজা (কৌশকী কচ্ছপতি), তাম্রলিপির রাজা, মালদহের (মোদা গিরির) রাজা, সুহ্ম বা রাঢ়দেশের রাজা প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন অংশের রাজগণও ভীমকে সহজে পথ ছাড়িয়া দেন নাই। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের উল্লেখ মহাভারতের অনেকাংশেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত রাজার প্রায় সকলেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তির রাজা ময়ূরধ্বজ ও নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বৃহৎ বঙ্গের অপরাপর রাজগণ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় আমাদের বৃহৎ বঙ্গ পরাক্রান্ত রাজগণের নিবাসস্থল এবং শ্রেষ্ঠ আর্য্যভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-সীমান্তের রাজগণের প্রসঙ্গে যদিও কিরাত, চীন ও যবন সৈন্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তময় বৈবাহিক আত্মীয়তা ছিল তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। আমরা দেখাইয়াছি, এই বৃহৎ বঙ্গের কেহ কেহ সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা সম্বন্ধে এদেশের দাবী

"নাসৌ মুনির্যস্য মতং নাভিন্নং।"

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্মার্থ যুক্তং বচনং প্রমাণং।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং॥"

মগধ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর, অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র প্রভৃতি স্থান বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত, তাহাদের ভৌগলিক সংস্থান সর্ব্বজনসম্মত; কিন্তু এই রাজ্যগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি স্থান আছে—যাহাদের ভৌগলিক সীমানা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

মণিপুর—বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমান্তে যে মণিপুরের রাজারা বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেছেন,—তাহার সঠিক সংস্থান এখনও কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

মহাভারতের প্রমাণ দ্বারা বর্ত্তমান কালের বঙ্গবিশ্রুত মণিপুর অর্জ্জুনের মণিপুর কিনা—তাহা বিচার করা যাউক। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ২১৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"অর্জ্জুন কলিঙ্গতীর্থ ও তত্রত্য পুণ্যতীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্মাবলী অতিক্রম করিয়া চলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তাপসগণ-পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহাসাগর-উপকূল-মার্গে মণিপুর গমন করিলেন।" সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ নন্দলাল দে মহাশয় তাঁহার Geographical Dictionary of Ancient India নামক পুস্তকে ভারতবর্ষের যে মানচিত্র দিয়াছেন তাহাতে মহেন্দ্র পর্ব্বত তাম্রলিপ্তির ১০০ শত মাইল দক্ষিণে দেখান হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন উড়িষ্যার উত্তরে মাত্তরা পর্য্যন্ত সমস্ত পর্ব্বত-শ্রেণীকেই মহেন্দ্র পর্ব্বত বলা হইত; মহেন্দ্র পর্ব্বত অপরদিকে প্রায় বঙ্গদেশের এক প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তৎকালীন উড়িষ্যা রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, তবে একথা নিশ্চিত যে অর্জ্জুন ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে যাইতেছিলেন, "মহেন্দ্র পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া" অর্জ্জুন ক্রমে পূর্ব্বদিকে আসিয়া সাগরে পৌঁছিলেন; এই সাগর বাঙ্গলার সুপ্রাচীন সাগর-তীর্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালে সমুদ্র অনেকটা উত্তরে ছিল—সুতরাং বাঙ্গলার পূর্ব্বে "মণিপুর"—মহাভারতের মণিপুর হওয়া বিচিত্র নহে। ত্রিপুরার "রাজমালার" সারাংশ সঙ্কলন করিয়া কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন ত্রিপুরার পূর্ব্বদিকে যে মণিপুর দৃষ্ট হয়, তাহার প্রাচীন নাম "মিতাইলেক্ পাক্," গত দুই শতাব্দীর মধ্যে শ্রীহট্টের বৈষ্ণব

"মিতাইলেক্ পাক্।"

অধিকারীরা এই দেশকে 'মণিপুর' আখ্যা দিয়াছেন। এই মত বিচারসহ কিনা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আমরা মণিপুরের ঐতিহাসিক পরিশিষ্টে তাহা দেখাইয়াছি।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা উড়িষ্যা, এমন কি দ্রাবিড় রাজ্যের 'ম' অক্ষরযুক্ত নগরগুলির তালিকা হাতড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে সেই প্রাচীন 'মণিপুর' নাম দিয়াছেন। ল্যাসেন (Lassen) চিকাকোলের দক্ষিণে "মনফুর বন্দরকে" মণিপুর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "প্রাচীন হিন্দুদিগের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থের" লেখক (Weapons of Ancient Hindus, pp 145-148) ল্যাসেনের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং মাদুরার সন্নিহিত "মনলুরা" নামক স্থানকে বভ্রুবাহনের রাজধানী মনে করিয়াছেন। মিঃ রাইস্ (Rice) ইহাকে মধ্যভারতের "রত্নপুর" বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং অপর একজন লেখক চিল্কা হ্রদের তীরস্থ "মাণিকপত্তনই" মণিপুর বলিয়া অনুমান করিতেছেন। সুতরাং "মণিপুর" নগরটি ভারতবর্ষের "ম" যুক্ত নগরের নামের তালিকা প্রায় নিঃশেষ করিয়াছে, অথচ কোন মতই সত্যের বিশেষ সন্নিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রবাদের মূল।

এতগুলি মতের মধ্যে বঙ্গদেশীয় চিরাগত প্রবাদটি আমরা ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না। যখন মণিপুর নামক একটা প্রসিদ্ধ নগর এখনও বিদ্যমান এবং উহা পূর্ব্বদেশের অন্তর্গত, তথাকার রাজারা বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া এখনও দাবী করিতেছেন—তখন বৃহৎ বঙ্গের ইতিহাসে সে কথাটা আমরা ছাড়িয়া দিব কিরূপে? অন্ততঃ প্রবাদটার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করি।

চেদি কোথায়।

চেদি—চেদি সম্বন্ধেও বঙ্গের একটা ক্ষীণ দাবী আছে। সে দাবী বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। তথাপি যখন এখনও কোন মতই সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় নাই এবং একই নামে অনেক দেশ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পরিচিত, তখন প্রবাদগুলির উল্লেখ করিতে দোষ নাই। "নষ্টমূলা জনশ্রুতিঃ" প্রবাদ যতই অবিশ্বাস্য হউক না, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকা অসম্ভব নহে, অন্ততঃ সেই জনশ্রুতি অপর কোন বিষয়ের উপর প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোক পাত করিতে পারে। মহাভারতের সময় চেদি এক অতি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল; চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে কৃষ্ণের শত্রুতা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। শিশুপাল জরাসন্ধের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। বসুদেবের ভাগিনী শিশুপালের মাতা ছিলেন। কৃষ্ণ পিতৃস্বসার অনুরোধে শিশুর বহু অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন; ইন্দ্রপ্রস্থে এই অপরাধের মাত্রা চরমে পৌঁছিয়াছিল; তখন কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "আমি যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে চলিয়া গিয়াছিলাম তখন শিশুপাল আমার মথুরাপুরী অরক্ষিত পাইয়া উহা দগ্ধ করে। আমার পিতা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন সে আমাদের যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করে; সৌবীর দেশে একান্ত পতিপরায়ণা বভ্রু পত্নীকে তাঁহার ঘোর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক লইয়া যায়।" রাজসূয় যজ্ঞসভায় শিশুপাল কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এবং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ

পণ্ড করিবার মানসে যেরূপভাবে সমবেত রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতের পাঠক সকলেই অবগত আছেন; ইনি সেকালে যে একজন রাজচক্রবর্তী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন এই রাজচক্রবর্তী শিশুপালের চেদি কোথায়? কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারতের অপর কয়েকটি দেশ (পূর্ব্বে টৌন্সি ও পশ্চিমে কলিসিন্ধ এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী) প্রাচীন চেদির অন্তর্গত ছিল। এই স্থানটিই বৌদ্ধসাহিত্যে চেদি বলিয়া উল্লিখিত। রাজস্থানের লেখক টড্ অনুমান করেন, বুন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতি চাঁদেরি প্রাচীন চেদি। কাহারও কাহারও মতে গ্রীকগণ যে চন্দ্রাবতী (সন্দ্রাবতিস্) নগরের নাম করিয়াছেন, তাহাই এই চাঁদেরি এবং এই স্থানটি মহাভারতের শিশুপালের রাজধানী ছিল। ইহা ললিতপুরের ১৮ মাইল পশ্চিমে স্থিত এবং বর্তমান চাঁদেরির ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ও প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। আইন আকবরীর মতে এই নগরী সুপ্রাচীন এবং এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত রাজাদের রাজধানী ছিল। ডাঃ ফুরার, জেনারেল কানিংহাম এবং বুলারের মতে বুন্দেলখণ্ডটাই প্রাচীন চেদিরাজ্য। স্কন্দপুরাণ ও রেবাখণ্ডে 'দাহলমণ্ডল'কে (বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম) প্রাচীন চেদি বলা হইয়াছে। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমি যে মণ্ডল রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই 'দাহলমণ্ডল'—শোণ ও নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থান-সংলগ্ন ভূভাগ ইহার অন্তর্গত। মহাভারতের সময় এই প্রদেশের রাজধানীর নাম ছিল শুক্তিমতি, গুপ্তদের সময় চেদি রাজ্যের রাজধানী কালাঞ্জর এবং কলচুরিদের সময় উহা মহিষমতি নগরী নামে পরিচিত ছিল (নন্দলাল দের ভৌগলিক ইতিহাস, ৪৮ পৃঃ)।

পূর্ব্বোক্ত মতগুলি যদিও ঠিক একটা জায়গাকে নির্দ্দেশ করে না, তথাপি মনে হয় মোটের উপর মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডটাই প্রাচীন চেদিরাজ্য বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ-প্রচলিত প্রবাদগুলি আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহি না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভৌগলিক ইতিহাস এখনও সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। এসময়ে প্রবাদগুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, হয়ত যাহার মূল্য নাই বলিয়া এখন মনে হইতেছে, কালে তাহার কোনরূপ মূল্য দাঁড়াইতে পারে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে (১৮৭৫ খৃঃ, ২৮শে মার্চ্চ) "ভাওয়ালের ইতিহাস" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার লেখক ভাওয়াল-জয়দেবপুর স্কুলের পণ্ডিত নবীনচন্দ্র ভদ্র তাঁহার পুস্তকের ২০।২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "ভাওয়ালের উত্তর-পশ্চিমাংশে 'দিঘ্লীর ছিট্' নামক বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা ও প্রাচীরের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে এক গড়খাই দৃষ্ট হয়; অধুনা তাহা ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ হওয়াতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও সর্পাদি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়াছে। সুতরাং তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথ্যানুসন্ধান করা দুঃসাধ্য। জনশ্রুতিতে জানা যায় ইহাই

রাজা শিশুপালের রাজধানী ছিল। উক্ত স্থানের শৈলাট গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বৃহদায়তন প্রাচীন পুষ্পোদ্যানের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহাতে মুচুকুন্দ, নাগকেশর ও গুলাচি এবং বৃহৎ বৃহৎ চাম্বল প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৃক্ষসকল দৃষ্ট হয়। জনরব আছে যে উহাই উল্লিখিত রাজার পুষ্পবাটিকা ছিল; লোকে উহাকে "ফুল সাঙ্গনের গড়" বলিয়া থাকে। উক্ত গ্রামের উত্তরাংশে শিশুপালের রাজধানী ছিল। চেদি যে কামাখ্যার অন্তর্নিবিষ্ট প্রদেশ তাহারও বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে শিশুপাল রাজার বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, অতএব বাহুল্য বিবেচনায় তদ্বিবরণ বর্ণনায় বিরত রহিলাম।"

"বহুদিন গত হইল, ভাওয়ালের মধীর মাঠের সম্মুখে কতকগুলি অক্ষরযুক্ত একখণ্ড তামার পাত পাওয়া গিয়াছিল, * তত্রত্য ভূতপূর্ব্ব জমিদার স্বর্গীয় মহাত্মা গোলোকনারায়ণ রায়চৌধুরী তাহা আনাইয়া ঐ অক্ষরগুলি পড়াইবার জন্য অনেক যত্ন করাইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাহা চিনিতে না পারিয়া ঢাকার কোন বিজ্ঞ ইংরেজের নিকট পাঠান, তথায়ও কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে পারেন না। তৎপর তাহা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। কিন্তু সেখানেও কেহ তাহা পাঠ করিতে না পারায় তাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। বোধকরি ঐ অক্ষরগুলি চাষা-নাগরী হইবে। এখানে যাহারা চাষা-নাগরী অবগত আছে, তাহাদিগকে ঐ তাম্রশাসন প্রদর্শন করা হইয়াছিল না..................ভাওয়ালে

চাষা-নাগরী। এখনও চাষা-নাগরী চণ্ডাল জাতির মধ্যে কেহ কেহ অবগত আছে, তদ্বারা বিলক্ষণ অঙ্কগণনা ও হিসাবাদি করিয়া থাকে, চাষা-নাগরীতে লিখিত কতিপয় পুস্তক তাহাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়" (২৫-২৬ পৃঃ)।

পুস্তকখানির প্রারম্ভেই লিখিত আছে—"জনরব আছে যে ভাওয়াল রাজ্য শিশুপালের রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদি রাজ্য শিশুপালের রাজধানী—তদনুসারে ভাওয়াল চেদি-রাজ্যের অংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন তন্ত্রের লিখনাভাসে কামাখ্যা দেশের দক্ষিণ সীমা বৃদ্ধগঙ্গা (বুড়ীগঙ্গা) ও চেদি দেশ কামাখ্যার অংশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে" (উপক্রমণিকা)। লেখক প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এককালে ভাওয়ালের আয়তন খুব বড় ছিল। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা প্রভৃতি স্থান ভাওয়ালের মধ্যে "এবং লাক্ষা নদীর পূর্ব্বে তুরাক্ নদীর পশ্চিমে বহুপরিমিত ভূমি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।"

এই শিশুপাল খুব সম্ভব পালবংশীয় কেহ হইবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভীমসেনের পুত্র ধীমন্তসেনের পৌত্র এবং রণধীরসেনের পুত্র হরিশ্চন্দ্রকেও কিংবদন্তী পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র

* এই তাম্রশাসনখানি এখন পাওয়া যায় না; তবে সম্ভবতঃ নলিনী ভট্টশালী মহাশয় ইহারই উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার পাঠোদ্ধার হয় নাই, তবে ভট্টশালী মহাশয় ইহার একটা আনুমানিক সারাংশ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন, উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

স্থির করিয়া সাভারের নিকটবর্ত্তী জনপদে অনেক উপগল্পের সৃষ্টি করিয়াছিল; ভীম কৈবর্ত্তের জাঙ্গালকেও মধ্যম পাণ্ডবের কীর্ত্তি বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত, এই শিশুপালকেও তদ্রূপ মহাভারতোক্ত শিশুপালের সঙ্গে এক করিবার কিংবদন্তী প্রচলিত হইতে পারে। মহাভারতের সময়ে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও নাগকেশর এবং গুলাচি পুষ্প তরুর বংশ যে এখনও বর্ত্তমান আছে—তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু মহাভারতের সেই অংশ আলোচনা করিলে দেখা যায় ভীম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রথমতঃ পাঞ্চাল, তৎপরে ক্রমান্বয়ে বিদেহ (মিথিলা) ও গণ্ডক দেশবাসীদিগকে জয় করিয়া দর্শান দেশে উপস্থিত হইলেন। তথাকার রাজার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজয়পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথায় প্রবল পরাক্রান্ত রোচমানকে জয় করিয়া পূর্ব্ব দেশ অধিকার করিলেন। তৎপরে দক্ষিণে যাইয়া পুলিন্দদিগকে পরাভূত করিয়া শিশুপালের রাজ্য চেদি দেশে উপস্থিত হইলেন।

ভীমের পূর্ব্বমুখী যাত্রা।

তারা তন্ত্রে লিখিত আছে, পুলিন্দদেশ শ্রীহট্টের পূর্ব্বে এবং কামরূপের উত্তরে,—(নন্দলাল দের প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক অভিধান, ১৬১ পৃঃ) এবং গণ্ডকী নদী দেবলগিরি হইতে উৎপন্ন (তিব্বত দেশের দক্ষিণ সীমান্তে) এবং ত্রিবেণীঘাটের সন্নিহিত কোন স্থান হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে (৬০ পৃঃ)।

গণ্ডক ও পুলিন্দ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভীম ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া চেদিমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই মত একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

বরঞ্চ মহাভারতের একটি উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় চেদি দেশ বঙ্গের সন্নিহিত ছিল। পৌণ্ড্র বাসুদেবের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, "এই পৌণ্ড্র বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি ও সমস্ত চেদিদেশে সুবিখ্যাত" (সভা, ১৩ অঃ)। এক নামে ভিন্ন ভিন্ন যুগে নানা প্রদেশ বুঝাইত—তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং চেদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম হওয়াও বিচিত্র নহে।

এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের ভার ভাবী প্রাচীনভারতের ইতিহাস লেখকের উপর। আমাদের পক্ষে এই প্রচেষ্টা আঁধারে ঢিল ছোড়াছুড়ির মত।

নবীনচন্দ্র ভদ্র মহাশয়ের "ভাওয়ালের ইতিহাসে" প্রসঙ্গক্রমে যে কথাটা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা এত প্রয়োজনীয় মনে করি যে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। এই যে চাষা-নাগরীর কথার এখানে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এ কথাটা আমার কাছে একেবারে নূতন। তবে কি ব্রাহ্মী লিপি কিংবা গুপ্ত লিপির অনুশীলন দেশ হইতে এখনও পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই? সমাজের উপরকার স্তরে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহারা নানা দেশের সংস্পর্শে আসিয়া যুগে যুগে রীতি, নীতি, ভাব ও ভাষায় অনেকরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এমন কি অনেক সময়ে ভিন্নদেশাগত বিজয়ী বীরদের অত্যাচারে কখনও কখনও সমাজের

নিম্নস্তরে প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ রক্ষা।

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা একেবারে বিলুপ্ত হন, নতুবা দেশান্তরী হইয়া আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণী সেই ঝড়ের উৎপাতে একেবারে নষ্ট হয় না। শাল, তমাল ভাঙ্গিয়া প্রভঞ্জন লীলা করেন, কিন্তু তিনি শ্যামদূর্ব্বাদলের একটিও শিখা ভাঙ্গেন না। দেশের প্রাচীনতম আচার, নীতি এমন কি শিক্ষা, দীক্ষা, কলাবিদ্যা—এ সমস্তই দেশের নিম্নতম শ্রেণীর কুটিরে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে, এদেশে যে তাহা হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পরে দিব। এই নিম্নশ্রেণীর লোকেরা জাতীয় প্রাচীন সম্পদের অন্তঃপুরের দুর্গস্বরূপ। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা এই অন্তঃপুরে যতটা রক্ষিত আছে—উচ্চশ্রেণীর সমাজে তাহা নাই। এই জন্যই কি ভাওয়ালের জঙ্গলে চণ্ডালেরা সেই প্রাচীন লিপি এখনও বজায় রখিয়াছে? এবং প্রাজ্ঞমানী ভদ্রলোকেরা নাসিকা কুঞ্চন করিয়া সেই লিপির নাম দিয়াছেন "চাষা-নাগরী ?" এই নাগরীতে লেখা পুঁথিও কিছু ছিল। বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত লিপিকেই কি ব্রাহ্মণেরা "চাষা-নাগরী" নাম দিয়া তাঁহাদের ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ? ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, এই চাষা-নাগরীতে জ্ঞান-সম্পন্ন লোক ও চাষা-নাগরীতে লিখিত পুঁথি ভাওয়ালে চণ্ডালদের মধ্যে ছিল। এই ৫৭ বৎসরে কি তাহা লোপ পাইয়াছে ? বিচিত্র নহে, কিন্তু ইহার খোজ করা একান্ত প্রয়োজন; অপিচ, এই "চাষা-নাগরী"র অর্থ কি "হিন্দুস্থানী লিপি" ?—তাহা বলিয়া ত মনে হয় না। হিন্দুস্থানীরা বহুকাল যাবৎ বাঙ্গলার নানা স্থানে বাস করিতেছে; তাহাদের নাগরীর সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। তাহাদের নাগরীর এইরূপ অদ্ভুত নাম কেনই বা হইবে ? ব্রাহ্মীলিপির জ্ঞান যদি এদেশে নষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা বৌদ্ধ-বিদ্বেষের ফলে হইয়াছে। দেব নাগরীর প্রাধান্যের যুগে বৌদ্ধ যুগের লিপি হতাদৃত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তাহা সমাজের নিম্নস্তরে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। সেই লিপির "চাষা-নাগরী" নাম হওয়াও অসম্ভব নহে।

ত্রিপুরদেশে দ্রুহ্যু।

ত্রিপুরদেশ—যযাতিপুত্র দ্রুহ্যুর ত্রিপুররাজ্যে আগমন সম্বন্ধেও বহু প্রবাদ এদেশে চলিয়া আসিয়াছে। পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত দ্রুহ্যু এক বর্ব্বর রাজ্যে চলিয়া গেলেন। মহাভারতের আদি পর্ব্বের ৮৩ অধ্যায়ে এই অভিশাপের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। দ্রুহ্যুকে যযাতি বলিলেন—"তুমি সেই দেশে যাও, যেখানে অশ্ব, গজ, রথ, গর্দ্দভ, ছাগ বা গো-বাহিত কোন যানবাহনের সুবিধা নাই। যেখানে একান্ত নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলেও ভেলার আশ্রয় করিতে হয় (বড় নৌকায় যাতায়াতের উপায় নাই) অথবা সাঁতার কাটিয়া যাইতে হয়।" কিন্তু সেই দেশ কোন্ দেশ, তাহা মহাভারতকার উল্লেখ করেন নাই। খিলহরিবংশে (৩০ অঃ, ১৬-২০ শ্লোক) উল্লিখিত হইয়াছে—যযাতি সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন এই বিভাগানুসারে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর ভাগ দ্রুহ্যু পাইয়াছিলেন বিষ্ণুপুরাণানুসারে (৪র্থ অংশ, ১০ম অঃ, ১৭।১৮ শ্লোক) দ্রুহ্যু পশ্চিম দিক্ পাইয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে (৯ম স্কন্ধ, ১৯ অঃ ১৬।১৭ শ্লোক) তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের অধিকা লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণগুলির মধ্যে অনৈক্যের সামঞ্জস্য করিবার জন্য শব্দকল্পদ্রুম-সংকলয়িতা রাধাকান্তদেব বাহাদুর বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—তাহা শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত হইয়াছে। "যযাতি মরণ সময়ে কনিষ্ঠ পুত্রং পুরুং রাজচক্রবর্ত্তিনং কৃতবান্। যদবে দক্ষিণ পূর্ব্বস্যাং কিঞ্চিদ্রাজ্যখণ্ড দত্তবান্। তথা দ্রুহ্যবে পূর্ব্বস্যাং দিশি পশ্চিমায় তুর্ব্বসবে উত্তরাস্যামনবে সর্ব্বান্ পুরোরাধিনাং চক্রে।"

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্রুহ্যু পূর্ব্বদিক্ পাইয়াছিলেন। যাঁহারা দ্রুহ্যু হইতে ত্রিপুররাজবংশাবলীর বংশলতা অঙ্কিত করেন তাঁহারা বলেন—"কোন কোন পুরাণে যে দ্রুহ্যুকে পশ্চিমদিকে প্রেরণের কথা পাওয়া যায়, কল্পভেদে মূলবক্তা বা শ্রোতার বাসস্থান-ভেদে, বা দিক্‌নির্ণয়ের কেন্দ্রভেদে তাহা ঘটিয়াছিল ইহাই বুঝা যায়।"

খাস্ ত্রিপুরার যে সকল সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ইতিহাস আছে তাহার কতকগুলি ৪।৫শত বৎসরের প্রাচীন ; ইহাদের লেখকগণ সকলেই একবাক্যে ত্রিপুররাজগণের পূর্ব্বপুরুষ যযাতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজরত্নাকরের ষষ্ঠ সর্গে (৪-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ও রাজমালার প্রথম অধ্যায়েও এই কথা আছে। রাজমালা পুস্তকখানি প্রাচীন, ইহাতে লিখিত আছে যে চণ্ডেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজার শ্রীহট্টনিবাসী দুই সভাপণ্ডিত ত্রিপুরা ইতিহাস সঙ্কলন করিতে নিযুক্ত হন। চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পাণ্ডা দুর্লভেন্দ্র (চন্তাই) ইহাদিগকে সহায়তা করেন। তাঁহারা রাজমালিকা, যোগিনীমালিকা, বারণ্যকায়নির্ণয়, হরগৌরীসংবাদ ও লক্ষ্মণমালিকা নামক সুপ্রাচীন সংস্কৃত ঐতিহ্যগ্রন্থ আলোচনা করিয়া বিশেষ চন্তাইগণ-কথিত তিপ্রাভাষায় প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণপূর্ব্বক রাজমালা সঙ্কলন করেন। রাজমালা পুস্তকখানি সেই যুগের বাঙ্গলা ভাষার একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী হইতেও ইহার বর্ণিত বৃত্তান্ত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ; কিন্তু প্রথম কয়েক অধ্যায়ে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ও কল্পনার লীলাখেলা আছে। এই কয়েকটি অধ্যায় সম্বন্ধে অবশ্যই দ্বিধা আছে। ত্রিপুরার রাজবংশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস-লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ তথাকার রাজন্যবর্গের যযাতি হইতে উদ্ভবের দাবী অস্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে কামরূপের স্থানরাজাদের বংশধর বলিয়া মনে করেন এবং 'বিশ্বকোষ'কার হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া দ্রুহ্যুর পশ্চিম দেশে উপনিবেশ-স্থাপনের মতটারই পক্ষপাতী।

এই জটিল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা এখানে না করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে আমি সঙ্কল্প করি নাই। কিন্তু রাজরত্নাকরে ত্রিপুর হইতে বর্ত্তমান পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য পর্য্যন্ত যে ১৮৪ জন নৃপতির বংশলতা পাওয়া যায়—তাহার অনেকাংশই ঐতিহাসিক বিচারসহ ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের মত এরূপ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অন্য কোন বংশকে দেখা যায় না। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। আর্য্যত্বের ক্ষত্রিয়-কুলতিলক চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমানী আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান প্রধান রাজগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই দেশান্তর আগত এবং উত্তরকালে ব্রাহ্মণানুগ্রহে হিন্দু-ধর্ম্ম ও সমাজের উচ্চ

শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং কোন রাজবংশে যদি আর্য্যসমাজের বহির্ভূত কোন সম্প্রদায়ের শোণিত প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা সার্ব্বজনীন রীতির দ্যোতক,—নিন্দার্হ নহে।

এই অধ্যায়টা একটু বড় হইল। যে কয়েকটি রাজবংশের কথা লিখিত হইল, তাহা ছাড়া আরও অনেক রাজবংশ বাঙ্গলাদেশে দ্বাপরযুগের ঐতিহাসিক মঞ্চের অভিনেতৃস্বরূপ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। নানারূপ পৌরাণিক উপগল্পের মিশ্রণসত্ত্বেও একথাটা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মগধাশ্রিত মহাভারতীয় যুগের বাঙ্গলাদেশ, বিদ্যা-গৌরবে, যশঃ-প্রতিষ্ঠায় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একটি অতি শ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। যুগে যুগে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের এমন কি তৎকালপরিচিত ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম রাজশক্তি দিল্লী ও মগধ ইহাদের একতমের রাজধানীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। আমরা বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন দলিলের কোন কোনটিতে দেখিয়াছি—'সরকার ইন্দ্রপ্রস্থে'র দোহাই দেওয়া হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও বাঙ্গলা চিরদিন দিল্লীর সহিত বিদ্রোহিতা করিয়া আসিয়াছে। ঐরূপ দোহাই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের পরিচায়ক।

শ্রীহট্টের বিস্তৃত ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় দাবী করিতেছেন, শ্রীহট্টের লাউড় নামক স্থান এককালে মহাভারতের ভগদত্তের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বগুড়ার ইতিহাস-লেখক প্রভাসচন্দ্র সেন বলেন যে উক্ত জেলার মহাস্থানগড় নামক স্থানটি সুপ্রসিদ্ধ পৌণ্ড্র বাসুদেবের রাজধানী ছিল। দিনাজপুরের ইতিহাসে ঐ দেশের কোন কোন অংশকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাণকন্যা উষার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের লীলাভূমি বলিয়া বর্ণিত আছে। মেদিনীপুরের বগড়ি অঞ্চলটা ভীমকৃত বক-রাক্ষসবধের লীলাস্থল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এইভাবে বঙ্গদেশের কোন কোন অংশ বিরাটের গোগৃহ এবং কীচক-বধভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্য সত্যই মহাভারতের সময়ে হুগলীর নিকট মহোজা নামক এক বিক্রান্ত রাজা বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু যতগুলি কিংবদন্তী স্থানীয় লেখকগণ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া দ্বিধাশূন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রমাণাভাবে তাহার অনেকগুলিই অশ্রদ্ধেয়। ১৮৯১ খৃঃ প্রকাশিত স্বরূপচন্দ্র রায়-কৃত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, সুবর্ণগ্রামের (জেলা ঢাকা) সন্নিহিত লাঙ্গলবন্ধে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব আগমন করিয়াছিলেন (২৩ পৃঃ)। সুবর্ণগ্রাম নাম সম্বন্ধে এই লেখক বলেন—"জনশ্রুতি যে অতি প্রাচীন কালে আকাশ হইতে এই বিস্তৃত ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হইয়াছিল, তদবধি ইহা সুবর্ণগ্রাম নামে আখ্যাত হয়। সুবর্ণ বা সুবর্ণবৎ কোনও পদার্থের বর্ষণ অসম্ভব কথা নহে। ১৮১০ খৃঃ অব্দে ইউরোপের অন্তর্গত হাঙ্গেরী দেশে রক্ত ও অন্যান্য সময়ে পশুভক্ষণীয় বস্তু এবং ১৭৭৪ শকের ১৪ চৈত্রে চীনদেশে বালুকাবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৮৭ খৃঃ ১১ই আগষ্টে বোম্বাই সহরে প্লাটিনাম্ বৃষ্টি হইয়াছিল" (৯ পৃঃ)।

জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু দিদিমার গল্পগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার এইরূপ পাণ্ডিত্যের প্রচেষ্টা দেখিলে মনে হয় আমাদের লেখকের

অনেক সময়ে বৃথা শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইতে যাইয়া ইতিহাসকে হাস্যরসের এলাকায় পর্য্যন্ত লইয়া আসেন, তখন তাঁহাদের অবলম্বিত প্রবীণ অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্য্য কৌতুক ও কৃপার উদ্রেক করে।

আমার নিকট বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় রাশি রাশি প্রাদেশিক ইতিহাস ছড়ান রহিয়াছে। এই সকল ইতিহাসের কতকটা মূল্য স্বীকার করিতেই হইবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ সম্বন্ধে তাঁহাদের উল্লিখিত অনেক তথ্যই মূল্যবান্; জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করা অন্যায় নহে, কিন্তু এই সকল প্রাদেশিক বিবরণীর আদিভাগে ইঁহারা যখন পৌরাণিক যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অধিকাংশ স্থলেই ইঁহারা পাণ্ডুপুত্রদের লইয়া যুক্তি-তর্কের আড়ম্বর করিয়া বৃথা ধস্তাধস্তি করিয়াছেন। তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির প্রমাণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী না জানার ফলে অনেক সময়ে তাঁহাদের ভ্রমগুলি উপহাসাস্পদ হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে একটি কথা এই যে নবব্রাহ্মণ্যের প্রচারকগণ সমস্ত দেশটা মহাভারতের জাল দিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। হিন্দুর পুরাণ ছাড়া এ দেশে আর কোন বিষয়ক ঘটনার অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। এইভাবে বিগত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইদানীন্তনকালে ব্রাহ্মণগণ যেখানে যেখানে বৌদ্ধ-যুগের নিদর্শন ছিল—তাহা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। চন্দ্র-সূর্য্যবংশের গৌরব লোকচক্ষে তাঁহারা খুব অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেখানে যে কোন রাজা আছেন, তাঁহাদের আদি পুরুষকে মহাভারতের কোন দেশ-বিশ্রুত বীরের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া, বংশলতা টানিয়া আনিয়াছেন। বঙ্গদেশের সকল রাজার সম্বন্ধেই ঐরূপ ঘটিয়াছে। শুধু এদেশে নহে, রাজপুতনা প্রভৃতি দেশেও সূর্য্যবংশের গোঁজামিল একইভাবে হইয়াছে। ভারতের পশ্চিম দিক্‌টা সূর্য্যবংশের ও পূর্ব্ব দিক্‌টা চন্দ্রবংশের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং রাজাদিগের আদিপুরুষের কথাটা একেবারে ইতিহাস হইতে বাদ দিলেও মন্দ হয় না। যতই কেন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হউক না কেন, ঐতিহাসিকগণ এই সকল বংশ-লতার মুখপাতটা খুব সুচক্ষে দেখিবেন না। বালি দ্বীপের হিন্দুগণ তাঁহাদের দেশে অযোধ্যা, সরযূ, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি সমস্ত স্থানই দেখাইয়া থাকেন। এ দেশের ইতিহাসকেও ব্রাহ্মণগণ মহাভারতোক্ত তীর্থে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধেতিহাস মুছিয়া ফেলিয়া ছিলেন। যাহা হউক এই অধ্যায়ে যে সকল কথা লিখিত হইল তাহা হইতে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, মহাভারতের যুগে আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ সার্ব্বভৌম নৃপতিদের নিবাসভূমি ছিল। শিশুপালকে বাদ দিলেও জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, নরক, ভগদত্ত প্রভৃতি রাজারা আর্য্যাবর্ত্তের যে কোন নৃপতি হইতে শৌর্য্য, বীর্য্য ও ক্ষমতায় ন্যূন ছিলেন না; ইঁহারা এই দেশের প্রাচীন যুগের গৌরব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিদ্বেষ

নানাদেশের প্রভাবে মতের স্বাধীনতা

কেশবেন কৃতং কর্ম্ম জরাসন্ধবধে তদা।
ভীমসেনার্জ্জুনাভ্যাঞ্চ কস্তং সাধ্বিতিমন্যতে।
অদ্বারেণ প্রবিষ্টেন ছদ্মনা ব্রহ্মবাদিনা॥
দৃষ্টঃ প্রভাবঃ কৃষ্ণেন জরাসন্ধস্য ভূপতেঃ॥

—মহাভারত, সভা, ৪১ অঃ, ২।৩।

পুরাকালে পূর্ব্বভারতের রাজারা অধিকাংশই শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ-বিদ্বেষী এবং কিরাত, মেচ, কুকি, চাক্‌মা, হাজাং, খস্ প্রভৃতি জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন; শিব অনুচরগণের বিকৃত দেহ ও অদ্ভুত মুখ কল্পনা করিবার কারণ ইহাও হইতে পারে। প্রাচীন শৈব ধর্ম্ম এ দেশে বদ্ধমূল ছিল। শিবের সঙ্গে এ দেশের রাজারা নানাভাবে আত্মীয়তা কল্পনা করিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন। এই দেশে এককালে স্বয়ম্ভুই সম্রাট্ ছিলেন। ত্রিপুররাজ্যের ত্রিলোচন এবং কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ শিবের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। হরিবংশে লিখিত আছে মহারাজ বাণকে শিব এত ভালবাসিতেন যে স্বীয় পুত্র কার্ত্তিকেয় হইতে তাঁহার আবদার বেশী রাখিতেন; বাণ-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ—সর্ব্বপ্রকার শিবলিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বাণলিঙ্গ নামে অভিহিত। কোচদের সঙ্গে নানারূপ শিবলীলা উপকথার বিষয়ীভূত হইয়া আছে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এ সম্বন্ধে নানা কাহিনী বর্ণিত আছে। পার্ব্বত্য জাতিদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেশামেশি, যজ্ঞ-বিদ্বেষ ও কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা ইত্যাদি কারণে পূর্ব্বদেশের রাজারা ক্ষত্রিয় হইয়াও 'দানব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ, বাণ, ভগদত্ত, নরক ও মুর প্রভৃতি রাজারা ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও দানব নামে পরিচিত। ইহারা যে আর্য্য-সমাজভুক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক সাহিত্যে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বদেশীয় রাজারা অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম-ভারতীয়, চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় ও যদুকুলের রাজাদের সঙ্গে ইহাদের কুটুম্বিতা ছিল। জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে মথুরারাজ কংস এবং বাণের কন্যা উষাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষের জন্য ক্ষত্রিয়পুঙ্গব কংস 'দানব'

শৈব প্রভাব।

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়দেবকৃত কৃষ্ণশ্লোকে তাঁহাকে "কংসদানবঘাতন" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শৈব রাজাদের অনেকেই যজ্ঞে পশুবলির প্রতিবাদী ছিলেন। নরকের বিরুদ্ধে ইহাই প্রধান অভিযোগ ছিল। স্বয়ং শিব দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন। সমস্ত বাঙ্গলাদেশ এক সময়ে কৃষ্ণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধবাদী ছিল। দেশ ব্যাপিয়া সেই সময়ে ভোলানাথের ধ্বজা উড়িতেছিল; কৃষ্ণ-সমাশ্রিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এদেশে সে যুগে সমাদৃত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে যজ্ঞ-নিষেধকারী, সাম্য-প্রচারক, করুণাখনি বুদ্ধদেবকে শিব তাঁহার সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বহুযুগ পরে যখন এ দেশ কৃষ্ণকে স্বীকার করিল, তখন তাঁহাকে শঙ্খচক্রগদা ছাড়িয়া এ দেশের মাটিতে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালী তাঁহার হাতে একটি বাঁশী দিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। এ দেশ কখনই ঐশ্বর্য্যকে গণ্য করে নাই; বল দিয়া এ দেশ কখনই জয় করা যায় নাই; বাঁশীর সুরে—প্রেমের আহ্বানে বাঙ্গালী চিরকাল সাড়া দিয়াছে।

জরাসন্ধের চরিত্রে বৃহৎ বঙ্গের ক্ষাত্রনীতি অতি উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণের নীতি ও জরাসন্ধের নীতি দুই ভিন্ন সামগ্রী। ইন্দ্রপ্রস্থের নীতি "মারি অরি, পারি যে কৌশলে।" কৃষ্ণ ধর্ম্মাবতার সাধুচরিত্র যুধিষ্ঠিরের মুখে মিথ্যাকথা কহাইয়া গুরুবধ করাইয়াছিলেন; ক্ষাত্র-নীতি উল্লঙ্ঘন করিবার ইঙ্গিত দিয়া অন্যায় ভাবে ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের হত্যা ঘটাইয়াছিলেন; ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন; ছদ্মবেশে গিরিব্রজপুরে প্রবেশপূর্ব্বক উপবাসী জরাসন্ধের এবং কৌশলে দিবাবসানের চাতুরী খেলিয়া জয়দ্রথের হত্যার কারণ হইয়াছিলেন।

এগুলি মহাভারতের উপকথা মাত্র। কিন্তু পূর্ব্বভারতের যাহা কিছু কাব্যকথা ও গল্প তাহাদের সকলের মূলে সনাতনধর্ম্মাশ্রিত মহানীতির পরিচয় জাজ্বল্যমান। মহাভারতেও জরাসন্ধের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব।

জরাসন্ধের ক্ষাত্রনীতি।

যুগে যুগে রাজনৈতিক আদর্শ ও ক্ষাত্রধর্ম্মের মূলভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমুদ্র যেমন তাহার সিকতাভূমি লঙ্ঘন করে না,—মহারাজ জরাসন্ধ তদ্রূপ সেই যুগে আচরিত ক্ষাত্রনীতি উল্লঙ্ঘন করেন নাই। প্রথমতঃ জরাসন্ধ যদুবংশীয়দের প্রবল প্রতাপ সম্বন্ধে সমস্ত বিদিত হইয়াও স্বয়ং যুদ্ধকামী বা সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির ইচ্ছুক হইয়া বিনাকারণে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই। এমন কি যখন কৃষ্ণ জরাসন্ধ-জামাতা কংসকে নিধন করেন—তখনও মগধ-সম্রাট্ দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যত হন নাই। কিন্তু যখন তাঁহার প্রিয় কন্যা অস্তি তাঁহাকে স্বীয় স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ লইতে ক্রমাগত উত্তেজিত করিয়া করুণ আর্ত্তনাদে রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিয়া তুলিলেন, তখন তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। প্রথম অভিযানে যদুবীরেরা তাঁহার অসামান্য শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল; কিন্তু অস্তি তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেন নাই, ক্রমাগত উস্কাইয়া পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া জরাসন্ধের সামরিক অভিযানগুলির ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন যে ভাবে যাইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন, তাহা নীতিবিগর্হিত। তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গুপ্তদ্বার দিয়া মগধ রাজধানীতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা গুপ্তভাবে জরাসন্ধের বিশ্ববিশ্রুত ভেরীত্রয় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত চৈত্যশৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। জরাসন্ধ অতি বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগের আতিথ্যসৎকার করিতে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। তাই বলিয়া জরাসন্ধ যে তাঁহাদের কার্য্যাবলীর খবর রাখিতেন না, তাহা নহে। গুপ্ত চরের মুখে তাঁহাদের প্রবেশ অবধি চৈত্য ও ভেরী-ভঙ্গের সমস্ত খবরই তিনি জানিতেন; কিন্তু আতিথ্য-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার জন্য তিনি গৃহাগত স্নাতক ব্রাহ্মণবেশীদিগের প্রতি কিছুমাত্র প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। কৃষ্ণ যখন বলিলেন, "আমরা তোমার শত্রু," তখন ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের করায়ত্তে পাইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। সেই অদ্বিতীয় বীরসম্রাট্ বিনীত ও শান্তভাবে বলিলেন, "কই, আমি ত আপনাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" এরূপ সংযতেন্দ্রিয় বিনয়ান্বিত পুরুষকে শুধু ক্ষাত্রবীর বলিয়া নহে—একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ নীতিমান্ পুরুষ বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবগণের সহিত মগধে যাত্রা করেন তখন তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল,—এইভাবে গোপনে জরাসন্ধকে হত্যা করিতে পারিলেও "তাঁহার অন্যান্য স্বপক্ষগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা নিহত হইতে পারেন।"

কিন্তু যখন কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন—তখন জরাসন্ধ স্বীয় সৈন্যগণ দ্বারা বা তাঁহার বিশ্বজয়ী সেনাপতিদিগের দ্বারা তাঁহাদের বধ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন না।

জরাসন্ধের অপূর্ব্ব সংযম।

কৃষ্ণকে তিনি 'দাস' বলিয়া ঘৃণা করিতেন—(মহা, সভা, ৪১ অঃ ১ম শ্লোক), তাই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। অর্জ্জুনাপেক্ষা ভীমকেই সমধিক দৈহিক বলসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকেই তাঁহার কথঞ্চিৎ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনোনীত করিলেন। তখন মহারাজ জরাসন্ধ কোন ব্রত পালন করিয়া উপবাসী ও পরিশ্রান্ত ছিলেন, এই অবস্থায় তিনি ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি তৎপুত্র সহদেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন; যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বৈদ্য নানারূপ প্রলেপ ও ঔষধ লইয়া উপস্থিত রহিলেন, ইহাই তাৎকালিক দ্বৈরথ যুদ্ধের নীতি ছিল। জরাসন্ধের আত্মীয় সুহৃৎ ও অসংখ্য সৈন্য তামাসগীরের মত কুতূহলী হইয়া সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত রহিলেন। জরাসন্ধ অক্ষরে অক্ষরে ক্ষাত্রনীতি পালন করিয়াছিলেন। কত বড় সংযম তাঁহার ছিল যে উপবাসক্লিষ্ট শরীরে—বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সামন্ত-রাজগণ-পরিবৃত থাকিয়াও—সমস্ত সুবিধা তৃণবৎ উপেক্ষাপূর্ব্বক স্বীয় প্রাসাদে, স্বগণের মধ্যে, নিরাশ্রয় অবস্থায় কুটচক্রী শত্রুগণের যুদ্ধের আহ্বান এইভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনজন যোদ্ধার মধ্যে যাঁহাকে দৈহিক বলে ও পদমর্য্যাদায় যোগ্যতম মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকেই স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন! এহেন অকুতোভয় ক্ষাত্রনীতির সাক্ষাৎ আদর্শস্বরূপ। বীরবরের উপবাস ও ব্রতধারণের কথা জানিয়াও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তদ্দত্ত সমস্ত সুবিধা দ্বিধাশূন্যভাবে অম্লানচিত্তে গ্রহণ করিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। জরাসন্ধের

চরিত্রে সম্রাটের যোগ্য শৌর্য্যবীর্য্যের সঙ্গে সংযমের অপূর্ব্ব মহিমা মিশিয়া গিয়াছিল ; তিনি তাঁহার কপটাচারী শত্রুদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় শিশুপালের ন্যায় অসংযত ক্রোধ বা অপভাষা ব্যবহার করেন নাই। ইঁহারই সিংহাসন উত্তরকালে মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ ও তাহার উত্তর।

কৃষ্ণ মগধরাজের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, জরাসন্ধ তাহাদের সকলগুলিরই নিরাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ—যাহা আমরাও প্রতিবাদ করিতে দ্বিধা বোধ করি—তাহা তাঁহার মহাদেব মন্দিরে একশত রাজাকে বলি দেওয়ার সংকল্প।

এই নিষ্ঠুর ও বর্ব্বরজনোচিত ব্যবহার সমর্থন করা যায় না। কিন্তু জরাসন্ধ এই অভিযোগের উত্তরে কি বলিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য :—"হে কৃষ্ণ! আমি কোন রাজাকেই জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই। বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক লোককে আপনার বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।" সুতরাং দেখা যাইতেছে এই ৮৪জন রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, তিনি বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জরাসন্ধ সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রতীক ছিলেন। এই ক্ষাত্রনীতিরক্ষাকল্পে তিনি শত্রুদিগকে করায়ত্তে পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি অলৌকিক মর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন এবং ত্রয়োদশ দিবস দিনরাত্র অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ভীমহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সেই যুগের রাজনীতির আদর্শ ভিন্নরূপ ছিল ; কিন্তু তাহা যাহাই থাকুক না কেন, তিনি তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। বন্দী রাজগণ সম্পর্কে তিনি কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "আমি ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী, দেবপূজার জন্য রাজগণকে আনিয়াছি, এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিব?" (মহাভারত, সভা, ২২ অঃ।)

ক্ষাত্রশক্তির বিলোপ।

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশের এই সকল রাজগণের প্রায় সকলেই কৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন, এই জন্যই কৃষ্ণ-সমাশ্রিত নব ব্রাহ্মণসমাজ ইঁহাদিগকে রাক্ষস ও দানব বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না, নিজেরাই ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেন; পৌণ্ড্র বাসুদেব "শঙ্খচক্রগদাধর" বলিয়া নিজেকে অভিহিত করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার শার্ঙ্গ ধনু, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও কৌমোদকী গদার অনুশাসন মানিত না, তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিতেন। নরক, মুর, ভগদত্ত, বাণ প্রভৃতি রাজারা চিরকাল কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণকে কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া উত্তরপশ্চিমে যে নূতন হিন্দুসমাজ গঠন করিতেছিলেন—পূর্ব্বদেশের সার্ব্বভৌম রাজারা তাহার ঘোরতর বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। মহাভারত, রামায়ণ এই দুই হিন্দুসমাজের সর্ব্বজনাদৃত গ্রন্থে ধর্ম্মসমন্বয়ের একটা চেষ্টা আছে ; কিন্তু যে আকারে আমরা এই দুই পুস্তক পাইতেছি—তাহা সমধিক পরিমাণে কৃষ্ণের মহিমদ্যোতক।

আর্য্যাবর্ত্তের এই অংশে পরবর্ত্তী কালে ক্ষত্রিয়শক্তি একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল। পুরাণে নন্দবংশ শূদ্রকুলজাত বলিয়া বর্ণিত আছে। এই বংশের স্থাপয়িতার সহিত পুরাণকার পরশুরামের উপমা দিয়া তাঁহাকে ক্ষাত্রকুলান্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৌর্য্যদের শূদ্রত্বও সর্ব্বজনস্বীকৃত। পরশুরামের পর কুরুক্ষেত্রে এবং তৎপরে নন্দদের দ্বারা ক্ষাত্রশক্তি বিশেষরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। এই যুগে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যজ্ঞাদি বিলুপ্ত হয়। যাহারা যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইত, তাহারা দানব, রাক্ষস প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখা যায় মৌর্য্যদিগকে দানবদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা হইয়াছে।*

জৈন ও বৌদ্ধদিগের অধিকারকালে প্রাণিহিংসামূলক যজ্ঞাদি বহুপরিমাণে লুপ্ত হয়। আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ পূর্ব্ব হইতে নব ব্রাহ্মণ্য-নেতা কৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিল। এখানে কৃষ্ণবিরোধী দলের চেষ্টায় যজ্ঞাগ্নি বহুকালের জন্য একরূপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। এখানে নানাদেশীয় লোকের যতটা সমাগম ও মিশ্রণ হইয়াছিল - বোধ হয় ভারতের আর কোন দেশে ততটা হয় নাই। বাঙ্গালী বহুপূর্ব্ব হইতে সমুদ্রে যাতায়াত ভালবাসিতেন; সমুদ্র-তীরবর্ত্তী তমলুক এবং পূর্ব্ববঙ্গে অধুনা-বিলুপ্ত কপিলাশ্রম প্রভৃতি স্থান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চাম্পা, কম্বোজ, টংকিং, আনাম, জাবা, সুমিত্রা প্রভৃতি দেশের নানা মন্দির-গাত্রের ক্ষোদিত লিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশের লোক সমুদ্রে যাতায়াতে অতীব দক্ষ ছিলেন। বাঙ্গালীরা খৃষ্ট জন্মিবার বহুপূর্ব্বে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সমুদ্রপথে চীনদেশে গমনাগমন করিতেন। কথিত আছে, চীনদেশে উপনিবিষ্ট হিন্দুগণ চীনপতির সাহায্যে একদা ২,৮০০ নৌসেনা ও কতকগুলি রণতরী দিয়াছিলেন—ইহা খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা। (বাঙ্গালীর বল, ২ পৃঃ, এবং J. R. A. S, 1896; Article by G. Phillip.) খৃষ্ট জন্মিবার কিছু পরে বাঙ্গালীরা মাটাবান-তীরে উপনিবেশ-স্থাপনপূর্ব্বক তথায় 'সদ্ধর্ম্ম' নামক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে পূর্ব্বদেশীয় রাজাদের নৌবলের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

সুতরাং শুধু নিকটবর্ত্তী পাহাড়িয়া জাতিদের সঙ্গে নহে, বাঙ্গালী সনাতনকাল হইতে বিভিন্ন জাতিদের সংস্পর্শে বিশেষভাবে আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাম্রলিপ্তির লোকেরাই আরও দক্ষিণ দেশে যাইয়া তামিলরূপে গণ্য হইয়াছে। তামিল ও তেলেগু জাতির সঙ্গে যে এককালে এদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামের শ্যানজাতি, ব্রহ্মদেশের কিরাত ও চীনদেশবাসিগণ এদেশের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকেদের মধ্যে অধুনা মস্ত বড় একটা বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর তোলা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসীদের সঙ্গে আহারাদি চলে না, অথচ কোন কোন জাতি—যথা, সূত্রধর প্রভৃতি,—তাহাদের ব্যবসায়ে অপরিচ্ছন্নতার কিছুই নাই তথাপি সমাজ তাহাদিগকে ঠেকাইয়া

* "কালকা দৌহৃ‌তা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।" চণ্ডী, অষ্টম মাহাত্ম্যম্।

রাখিয়াছে,- একজাতীয় লোক হইলে এতটা বিচ্ছিন্নতা কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। কোন কোন সময়ে রাজ-নির্য্যাতনে অথবা রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের কালে শ্রেণী-বিশেষ অপদস্থ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ বিদেশাগত ভিন্নজাতির বংশধরগণকে হিন্দুসমাজে নিজেদের নিম্নস্তরে একটু জায়গা দিয়া তাঁহাদিগকে কতকটা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অধিকাংশ স্থলে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, এদেশ ব্রাহ্মণ্য প্রভাব হইতে অনেকাংশে বিমুক্ত হইয়া দূরদেশসমূহের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের ফলে চিন্তাজগতে কতকটা স্বাধীনতা পাইয়াছিল। এ দেশে কোন দিনই পরের অত্যাচার এবং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের কঠোরতা সহ্য করিতে পারে নাই। গঙ্গা যেরূপ চিরচঞ্চল, পদ্মানদীর তীর যেরূপ সতত ভঙ্গশীল—এদেশের চিন্তা ও সামাজিক গঠন তেমনই অবিরাম গতিশীল। কৃষ্ণ-বিদ্বেষীদের ধ্বজার নিম্নে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল—কিন্তু সেই ধর্ম্ম দুইটিও বেশীদিন এখানে স্থায়ী হয় নাই, তারপর পুনরায় নব ব্রাহ্মণ্যের ছটা এদেশকে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। এদেশের লোকেরা যখন যে ভাবটি ধরিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। পৌণ্ড্র বাসুদেব যে অঞ্চলে কৃষ্ণ-বিদ্বেষের চূড়ান্ত অভিনয় করিয়াছিলেন—তাহার বহুযুগ পরে কে জানিত সেই দেশের মৃত্তিকায়, সেই গঙ্গার উপকূলে, কৃষ্ণ নামের মহিমায় লোকে এমনভাবে মাতিয়া উঠিবে! আমিই 'একমাত্র শঙ্খচক্রগদাধর' বলিয়া পৌণ্ড্রক গর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কে জানিত সেই দেশে কৃষ্ণের কীর্ত্তিকথা এরূপ ভাবে প্রচারিত হইবে?

জৈনেরা জীবে দয়ার অভিনয়ের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একদল মাথায় ময়ূরপুচ্ছ লইয়া চলাফেরা করিতেন। পাছে তাঁহাদের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া কোন ক্ষুদ্র কীট নিহত হয়, এই ভয়ে তাঁহারা সেই ময়ূরপুচ্ছ দিয়া পথ ঝাড়িতে ঝাড়িতে অগ্রসর হইতেন। তাঁহাদের একশ্রেণী প্রতিদিন পিপীলিকাকে নিয়মিত ভাবে শর্করা প্রদান করেন এবং অন্য একদল বাড়াবাড়ি করিয়া এখনও নগ্ন গাত্রে ছারপোকা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দেহের রক্তদ্বারা তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া থাকেন। এক সময়ে স্বয়ং পার্শ্বনাথ এই দেশে বহুবৎসর জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং এদেশে—বিশেষ সুন্দরবন বিক্রমপুর এবং মানভূম অঞ্চলে—বহু লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। বহু বঙ্গ-পল্লী হইতে তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—এই ধর্ম্ম তৎকালে কতটা ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। জয়নগর-মজিলপুর-নিবাসী স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধারকল্পে নিবেদিতজীবন শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন, তাঁহার নিবাসপল্লী হইতে ৬।৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী করঞ্জলী গ্রামে সম্প্রতি একটা পুষ্করিণী-খননকালে প্রায় ৬ফিট্ উচ্চ এক বিশাল কাল-পাথরের জৈনদিগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত পার্শ্বনাথমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কালিদাসবাবু লিখিয়াছেন, "এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি আমি ইতিপূর্ব্বে অন্য কোথায়ও দেখি নাই।" যথাস্থানে ইহার ছবি দেওয়া

জৈন প্রভাব।

গেল। শিবি যে মহাত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই একটা উপগল্প মাত্র, বৌদ্ধজাতকে বুদ্ধ একজন্মে একটা বুভুক্ষু ব্যাঘ্র ও তাহার শাবকদ্বয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজের দেহ দান করিয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন—এরূপ একটা উপাখ্যান আছে; ইহাও অবশ্য একটি উপগল্পমাত্র। কিন্তু আমাদের দেশে ত্যাগ ও দয়াধর্ম্মের যে কি অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়াছে তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। শিবি উপাখ্যান, দাতাকর্ণ উপাখ্যান প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে যে অতিরঞ্জন আছে, তাহা একটু মুছিয়া ফেলিলেই ধরা পড়িবে যে, ঐ সকল কবি-কল্পনার অভ্যন্তরে সত্যের অস্থিকঙ্কাল রহিয়া গিয়াছে। ইহারা আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় নিছক কল্পনাপ্রসূত নহে। এখনও বাঙ্গালী বৈষ্ণবের ঘরে রক্তের নাম করিতে নাই—'কাটা' কথা তাঁহাদের অভিধানে নাই, তরকারী কোটা বা কাটাকে তাঁহারা 'বানান' বলেন। জীবে দয়ার নীতিকথা সেই আদি কাল হইতে এদেশে এমনই ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। দয়া, প্রীতি, ত্যাগ—এই সকল গুণের আদর সম্ভব-অসম্ভব গল্পচ্ছলে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। পুরাণকারগণ, কথক ও কীর্ত্তনীয়ারা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নানা উপাখ্যান দ্বারা ত্যাগ-ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা এক সময়ে বণিক্-শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বণিকেরা বেদোক্ত পণিজাতি, ইঁহারা গরু হইতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি পাইতেন, কৃষিকার্য্যে দক্ষ ছিলেন। ইঁহারাই পশুবলির বিরোধী ছিলেন। বেদের সময় হইতেই আর্য্যদের সঙ্গে ইঁহাদের শত্রুতা চলিয়াছিল। এই নিরীহ পণিজাতি সংখ্যায় প্রবল ছিলেন এবং উত্তরকালে ইঁহারাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্ষেত্র সুপ্রসারিত করিয়া যজ্ঞ-বিরোধী হইয়াছিলেন।

উপগল্পগুলি নিছক গল্প নহে।

নানা দেশের সভ্যতা, নানা ভাব ও নানা ধর্ম্মের প্রবাহ এ দেশে আসিয়া শতস্রোতা গঙ্গার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার সাগরসঙ্গমে মিশিয়া গিয়াছে। এজন্য বাঙ্গালী যাহা আজ ভাবিবে, তাহা ভারতবর্ষের অন্যত্র কাল কি পরশ্ব ভাবিবে। বাঙ্গালী জাতি সর্ব্বদাই চিন্তার নেতা। তাঁহারা একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার মানুষ নহেন। বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণ্য ও জাতিভেদ মাত্র কয়েক শতাব্দীর জন্য তাঁহাদিগকে অচলায়তনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানে যে বিশৃঙ্খলতা, যে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মমূলক অত্যাচার এদেশে প্রবল ঝড়ের মত প্রবাহিত হইতেছিল—যাহাতে বাঙ্গলার কুঁড়েঘরগুলি হয়ত বা উড়িয়া যাইত—তাহা হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-গুরুগণ অত কড়া ও শক্ত নিয়মের দড়ি দিয়া কুটিরগুলি বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা সে বাঁধন বেশীদিন মানিয়া চলিবার দেশ নহে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের আন্দোলনে সেই কুটিরের ভিতে খুব জোরে নাড়া পড়িয়াছিল। অধুনা আর একটা বিপ্লবের যুগ আসিয়াছে। বাঙ্গালী যুগে যুগে কিরূপ চিন্তাশীলতা ও গঠনমূলক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, তাহাই আমরা ঐতিহাসিক অধ্যায়ে ক্রমে ক্রমে দেখাইব।

বার বার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নব ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম

"গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ"

পৌরাণিক যুগের কল্পনার কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া যে সত্যের আলোটুকু আসিয়াছে তাহাতে বৃহৎ বঙ্গের মানচিত্রকে খুব উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছে। অপিচ আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ-সমাশ্রিত যে আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতে ব্রাহ্মণকে দেবতা হইতেও উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছিল। এই গৌরব ও পূজার প্রধান পতাকাবাহী ও পুরোহিত ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ব্বকালের অর্থাৎ বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণ ছিলেন অন্যরূপ। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-রক্তের উপর ততটা জোর দেন নাই। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইত এবং প্রধানতঃ বৃত্তিই জাতি-নির্দ্দেশক ছিল। যে কোন জাতির লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এমন কি কোন কোন মহর্ষি গণিকাজাত ছিলেন। সত্যকাম ও নারদের মাতার স্থান এই পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, মহাভারতের প্রমাণ।

কিন্তু মহাভারতের যুগের পর হইতে ব্রাহ্মণগণ যে ক্ষমতা পাইলেন, তাহা তাঁহাদিগের অপ্রতিদ্বন্দ্বি শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ভাবে প্রতিপন্ন করিল। বঙ্গদেশের রাজারা, এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষের রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন; অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্রাট্‌গণও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে ব্রাহ্মণকে স্বর্গমর্ত্ত্যের সর্ব্বোচ্চস্থানে যে ভাবে আসীন করা হইয়াছে, পূর্ব্ব-ভারতবাসিগণ প্রথমতঃ তাহা স্বীকার করেন নাই। মহাভারতে যজ্ঞাদির যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও ফলশ্রুতি আছে এবং বিশেষ করিয়া অনুশাসন-পর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপের যে সকল উপগল্প লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রভাব প্রথমতঃ এদেশ স্বীকার করে নাই। মহাভারতকার লিখিয়াছেন—ব্রাহ্মণের সেবা করিলে ইহলোকে ও পরলোকে এমন কোন অভীপ্সিত সামগ্রী নাই, যাহা মানুষে না পাইতে পারে। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম জোর দিয়া বলিল 'কাহাকেও কিছু দিবার ক্ষমতা অপরের নাই। কর্ম্মই লোকের অদৃষ্ট নির্ম্মাণ করে এবং কর্ম্মই সর্ব্বফলপ্রসূ।'

ব্রাহ্মণ "অগ্নিশিখা" ও "একমাত্র উপাস্য।"

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ব্রাহ্মণসম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাবাদ আছে তাহার কিছু নমুনা আমরা নিম্নে দিতেছি। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 'ফলতঃ ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, আমি ব্রাহ্মণগণের দাস। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতিই পরমধর্ম্ম, পতিই দেবতা ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও পরমগতি (অষ্টম অধ্যায়)। অরণ্যমধ্যে

অগ্নিশিখা যেরূপ সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে সমুদায় ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন। উঁহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই। ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য। **উঁহারা দেবতাকে অপদেবতা ও অপদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন।** মুষ্টিদ্বারা বায়ুগ্রহণ ও হস্তদ্বারা চন্দ্রস্পর্শ ও পৃথিবীধারণ করা যেরূপ, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন" (৩৩ অধ্যায়)।

ব্রাহ্মণেরা দেবতাকে উপদেবতা ও উপদেবতাকে দেবতা করিতে পারেন।

সাতাইশ নক্ষত্রের কোন্ কোন্‌টিতে ব্রাহ্মণকে কি কি খাওয়াইলে বা দিলে স্বর্গলাভ হয়, ৬৪ অধ্যায়ে তাহার একটা দীর্ঘ তালিকা আছে,—যথা কৃত্তিকায় ঘৃত, পায়স; রোহিণী নক্ষত্রে মৃগমাংস, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি; মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎস ধেনুদান; আর্দ্রায় তিলমিশ্রিত কেশর; পুনর্ব্বসুতে পিষ্টক ও অন্ন; পুষ্যায় সুবর্ণদান; অশ্লেষায় রজত ও বৃষদান; মঘায় তিলসংযুক্ত সরাব ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে দাতাদিগকে নানারূপ লোভ দেখান হইয়াছে, যথা—"চিত্রা নক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অপ্সরাদের সঙ্গে নন্দনকাননে বিহার করিতে পারা যায়।" এই অগণিত দানদ্রব্যের মধ্যে রাজকীয় বিলাস সামগ্রীর অভাব নাই, যথা—হাতী, রথ, কম্বল, শ্বেতবর্ণমাল, মেষমাংস এবং অগুরু-চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। যে যে বিখ্যাত পুরুষেরা ব্রাহ্মণদিগের এবংবিধ দান করিয়া স্বর্গের সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াছেন, ৭৭ অধ্যায়ে তাঁহাদের নামের এক দীর্ঘ তালিকা আছে; আমরা সহিষ্ণু পাঠকবর্গের ঘাড়ে সেই মুষল চাপাইব না; এমন কি স্বীয় পরিণীতা ভার্য্যাকেও ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কোন রাজা প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপের আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব—"ব্রাহ্মণদিগের শাপ-প্রভাবেই সাগরের জল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে, উঁহাদের কোপানল দণ্ডকারণ্যে এখনও প্রশমিত হয় নাই। উঁহারা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ, প্রমাণের প্রমাণ। উঁহাদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেই পূজার যোগ্য। **যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য, তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউন বা মূর্খ হউন—তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা বিধেয়। অগ্নি সংস্কৃতই হউন বা অসংস্কৃতই হউন, তাঁহার দেবত্ব কিছুতেই লুপ্ত হয় না। যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হন না, প্রত্যুত যজ্ঞগৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জানিয়া সমাদর করিবে"** (১৪১ অধ্যায়)। "ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্-সমূহ ব্রাহ্মণ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন" (৩৪ অধ্যায়)।

পরশুরামের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বড় কি ক্ষত্রিয় বড় সমাজে একবার এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। পালি "অম্বঠ্‌ঠসুত্ত" নামক পুস্তকে দেখা যায়, বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়দিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বেই একবিংশবার যুদ্ধ করিয়া পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন; কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনও পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হওয়ার পর মহানন্দ প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে নিরস্ত হইয়া অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অনেকে কিরূপ দীনভাবে ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে।

ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব ও ব্রাহ্মণ্য-জাতিভেদের কড়াকড়ি ভারতে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এই ব্রাহ্মণ-শিক্ষাদীক্ষার ভিত্তিভূমি মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বের দশম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে: "হীন জাতিকে উপদেশ দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।" "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইঁহারা পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন কখনই ভোজন করিবেন না" (১৩৪ অধ্যায়)। বৈশ্যের অন্ন-সম্বন্ধেও কতকগুলি নিষেধ-বিধি আছে। এ দিকে যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসক, অস্ত্রজীবী, পুরাধ্যক্ষ, দেবল ও দৈবজ্ঞ তাঁহাদিগকেও শূদ্রের পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। যাঁহারা বেতন লইয়া অধ্যাপনা করেন—সেইরূপ ব্রাহ্মণেরও অন্ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মনুস্মৃতি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ-রাজ পুষ্যামিত্রের সময়ে ফিরিয়া লেখা হইয়াছিল, তখন তাহাতে উহার বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল; পুষ্যামিত্র মৌর্য্যরাজের সেনাপতি ছিলেন, শেষে স্বপ্রভুকে হত্যা করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। আশ্চর্য্যের কথা—বিষয়-বিরাগের স্থলে ব্রাহ্মণ যে পার্থিব ভোগ-বিলাসের যোগ্য পাত্র, তাহা এই মানব-স্মৃতির নব সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সেনাপতি হইতে পারেন, রাজা হইতে পারেন, ইত্যাদি ব্যবস্থা স্পষ্টরূপে সংশোধিত মনু-স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ-রাজার কার্য্য সমর্থন করিতেছে, "সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ। সর্ব্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্র বিদর্হতি।" (মনু, ১০০)। সমস্ত পৃথিবীর অধিকার ন্যায়তঃ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, এ ভাবের কথাও মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সুঙ্গবংশের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের অপরাধের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণের দণ্ড অতিলঘু করিয়া দেন। শূদ্রদের উপর শাস্তির ব্যবস্থা এই সময়ে কঠোরতম হইয়া দাঁড়ায়, এতদ্দ্বারা সুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের স্বজাতিকে বাড়াইবার প্রবল চেষ্টা ও মৌর্য্যদিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ সূচিত হইতেছে।

খাদ্যাখাদ্যের বিচার।

স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে যে সকল অনুশাসন শাস্ত্রীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও সূত্র মহাভারতেই পাই—"পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরমা গতি। অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না—তিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ফল লাভ করিয়া থাকেন" (১৩৬ অধ্যায়)। এই উক্তির সঙ্গে নারদপঞ্চচূড়া-সংবাদের নানারূপ অযথা কথা মিলাইয়া পড়িলে স্ত্রীলোকদিগের উপর শাস্ত্রীয় কঠোর বিধির কারণ উপলব্ধ হইতে পারে। সম্ভবতঃ সন্ন্যাসের প্রতি

স্ত্রীলোকের বৃক্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য দেখা নিষিদ্ধ। তাঁহাদের সম্বন্ধে অপবাদ।

অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ গার্হস্থ্যের প্রধান আকর্ষণ—স্ত্রীজাতির উপর ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য এই সকল ঘৃণ্য অপবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দুই একখানি বৌদ্ধজাতকে যে সকল ন্যক্কারজনক উপকথা পাওয়া যায়—তাহা নিশ্চয়ই স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের দুশ্ছেদ্য স্বাভাবিক বন্ধন ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইয়াছিল। "দুনিয়া সব বাউরা হোকর ঘর ঘর বাঘিনী পোষে" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক উক্তিও সেই প্রাচীন উদ্দেশ্যমূলক। গৃহীকে গৃহছাড়া করিবার উদ্দেশ্যে গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন গৃহিণীকে এইভাবে নিন্দিত করা হইয়াছে।

মহাভারতে এই যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা আছে, তাহা প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর হিন্দু জনসাধারণের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে এরূপ অদ্ভুত ও অচলা ব্রাহ্মণভক্তির লীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত জাতির জন্য দীক্ষার দ্বার খুলিয়া দিলেন—যজ্ঞধর্ম্মের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন, তাহারও দ্বিসহস্র বৎসর পরে চৈতন্য "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ" সাম্যের এই মহাবাণী প্রচার করিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ যুগ হইতে এই সকল ধর্ম্মগুরুগণের সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কথঞ্চিত অস্বীকৃত হইলেও তাঁহাদের জন্য একটা শ্রদ্ধার আসন সর্ব্বত্রই নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধুনা ব্রাহ্মধর্ম্ম সেটুকুও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি কি অমোঘ বিশ্বাস—কি অচলা ভক্তি হিন্দুসমাজের অস্থিপঞ্জরে প্রবেশ করিয়া আছে। এখনও জনসাধারণের মধ্যে সে বিশ্বাস কতক পরিমাণে অনড় হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোক কাহারও মুখ দেখিতে পারিবে না, মহাভারতীয় এই নীতির খুব বাড়াবাড়ি অভিনয় হইয়াছে। স্বর্গীয়া রাসমণির জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে, তিনি স্বামীর ঘোড়াটা দেখিয়া লজ্জায় একহাত ঘোমটা টানিয়া দিয়া তথা হইতে পলাইয়া গিয়াছিলেন। ইহা গল্প-গুজব নহে, সত্যকার ঘটনা, রাসমণি স্বয়ং লিখিয়াছেন। (রাসমণির জীবনী দ্রষ্টব্য।) অবশ্য গাছ দেখিয়া লজ্জা পাওয়ার উদাহরণ এখনও আমরা পাই নাই। প্রচলিত "অসূর্য্যম্পশ্যা" কথাটাতে সূর্য্যের দৃষ্টি হইতেও মেয়েদের আত্মরক্ষার ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি। জাতিভেদ এবং অন্নভোজনের যে কড়াকড়ি এদেশে হইয়াছে তাহাতে মনে হয়,—সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব হাঁড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নৈষ্ঠিক হিন্দু রন্ধনশালায় সতর্ক পাহারা দেওয়াই পরম ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন। মহাভারতকার বলিয়াছেন, "শূদ্রান্ন, শিল্পী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিতসদৃশ" (অনুশাসন, ১৩৫ অধ্যায়)।

উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নিরস্ত করিয়া যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম শির উত্তোলন করিয়াছিল, তাহা এই সকল উপদেশ মূলধনের ন্যায় বিশেষ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সেই নবগঠিত সমাজের এই সূত্রগুলি ছিল ভিত্তিস্বরূপ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি হিন্দুদর্শনে পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান অনেক স্থলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মহাভারত ব্রাহ্মণদিগের মাহাত্ম্যের অতিশয়োক্তি ও যজ্ঞের সমর্থন করিয়াও 'জীবে দয়া' নীতির কথা ভুলিয়া যান নাই। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে দেখিতে পাই, "মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া

জ্ঞান করা উচিত। যখন সিদ্ধিকাম জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান, তখন মাংসাশী দুরাত্মগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে রাক্ষস বলা যাইতে পারে। যাঁহারা মাংসাহারে বিরত, তাঁহাদের দুর্গম অরণ্যে, দুর্গ বা চত্বরে বা উদ্যত-শস্ত্র ব্যক্তি বা সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তু হইতে কোন ভয়ের কারণ থাকে না। এবংবিধ ব্যক্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বভূত-শরণ্য, বিশ্বাসজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। যদি কেহই মাংসভোজী না হয়, তবে পশুহত্যা এককালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংসভোজীর জন্য জীবহত্যা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অপর কর্ত্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারীর তুল্যফল ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার জন্য ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়...... যে ব্যক্তি মাংস ভোজনে স্বয়ং বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয় সন্দেহ নাই" (অনুশাসন পর্ব্ব, ১১৫ অধ্যায়)। শেষোক্ত বিধান পাঠ করিয়া আমাদের দেশের বিধবাদিগের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তাঁহারা নিজেদের স্বজনবর্গকে উৎকৃষ্ট মাছের মুড়া বা পেটি খাওয়াইবার জন্য কত অনুনয়-বিনয় করেন, তাহা সকলেই জানেন। নিজেরা যে সুখে বঞ্চিত, আপনার জনকে সেই সুখভোগ করিতে দেখিলে তাঁহাদের পরোক্ষভাবে কতকটা তৃপ্তি ঘটিতে পারে। কিন্তু মহাভারতের মতে এই মাংসাহার-বিরতা মহিলাদিগের জন্যও নরকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, মহাভারতে জীবের প্রতি দয়ার যে সূত্র প্রচারিত হইয়াছে—তীর্থঙ্করগণ, স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক তদপেক্ষা নূতন কথা কিছু বলেন নাই। আমাদের অধিকার-বিস্তৃতির সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের ভীষণ অরণ্যানী কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহা বাসযোগ্য জনপদে পরিণত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, হিংস্র জন্তুদিগকে নিঃশেষ করিবার দরকার ঘটিয়াছিল। মূলতঃ এই অভিপ্রায়ে আর্য্যগণ যজ্ঞাবিধি পালন করিতেন, তাহাতে অসংখ্য পশুবলি দেওয়া হইত। অবশ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন বিশাল স্থানে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে কাষ্ঠের জলীয় নির্য্যাস-জাত বাষ্পরাশি আকাশে পরিব্যাপ্ত হইলে পর্জ্জন্যদেবের কৃপালাভ করা সম্ভবপর হয়, এজন্য অনাবৃষ্টি দূর করিবার উদ্দেশ্যেও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু পশুভয়-নিবারণ ও দুর্ভেদ্য জঙ্গল পরিষ্কারপূর্ব্বক তাহা লোকাবাসে পরিণত করাই অনেক যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই পশুহিংসার নির্ম্মমতা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে এতদ্দেশ অরণ্যবহুল ছিল; এজন্য যজ্ঞাগ্নি এ দেশে ঘন ঘন প্রজ্বলিত হইত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শৌর্য্য, বীর্য্য ও শোণিত-পাতের একটা শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। যে সকল দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক অধিকাংশ অনার্য্য ছিলেন, তাঁহারা এই যজ্ঞগুলি খুব সুচক্ষে দেখিতেন না। অনার্য্যগণ প্রায়ই যজ্ঞ বিঘ্ন ঘটাইতেন। তাঁহাদিগকে

রাক্ষস, দানব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। ইঁহারাই উত্তরকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সুবৃহৎ জনসাধারণের মনের ভাবের অভিব্যক্তি স্বরূপ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। সাধারণ জনমত পূর্ব্বেই এই দয়াধর্ম্ম শিখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সেইজন্যই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দুই ধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে এতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল। জীবে দয়ার সূত্র আমরা মহাভারতাদি পুরাণে প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি, উত্তরকালে এই সূত্রগুলির বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কপিলাবস্তু—শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি হইতে মাত্র দেড় শত ক্রোশ পশ্চিমে। ঢাকা হইতে কলিকাতা যতদূর প্রায় ততটুকু ব্যবধান। সুতরাং কপিলাবস্তুকে বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। গয়া, মানভূমি, বুদ্ধদেবের মহাতীর্থ, ও তীর্থঙ্করদের প্রচারক্ষেত্র আমাদের বৃহৎ বঙ্গের অন্তবর্ত্তী; বহুযুগ ধরিয়া এই সমস্ত দেশ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ ছিল। এই জন্যই এ অঞ্চলটা ব্রাহ্মণগণ পরিত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন কিন্তু বৈদিক যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন কালেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি এ দেশে একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। যখন উহা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল, তখন সেন রাজাদের মাতৃকুলের কোন আদি পুরুষ—তিনি সুরবংশীয়ই হউন বা অপর কোন বংশীয়ই হউন—সুদূর পশ্চিম হইতে নব ব্রাহ্মণ্যদীক্ষিত সাগ্নিক যজ্ঞানুষ্ঠানে পারগ ব্রাহ্মণদিগকে এখানে আনিয়া তাঁহাদিগকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এ দেশের ধর্ম্মগুরু ও সমাজগুরুরূপে অধিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। সেই কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া আমরা এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিধান শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। কিন্তু তাঁহাদের অধিকারে যুগে যুগে অনেক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে; এই বিদ্রোহীদলের সর্ব্বজনস্বীকৃত অধিনায়ক ছিলেন সপার্ষদ চৈতন্যদেব। তন্ত্ররত্নাকরে লিখিত আছে,

সর্ব্বপ্রধান বিদ্রোহী চৈতন্য, তাঁহার প্রতি আক্রোশ।

ত্রিপুরাসুর হত হইলে বটুকভৈরব গণদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—ত্রিপুর নিহত হওয়ার পর তাহার সত্তা জগৎ হইতে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল,—না কোন না, কোন প্রকারে বিদ্যমান ছিল। গণদেব উত্তর করিলেন,—ত্রিপুরাসুর হত হইলে তাঁহার রূপ তিনভাবে জগতে দেখা দিয়াছিল—সেই মহাতেজা অসুরের প্রধান অংশ শচীগর্ভে চৈতন্যরূপে প্রকট হইল, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহারা সম্মুখযুদ্ধে শিব-শক্তির বিরুদ্ধতা করিতে অসমর্থ হইয়া মানুষকে হীনবল করিবার জন্য নারীভাবের উপাসনা শিক্ষা দান করিল। "শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে। হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ণ-সজ্জবহন। অংশেনাত্তেন গৌরাখ্য শচীগর্ভে বভূব সঃ। ......ততো দুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ। উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ॥" নব-ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম যাহা আপৎকালের ধর্ম্মের ন্যায় সময়ের প্রয়োজন বুঝিয়া সমুদ্রযাত্রা নিষেধ, স্ত্রীলোকের প্রতি অবিচার এবং প্রবহমাণ স্বাভাবিক ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়া জাতিভেদ ও আহার-সংযমের জন্য শত শত নিষেধবিধি দ্বারা সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে কৃত্রিমতা আনয়ন করিয়াছিল—তদ্বিরুদ্ধে

বাঙ্গালী জাতি পুনঃ পুনঃ সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছে। চৈতন্যদেব প্রাচীন সমাজের প্রধান এবং প্রথম বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ আধুনিক সময়ে রামমোহন রায় ঘোষণা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি গান্ধী-প্রবর্ত্তিত নীতিতে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিত বোধ হয় একেবারে ধ্বসিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী কোন কালেই স্বাধীনতার ডাক অগ্রাহ্য করে নাই। চিন্তার সঙ্কীর্ণতা, কোন ধর্ম্মমতের অস্বাভাবিক অনুজ্ঞা তাহারা বেশী দিন সহ্য করে নাই. জরাসন্ধ, নবক, মুর প্রভৃতির সময় হইতে বৃহৎ বঙ্গ চির দিন স্বাধীনতার যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে এই যুদ্ধলীলা বিশেষ ভাবে সংঘটিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের শেষে একটি কথা আমাদের বক্তব্য। মহাভারতেই আমরা নব-ব্রাহ্মণ্যের সূচনার লক্ষণ সকল দিকে দেখিতেছি,—রন্ধনশালাকে দর্শন-স্পর্শনের অতীত অতি পবিত্র মন্দিরে পরিণত করা, জাতিভেদের অচ্ছেদ্য প্রাচীর উত্তোলন করা, স্ত্রীলোককে কৌটায় পুরিয়া রাখা, সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণদিগকে অন্য সর্ব্বজাতি অনধিগম্য ঊর্দ্ধ-লোকে স্থান দিয়া তাঁহাদিগকে দ্যুলোক-ভূলোকের একাধিপত্য প্রদান করা—এ সমস্তই সূত্রাকারে মহাভারতে দেখিতে পাই।

কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে পশুহননবৃত্তি ত দয়ার সঙ্গে খাপ খায় না। যে মহাভারতে পশু-হত্যার বিরুদ্ধে এরূপ স্পষ্ট ও দ্বিধাশূন্য ভাষায় অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—তাহা এ সম্বন্ধে যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রচারক নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা কি ভাবে করিবে? তবে কি মহাভারত যজ্ঞার্থে পশুবলি নিষেধ করিয়াছেন? তাহা ত কখনই নহে। মহাভারতের মূলনীতি জীবহত্যার বিরোধী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে রাজ্যে পশুবলি দিনরাত অনুষ্ঠিত হইত, নরবলিও যথায় বাদ পড়িত না, এমন কি একশত নরেন্দ্র বলি দিয়া যেখানে জরাসন্ধ শিবের তুষ্টিসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পরমদয়াবান্ আদর্শ নৃপতি অশোকও যেখানে পশুহত্যা নিষেধ করিয়াও প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি পশুবধের অনুজ্ঞা দিয়া মাংসাশিগণের জন্য স্বীয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন—সেই রাজ্যে মহাভারতকার একেবারে জীবহত্যা নিষেধের হুকুমজারি করিতে কিছু দ্বিধাবোধ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? মাংসাশীদিগের জন্য মহাভারত কয়েকটি রক্ষাকবচের অনুকল্পনা করিয়াছিলেন। "বৃথা-মাংস" কথাটা আমরা মহাভারতেই পাইতেছি। দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া মাংস প্রসাদস্বরূপ খাইলে দোষ নাই। এই যে রক্ষাকবচ ঋষিরা দিয়া গেলেন, সেই রন্ধ্রে মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা দেবস্থানগুলিকে পশুরক্তে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। এই রক্ষাকবচের ফলে এখনও কালীঘাটাদি তীর্থস্থান অষ্টমীরদিনে একটা বিরাট্ হত্যাশালায় পরিণত হইয়া থাকে। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাসে দেখিতে পাই, রাজারা শত্রুগণকে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে অবাধে বলি দিতেছেন। এইভাবে দায়ুদ খাঁর নিকট-আত্মীয় মমারক খাঁ চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট ত্রিপুরার পুরোহিত চন্তাই খিচুঙ কর্ত্তৃক বলিস্বরূপ হত হইয়াছিলেন এবং সেদিনও মণিপুরের থাঙ্গল জেনারেলের

আদেশে সাগরেসবা ধনসিংহ নামক জল্লাদ টেওয়াংগা নামক খড়্গ দ্বারা কুইণ্টন, স্কীমে, সিম্সন এবং কলিন্স এই চারি জন শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষকে দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে বলি দিয়াছিল ; নব নব আগমনের দিনে হিন্দুগণ ঐ রক্ষাকবচগুলি হাতে পাইয়া এরূপ হিংস্র ও নির্ম্মম হইয়া পড়িয়াছিল ! রক্ষাকবচগুলি নিরীহভাবে প্রথম দেখা দিলেও উহা পরিণামে বীভৎস অত্যাচারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। (মহাভারতে বৃথা-মাংস সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"যে মাংস মন্ত্রপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে দান করা যায়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথা মাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথা মাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে" (অনুশাসন, ১১৫ অধ্যায়)। বলা বাহুল্য যে এইরূপ বিধানের পর হিন্দুস্থানে উপলক্ষ বা অজুহাতের কোন অভাব কেহ বোধ করেন নাই এবং কাহারও মাংস-ভোজনের বিঘ্ন ঘটে নাই। মহাভারতে জীবে দয়া সম্বন্ধে যে প্রকাণ্ড বক্তৃতা দেখা যায়, রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করাতে তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু মহাভারতীয় নীতি লোকমতের দিগ্দর্শন স্বরূপ; উহা যে পরবর্ত্তী কালে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকূলতা সূচনা করে. তাহাতে সন্দেহ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজয় কর্ত্তৃক লঙ্কা অধিকার

"একদা যাহার বিজয়-সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়।"
—দ্বিজেন্দ্রলাল।

এইবার আমরা ঐতিহাসিক যুগের নিকটে আসিয়া পড়িলাম। পৌরাণিক যুগের স্বপ্ন-কুহেলিকার উপরে পটক্ষেপ হইলে আমরা যে সকল দৃশ্যের সাক্ষাৎকার লাভ করি, তাহার প্রচ্ছদপটে ইতিহাসের অরুণালোক আসিয়া পড়িয়াছে।

যে সময়ে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভ হয় (খৃঃ পূঃ ৪৮৩), তাহারই সন্নিহিত কোন সময়ে বঙ্গাধিপ সিংহবাহুর পুত্র বিজয় লঙ্কা দ্বীপে যাইয়া তাঁহার বহু সুহৃদ্ ও অন্তরঙ্গ-সহ সেই দেশ জয় করিয়া উপনিবিষ্ট হন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই দেশ বিদ্রোহের দেশ,

ইহা শান্তশিষ্টদের আবাসভূমি নহে। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশ জয় করিতে রঘুকে যেরূপ বাধা পাইতে হইয়াছিল, অন্য কোথাও তিনি এরূপ দুর্দ্দান্ত শত্রুর সম্মুখীন হন নাই। বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ যাঁহাকে আমরা পুরুষোত্তমের সিংহাসনে বসাইয়াছি, সেই চৈতন্যদেবও বাঙ্গলার শিষ্টশান্ত সন্তান ছিলেন না, তিনি বাল্যকালে অতি দুরন্তই ছিলেন।

এই বিদ্রোহের দেশে ঐতিহাসিক যুগের প্রথমাঙ্কে আমরা এক বিদ্রোহী রাজকুমারের দেখা পাই। রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, হে মাতঃ বঙ্গভূমি! তুমি তোমার সন্তানদের আর শান্তশিষ্ট করিয়া রাখিও না—তাহাদের গৃহহীন ছন্নছাড়া করিয়া দাও। রাজকুমার বিজয় বঙ্গমাতার সেইরূপ এক গৃহতাড়িত ছন্নছাড়া সন্তান ছিলেন। তিনি প্রজামণ্ডলীর নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজবিদ্রোহী হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। বিজয়ের অনতিপরে বৌদ্ধধর্ম্ম লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিল। পিতৃনাম স্মরণীয় করিবার জন্য সিংহবাহু-তনয় লঙ্কার নাম সিংহল রাখিয়াছিলেন, তদবধি সেই নাম চলিয়া আসিতেছে।

এই বিজয় কর্তৃক সিংহল-বিজয় বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা। সমস্ত প্রাচীন পালিপুস্তকে বাঙ্গালীর সিংহবাহু-তনয় বিজয়ের বিজয়গাথা কীর্ত্তিত আছে।

আমরা মহানাম-কৃত মহাবংশ হইতে বিজয়-কৃত লঙ্কাজয়ের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই লঙ্কা-বিজয় বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি অতীব গুরুতর ও গৌরবাত্মক ঘটনা। মহামহীরুহেও ঘুণ ধরে, আমাদের এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতেও একটু ঘুণ ধরিয়াছে। সুতরাং বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

দ্বীপবংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রভৃতি সিংহলের যাবতীয় প্রাচীন ইতিহাসের মত এবং সিংহলের চিরন্তন সংস্কার—লঙ্কাজয়ী বিজয় বাঙ্গালী ছিলেন; এসম্বন্ধে যিনি সমস্ত ঘটনাটি অবগত, তাঁহার মনে কোন দ্বিধার ভাব থাকিতেই পারে না। এইজন্য সেই ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিবৃতি আবশ্যক।

বঙ্গের রাজার সুসিমা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন (দ্বীপবংশ)। এই কন্যা যেমন সুন্দরী তেমনি স্বাধীন ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তি ছিলেন; রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রের জন্য গঞ্জনা সহিতে হইত। সুসিমা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া একদা গোপনে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইহা খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা; সুতরাং সেই সুদূরকালের সমস্ত ইতিহাসের ন্যায় ইহাতেও কতকটা উপগল্প মিশ্রিত আছে। এইরূপ উপগল্প কেন হইল, তাহাও আমি পরে লিখিব।

সিংবাহুর রাজধানী সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান।

যখন রাজকন্যা রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন একদল বণিক্ বঙ্গ হইতে মগধে যাইতেছিলেন, কুমারী তাঁহাদের সঙ্গ ধরিলেন। পথে রাঢ়দেশে এক সিংহ তাঁহাদিগকে তাড়া করিল। (সম্ভবতঃ সিংহউপাধিধারী কোন বর্ব্বর দস্যুদলপতি অর্থলুব্ধ হইয়া বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।) বণিকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু

রাজকুমারী কামাতুরা হইয়া তাহাকে ভজনা করিলেন। সিংহের ঔরসে সুসিমার দুইটি সন্তান জন্মিল। দ্বীপবংশ লিখিয়াছেন, ইঁহারা উভয়েই পরমসুন্দর ছিলেন। পুত্রের নাম সিংহবাহু এবং কন্যার নাম সিবলী। ষোড়শবর্ষ সিংহের সঙ্গে বাস করিয়া (দ্বীপবংশ অনুসারে;—মহাবংশ অনুসারে দ্বাদশবর্ষ) রাজকুমারীর স্বামীর প্রতি অরুচি হইল, তিনি তাঁহার পুত্রকন্যা লইয়া উদ্ধশ্বাসে তাঁহার পিতৃরাজ্য বঙ্গের উপান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সিংহ সেইদিনই পলায়নপর স্ত্রীপুত্রকন্যার সন্ধানে দ্রুত রওনা হইয়া বঙ্গের উপান্তে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল।

এখানে সিংহবাহু তাঁহার পিতাকে বধ করিয়া উত্তরাধিকার-সূত্রে বঙ্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন; (যেহেতু তাঁহার অপুত্রক মাতামহ বঙ্গেশ্বরের অল্প দিন পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল)। কিন্তু তাঁহার মাতা সুসিমা বঙ্গেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং সিংহবাহু তাঁহার মাতামহের রাজ্য মাতার স্বামীকে ছাড়িয়া দিয়া যেখানে (অর্থাৎ বঙ্গ হইতে মগধের পথে রাঢ় দেশে) তিনি আশৈশব পালিত হইয়াছিলেন, সেইখানে "সিংহপুর" নামক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। *

এই রাঢ় দেশের নামান্তর লাঢ়, লাট, রাল প্রভৃতি। একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে এই দেশকে "লাঢ়" বলা হইয়াছে। মীনহাজ ইহাকে "রাল" এবং মহাবংশকার "লাঢ়" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"সিংহপুর" রাঢ়ের অতি প্রাচীন রাজধানী। জৈন হরিবংশে পূর্ব্ব-ভারতের দুইটি প্রধান নগর উল্লিখিত আছে, একটি গৌড়, অপরটি সিংহপুর। বঙ্গীয় কুলজীগ্রন্থের অনেক-গুলিতেই এই সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বল্লালসেন-কৃত বঙ্গীয় ২৭টি কুলস্থানের মধ্যে সিংহপুর অন্যতম। "সিংহপুরো মৎস্যপুরো মেঘনাদস্তথাপিচ। বাসার্থং প্রদত্তস্তেভ্যোবল্লালেন মহীভুজা॥"—বাচস্পতির কুলকারিকা। এই স্থানটি কাঁথি মহকুমা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং কাটোয়া হইতে ১৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে, অক্ষরেখার ২৩°৫৩′ উত্তরে এবং দ্রাঘিমারেখার ৮৮°৭′ পূর্ব্বে অবস্থিত।

ঐতিহাসিকগণ জানেন রাঢ় দেশের যে স্থানে সিংহপুর অবস্থিত, পুরাকালে উক্ত দেশের সেই অংশ (দক্ষিণাংশ) কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। মহাবংশে উক্ত আছে সিংহবাহুর মাতামহ বঙ্গের রাজা কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ কলিঙ্গের সীমা তখন বঙ্গদেশের একপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছিল এবং উভয়রাজ্য পাশাপাশি ছিল। এককালে তমলুক কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং কলিঙ্গরাজ এত পরাক্রান্ত ছিলেন যে অশোক এক লক্ষ সৈন্য ধ্বংস এবং বহু লক্ষ সৈন্য আহত করিয়া বহু কষ্টে কলিঙ্গ জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

* "Sinhapur—Sinhapur in the district of Hughly in Bengal; it was founded by Sinhabahu, the father of Vijay who conquered and colonised Lanka. ...It is situated in Radha, the Lata of the Buddhists and Lade of the Jains"—The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India by Nandalal De, M.A., B.L. Published by Luzac & Co., London, p. 186.

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কলিঙ্গ-যুদ্ধের মত এরূপ গুরুতর ঘটনা সেই পুরাতন যুগে বিরল। যতটা জানা যায়, তাহাতে মনে হয় তাম্রলিপ্তিই (তমলুক) কলিঙ্গের মুখপাত্র-স্বরূপ ছিল, এবং অশোকের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তাম্রলিপ্তির লোকেরাই সেই যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন (পরিশিষ্টে 'মেদিনীপুর' দ্রষ্টব্য)। মেদিনীপুর জেলাটা তমলুকের অন্তর্গত ছিল; সেদিন পর্য্যন্তও (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বগড়ি পরগনা, হুগলীর অন্তর্গত কতকগুলি পরগনা এবং হিজলি জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল (যোগেশচন্দ্র বসুর মেদিনীপুরের ইতিহাস, ২৫ পৃঃ)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জগমোহনের 'দেশাবলী-বিবৃত্তি' নামক যে সংস্কৃত ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয়, এক সময়ে বেহালা, বড়িষা, মঙ্গলঘাট প্রভৃতি পল্লী পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে যে সামন্তচক্র রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্ততঃ তিনজন রাজা কলিঙ্গবাসী ছিলেন—দন্তভুক্তি, অপারমন্দার ও কোটাটবী। এই সকল ও অপরাপর প্রমাণ-দ্বারা নির্ণীত হয় যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবচ্ছেদ-রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—বিশেষ রাঢ় দেশের অধিকাংশ এক সময়ে কলিঙ্গ-রাজ্যের কুক্ষিগত ছিল। সিংহবাহু যখন সিংহপুর স্থাপন করেন, তখন তিনি মাতামহের রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিংহপুরে একটা স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার অনতিপরে সিংহপুর কলিঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছিল এবং এককালে এই সিংহপুরের রাজারাই সমস্ত কলিঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া শিলালিপিতে ঘোষণা করিতেন।* এক সময়ে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা একটা যুক্তরাজ্য ছিল, তাহা সেদিনকার কথা, কিন্তু তাই বলিয়া উড়িষ্যার লোককে বাঙ্গালী বলা যায় না, যদিও লাট সাহেবকে বঙ্গেশ্বরই বলা হইত। সেইরূপ প্রাচীনকালে সিংহপুর—কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত থাকিলেও অধিবাসিগণ বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে কখনই উড়িয়া বলা যাইতে পারে না। ১১৪২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরবাসী বাঙ্গালী সুপ্রসিদ্ধ অনন্তবর্ম্মা সমস্ত উড়িষ্যা জয় করিয়া গঙ্গাবংশের স্থাপন করেন; প্রায় ৫০০ বৎসর কাল অনন্তবর্ম্মার বংশধরগণ কলিঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া এদেশের সঙ্গে কলিঙ্গের রাজনৈতিক সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। রাঢ়দেশের এক প্রধান অংশ যে এককালে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল, তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে; এমন কি "রাঢ়" নামেই ইহা কতকটা প্রমাণিত। "ঢ়" অক্ষরটি উড়িষ্যার নিজস্ব, এই অক্ষরটি বাঙ্গলা শব্দে খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। বিজয়ের সিংহপুর এখন সিঙ্গুর বা সিঙ্গুরগড় (সিংহপুরগড়) নামে পরিচিত।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, নন্দলাল দে এবং অধ্যাপক ডাঃ সহিদুল্লা সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সিঙ্গুরই যে প্রাচীন সিংহপুর তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বঙ্গ হইতে মগধে

* "Kalinganagar, however, appears to have been the general name of the capitals of Kalinga which were different at different periods, as Nanipur, Dantapura, Bhubaneswar, Pistapur, Jaintapur, Simhapur and Mukhalinga." Geo. Dictionary, N. De,—p. 85.

যাইতে হইলে রাঢ়দেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় এবং মহাবংশের বর্ণনা পাঠ করিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে, রাঢ়দেশের যে অংশে রাজকুমারী সিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং যেখানে উত্তরকালে সিংহবাহু তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন, তাহা বঙ্গদেশের প্রান্তসীমায় ছিল। বণিক্‌দের সঙ্গে কুমারী সুসিমা মগধে যাইবার পথে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া রাঢ়ে পৌছিলেন এবং সিংহও তাহার রাঢ়দেশের নিবাসস্থানে স্বীয় পুত্র, কন্যা এবং পত্নীকে না পাইয়া অমনই ছুটিয়া আসিয়া বঙ্গদেশে অত্যাচার করিতে লাগিল,—এই সকল বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, রাঢ়দেশের সেই স্থানটি এবং বঙ্গদেশের প্রান্তসীমা অতি নিকটবর্ত্তী ছিল। বঙ্গ ও মগধ এই দুই রাজ্যের মধ্যে রাঢ় দেশ—এবং দক্ষিণ-রাঢ়েই সিংহপুর। আমরা পরে বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের মতের সমালোচনা করিব, এইজন্য সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান-সম্বন্ধে এতগুলি কথা লিখিলাম।

বিজয় পিতা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া একটা জাহাজের বহর লইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন। দ্বীপবংশে লিখিত আছে, রাজা সিংহবাহু বিজয়কে এই ভাবের দণ্ড দিয়াছিলেন,—"এই বালককে (বিজয়কে) এ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দাও—ইহার সমস্ত দাস, দাসী, মজুর, সহচর ও তাহাদের স্ত্রীপুত্র কেহ যেন আর এ দেশে না থাকে। জাহাজে ভাসিতে ভাসিতে ইহারা যেখানে ইচ্ছা যাউক, আর যেন ইহারা স্বদেশে মুখ দেখাইতে বা বাস করিতে না আসে।" মহাবংশের বিবরণের সমস্তটার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, রাজা সিংহবাহু বিজয় ও তাঁহার সাতশত সহচরের অর্দ্ধ-মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বীপবংশে এই মস্তক-মুণ্ডনের উল্লেখ নাই। মহাবংশ পরবর্ত্তী গ্রন্থ, মনে হয় ইহার লেখক একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, পরিকর-পরিবৃত হইয়া শিশুমণ্ডলী যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তাহা ঝটিকা-তাড়িত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সেই জাহাজের আরোহিগণ "নগ্নদ্বীপে" উপনিবিষ্ট হইল। ("The ship in which the children had embarked was hopelessly driven to an island named Naggadwip."—Dwipavamsa.) ক্রমশঃ ঝটিকা-তাড়িত হইয়া স্ত্রীলোকের জাহাজও বিজয়ের জাহাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুদূর এক দ্বীপে আশ্রয় লইল,—তাহার নাম মহিলা-রাষ্ট্র, মহাবংশ-অনুসারে 'মহিলা-দ্বীপ'।

দ্বীপবংশে লিখিত হইয়াছে—ঝটিকা-তাড়িত হইয়া সপরিকর বিজয়ের জাহাজ অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল—তাহার যন্ত্রাদি বিকল হইল, এবং পথ হারাইয়া কোনক্রমে তাঁহারা সুপুরা বন্দরে উপস্থিত হইলেন। মহাবংশ ও দ্বীপবংশের বর্ণনা এ বিষয়ে একরূপ। এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব নগ্নদ্বীপ এবং মহিলারাষ্ট্র বা মহিলাদ্বীপ কোথায়। সুপুরা বন্দর হইতে ইহারা ভরকচ্ছে যাইয়া তিনমাস বাস করিয়াছিলেন (দ্বীপবংশ), এখানে অধিবাসিগণ ইহাদিগকে বিস্তর ভদ্রতা ও সৌজন্য-দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা মদ খাইয়া তথাকার স্ত্রীলোকদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার ও হঠকারিতা করিয়া সর্ব্বসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা একত্র হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, "এই দুরাত্মাদিগকে (rascals) হত্যা করা হউক" (দ্বীপবংশ); মহাবংশ লিখিয়াছেন—বিজয়ের নিজ

সহচরেরাও অবাধ্য হইয়া নানারূপ অত্যাচার করাতে বিজয় সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনে হয়, এই কথায় একটা ইঙ্গিত আছে যে, বিজয়ের সঙ্গে তাঁহার বিদ্রোহী অনুচরবর্গের মনোমালিন্য ঘটাতে একদল সেইখানে রহিয়া গিয়াছিল; এতৎসম্বন্ধে কতকগুলি কথা পরে লিখিব।

বিজয় এখানেও আবার ভয়ানক ঝটিকার মুখে পড়িলেন, সেই ঝড়ে জাহাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া দক্ষিণমুখে যাইতে যাইতে লঙ্কায় উপস্থিত হইল।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে 'জাফ্‌না' নামক যে দ্বীপ দৃষ্ট হয় (সিংহলের উত্তরে) উহাই নগ্নদ্বীপ। এইরূপ অনুমান করিবার হেতু এই যে, সিংহলের উত্তরে ভারতসমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূলে সেই সময়ে নগ্নদ্বীপ নামে একটি দ্বীপ ছিল, তথায় বুদ্ধদেব একবার গিয়াছিলেন বলিয়া মহাবংশে উল্লিখিত আছে। সুতরাং যখন নগ্নদ্বীপ পাওয়া যায় না, অথচ সিংহলের উত্তরে 'জাফ্‌না' নামক দ্বীপ পাওয়া যাইতেছে—বুদ্ধদেব-সংশ্লিষ্ট ঐ দ্বীপেরই পূর্ব্ব নাম নগদ্বীপ বা নগ্নদ্বীপ থাকা সম্ভব।

কিন্তু আমার মনে হয় মহাবংশ ও দ্বীপবংশোক্ত নগ্নদ্বীপ খুবসম্ভব পূর্ব্ব উপকূলের "নেগাপত্তম্"। এই বন্দর তাঞ্জোরের নিকটবর্ত্তী। ইহা অতি প্রাচীন স্থান; খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই স্থান বৌদ্ধদিগের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান ছিল। তাহারও বহুপূর্ব্বে এই বন্দর বিখ্যাত ছিল। ঐতিহাসিক James Burgess সাহেব তাঁহার History of Indian Architecture (১ম খণ্ড, ২০৬ পৃঃ ১৯১০) পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"কাবেরীর তটভাগে নেগাপত্তম্ তাঞ্জোরের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এই বন্দর মাদ্রাস হইতে ১৭৩ মাইল দূরে অবস্থিত এবং বৌদ্ধগণের একটি প্রধান তীর্থ। ১০০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের প্রদত্ত ভূমিতে কিদারাম অথবা কথা-প্রদেশের (সম্ভবতঃ দক্ষিণ-ব্রহ্মদেশ অথবা শ্যামের অন্তর্গত) রাজা চড়ামণ বর্ম্মা (চূলামন) কর্ত্তৃক এখানে একটি বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পরে কুলতুঙ্গ চোল ১০৯০ খৃষ্টাব্দে এখানে অন্ততঃ দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মদেশীয় একটি অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও পেগুদেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রীরা নেগাপত্তমে যাতায়াত করিতেন।" বারজেস্ সাহেব তথাকার আর একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উচ্চতা ছিল ৭০ ফিট্। এই মন্দির নেগাপত্তম্ হইতে মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যেস্যুট পাদ্রীরা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। বৌদ্ধ রাজগণ যেখানে মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেন, তাহা প্রায়ই বুদ্ধের অনুচর কিংবা সুপ্রাচীন জগন্মান্য কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সমাধির উপর স্থাপিত হইত। এই ভাবে নালন্দা বিহার ও তথাকার মঠ-মন্দিরাদি বুদ্ধদেবের প্রসিদ্ধ জনৈক শিষ্যের সমাধি উপলক্ষ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। দশম-একাদশ শতাব্দীতে নেগাপত্তমে যে সকল কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ আদিযুগের কোন শ্রমণের সমাধির স্মারক, নতুবা রাজারা সেখানে এতগুলি মন্দির ও স্তূপ রচনা করিবেন কেন, এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতেও পেগু প্রভৃতি দূরতর দেশ হইতে এখানে

নগ্নদ্বীপ ও মহিলাদ্বীপ।

যাত্রীর সমাগম হইবে কেন? এই সকল কারণে নেগাপত্তম্ যে অতি প্রাচীন স্থান, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করিয়াছেন, পশ্চিম উপকূলের মালদ্বীপই বৌদ্ধ গ্রন্থোক্ত "মহিলা-দ্বীপ।" এখানেও আমার মনে হয়, পশ্চিম উপকূলের মহি বন্দরই এই মহিলা-দ্বীপ,—ইহা মহিদ্বীপ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল (ওয়েবষ্টার অভিধানের ভৌগোলিক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এই মহিদ্বীপ খুব প্রসিদ্ধ স্থান,—ইহা এককালে ফরাসীদিগের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল।

কিন্তু এই উভয়মতের যেটিই গৃহীত হউক না কেন, মূল সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। যেহেতু জাফ্না ও নেগাপত্তম্ উভয়ই ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে এবং মালদ্বীপ ও মহিদ্বীপ সেইরূপ পশ্চিম উপকূলে। বিজয় সিংহপুর ছাড়িয়া খুব সম্ভব তমলুক হইয়া দক্ষিণ মুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব উপকূলে একদল রহিয়া গেলেন, পশ্চিম উপকূলেও বিপদে পড়িয়া আর একদল পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু মহাপরাক্রান্ত বীর বিজয় ও তাঁহার দুর্দ্দান্ত সহচরেরা সুপ্পরিক (আধুনিক সোপরা, থানা জেলার অন্তর্গত বোম্বাইএর উত্তরে) হইয়া ভরকচ্ছ নগরে (আধুনিক ব্রোয়াচ্) উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে মানবিক এবং দৈব উভয় শক্তি-দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়া অনাহার ও নানা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সিংহলে পৌঁছিলেন।

এই সহজ সরল সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিবার কোনই কারণ নাই। বস্তুতঃ অটো ফ্রাঙ্কি (Otto Franke), বারনফ্ (Burnouf) প্রভৃতি বহুবিধ জগন্মান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিতগণ ও সিংহলবাসীরা ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সিংহলের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপাল, সিদ্ধার্থ, ভিক্ষু পি বজরাননন্ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহলীভাষার অধ্যাপক শীলানন্দ আমাকে জানাইয়াছেন যে, * সিংহলী বৌদ্ধগণের চিরাগত বিশ্বাস যে, তাঁহারা বাঙ্গালী; কত শত শতাব্দী পরেও সিংহলীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের চেহারার যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য, মিথিলা, আসাম ও বিহার-বাসীদের সঙ্গেও আমাদের ততটা সাদৃশ্য নাই। সিংহলী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার অতি

* "We have the long-standing tradition that Vijay came to Ceylon from Bengal and founded an empire here in the 6th century B. C. This tradition is of hoary antiquity and has come down to us from remote generations. This belief is confirmed by the evidence of Mahavamsa, Dipavamsa, and other works and is supported by the striking resemblance between the features and appearance of the Bengalis and the Buddhist population of Ceylon, no less by the great similarity between the Bengali and Ceylonese dialects. The Ceylonese women wear *sari* just like Bengali ladies. Last year when some Sinhalese women came to Calcutta, I had at first mistaken them for Bengali women. Similarly if Sinhalese women would pass by the streets of a Bengali town, the Bengalis would mistake them for their own people. I have heard the Bengalis say that the Sinhalese people speak Bengali exactly like Bengalis, whereas their immediate neighbours—the Biharis and other people who sometimes spend their whole life in Bengal, cannot speak Bengali except with a peculiarly non-Bengali accent." P. Shilananda, Buddhist Priest and Professor of Sinhalese, Calcutta University.

নিকট সম্বন্ধ, তাহা পরে লিখিব। বস্তুতঃ ধর্ম্মপাল, রেভারেণ্ড সিদ্ধার্থ, রেভারেণ্ড শ্রীলানন্দ প্রভৃতি যতজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেকের চেহারা অবিকল বাঙ্গালীর মত। আমরা কয়েক স্থলে দেখিয়াছি, বাঙ্গালীরা কোন কোন সিংহলীর সহিত বাঙ্গালায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া শেষে বিস্ময়ের সহিত আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশবাসী,—বাঙ্গালা বুঝেন না। গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে (১৯৩৩) নয়া দিল্লীতে সিংহল গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পেরিসুন্দরম এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালী বিজয় যে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৯৩৩, ১৭ই এপ্রিলের 'লিবার্টি' দ্রষ্টব্য)।

সুপ্পরিক ও ভরকচ্ছ—এই দুইটি স্থান দক্ষিণ-গুজরাটের সন্নিহিত। গুজরাটের দক্ষিণাংশকে গ্রীকগণ লাট্ বা লারিকা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সূত্রে কয়েকজন পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার করিতেছেন যে, সিংহবাহু বাঙ্গালী মায়ের পুত্র বটেন, কিন্তু তিনি গুজরাটের দক্ষিণে প্রাচীন লাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

নানাকারণে বাঙ্গালাদেশের প্রতি বাহিরের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন, আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন অযৌক্তিক ও অদ্ভুত একটা মত প্রচার করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের সেক্সপীয়রের এই কয়েকটি কথা মনে পড়া স্বাভাবিক—"যিনি আমার ধনরত্ন হরণ করেন, তিনি কিছুই হরণ করেন না। তিনি যাহা লইয়া যান, তাহা আজ আমার, কাল অপরের। কিন্তু যিনি আমার সুনাম হরণ করেন, তিনি এমন একটি জিনিষ হরণ করেন, যাহাতে তাঁহার কোনই লাভ হয় না, অথচ আমি প্রকৃতই দরিদ্র হইয়া পড়ি" (ওথেলো)। বঙ্গের ইতিহাসে বিজয়ের সিংহল-জয় তেমনিই বাঙ্গালীর একটি বড় সুনামের বিষয়।

বঙ্গের রাজকুমারী চলিয়াছেন, বঙ্গ হইতে মগধে—মধ্যেই রাঢ় দেশ, সেই দেশেই তৎপুত্র সিংহবাহু রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশ (সমতট) এখনও আছে, তন্নিকটবর্ত্তী রাঢ় দেশ এবং তাহা উত্তীর্ণ হইয়া মগধে এখনও যাইতে হয়। ইহা ছাড়া ভারতবিশ্রুত সুপ্রাচীন সিংহপুর বঙ্গের উপকণ্ঠে রাঢ় দেশে এখনও বিদ্যমান।* সুতরাং এই বিবরণে ভৌগোলিক জটিলতা কিছুমাত্র নাই। যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, গুজরাটের দক্ষিণাংশ এককালে লাট্ বা লারিকা নামে উক্ত হইত—তবেও কি বলিতে হইবে বঙ্গ হইতে মগধে যাইতে গুজরাটের সেই লাট্ দেশ পথে পড়ে? বঙ্গের সীমান্ত ছাড়িয়াই

* Radha—that part of Bengal which lies to the west of Bengal including Tamluk, Midnapur and the districts of Hugli and Burdwan. A portion of the district of Murshidabad was included in its northern boundary. It was the native country of Vijay who conquered Ceylon with seven hundred followers (Uphams 'Rajabali,' Pt. I, Raj-Tarangini, Chap. 11, Mahavamsa, Chaps. 6, 47). It is the Lāla of the Buddhists and Lāḍa of the Jains ....It should be stated here that Radha is a corruption of Rashtra and an abbreviation of Gangarashtra or Gangarada—the Gangaride of Megasthenes.—"Geographical Dictionary," pp. 64-65.

রাঢ় দেশ—মগধের পথে রাজকুমারী সেই স্থানে উপনীত হইলেন। এ অবস্থায় গুজরাটের কথা উদয় হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? সিংহ রাঢ়ের সীমা ছাড়িয়াই বঙ্গে আসিয়া অচিরাৎ উপস্থিত হইল—এখানে গুজরাটের কথা কি করিয়া উঠিতে পারে? তারপরে বিজয় সিংহপুর ছাড়িয়া দক্ষিণ মুখে চলিলেন, প্রথম নগ্নদ্বীপ—পূর্ব্ব উপকূলে, দ্বিতীয় মহিলাদ্বীপ—পশ্চিম উপকূলে সর্ব্বশেষ সুপ্পরিকা বন্দরে। সমুদ্রযাত্রার পর পর ভৌগোলিক নির্দ্দেশ এই ভাবে পাওয়া গেল, অর্থাৎ ইঁহারা পূর্ব্ব উপকূল হইতে রওনা হইয়া পশ্চিম উপকূলের দিকে চলিয়াছিলেন। কিন্তু যদি গুজরাট হইতে বিজয় রওনা হইতেন তবে উল্টা রাস্তার রাস্তা দিয়া তাঁহাকে গমন করিতে হইত,—প্রথমই সুপ্পরক বন্দরের নাম থাকিত। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে, বহু পর্য্যটন এবং দুই বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া আসিয়া সর্ব্বশেষে তিনি সুপ্পরকে পৌছিয়াছিলেন।

এদিকে সে সময়ে দক্ষিণ-গুজরাটের নাম লাট্ থাকিলেও সেখানে সিংহপুর কোথায়? সেই দেশে সিংহপুর রাজধানী বা তৎসংক্রান্ত কোন সংস্কারের চিহ্নমাত্র নাই। পশ্চিমোত্তরে এক সিংহপুর আছে—এই সিংহপুর (Salt Range) বঙ্গ হইতে ১৩০০ মাইল দূরে - তক্ষশীলার নিকট ও বিতস্তা নদীর তীরবর্ত্তী: এখানে বঙ্গের রাজকুমারী অবশ্য হাঁটিয়া আসিতে পারেন নাই; এই সুপ্পারক বন্দরও পূর্ব্বোক্ত সিংহপুর হইতে ৯০০ মাইল দূরে অবস্থিত, সেখান হইতেও সিংহবাহু সুপ্পারকে আসেন নাই। প্রতিবাদীরাও এই সিংহপুর বিজয়ের জন্মভূমি বলিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা গুজরাটের মানচিত্র হাৎড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, কাথিওয়ারে যে সিহোর নামক স্থান আছে, তাহাই হয়ত সিংহপুর। কিন্তু বঙ্গ দেশ হইতে বিজয়কে এতটা দূরে লইয়া যাইবার হেতু কি? বঙ্গ দেশের উপান্তে রাঢ় দেশ, তথায় বহু প্রাচীন সিংহপুর—এবং ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে নগ্নদ্বীপ, পশ্চিম উপকূলে মহিলাদ্বীপ, তৎপরে সুপ্পরক—পর পর সমস্তই আছে, এই সাজানো বাগান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিতান্ত অসতর্ক এবং অযৌক্তিক মত প্রচারের কারণ কি? কবির গানটি মনে পড়ে,—"আঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে, আঁধার-পথে খুঁজতে গেলি।"

প্রতিবাদীদের অগ্রণী বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ই. জে. র‍্যাপসন তাঁহার সম্পাদিত অক্সফোর্ড Early History of India পুস্তকে এরূপ অসম্ভব কথা লিখিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তিনি মনের কথা সরল সহজ ভাবে না লিখিয়া অতিশয় দ্বিধার সহিত যাহা লিখিয়াছেন তাহা অসংবদ্ধ ও পরস্পর-বিরোধী। তিনি লিখিয়াছেন, "The Mahavamsa seems to locate Lala in Magadh."* "মহাবংশের লেখা পড়িলে মনে হয় যেন লাল্ দেশ মগধের অন্তর্গত।" তাই যদি হবে, তবে তিনি বিজয়কে গুজরাটের লাট্ দেশবাসী মনে করেন কেন? মহাবংশে যাহা বলা হইয়াছে, দ্বীপবংশ এবং কুলবংশেও তাহাই আছে, সিংহলের

* মহাবংশে অতি পরিষ্কার ভাবে লিখিত আছে যে, বঙ্গ হইতে মগধে যাইতে পথে রাঢ় দেশ। কিন্তু র‍্যাপসন কেন লিখিলেন, মহাবংশ পড়িলে মনে হয় রাঢ় দেশ মগধের অন্তঃপাতী? বাঙ্গলা দেশে যে অতি প্রাচীন ভূখণ্ড রাঢ় নামে চিরবিশ্রুত, তাহা কি তিনি জানেন না? বাঙ্গলার নাম করিতে তাঁহার কুণ্ঠার কারণ কি?

সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থের ঐ একই সুর। তবে তিনি কোন্ প্রমাণ-বলে বিজয়কে গুজরাটবাসী বলিতে চান? এই সকল প্রাচীন পুস্তকের সরল অর্থ তিনি বুঝিয়াও লিখিয়াছেন, "লাট দেশের সিংহপুর সম্ভবতঃ কাথিওয়ারের সিহোর।" বিজয়ই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে সিংহলে সর্ব্বপ্রথম আর্য্যোপনিবেশ স্থাপন করেন। যদি তিনি সত্যই কাথিওয়ারের অধিবাসী হইবেন, তবে কি করিয়া র‍্যাপসন আবার লিখিলেন—"The first stream of emigration to Ceylon came from Orissa and perhaps from South Bengal." তাঁহার মতে কাথিওয়ার হইতে প্রথম অভিযান গেল, অথচ পুনরায় দক্ষিণ-বঙ্গ দেশ হইতে বিজয় গিয়াছিলেন—এরূপ পরস্পর-বিরোধী একটা ইঙ্গিত তিনি কি করিয়া দিলেন? ইহার মত একান্ত দ্বিধা-যুক্ত, এবং "শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি"-গোছের।

বিজয় যে বাঙ্গালী তাহার আর একটা অকাট্য প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের পর আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

সিংহলের রাজা নিঃশঙ্ক মল্লের শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইনি বিজয়ের বংশে উদ্ভূত। Epigraphica Zeylanica-র দ্বিতীয় খণ্ডে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রাজা সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসর বিজয় সিংহলে পদার্পণ করেন—সেই সময় হইতে ১৭০০ বৎসর পরে নিঃশঙ্ক মল্ল ভূমিষ্ঠ হন, তাহা হইলে ইহার জন্ম-তারিখ হইল ১২০৭ খৃঃ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হুগলী জেলার অধিকাংশ এক সময়ে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং রাঢ় দেশের কতকাংশ পর্য্যন্ত কলিঙ্গ-রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি যে, এক সময়ে সিংহপুর অতি প্রধান ও প্রবল-পরাক্রান্ত নগর ছিল। গৌড় দেশের ছোট ছোট রাজারা যেরূপ "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিতেন, মেদিনীপুর ও সিংহপুরের রাজারাও সেইরূপ "কলিঙ্গেশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিতেন, সিংহপুরের অভ্যুজ্জ্বল সময়ে ইঁহারা কলিঙ্গের রাজগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তমলুকের রাজা ১১৪২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত উড়িষ্যা জয় করিয়া গঙ্গাবংশকে তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন—ইঁহার নাম অনন্তবর্ম্মা, ইনি বাঙ্গালী ও ক্ষত্রিয়, সম্ভবতঃ ইঁহারা সিংহপুরের রাজাদের জ্ঞাতি ছিলেন। প্রায় ৫০০ বৎসর কাল কলিঙ্গদেশ বাঙ্গালীর শাসনাধীন ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে সিংহপুর-রাজ্য হীনশ্রী হইয়াও "উত্তরে দ্বারকানদী, পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়নদ এবং পশ্চিমে ময়ূরাক্ষিনদ এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন প্রায় ২৮০ বর্গমাইল ব্যাপক ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। সিংহপুরের তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে জয়যান বা জযান গ্রাম। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই এই দুই গ্রামের মধ্যে অন্যতম জয়যানের ১,৫৭০ সুবর্ণমুদ্রা বৎসর বৎসর রাজস্ব দিতে হইত, সুতরাং ইঁহাদের রাজ্যের আয়তন সেই সময়ের মাপকাঠিতে বিচার করিলেও একটা প্রকাণ্ড ভূভাগ ছিল। (নগেন্দ্রনাথ বসুর জাতীয় ইতিহাস—রাজন্য কাণ্ড, ১৩৭ পৃঃ।)

সিংহলের রাজারা চিরকালই সিংহপুরের বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, এবং তাঁহারা একদা কলিঙ্গেশ্বর "উপাধি" ধারণ করিয়া সমস্ত সিংহল দেশটা কলিঙ্গেশ্বর সিংহপুর-পতির অধীন বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এখন আমরা নিঃশঙ্ক মল্লের লিপি হইতে কতকটা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"When one thousand seven hundred years had elapsed since this King (Vijoy), protected by the Gods in accordance with the behest of the Buddha, arrived in the island of Lanka, and destroying the *yakṣas* made in an abode for mankind, there was born the great king Siri Sañgaba Kalinga Parakrama Bahu Viraraj Nissanka Malla Aprati Malla in *Siṃhapur in the country of Kalinga* in role Jambudiva, the birthplace of the Buddhas, Bodhisattas and Universal monarchs, (he was born) of the womb of the great queen Parvati unto King Joygopa who was like unto a *tilak* ornament to this royal line (of the Okkaka * dynasty). He grew up in the midst of royal splendour and being invited by the great king of the island Lanka, his senior kinsman, to rule over the island of Lanka which was his by the right of lineal succession of kings, he landed in great state in Lanka. Enjoying (thereafter) the royal dignities of governor and subking and being proficient in all arts of sciences, he in due order of regal succession received the sacred unction and wearing the crown assumed supreme sovereignty.—"Epigraphica Zeylanica," Vol. II.

এই লিপির সারমর্ম্ম এই যে রাজা নিঃশঙ্ক মল্ল সিংহপুরের বিজয়ের বংশোদ্ভব। এই স্থানের রাজারা "কলিঙ্গেশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন এবং ইহা কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। ইনি বিজয়ের সিংহলে পৌঁছিবার ১৭০০ বৎসর পরে সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশোদ্ভব কোন সিংহলরাজ তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না পাইয়া তাঁহাদের মূলস্থান সিংহপুরের এক জ্ঞাতিকে আনাইয়া রাজ্যটি তাঁহাকে প্রদান করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহপুরের রাজবংশের দাবী সিংহলের সিংহাসনে অগ্রগণ্য ছিল।

দক্ষিণ-রাঢ় যে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল, তাহা সর্ব্বসম্মত ; সিংহপুর অতি প্রাচীন ও প্রধান নগর এবং কলিঙ্গভুক্ত ছিল, তাহাতে কোন দ্বিধা নাই। এমন অবস্থায় এই লিপির প্রমাণ অকাট্য। †

এখন বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে সিংহলী ভাষার যে নিকট-সম্বন্ধ তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মহম্মদ সহিদুল্লা সাহেব এম্. এ., ডি. লিট্. আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন, "I have tried to show in an article that the Singhalese language has the greatest affinity with the language of the Eastern inscriptions of Asoka and must have been derived from the ancient language of Radha. According to the description of

* Ikṣaku

† ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়—এই বংশ "মৃগেন্দ্রদিগের গুহাতুল্য" সিংহপুর রাজধানী হইতে আগত হইয়াছিলেন ; সিংহপুর তখন কলিঙ্গের অন্তর্গত। পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়া এই বর্ম্ম-বংশ কামরূপ, অঙ্গদেশ, দিব্বোকের রাজধানী পৌণ্ড্রদেশ প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলি জয় করিয়াছিলেন (ভোজবর্ম্মার বেলাভা তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য)।

the Mahavamsa Lâta the motherland of Bijay was situated between Vanga and Magadha. So it cannot but be the Radha which has been called Ladha in the Jain books and in the Tirumalai inscriptions of Rajendra Chola."

["আমি একটি প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সিংহলী ভাষার সঙ্গে অশোকের পূর্ব্বভারতের লিপি-ব্যবহৃত ভাষার ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। ঐ ভাষা নিশ্চয়ই রাঢ় দেশের প্রাচীন ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মহাবংশের বর্ণনানুসারে বিজয়ের মাতৃভূমি মগধ ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, সুতরাং ইহা জৈনপুস্তকে এবং রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে যে দেশকে 'লাট্' বলা হইয়া থাকে সেই দেশ, অর্থাৎ 'রাঢ়' ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না।"] সহিদুল্লা সাহেব যে প্রবন্ধের কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা দেখি নাই।

শব্দ-সাদৃশ্য

বাঙ্গলা	সিংহলী	বাঙ্গলা	সিংহলী
বাতাস, বাত	বাতায়	পিঠ, পিট	পিট
শীত (পূর্ব্ববঙ্গে হিত)	সিত, হিত	স্তন	তন
বর্ষা	বাস্ম	উরু	উর
ফেনা, ফেন	পেন	হাড়, হাড্ডি	এ্যাটে
মাটি	ম্যাটি	দাঁত	দা৲ত
লোম	লোম	জিভ, জিব	দিব
মাকড়সা	মাকুলুবা	পুস্তক, পৌথা, পোত	পোত
ভিটা বা ভিটি, ভিত	* বিত্ত	জল	দল
আম্র, আম	আম্ব	সুপ্	সুপ
আতা	আতা	গুয়া (গুবাক)	পুয়া, পুয়াক
সাদা	সুদু	পেঁপে	পেপল
রাতা, রাতু (রক্তবর্ণ)	রা৲তু	কেশ	কেশ

* দৃষ্ট হইবে যে, পূর্ব্ববঙ্গের অনুরূপ সিংহলী ভাষায় "ভ"-স্থানে অনেক সময় "ব" ব্যবহৃত হয়, যথা—বাঙ্গলা "ভাত" শব্দ সিংহলীতে "বা৲ত"; পূর্ব্ববঙ্গেও ঐ "বাত" প্রচলিত। সিংহলীর "অ"কার ঠিক বাঙ্গলা অকারের মত নহে; উহা বরং বাঙ্গলার "আ"কারেরই বেশী সন্নিহিত। সিংহলী "অ"এর উচ্চারণ অর্দ্ধদীর্ঘ, কতকটা ইংরেজী ahএর মত। এ জন্য আমি তাঁহাদের "অ"কারের স্থলে বাঙ্গলায় "আ৲"কার ব্যবহার করিলাম।

বাঙ্গলা	সিংহলী	বাঙ্গলা	সিংহলী
কাণ	কা্ণ	দেব	দেউ, দেব
ছিদ্র	সিদুর	ধর্ম্ম	ধা্হম্
মুখ	মুহল	হাওয়া	ওয়া
হাত	আ্ত	লোহা	লোহ
বাহু	বাহু	উত্তর	উত্তুর
গাছ	গাস	দক্ষিণ, দখিণ	দকুন
বিবাদ	বাদ	সাত	হা্ত
প্রহার	পহা্র	আট	আ্ট
নদী, গাঙ্গ	গা্ঙ্গ	মাছুর	প্যাছুরা
সাগর, সায়ুর	সা্য়ুর	সুখ	সুক
বিল	বিল	দুঃখ	দুক
গ্রাম	গা্ম	জাল	দ্যাল
তৈল, তেল	তেল	চাল	চাল, হাল
উকুন	উকুন	কিন	তুন
স্নান করা, নাওয়া	নানওয়া	ভাত	ভাত, বা্ত
নিদ্রা যাওয়া, নিদ যাওয়া	নিদনওয়া	সর	সর
বাঁধ	বাণ	ফাঁস	পাস
উত্তম	উত্তুম	সোত বা হোত	হোয়া
চোর, চোরা	চোরু, হরা	সমুদ্র	সমুদুর
লাঙ্গল (নাঙ্গল)	নাগুল	পৌষ	পোষন
বাঘ	বগ	চৈত্য	চৈত
বিড়াল	বলালা	মানুষ	মিনিহা
ইন্দুর	উন্দুর	(পূর্ব্ববঙ্গে "মানু" ও পশ্চিমবঙ্গে "মিন্‌সে")	
মাছি, মক্ষি	ম্যাস্সা	পুত্র, পুত	পুতা
কুকুর	কুকুরু	মামা	মামা
হাঁস	হানসয়া	লো (রক্ত)	লে
ময়না	মায়িনা	কোথায়	কোহান, কোহেন
আক (ইক্ষু)	উক	গৃহ	গে
কাল	কা্লু	চন্দ্র, চাঁদ	ছান্দ, হান্দ
নীল	নীল	মা	মাও
চিনি	সিনি (উচ্চারণ 'ছিনি')	হাড়ি	হা্টি

বাঙ্গলা	সিংহলী	বাঙ্গলা	সিংহলী
ব্রাহ্মণ	বামুনা, বাবুনা	কাসি	কাস, কাস্ন
নাদা	লাডা	পিঠা	পিট
চাতাল	ছান্দাল	লবণ, লুন	লুন
আমি	আম্মা	বদনা	বদিনা
মট্‌কি	মুট্টি	শালিধান বা চাউল	হাল
পাতিল (Cooking pot)	এ্যাতিলি	বদনা	উদ্দুনা
নাও (নৌকা)	ন্যাও	কম্বল	কম্বলিয়

সিংহলী শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ও পর্তুগীজ হইতে গৃহীত, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা শব্দ, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কথিত শব্দের সঙ্গে সিংহলী শব্দের খুব মিল দেখা যায়। এরূপ তালিকা খুব দীর্ঘ করা যায়। অবশ্য ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে পরস্পরের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং অপর কোন প্রাদেশিক ভাষায় এইরূপ শব্দ-সাদৃশ্য খুঁজিয়া কতক পরিমাণে স্থির করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সঙ্গে সিংহলীর সম্বন্ধ অত্যধিক; অপর কোন ভাষার সঙ্গেই সিংহলের ভাষার এতটা সাদৃশ্য নাই। বহু শব্দ আরও আছে, যদ্দ্বারা এই সাদৃশ্য প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু শুধু শব্দ-সাদৃশ্য-দ্বারা এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার নিবিড় সম্বন্ধ নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয় না। বিভক্তি-চিহ্ন এবং বাক্য-বিন্যাসের রীতিই এই সম্বন্ধ নিশ্চয়তার সহিত সূচনা করে। এক্ষেত্রে ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ একটু সন্ধান করিলে সিংহলীর সঙ্গে বাঙ্গলার পরম ঐক্য প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। আমি স্বয়ং সিংহলী জানি না, দুই-এক জন প্রথিতযশা সিংহলীর মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

সিংহলী "সে" শব্দ "উহু" এবং "ও"-দ্বারা বুঝায়—আমাদের বাঙ্গলার "ও জানে" এবং সিংহলীতে "উ জানে না" প্রায় একরূপ। "তাহার" শব্দের সিংহলী প্রতিশব্দ="উহাগে"। পূর্ব্ববঙ্গে এই শব্দ="ওহাগো" এবং "উহাগো"। তাহারা=সিংহলীতে "ওন", "ওয়ান", "ওহন"—পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণ লোকেরা এই স্থলে "উনি", "ওনারা", "ওয়ান" বলিয়া থাকে। "আপনার" শব্দ সিংহলীতে "আপ্পগে"—পূর্ব্ববঙ্গে "আমাগো"; "আপনাকে" সিংহলীতে "আপেন"। স্ত্রীলিঙ্গে সিংহলী she শব্দ="এ্যা"; আশ্চর্য্যের বিষয়, ফরিদপুরে এখনও ছোট ছোট মেয়েদের "এ্যা" বলিয়া সম্বোধন করা হয়। "তোমার"—সিংহলীতে "তোগে", পূর্ব্ববঙ্গে "তোগো" (যথা—"তোগোর" সাথে কথা বলিব না, ইত্যাদি)।

ক্রিয়াবিশেষণেও এই সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। "কোথায়" সিংহলীতে "কোহে"—পূর্ব্ববঙ্গে "কোহানে"; সেখানে=সিংহলী "এহে"—পূর্ব্ববঙ্গে "ওহানে"; "আমি" শব্দটি সিংহলীতে "মাম্মা"—পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুথিতে "আম্মি" এবং "আম্মা"।

প্রাচীন বাঙ্গলা পুথিতে অনেক শব্দের যে রূপ পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে সিংহলীর নৈকট্য অধিকতর দৃষ্ট হয়। পুরাতন পুথিতে পুস্তক শব্দে "পোথা" ও "পোত" এই দুই রূপই পাওয়া যায়। সিংহলীতে পুস্তক="পোথ" ও "পোত"।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুথি মাত্রেই "মা" শব্দের স্থলে "মাও" পাওয়া যায়। সিংহলে "মাও" শব্দই এখনও প্রচলিত। ব্রাহ্মণ শব্দ এখনও পাড়াগাঁয়ে "বামুন" ও "বাবুন"-রূপে প্রচলিত। সিংহলীতে ঐ শব্দ "বাবুনা"। সিংহলী "পুতা" বাঙ্গলায়ও প্রচলিত ছিল, যথা—"অবু তব গিরিসুতা যায় বলে পড়ে পুতা।" বাঙ্গলায় প্রাচীনকালে দুর্গকে "কোট" বলিত। আমাদের ঢাকা জেলাতে সুয়াপুর গ্রামে একটা প্রাচীন দুর্গ যেখানে ছিল, সেখানটাকে লোকে "কোটবাড়ী" বলে। পূর্ব্ববঙ্গের বহু প্রাচীনস্থানে এই অর্থে "কোট" বা "কোটবাড়ী" ব্যবহৃত হইত। সিংহলে দুর্গকে "কোট" বলে। স্নানার্থে "নাহা" শব্দ সুপরিচিত; ঐ শব্দ ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া এখনও সিংহলে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে নদীমাত্রকে "গাঙ্গ" বলে, সিংহলেও তাহাই। বাঙ্গলায় ঘোড়া, গরু প্রভৃতির পুরীষ বুঝাইতে "নাদা" শব্দ ব্যবহৃত হয়, পূর্ব্ববঙ্গে এই শব্দ "লাদা"—সিংহলীতে উহা "লাড্ডা"। "গৃহ" শব্দ প্রাচীন বাঙ্গলায় "গেহ", "গে" এই দুই রূপেই পাওয়া যায়,—সিংহলীতে উহা "গে"। "স্রোত" শব্দ সিংহলীতে "হোয়া" —পূর্ব্ববঙ্গে "হোত"। "রক্ত" শব্দ সিংহলীতে "লে", প্রাচীন বাঙ্গলাতে "লো"। "শালিধান" সিংহলীতে "হালি"। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় এই শব্দ "হালি"-রূপেই পাওয়া যায়। তথায় "স"কার অনেক সময়ই "হ"কারে পরিণত হইয়া থাকে। "ছিদ্র" শব্দ সিংহলীতে "সিদুর", সম্ভবতঃ এই শব্দ-দ্বারাই বাঙ্গলার "সিদকাঁটা", "সিন্দেল চোর" প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা হইতে পারে। "স্তন" শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের পুথিতে "তন"-রূপে কখন কখনও দেখিয়াছি। সিংহলীতে "স্তন" শব্দ "তন"-রূপেই প্রচলিত আছে। সিংহলীতে "মুখ" শব্দে "মুহুল", প্রাচীন বাঙ্গলাতে 'মুহে', "মুহে" সপ্তমীতে ব্যবহৃত হইত। "ইন্দুর" শব্দ সিংহলীতে "উন্দুর"; প্রাচীন বাঙ্গলা পুথিতেও ঠিক এরূপ পাওয়া গিয়াছে। "উত্তর" শব্দ সিংহলীতে "উতুর", এখনও বাঙ্গলাতে "উতুরে হাওয়া"য় ঐ রূপটি বজায় আছে। "রাতু", "রাতা" (রক্তবর্ণ) প্রাচীন বাঙ্গলায় অনেক পাওয়া যায়, যথা—কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে "কার সঙ্গে ঝগড়া করি চক্ষু কৈল্লি রাতা।" সিংহলী "সমুদ্দুর",—বাঙ্গলা প্রাচীন পুথিতে ঠিক এই রূপই পাওয়া যায়।

"ধম্ম" শব্দ সিংহলীতে "ধহাম"; প্রাচীন বাঙ্গলা পল্লীর "ধামরাই", "ধামারণ" (ঢাকা জেলা) প্রভৃতি নামে ঐ ধহাম শব্দের সঙ্গে নৈকট্য সূচিত হইতেছে। বাঙ্গলার পারিবারিক উপাধিগুলির কোন কোনটি সিংহলে দৃষ্ট হয়; যথা—সেন, দাস, সিংহ, বর্দ্ধন ইত্যাদি। ছন্দের প্রকৃতিগত রূপ সিংহলী ও বাঙ্গলায় প্রায় একরূপ। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান করি নাই যেটুকু জানিয়াছি, তাহাতে এই সাদৃশ্য অতি আশ্চর্য্য। "আমি সিংহলী জানি না" এ কথা সিংহলীতে "মম সিংহলী দানে না।" (বাং) আমি জানি না=(সিং) মম না দানিমি (বাং) সে যায়, ও যায়=(সিং) ওহু যাইই। (বাং) সে দেখে, ও দেখে=(সিং

ওহু দাখি। (বাং) সে বা ও স্নান করে বা নায়=(সিং) ওহু নানওয়া। (বাং) সে বা ও আদর করে=(সিং) ওহু আদরে করনওয়া। (বাং) সে যায় বা ও যায়=(সিং) ওহু যাইই। (বাং) সে গেল=(সিং) ওহু গলা। (বাং) উহার পুস্তক আমি নেই নাই (পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গলায়—ওগোর পুথি আমি নেই নাই)=(সিং) ওহুগে পোতা মম ন গাত্তেমি। (বাং) (Imperative) যাও=(সিং) যাও (উচ্চারণের একটু সামান্য তফাৎ আছে)। (বাং) খাও=(সিং) খাও (khawa)। (বাং) ভাত খাও=(সিং) বাত খাও (khawa)। (বাং) উহাকে বা ওকে মার=(সিং) ওহু মার (marwa)। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীর ভাষার সঙ্গেই সিংহলীর বেশী মিল।

সহিদুল্লা সাহেব বিজয়কৃত সিংহলজয়-সম্বন্ধে আমাকে যে একটি ক্ষুদ্র নোট দিয়াছেন, (বিদেশী এবং বাঙ্গালী বহু পণ্ডিতই এই নোটের অনেকাংশই স্বীকার করিয়া থাকেন) তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

"The voyage of Vijay was in this order—Vanga country—Nagga Dwip, Mahila Dwip, Supparakka, Bharukaccha, corresponding to Bengal—Jaffna, Māldwip, Sopara, Broach. This order of the places shows that the voyage must have been started from the eastern coast, not the *western coast*. Vijay must have left some of his followers at Bharukaccha. These become settled there and gave the name of the older country to their new home which was afterwards corrupted to Latā, evidently the same word as Lāla.

Sinhapur is said to have been situated between Vanga and Magadha in Lāla-rattha (*SKT.* Lada Rashtra). In the Jain Prakrit books it is called Lādha. In the Prabodha-Chandrodaya it is called Raḍha. Minhaj calls it Rāl. Sinhapura or Singapura has been mentioned in some inscriptions. There it is said to be in Kalinga. The Varma kings of Bengal claimed to have come from Singapura. King Niśśankamalla (about 1200 A.D.) of Ceylon came from a dynasty of Kalinga kings who were reigning at Singapura, being of the same family from which descended Vijay—the first King of Ceylon. So Sinhapur must have been in South Raḍha which afterwards became merged in the Kalinga kingdom. Mr. Nandalal Dey identifies this Sinhapur with Singur in the district of Hughly."

"বিজয়ের সমুদ্র-অভিযান এইভাবে হইয়াছিল, বঙ্গদেশ—নগ্নদ্বীপ, মহিলাদ্বীপ, সুপ্পারক, ভরুকচ্ছ (বর্ত্তমান বাঙ্গলা—জাফ্না, মালদ্বীপ, সোপরা, ব্রুচ্)। এই অভিযান হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিজয় পূর্ব্ব-উপকূল হইতে রওনা হইয়াছিলেন। পশ্চিম-উপকূল হইতে তাঁহার যাত্রারম্ভ হইতেই পারে না। বিজয় সম্ভবতঃ তাঁহার কতকগুলি অনুচরকে ভরুকচ্ছে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহারা যে স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইস্থানটি তাঁহাদের

জন্মভূমির নামানুসারে অভিহিত করিয়াছিলেন; সেই নাম কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া "লাড়" নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই লাড় এবং আমাদের "রাঢ়" বা "লাঢ়" নিশ্চয়ই একশব্দ।

সিংহপুর বঙ্গ-মগধের মধ্যবর্ত্তী লাল-রাট্‌ঠ (সংস্কৃত লাঢ়রাষ্ট্র) নামক স্থানে অবস্থিত। জৈনদিগের প্রাকৃত গ্রন্থসমূহে এই দেশ "লাঢ়," প্রবোধচন্দ্রোদয়ে "রাঢ়" এবং মীনহাজ কর্ত্তৃক "রাল" নামে উক্ত হইয়াছে। কতকগুলি প্রাচীন লিপিতে সিঙ্গপুর বা সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল লিপিতে এই স্থান কলিঙ্গের অন্তবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত আছে। বঙ্গ-দেশের বর্ম্মবংশীয় রাজারা এই সিংহলের অধিবাসী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। সিংহলরাজ-রাজেন্দ্র নিষ্কঙ্কমল্ল (অনুমান ১২০০ খৃঃ) সিংহপুরের রাজাদের বংশে উদ্ভূত এবং তিনি সিংহলরাজ্য-স্থাপয়িতা বিজয়ের বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। সিংহপুর দক্ষিণ-রাঢ়ে অবস্থিত। ঐ নগর বিজয়ের পরে কলিঙ্গ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াগিয়াছিল। মিঃ নন্দলাল দে এই সিংহপুরকে হুগলী জেলার বর্ত্তমান সিঙ্গুর বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।"

নগেন্দ্রনাথ বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গলার পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। দুই একটি কথা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয় নাই। বাঙ্গালী গুজরাটে উপনিবেশ-স্থাপনপূর্ব্বক উক্ত দেশের একাংশকে "রাঢ়" নাম দিয়াছিলেন, সহিদুল্লা সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সম্ভবপর হইতে পারে, যতদূর জানি তিনিই এই মতের প্রথম প্রচারক। বাঙ্গালী কর্ত্তৃক গুজরাটে উপনিবেশ-স্থাপনের একটা প্রাচীন সংস্কার এ দেশে ছিল, তাহা আমরা অবগত আছি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে কালকেতুর গুজরাটে রাজ্য-স্থাপনের একটা গল্প আছে। এই গল্পটি অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দরে গুণবন্ধু রাজার পুত্র সুন্দরের এবং বৰ্দ্ধমানরাজ বীরসিংহের কন্যা বিদ্যার গল্পের ন্যায় নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর-লেখকগণ—যথা, কবিকঙ্কণ ও রামপ্রসাদ—এই গল্পের স্থান-নির্দ্দেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ যেমন গুজরাটে উপনিবেশের কথা লিখিয়াছেন, মাধবাচার্য্য এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপরাপর চণ্ডীকাব্য-লেখকগণও সেই গুজরাটেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন কাল হইতে এই সংস্কার এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে। গুজরাট বঙ্গদেশের কাছে নহে, অথচ প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীর গুজরাটে উপনিবেশ-সম্বন্ধে একটা গল্পকথা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকাংশ মিথ্যা ও অবিশ্বাস্য হইলেও মূলে কোন একটা ঐতিহাসিক ঘটনার অঙ্কুর ছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় মিঃ জে. এন. দাসগুপ্ত "মিরাট আহমদি" নামক একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শুধু কবিকঙ্কণ নহেন, উক্ত পুস্তকের মুসলমান লেখকও একটা অনুরূপ গল্প বলিয়াছেন। দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন, "The coincidence between the Hindu poet (Kavikankan) and the Mohammedan historian (author of Mirat Ahmadi) would suggest that a traditional account of the foundation

কুমারী একাকী রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন; তিনি স্বাধীন জীবনের সুখ-ভোগের জন্ম লোলুপ হইয়াছিলেন। একদল পথিক মগধের পথে যাইতেছিল, কুমারী তাহাদের সঙ্গ লইলেন। 'লাল' দেশের জঙ্গল-পথে তাঁহারা এক সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। যে যে-দিকে পারে পলাইয়া গেল, কিন্তু রাজকুমারী যে পথ দিয়া সিংহ যাইতেছিল, সেই পথে চলিলেন।

রাজকুমারীর পিত্রালয়-ত্যাগ।

সিংহ যখন স্বীয় আহার্য্য ভোজনান্তে স্বস্থানে যাইতেছিল, তখন দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। সিংহ সেই রমণীর মোহে পড়িয়া গেল। সে লেজ নাড়িয়া কুমারীর নিকটবর্ত্তী হইল এবং তাহার দুইকর্ণ তখন ঝুলিয়া পড়িল। সিংহকে দেখিয়া কুমারীর দৈবজ্ঞের কথা মনে উদিত হইল এবং তিনি নির্ভয়ে তাহার গাত্রে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার কোমল স্পর্শে সিংহ গাঢ়তররূপে আকৃষ্ট হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া স্বীয় গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইল; সেখানে রাজকুমারীর সঙ্গে পশুরাজের মিলন ঘটিল। এই মিলনের ফলে রাজকুমারীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এই দুইটি যমজ সন্তান জন্মলাভ করিল।

সিংহের সহিত মিলন।

ছেলেটির হাত ও পা কতকটা সিংহের মত হইয়াছিল, এই জন্ম তাহার মাতা তাঁহার নাম সিংহবাহু রাখিলেন। কুমারীর নাম হইল সিংহসিবলী। ছেলের বয়স যখন ষোল হইল, তখন সে নিজের মনের একটা সন্দেহ-সম্বন্ধে তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার সঙ্গে আমাদের পিতার চেহারার এতটা বৈষম্য কেন?" তখন রাজকুমারী সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া পুত্র বলিল,—"চল, আমরা এ স্থান হইতে দেশে ফিরিয়া যাই।" মাতা বলিলেন, "তোমার পিতা একটা পাথর দিয়া এই গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যান।" তখন পুত্র সেই মস্ত পাথরটা কাঁধে করিয়া লইয়া ৪০০ মাইল পথ এক দিনে যাতায়াত করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মাতা ও ভগিনী সহ সিংহবাহুর পলায়ন।

ইহার পরে একদিন সিংহ শিকারের জন্ম চলিয়া গেল। সিংহবাহু এক স্কন্ধে তাঁহার মাতা ও অপর স্কন্ধে তাঁহার ভগিনীকে লইয়া খুব হাঁটিয়া চলিলেন। তাঁহারা কাপড়ের অভাবে গাছের পাতা ও লতা পরিয়াছিলেন। এই ভাবে তাঁহারা একটি পল্লীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে বঙ্গাধিপের এক ভাগিনেয় তাঁহার অধীনে সৈন্তাধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন। এই সেনাপতির নাম অনুর। তিনি বঙ্গের প্রান্তভাগের শাসন-কর্তৃত্ব করিতেন। যে সময় রাজকন্যা তদীয় পুত্র ও দুহিতার সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন, ঠিক সেই সময়ে তথাকার শাসনকর্ত্তা দৈবক্রমে তথায় একটি বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" রাজকন্যা বলিলেন, "আমরা বনবাসী।" শাসনকর্ত্তা তাঁহার লোকদিগকে

বলিয়া তাঁহাদিগকে বস্ত্রদান করিলেন। তাঁহারা সেই বস্ত্র পরিধানমাত্র তাহা বহুমূল্য পরিচ্ছদে পরিণত হইল।

শাসনকর্ত্তা অমুর তাঁহাদিগকে বৃক্ষপত্রে আহার্য্যদান করিলেন, কিন্তু সেই বৃক্ষপত্র তাঁহাদের প্রভাবে স্বর্ণনির্ম্মিত ভোজনপাত্রে পরিণত হইয়া গেল। বিস্মিত হইয়া শাসনকর্ত্তা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা কে?" তখন রাজকন্যা তাঁহাকে স্বীয় বংশ ও কুলের কথা বলিলেন। তখন শাসনকর্ত্তা তাঁহার মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিলেন।

বঙ্গের উপকণ্ঠে।

এ দিকে শিকার হইতে ফিরিয়া সিংহ তাহার পরিবারবর্গকে না-দেখিতে পাইয়া—বিশেষতঃ পুত্রহারা হইয়া—অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িল। সে আহার ও পানীয় ত্যাগ করিল এবং তাহাদিগের উদ্দেশে বঙ্গদেশের উপান্তবর্ত্তী পল্লীসমূহ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তৎপল্লীর অধিবাসীরা তাহার ভয়ে বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। সেই প্রান্তভাগের লোকেরা রাজার নিকট আসিয়া নালিশ করিল, "মহারাজ! একটা সিংহের দৌরাত্ম্যে আপনার রাজ্যে লোক বাস করিতে পারিতেছে না। আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।"

সিংহের অত্যাচার।

রাজা এমন কোন লোক পাইলেন না যে, এই বিপদ্ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। তখন রাজা হাতীর পিঠে সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি তোড়া রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন—"যে কোনও ব্যক্তি সিংহকে ধরিয়া আনিবে, এই তোড়া তাহারই হইবে।" তারপরে রাজা সেই তোড়ার মুদ্রাসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে দ্বিসহস্র ও শেষে ত্রিসহস্র স্বর্ণমুদ্রার পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। সিংহবাহু দুই বার এই কার্য্যে ব্রতী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা দুই বারই তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন; কিন্তু তিন বারের বার সিংহবাহু নিজের পিতাকে নিধন করিয়া ত্রিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিবার জন্য প্রয়াণ করিলেন।

সিংহবাহুকে রাজপুরুষেরা রাজসভায় উপস্থিত করাইল। রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি যদি এই সিংহকে বধ করিতে পার তবে রাজসিংহাসন তোমারই হইবে।"

সিংহবাহু সিংহের গর্ত্তের মুখে উপস্থিত হইলেন। দুর হইতে পুত্রকে পুনারাগত দেখিয়া অতি স্নেহবশতঃ সিংহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সিংহবাহু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর ছুড়িলেন। তীর সিংহের ঠিক মস্তকের উপরে পতিত হইল, কিন্তু বাৎসল্যের এরূপই প্রভাব যে সেই তীর সিংহের কোন ক্ষতি করিল না। সিংহের কপালে ঠেকিয়া উহা ফিরিয়া আসিয়া সিংহবাহুর পাদমূলে পড়িল। তিন বার এইভাবে সিংহবাহুর বাণ ব্যর্থ হইয়া গেল, কিন্তু চতুর্থ বারে সিংহের ক্রোধ হইল। ক্রোধ হওয়া মাত্র চতুর্থ বারের নিক্ষিপ্ত শর তাহার শরীর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

সিংহবাহু কর্ত্তৃক পিতৃবধ।

সিংহবাহু কেশরযুক্ত সিংহ-মস্তকটি লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই সময়ের সাত দিন পূর্ব্বে বঙ্গাধিপের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। রাজার কোন পুত্র ছিল না। মন্ত্রীরা

of Gujrat was long prevalent in Hindustan." (Bengal in the Sixteenth Century, p. 176.) এই দুইটাই উপন্যাস এবং ইহাদের মধ্যে হয়ত এইটুকু সত্য যে হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, বিদেশীরা গুজরাটের কতকাংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অল্পকালের জন্য তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর গুজরাট-অঞ্চলে উপনিবেশ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ দত্ত, এম. এ., পি. আর. এস., ডি. এস্-সি. মহাশয় সম্প্রতি আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন :—

"১৯১৯ সালে আমি গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়ারে ভ্রমণ করিতেছিলাম এবং ১৯২১ সালে আমি মধ্যপ্রদেশ ও মিরাটে কিছু কালের জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম। কাথিয়ারে ওয়ান্ধান নামক স্থানে আমি 'উদীচ্য যুবক মণ্ডলীর" সঙ্গে ছিলাম। ইহারা ব্রাহ্মণ এবং "উদীচ্য গৌড় ব্রাহ্মণ" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহারা বলেন যে, বহু কাল পূর্ব্বে এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে ইহারা তথায় আসিয়াছেন। এই গুজরাটবাসী ব্রাহ্মণেরা "গৌড় ব্রাহ্মণ" এবং যখন এলাহাবাদের নিকট কোন স্থান ইহাদের আদিম দেশ, তখন আমি ইহাদিগকে আমাদের বাঙ্গলার গৌড়ের অধিবাসী বলিয়াই অনুমান করিলাম। মিরাট সহর হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী খারখোদা নামক স্থানে আমি স্বামী সোমতীর্থ মহোদয়ের আশ্রমে বাস করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা "তাগা-ব্রাহ্মণ" এবং তাঁহাদের প্রাচীন কুলজীগ্রন্থ-অনুসারে তাঁহারা "গৌড় বাঙ্গলা" হইতে আসিয়া তদ্দেশে বাস করিতেছেন। এইরূপ "গৌড় ব্রাহ্মণ" আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিমে আরও অনেক স্থানে আছেন। আমার মনে হয়, প্রাচীনকালে বাঙ্গলা দেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ ঐ সকল অঞ্চলে গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মিরাট ও তাহার নিকটবর্ত্তী বুলন্দসহরাদি জেলাতে প্রায় চার লক্ষ "গৌড় ব্রাহ্মণ" বাস করেন; ইহারা নিজেই যখন গৌড় বাঙ্গলা হইতে আসিয়াছেন বলেন, তখন তাঁহারা যে বাঙ্গালী সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।"

বাঙ্গালীর সঙ্গে সিংহলের সংস্রব বহু পূর্ব্ব হইতে এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে। শুধু ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর নহে, বাঙ্গলার যে কোন বণিক্ বাণিজ্যে যাইবেন—তাঁহাকে সফর করিতে সিংহলে যাইতেই হইবে। বঙ্গীয় বহু প্রাচীন কাব্যে এ দেশের বণিক্‌দের সিংহলে যাতায়াতের কথা উল্লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা বাঙ্গলার সঙ্গে সিংহলের একটা ব্যাপক সম্পর্ক প্রতিপন্ন হয় এবং সিংহলে বাঙ্গালীর যে একটা স্থায়ী রকমের আড্ডা ছিল—এই সকল কাহিনী তাহার অপরোক্ষ ইঙ্গিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বস্তুতঃ বাঙ্গালী জাবা, বালী, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া, শ্যাম, জাপান ও চীন প্রভৃতি বহু স্থানে সেই ইতিহাস-পূর্ব্বযুগে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়ের এই কীর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অজন্তার বিশ্ববিশ্রুত চিত্রাবলির মধ্যে সিংহল দেশে বিজয়ের অভিযান-

শীর্ষক চিত্রটি সর্ব্বচিত্রের মধ্যে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছে। এই চিত্রাবলির বহুমূল্য মুক্তামালার মধ্যে বিজয়কৃত সিংহলবিজয় মধ্যমণিস্বরূপ। অজন্তার চিত্রাবলির ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ আমি নিম্নে দিতেছি; ইহা লেডি হ্যারিঙ্গহামের "অজন্তা-দৃশ্যাবলি" পুস্তকে উদ্ধৃত কুমারী কোরাথ এম্. লার্চারের মন্তব্য হইতে সঙ্কলিত হইল :—"এই চিত্রাবলির মধ্যে সিংহল-যুদ্ধ-শীর্ষক অত্যাশ্চর্য্য চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে। যদিও এই ছবিটি চিত্রকারিণী লেডি হ্যারিঙ্গহামের ঠিক মনের মত প্রতিলিপি হয় নাই, তথাপি এই পর্য্যায়ের চিত্রগুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তম এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল চিত্রের উপরিভাগ মাঝে মাঝে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (হয়ত ইচ্ছা করিয়াই কেহ এইভাবে কীর্ত্তিহানি করিয়া থাকিবে, অথবা অন্য কারণেও ইহা হইতে পারে) কিন্তু ইহার বর্ণের উজ্জ্বলতা অনেক পরিমাণে এখনও বিদ্যমান। ছবিগুলি ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মহান্ সমাবেশ অতি চমৎকার! পৃথক্ করিয়া দেখিলে এক এক পর্য্যায়ের ছবি এক একটি মণির ন্যায় বোধ হয়। অপূর্ব্বাকৃতি হস্তীগুলির বৃহৎ তোরণের মধ্য দিয়া যুদ্ধার্থে অভিযান, সৈন্যসমূহের বর্শাক্ষেপ-সহ যুদ্ধোদ্যম, আকাশে উড্ডীন তীররাজি, সমরক্ষেত্রে ভীতিদায়ক দৈত্যদানবের আবির্ভাব, পটোর্দ্ধে নর্ত্তকীদের চারু নর্ত্তন, গায়ক-বাদকদের সঙ্গ, রাজার অভিষেক—এই সমস্ত ছোট ছোট সুন্দর চিত্র-সংবলিত যে মহৎ দৃশ্য অবতারিত হইয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। অজন্তা গুহার চিত্রাবলির দ্বিধাশূন্য নিখুঁত কলানৈপুণ্য বিশ্ববিশ্রুত, কিন্তু এই চিত্রখানি অপরাপর সমস্ত চিত্রকে হার মানাইয়াছে।"

অজন্তা গুহায় সিংহল বিজয়ের চিত্রাবলি।

মহাবংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহলে আগমন *

বঙ্গদেশের রাজধানীতে বহুকাল এক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কলিঙ্গরাজার দুহিতাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাহার একটি কন্যা হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিলেন, "এই কন্যার সঙ্গে পশুপতির মিলন হইবে।" কন্যাটি অতি সুন্দর ও স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিলেন—রাজা ও রাণী ইঁহার ব্যবহারে লজ্জিত থাকিতেন। (দীপবংশে ইঁহার নাম "সুসিমা" বলিয়া লিখিত আছে।)

* উইলহেলেম্ গাইগার, পি-এচ্.ডি. এবং ম্যাবেল হেইনেস্ বোড, পি-এচ্.ডি-কৃত ইংরাজী অনুবাদ [illegible] এই বিবরণ সংকলিত হইল।

সাত শত অনুচরের একটিকেও ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া বিজয় ভীত হইলেন। তিনি পঞ্চাস্ত্রে (খড়্গ, ধনু, যুদ্ধকুঠার, বর্শা এবং বর্ম্ম) সজ্জিত হইয়া সেই পুকুরের তীরে উপনীত হইলেন; তথায় তিনি কোন অনুচরের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, শুধু সেই অতি সুন্দর বাপীতটে সন্ন্যাসিনীবেশী সেই স্ত্রীলোককে দেখিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "নিশ্চয়ই আমার অনুচরেরা এই রমণীর প্রভাবে বশীভূত হইয়াছে।" তখন তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলেন, "মহাশয়া! আপনি কি আমার লোকগুলিকে দেখিয়াছেন?" যক্ষী বলিল, "যুবরাজ! আপনি সেই সকল লোকজন দিয়া কি করিবেন? আপনি পুকুরে স্নান করিয়া জলপান-পূর্ব্বক শান্ত হউন।"

বিজয় কর্ত্তৃক যক্ষরাজ্য-অধিকার।

এই কথায় বিজয়ের মনে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেল,—"এই রমণী নিশ্চয়ই যক্ষী, সে আমার পদমর্য্যাদা-সম্বন্ধে সবই জানে।" তখন তাড়াতাড়ি তিনি ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া স্বীয় নাম ঘোষণাপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার ধনুর্গুণ-দ্বারা যক্ষীর কণ্ঠ বাঁধিয়া বামহস্তে তাহার কেশরাশি আকর্ষণপূর্ব্বক অন্যহস্তে নিষ্কাষিত কৃপাণ উত্থিত করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "দাসি! তুমি আমার সাত শত লোক ফিরাইয়া দাও, নতুবা আমি তোমাকে বধ করিব।" তখন ভীতা হইয়া যক্ষী অনুনয়পূর্ব্বক রাজকুমারের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিল এবং বলিল, "আমার জীবন দান করুন, প্রতিদানে আমি আপনাকে একটি সাম্রাজ্য দান করিব এবং স্ত্রীজনোচিত যে ব্যবহার আপনি ইচ্ছা করিবেন এবং যে সেবা আপনি চাহিবেন, তাহা সমস্তই দিব।"

যক্ষী পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই জন্য বিজয় তাহাকে দিয়া শপথ করাইয়া লইলেন এবং যে মুহূর্ত্তে তিনি আদেশ করিলেন, "আমার অনুচরদিগকে এখনই লইয়া আইস" তখনই যক্ষী তাহাদিগকে তথায় লইয়া আসিল। ইহার পর রাজকুমার বলিলেন, "আমার লোকজন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে।" তখনই যক্ষী প্রচুর চাউল, নানারূপ খাদ্যদ্রব্য এবং অপরাপর বহু সামগ্রী তাঁহাকে আনিয়া দিল। যে সকল বণিকেরা জাহাজে তথায় আসিয়াছিল এবং যাহাদিগকে যক্ষগণ খাইয়া ফেলিয়াছিল, এ সকল জিনিষপত্র ও খাদ্যদ্রব্য তাহাদেরই ছিল। সেই সমস্ত দ্রব্য-দ্বারা বিজয়ের লোকজনেরা অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিল, তৎপরে তাহারা একত্র বসিয়া আহার করিল।

বিজয় স্বয়ং সেই খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ যক্ষীকে দিয়াছিলেন, সে তাহা আহার করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিল। যক্ষী ষোড়শ-বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী রমণীর বেশে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিজয়ের নিকট উপস্থিত হইল। একটি বৃহৎ তরুচ্ছায়ায় যক্ষী অতি চমৎকার শয্যা রচনা করিল। একটি শিবিরের দ্বারা সেই স্থানটি উৎকৃষ্টরূপে আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল এবং তাহার ঊর্দ্ধে একটি অভ্রাতপ বিরাজিত ছিল। এই সকল আয়োজন দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রাজকুমার সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং যক্ষীকে সেই শয্যায়

যক্ষীকে শয্যা-সঙ্গিনী করা।

স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে বহু সুফলাভের আশায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচরেরা-শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিল।

রাত্রে রাজকুমার নানারূপ বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে শায়িতা যক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সমস্ত গোলমাল কিসের ?" যক্ষী মনে মনে চিন্তা করিল, "এখন ইনিই আমার প্রভু, আমি ইঁহাকেই এই রাজ্য দান করিব। যক্ষগুলিকে সমূলে বধ করিতে হইবে। যদি তাহা না করিতে পারি, তবে আমাকর্ত্তৃক ইঁহারা এইখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিয়া তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।"

যক্ষী বিজয়কে বলিল, "এইখানে যক্ষদের একটি রাজধানী আছে, তাহার নাম সিরিসাবত্থ। যক্ষ-রাজার নাম কালসেন। লঙ্কাধিপ যক্ষপতির কন্যাকে এখানে আনা

কুবন্না যক্ষীর সাহায্যে বিজয় কর্ত্তৃক কালসেন নামক যক্ষরাজের পরাজয়।
(অজন্তা-চিত্র হইতে গৃহীত)

হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার মাতাও আসিয়াছেন। এই কন্যার বিবাহোপলক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে। বহু যক্ষ এখানে সমাগত হইয়াছে, এই কলরব তাহাদের।

সিংহবাহু বিক্রমের নিদর্শন পাইয়াছিলেন; তাঁহারা জানিয়াছিলেন, সিংহবাহু মৃতরাজার দৌহিত্র এবং তাঁহার মাতাকেও চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া সিংহবাহুকে অভিনন্দনপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনিই আমাদের রাজা হউন।" সিংহবাহু রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার ধর্ম্মপিতাকে (মাতার স্বামী) অর্পণ করিয়া সিংহসিবলীকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় জন্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই নগরীর নাম হইল "সিংহপুর।" এই নগরীর চতুষ্পার্শ্বে ৪০০ ক্রোশ ব্যাপিয়া তিনি বহু পল্লী স্থাপন করিলেন।" লা'লদেশে"—সেই রাজধানীতে সিংহবাহু রাজত্ব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সিংহসিবলীকে রাজ্ঞীস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। বিবাহের পরে রাজ্ঞী ১৬ বার প্রসব করিলেন। প্রত্যেক বারেই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বিজয় এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুমিত্ত (সুমিত্র) রাখা হইল। যথাসময়ে রাজা বিজয়কে যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সর্ব্বসমেত রাজার ৩২টি পুত্র হইয়াছিল।

সিংহবা[illegible] ছাড়িয়া না[illegible] রাজধানী স্থাপন।

বিজয় অতি দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সঙ্গীরাও তাঁহারই মত ছিলেন। ইহারা রাজ্যে অসহনীয় অত্যাচার করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে তাঁহাদের সমস্ত ব্যবহারের কথা জানাইল। রাজা মন্ত্রীদিগকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিলেন এবং পুত্রের তীব্র নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবরাজ রাজার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। এইরূপে এক বার, দুই বার এবং তিন বারেও রাজার কথায় যুবরাজের চরিত্রের কোন উন্নতি হইল না। তখন প্রজাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিল,—"মহারাজ। আপনি পুত্রকে বধ করুন।" বিজয় ও তাঁহার শত শত সঙ্গীর মস্তকের অর্দ্ধভাগ মুণ্ডন করাইয়া রাজা তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসন দিলেন। তাঁহাদিগের স্ত্রী ও পুত্রকন্যা-সহ জাহাজে উঠাইয়া দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সমুদ্রপথের যাত্রী করাইলেন। স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রেরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে আগমনপূর্ব্বক তথায় বসবাস করিতে লাগিল। যেস্থানে বালকগণ উপনিবিষ্ট হইল, তাহার নাম হইল নগ্নদ্বীপ; মহিলাগণ যেখানে রহিলেন, তাহার নাম হইল মহিলাদ্বীপ; কিন্তু বিজয় যে বন্দরে গেলেন, তাহার নাম সুপ্পারক। কিন্তু সেখানে তাঁহার সঙ্গীদের দৌরাত্ম্যে বিপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার তিনি সমুদ্রপথে যাত্রা করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ বিজয় অবশেষে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইলেন। তথায় তাম্রপর্ণী নামক স্থানে তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে দিন ভগবান্ তথাগত যমজ সন্তানের ন্যায় পরিদৃশ্যমান দুইটি শালতরুর অবকাশস্থলে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই দিনই বিজয় লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিলেন। এইখানে মহাবংশ নামক গ্রন্থের বিজয়ের আগমন-শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। এই মহাবংশ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের চিত্তপ্রশমন, স্থৈর্য্য ও আনন্দের জন্য সঙ্কলিত হইল।

বিজয়-চরিত্র।

লঙ্কায় আগমন।

মহাবংশের সপ্তমাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহল-বিজয়

যখন জগতের অনন্তশরণ তথাগত ভূলোকের উদ্ধার সাধন করিয়া চিরমঙ্গলময় শান্তির শেখরদেশে আরোহণপূর্ব্বক নির্ব্বাণ-শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন সেই মহাজ্ঞানী বাক্যকোবিদগণের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব সমস্ত দেবতাগণের সমক্ষে সন্নিকটে দণ্ডায়মান দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সিংহবাহু-তনয় বিজয় সাত শত সঙ্গিসহ 'লাল-দেশ' হইতে লঙ্কায় আসিতেছে। হে দেবরাজ! লঙ্কায় আমার ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত হইবে, অতএব আপনি সাবধানতার সহিত বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে লঙ্কায় রক্ষা করিবেন।" যখন দেবরাজ তথাগতের এই কথা শ্রবণ করিলেন, তখনই তিনি তাঁহার সম্মানার্থ নীলোৎপল বর্ণদেবের (বিষ্ণুর) উপর লঙ্কারক্ষার ভার ও অভিভাবকত্ব প্রদান করিলেন। শক্র হইতে এই ভার প্রাপ্তি মাত্র সেই দেবতা লঙ্কায় উপনীত হইয়া কোন ভ্রমণশীল সাধুর ছদ্মবেশে তথায় এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। বিজয়ের সঙ্গিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! এই দ্বীপের নাম কি?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "এখানে কোন মানুষ নাই, কিন্তু তোমাদের কোন বিপদ্ ঘটিবে না।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার কমণ্ডলু হইতে তাহাদের গাত্রে জল ছিটাইয়া দিলেন, তৎপরে তাহাদের হস্তে রক্ষি-বন্ধনপূর্ব্বক আকাশপথে অন্তর্ধান হইয়া গেলেন।

তখন তথায় কুকুরীর বেশে এক যক্ষী উপস্থিত হইল। এই যক্ষী ছিল 'কুবন্না' নাম্নী যক্ষীর সহচরী। বিজয়ের এক অনুচর কুকুরীর পশ্চাতে ধাবিত হইল, কিন্তু বিজয় তাহাকে মানা করিয়াছিলেন। সে ভাবিল, নিশ্চয়ই এখানে কোন পল্লী আছে, নতুবা কুকুর থাকিত না। সেই কুকুরী-বেশিনী যক্ষীর অধিকারিণী কুবন্না নাম্নী যক্ষী অনতিদূরে এক বৃক্ষের নীচে বসিয়া সন্ন্যাসিনীর ন্যায় চরকা-দ্বারা সূতা কাটিতেছিল। বিজয়ের অনুচর সন্ন্যাসিনীকে একটা বাপীতীরে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া সেই পুকুরের জলে স্নান করিয়া জলপান করিল, তৎপরে কতকগুলি পদ্মনাল ভাঙ্গিয়া লইল এবং পদ্মপত্রে কিছু জল সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যক্ষী তখন তাহাকে বলিল "যেখানে আছ, ঠিক সেইখানেই থাক; এখন তুমি আমার করতলগত হইয়াছ।" এই কথা উচ্চারণ করামাত্র সেই লোকটি সেখানে বন্দীর মত হইয়া রহিল, তাহার নড়িবার শক্তি লুপ্ত হইল। কিন্তু তাহার হাতে যে রাখী বাঁধা ছিল তাহার গুণে সেই যক্ষী তাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারিল না। যদিও যক্ষী তাহার রাখীটা খুলিয়া ফেলিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, লোকটি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইল না। তখন যক্ষী তাহাকে আক্রমণ করিল এবং জোর করিয়া একটা গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যক্ষী বিজয়ের সাত শত অনুচরের সকলকেই সেই গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

যদি তুমি আজই ইহাদিগকে বধ কর, তবে পারিবে ; কিন্তু ইহার পরে আর তাহা সম্ভবপর হইবে না।"

বিজয় বলিলেন, "আমি ইহাদিগের সঙ্গে কিরূপে পারিব ? ইহারা তো অদৃশ্য হইয়া থাকে ?" যক্ষী বলিল, "সে যাহাই হউক, তুমি ভীত হইও না; আমি যেখানে যেখানে চীৎকার করিব, তুমি সেইখানে সেইখানে লক্ষ্য-সন্ধান করিবে। আমার যাদুবিদ্যার গুণে তোমার অস্ত্র তাহাদের শরীরে পতিত হইবে।" এই কথা শ্রবণমাত্র বিজয় যক্ষীর উপদেশানুসারে যক্ষদিগকে সংহার করিলেন। এইভাবে জয়লাভ করিয়া তিনি যক্ষরাজের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে অপর একজনকেও সেইরূপ পরিচ্ছদ দিলেন।

যক্ষ-বিজয়।

কতকদিন সেইখানে বাস করিয়া বিজয় তাম্রপাণি নগরে গমন করিলেন, এইখানে এক রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেই যক্ষীকে লইয়া স্বীয় মন্ত্রিবর্গসহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

যখন বিজয়ের সঙ্গীরা লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া শ্রান্তক্লান্ত-দেহে মাটীর উপর হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই দেশের লাল মাটীর গুণে তাঁহাদের করতল তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইজন্য তাঁহারা সেই স্থানের নাম "তাম্রপাণি" রাখিয়াছিলেন। এদিকে বিজয়ের পিতা সিংহবাহু সিংহবধ করার জন্য "সিংহল" নাম পাইয়াছিলেন; তদবধি তাঁহার সহচর ও আত্মীয়গণ ঐ নামে পরিচিত হইতেন; এই সংস্রবহেতু বিজয়ের লোকজনেরাও "সিংহল" নামে অভিহিত হইতেন।

যুদ্ধ-জয়ান্তে বিজয়ের প্রমোদোৎসব।
(অজন্তা-চিত্র হইতে গৃহীত)

বিজয়ের মন্ত্রীদিগের মধ্যে সেখানে কেহ কেহ নূতন নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। কদম্ব নদীর তীরে অনুরুদ্ধ নামক বিজয়ের এক অমাত্য "অনুরুদ্ধ" গাম (অনুরুদ্ধ গ্রাম) স্থাপন করেন। ঐ গ্রামের উত্তরে গাম্ভীরা নদীর তীরে পুরোহিত উপতিস্য "উপতিস্য" গাম (উপতিস্য গাম) সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয়ের আর তিন জন অমাত্য উজ্জনি, উরুবিধ এবং বিজিত নামক তিন পল্লী স্থাপন করেন।

নূতন নূতন নগর-স্থাপন।

এই দেশে অধিকার স্থাপিত হইলে সকলে বিজয়ের নিকট প্রার্থনা করিল, "আপনি আমাদের রাজপদে অভিষিক্ত হউন।" কিন্তু তাহাদের বারংবার প্রার্থনাসত্ত্বেও বিজয় বলিলেন, "যদি উচ্চকুলের কোন রমণী রাজ্ঞী হইয়া আমার সঙ্গে একত্র অভিষিক্ত না হন, তবে সহধর্ম্মিণী-হীন অবস্থায় কিছুতেই আমার অভিষেক হইতে পারে না।" কিন্তু তাঁহার অমাত্যবর্গের দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল, যে করিয়া হউক বিজয়কে রাজ্যাভিষিক্ত করিতেই হইবে। অবশ্য কাজটা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা দমিবার পাত্র নহেন, সুতরাং নিরাশ হইলেন না। তাঁহারা বহুসংখ্যক বহুমূল্য মণিমুক্তা ও অপরাপর সামগ্রীসহ দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ডু রাজার নিকট তাঁহার কন্যার সহিত বিজয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইলেন; তাঁহারা নিজেদের এবং অপরাপর ব্যক্তিগণের জন্যও সেইরূপ যোগ্যা কন্যার সন্ধানে দূতদিগকে অবহিত করিয়া দিলেন। যখন দূতেরা জাহাজে চড়িয়া মাদুরায় উপস্থিত হইল, তখন তাহারা মাদুরার রাজাকে সেই সকল উপহার ও পত্র প্রদান করিল।

দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ডু রাজা।

বিজয়ের অভিষেক।
(অজন্তা-চিত্র হইতে গৃহীত)

মাদুরার রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্বীয় কন্যাকে লঙ্কায় প্রেরণ করা স্থির করিলেন। বিজয়ের মন্ত্রীদের জন্যও তিনি আরও এক শত কন্যা প্রেরণ করা সংকল্প করিয়া নগরে ঢোল দিয়া ঘোষণা করিলেন, "যাহারা তাঁহাদের কুমারী কন্যাদিগকে লঙ্কায় পাঠাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা কন্যাদিগকে দুই প্রস্ত পরিচ্ছদসহ রাজদ্বারে উপস্থিত করাইবেন; তাহা হইলেই আমি তাহাদিগকে গ্রহণ করিব।"

এইভাবে তিনি বহুসংখ্যক কুমারী সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে ক্ষতিপূরণার্থে পণ দান করিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় কুমারীকে নানারূপ অলঙ্কার ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী এবং পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করিলেন। তিনি পদমর্য্যাদা-অনুসারে অন্যান্য কুমারীদিগকে উপযুক্ত বেশভূষা দিয়া সজ্জিত করাইলেন। বহু অশ্ব, গজ এবং শকট-সমাবেশে রাজযোগ্য মিছিল চলিল; তৎসঙ্গে অষ্টাদশ শিল্পীর এক সহস্র

পরিবারবর্গ লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিল। রাজদূত রাজার পত্রসহ মহারাজ বিজয়ের জন্য এই সকল উপঢৌকন ও কুমারীদিগকে লইয়া যাত্রা করিল। এই বিপুল জনতা লঙ্কার মহাতীর্থ (মহাতিত্ত) নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের উপস্থিতির স্মারক-স্বরূপ উত্তরকালে এই স্থানটির নাম 'মহাতীর্থ' হইয়াছিল।

সেই যক্ষীর গর্ভে বিজয়ের একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছিল। যখন বিজয় শুনিলেন, রাজকুমারী সিংহলে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন যক্ষীকে বলিলেন, "প্রিয়তমে, এই বেলা তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর; তুমি তোমার পুত্রকন্যাকে আমার নিকট রাখিয়া যাইতে পার। মানুষেরা তোমাদের মত যক্ষীদিগকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া যক্ষী তাহার স্বগণ যক্ষদিগের ভয়ে অত্যন্ত আতঙ্কিত হইল। বিজয় বলিলেন, "বিলম্ব করিও না, আমি তোমাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া নৈবেদ্য দান করিব।" যখন পুনঃ পুনঃ সকাতর-ভাবে প্রার্থনা করিয়াও যক্ষী নিষ্ফল হইল, তখন সে তাহার দুইটি সন্তান লইয়া তথা হইতে লঙ্কায় চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মনে সর্ব্বদা আশঙ্কা হইতেছিল যে তাহার কোন বিপদ্ ঘটিবে।

যক্ষীর মৃত্যু ও তাহার পুত্রকন্যার কথা।

লঙ্কা নগরীতে পৌঁছিয়া সে তাহার সন্তান দুইটিকে পুরীর দ্বারে রাখিয়া স্বয়ং একাকী নগরীতে প্রবেশ করিল। লঙ্কাবাসী যক্ষেরা তাহাকে চিনিতে পারিল এবং আশঙ্কা করিল যে সে বিজয়ের গুপ্তচর; তাহারা এই বিশ্বাসে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে এক দুর্দ্দান্ত যক্ষ একটি মুষ্টির আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিল। কিন্তু যক্ষীর এক মাতুল যক্ষপুরী হইতে নির্গত হইয়া পথে সেই বালক-বালিকাকে দেখিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? কাহার সন্তান?" এবং যখন শুনিল যে তাহারা কুবণ্ণার পুত্রকন্যা, তখন বলিল "তোমাদের মাতাকে যক্ষগণ হত্যা করিয়াছে, তোমাদিগকে দেখিতে পাইলেও তাহারা মারিয়া ফেলিবে, সুতরাং অগোচরে অতি দ্রুত পলাইয়া যাও।" তাহারা যথাসাধ্য দ্রুত গমন করিয়া সুমনকূটে উপস্থিত হইল। বালকটি বড় ও কন্যাটি ছোট ছিল। বালক বয়স্ক হইয়া নিজ ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহাদের বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইল, তখন তাহারা রাজার আদেশ লইয়া মলয় পর্ব্বতে বাস করিল। ইহাদিগেরই বংশধরেরা "পুলিন্দ" নামে খ্যাত হইয়াছে।

পাণ্ডু রাজার দূতেরা বিজয়কে রাজকন্যাসহ সেই সকল বহুমূল্য রত্নাদি ও কুমারীগণ অর্পণ করিল। বিজয় এই সকল দূতদের যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিয়া সম্মানিত করিলেন এবং কুমারীদের সহিত পদমর্য্যাদানুসারে স্বীয় মন্ত্রী এবং সেনাপতিদের বিবাহ দিলেন। মন্ত্রীরা এইবার তাঁহাকে রীতি-অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া একটি মহৎ উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। বিজয় রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পাণ্ডুরাজ-কন্যাকে সমারোহের সহিত বিবাহ করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্ঞীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি এই উপলক্ষে তাঁহার মন্ত্রীদিগকে অনেক ধন দান করিয়াছিলেন এবং তদবধি বৎসর বৎসর তিনি তাঁহার শ্বশুর পাণ্ডুরাজকে এক একটি মুক্তা উপহার পাঠাইতেন, এই মুক্তার মূল্য ছিল দুই লক্ষ মুদ্রা।

অতীতের দুর্ব্বৃত্ত জীবন পরিহারপূর্ব্বক এই নৃপতি সমস্ত লঙ্কার অধিপতি হইয়া অতিশয় ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্ব শান্তিপূর্ণ ও সুখময় হইয়াছিল। 'তাম্বপাণি' নগরে তিনি এইভাবে আটত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিজয়ের রাজ্যাভিষেক নামক মহাবংশের সপ্তম অধ্যায় এইখানে পরিসমাপ্ত হইল। এই পুস্তক সুধীজনের চিত্তপ্রশমন, স্থৈর্য্য ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দদানের জন্য সঙ্কলিত হইল।

মহাবংশের অষ্টমাধ্যায়ে পাণ্ডুবাসুদেবের রাজ্যাভিষেক

রাজাধিরাজ বিজয় জীবনের শেষ বৎসর চিন্তা করিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার কোন পুত্র নাই। এই মহারাজ্য বহুকষ্টে আমি গঠন করিয়াছি এবং ইহা বহুলোকাবাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সুগঠিত বিশাল রাজ্য আমার মৃত্যুর পর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং আমার ভ্রাতা সুমিত্রকে আনাইয়া তাঁহাকে এই রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।" তিনি মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ভ্রাতার নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এই পত্র-প্রেরণের কয়েকদিন পরেই বিজয় রাজার মৃত্যু হইল।

বিজয় কর্ত্তৃক স্বীয় ভ্রাতাকে আমন্ত্রণ।

তাঁহার মৃত্যুর পর উপাতিস্স গ্রামে থাকিয়া মন্ত্রীরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাজার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া এই সময়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিজয়ের মৃত্যুর এবং নূতন রাজার আগমন পর্য্যন্ত প্রায় এক বৎসর কাল লঙ্কাদ্বীপ রাজশূন্য অবস্থায় ছিল।

সিংহবাহুর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র রাজা হইয়াছিলেন; মদ্রদেশের রাজকন্যার গর্ভে তাঁহার তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লঙ্কা হইতে দূতগণ আসিয়া রাজাকে বিজয়ের পত্রখানি দান করিল। সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া রাজা তাঁহার তিন পুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমাদের মধ্যে একজনকে সুন্দর লঙ্কা-নগরে যাইতে হইবে। ইহা আমার ভ্রাতার রাজ্য, তিনি লোকান্তরিত হইলে এখন যে যাইবে, সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবে।"

রাজার সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার পাণ্ডুবাসুদেব যাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার পথে কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই—এ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়া, পিতার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক ৩২ জন মন্ত্রিপুত্র-সহ ধর্ম্মযাজকের ছদ্মবেশে তিনি জাহাজে রওনা হইলেন।

পাণ্ডুবাসুদেব।

সিংহলী কথার উপসংহার

আমরা মহাবংশের আর অধিক অনুবাদ দিব না। বিজয়ের লঙ্কার অভিযান এবং তথায় নব রাজ্যস্থাপন বাঙ্গলার ইতিহাসের অতি স্মরণীয় ঘটনা এবং বাঙ্গালী জাতির মস্ত বড় গৌরবের বিষয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই এই বিষয়টি স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিবার বিষয়, এইজন্য ইহা মূল পালি হইতে সমগ্রভাবে অনূদিত হইল। অধুনা বাঙ্গালীরা বিজয়ের গৌরবের কাহিনী কিছুই জানে না, আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। বাঙ্গালীর অসামান্য গৌরবের কথা আমরা বিদেশীয়দের বিবরণ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি হইতে কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা যে এসিয়ার দূর দুরান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে বসবাস করিয়া অপূর্ব্ব কর্ম্মশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত অপরেরা প্রসঙ্গক্রমে দিয়া গিয়াছেন - আমরা আমাদের কথা কিছুই বলি নাই। দ্বীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের কৃপায় আমরা সিংহল-বিজয়ের বৃত্তান্তটি পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাচীন সভ্যতা ও জয়শ্রীর এই মুষ্টিমেয় রত্নালঙ্কার আমাদের নিকট বহুমূল্য।

এই কাহিনীটি নানারূপ উপকথায় বিজড়িত। মহারাজ ধাতুসেনের আদেশে দ্বীপবংশ বিস্তারিত করিয়া লেখা হয়। রিচ্ ডেভিড্স্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে বিস্তারিতভাবে পুনর্লিখিত দ্বীপবংশই মহাবংশ নামে পরিচিত। ধাতুসেন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন—মহাবংশ ঐ সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিজয়ের মৃত্যু ৪৪৬ খৃঃ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং পাণ্ডবাসুদেব ৪৪৬ খৃঃ পূর্ব্বে রাজা হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক রিচ্ ডেভিড্স্ লিখিয়াছেন, "যে সময়ে মহাবংশ ও দ্বীপবংশ লিখিত হইয়াছে, তাহার বহুপরে রচিত ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপগল্পগুলির সঙ্গে মহাবংশ ও দ্বীপবংশের কাহিনী তুলনা করিলে শেষোক্ত আখ্যায়িকাগুলি অধিকতর বিশ্বসনীয় মনে হইবে।" তিনি আরো বলিয়াছেন, "এই সমস্ত কাহিনী ঠিক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারা গেলেও ইহারা তাহাদের সময়ের লৌকিক সংস্কারের যথাযথ চিত্র দিয়াছে; সেই চিত্র হইতে আমরা প্রাচীনতর কালের ঘটনার অনেকগুলি ইঙ্গিত পাইতে পারি।" আমরা এই আখ্যায়িকার ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দ্বীপবংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন সিংহলী গ্রন্থে এই ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে কোন মতান্তর নাই।

সিংহল-বিজয় বাঙ্গলার অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজয় কর্ত্তৃক সিংহল-বিজয় বঙ্গদেশের তদানীন্তন কালের একটি অতি শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় ঘটনা। বিজয়ের বংশধর রাজারা তাঁহাদের মাতৃভূমি পূর্ব্বভারত কখনই বিস্মৃত হন নাই। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে, এমন কি বঙ্গদেশ হইতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহু উদ্যমশীল ব্যক্তি যবদ্বীপ, মাটাবান, কাম্বোডিয়া, শ্যাম, সুমিত্রা, জাপান,

চীন প্রভৃতি দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সকল অঞ্চলে যে কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় গরিমায় উজ্জ্বল। প্রাম্বণম, শ্যামদেশ ও কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশীয় বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান। সুমিত্রা ও বালীদ্বীপে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর যে সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের ছাঁচ অনেকটা পাল রাজাদের সময়ের বঙ্গাক্ষরের মত। বালী ও যবদ্বীপের শুধু লিপি নহে, অনেক প্রস্তর ও ধাতু-মূর্ত্তিতে বাঙ্গালী-ভাস্করের হস্ত-চিহ্ন অতি স্পষ্ট। অধুনা চট্টগ্রামের দেযাং পাহাড়ের নিকটে ভূনিম্ন হইতে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর বহু ধাতব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানে আমরা সেই মূর্ত্তিগুলির একখানির এবং বালী-জাবা দ্বীপের কয়েকখানি বুদ্ধ বিগ্রহের ছবি দিলাম। আমার নিকট আরও দুইখানি ছিল, একখানি আমি মজিলপুরের কালিদাস দত্ত মহাশয়কে দিয়াছি। পাঠক দেখিবেন, বাঙ্গালী কৃত বিগ্রহ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মূর্ত্তিগুলি শুধু যে এক আদর্শে নির্ম্মিত তাহা নহে, তাহাদের সাদৃশ্য এত অধিক যে, মনে হয় তাহারা একই ভাস্করের দ্বারা নির্ম্মিত। পাল রাজাদের সঙ্গে যে ভারতীয় ঐ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি সিংহল-বিজয়কেই আমরা বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া মনে করি।

এককালে 'বাহু' শব্দযুক্ত নাম প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট্য ছিল। চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহুর বাড়ী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (বঙ্গে); ধর্ম্মপালের সমসাময়িক আসামের রাজা ছিলেন বীরবাহু। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 'কৃত্তিবাসী' রামায়ণে বীরবাহুর উল্লেখ আছে, সংস্কৃত রামায়ণে নাই—উহা বাঙ্গালী কল্পনার সৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়।

সিংহবাহুর জন্মকথা একটা গল্প মাত্র। গল্পটা রোম-নগর-স্থাপয়িতা রমুলাসের গল্পের মত। সমুদ্রতীরে রমুলাস ও তাঁহার ভ্রাতা রিমাস্‌কে এক ব্যাঘ্রী স্বীয় স্তন্য পান করাইয়া পালন করিয়াছিল। সিংহবাহুর সম্বন্ধে উপকথাটার দৌড় আরও অনেক বেশী। ইহাতে দৃষ্ট হয় সিংহবাহুকে একটা সিংহ জন্মদান করিয়াছিল। বঙ্গদেশে পশুরাজের সঙ্গে সেদিনও মণিপুরের রাজমূর্ত্তি অঙ্কিত পাওয়া যাইত। সিংহ এদেশে চিরকালই পরাক্রমের লাঞ্ছন। গৌড়েশ্বর রামপালের দ্বিতীয় পুত্র কুমারপালের সেনাপতি বৈদ্যদেব একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরাজিত রাজাদের মুকুটের সোনা দিয়া এক বৃহৎ সিংহ গড়াইয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহ্‌ প্রাসাদের তোরণের ঊর্দ্ধে স্থাপন করাইয়াছিলেন। ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন প্রাচীন রাজ-সিংহাসন ষোড়শ সিংহ-দ্বারা ধৃত। সিংহলাধিপ একটি মোমনির্ম্মিত সিংহ মগধেশ্বরকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা দেখিতে ঠিক জীবন্ত সিংহের মত হইয়াছিল; ঐ সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল। পিঞ্জরের দ্বার না খুলিয়া কেহ পশুরাজকে বাহির করিতে পারে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য সিংহবাহুর বংশধর সিংহটা মগধে মহানন্দের সভায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। একটা উত্তপ্ত লৌহশলাকা পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করাইলে সিংহ গলিয়া বাহির হইয়া আসিল। মগধবাসীর বুদ্ধির জয়জয়কার পড়িল। সিংহ-সম্বন্ধে এইরূপ না

ঐতিহাসিক কথা ও উপকথা বাঙ্গলা দেশময় প্রচলিত আছে। এদেশে যে দরজায় কোন সিংহমূর্ত্তি নাই—সে দরজা যদি গৃহের পুরোভাগে প্রবেশ-পথে থাকে, তবে তাহাকেও 'সিংদরজা' বলে এবং রাজা সিংহশূন্য আসনে বসিলেও তাহা 'সিংহাসন' নামে অভিহিত হয়। সেদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মল্লবীরের শেষ পরীক্ষা ছিল সিংহের সহিত লড়াই করা। উদাহরণ-স্বরূপ একশত বৎসরের প্রাচীন একখানি চিত্রপটের প্রতিলিপি এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহা কালীঘাটের এক পটুয়া আঁকিয়াছিল। একশত

সিংহের সহিত মল্লবীরের যুদ্ধ।
(১০০ বৎসরের প্রাচীন কালীঘাটের চিত্র)

বৎসরের প্রাচীন হইলেও চিত্রের আদর্শটি বহু প্রাচীন। পটুয়ারা পুরুষানুক্রমে একই

আদর্শে চিত্র অঙ্কন করিয়া থাকে। বাঙ্গালী মল্লবীর সিংহকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে মল্লের অণুমাত্রও আয়াস দৃষ্টি হয় না, অথচ আলিঙ্গনটি এত নিবিড় যে সিংহের মুখের হাঁ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন, চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বাওয়ালীর মোড়লদের একটা বিরাট্ রথে সিংহের সঙ্গে এক মল্লবীরের লড়াইয়ের ছবি কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সিংহটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু মল্লবীরের মূর্ত্তিটা এখনও ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, সে মূর্ত্তি বীরের মূর্ত্তি বটে! আমাদের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেবমন্দির 'সিংহময়' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'সিংহবাহিনী'-মূর্ত্তি বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালীর পূজিত দেবতা।

সিংহের প্রবাদ নানাকারণে এদেশে সম্ভবপর হইয়াছে। এই সিংহ-সংক্রান্ত উপকথার মধ্যে সত্যকথা এই যে পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তে রাঢ়দেশে কোন অনার্য্য দস্যু-দলপতি বঙ্গদেশাগত বণিক্‌দিগের সম্পত্তি লুণ্ঠনপূর্ব্বক বঙ্গেশ-তনয়াকে বহুকাল আটকাইয়া রাখিয়াছিল, এবং পরিশেষে অনৈক্য হওয়াতে রাজকুমারী সন্তানদ্বয়সহ পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন। এই দলপতির 'সিংহ' উপাধি থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। সম্ভবত এইরূপ কোন ব্যাপারকে পরিশেষে একটা গল্পের আকার দিয়া সিংহবাহুর বিবরণ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু উপকথাটি যেরূপ হউক না কেন, তাহার ভিতরকার যে ভৌগোলিক বৃত্তান্তটি আছে, তাহা অতি স্পষ্ট, সত্য সন্ধান করিবার সময় আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এই আখ্যানটি পড়িলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে বঙ্গ ও মগধের মধ্যে রাঢ় নামক প্রদেশের একাংশে সিংহপুর রাজধানী সিংহবাহু কর্ত্তৃক খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় আমার পরিচিত যে সকল সিংহলী বন্ধু আছেন বা এককালে ছিলেন, তাঁহাদের কয়েকখানি আলোক-চিত্র এইখানে প্রদত্ত হইল। সিংহলী বৌদ্ধদের সকলেরই বাঙ্গালীর চেহারা, ইহা দৃষ্টি-মাত্রই প্রতীয়মান হইবে। বিজয় ও তৎসহগামীদের বহু পরবর্ত্তী বংশধরদের চেহারার সঙ্গে প্রায় তিন হাজার বৎসর পরেও যে বাঙ্গালীদের এরূপ অবিকল সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তাহার এক কারণ এই যে, বঙ্গদেশের লোকেরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কতকটা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে দাক্ষিণাত্যের তামিলভাষী বহু লোক সিংহলে বাস করিয়া সিংহলী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু। বৌদ্ধগণ তাঁহাদের সহিত ততটা মিশেন নাই। দ্বিতীয়তঃ শুধু বিজয় ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ নহেন, সেই সময় হইতে বাঙ্গালীর এই উপনিবেশে পরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন যুগের শত শত বাঙ্গালী যাইয়া তথায় বসবাস করিয়াছিলেন। সেন রাজাদেরও অনেক পরে এই অভিযান থামিয়াছে। সিংহলে এরূপ পরিবার আছেন যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ৭।৮ পুরুষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে তথায় গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে এখনও যে 'পালওয়ার' নৌকা দৃষ্ট হয়, সিংহলেও সেইরূপ নৌকা প্রচলিত আছে (ছবি দেখুন)। বাঙ্গালীর বহু প্রাচীন পুস্তকে সিংহলে যাতায়াতের বিবরণ আছে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, সত্যপীরের কথা,

সিংহলী ধর্ম্মগুরু ধর্ম্মপাল—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।

বিমলানন্দ—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।

ধর্ম্মপাল, বৃদ্ধ বয়সে—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।

দেবপ্রিয় বলী সিংহ—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।

রেভারেণ্ড শীলানন্দ— ৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।

রেভারেণ্ড সিদ্ধার্থ ও তাঁহার সিংহলী বন্ধু—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছ

পালোযার নৌকা—৮৬ পৃঃ, ৩১ ছত্র।

এমন কি শনির পাঁচালী প্রভৃতি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র-বৃহৎ কাব্যে যেখানেই কোন বণিকের সফরে যাওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেইখানেই সিংহলে যাওয়াটা তাঁহার অপরিহার্য্য কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সিংহলের সঙ্গে বঙ্গের ব্যাপক সম্বন্ধ অনুমিত হইতেছে। *

আর্য্যাবর্ত্ত এখন বৌদ্ধযুগের শত শত কীর্ত্তির শ্মশান। সেই নালন্দা-বিহার, অশোকের রাজপ্রাসাদ, রেলিং ও বিজয়স্তম্ভ—এ সমস্তের ভাঙ্গা নিদর্শন কিছু কিছু খুঁড়িয়ে পাওয়া যাইতেছে। কথিত ৮৪ হাজার অনুশাসনের অতি সামান্য কয়েকখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু বৌদ্ধযুগের আদি ইতিহাস সিংহলে অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে।

সমুদ্রের অতলতলে হৃতসর্ব্বস্ব বণিক্ যেরূপ স্বীয় অগাধ সম্পত্তির একটি সামান্য অংশ উদ্ধার করিতে পারিলেও তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে—সিংহলের মহাবংশ, দ্বীপবংশ ও কুলবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদিগের নিকট তেমনই মূল্যবান্ ও যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবার সামগ্রী। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস এই সকল গ্রন্থে যাহা আছে, ভারতের আর কোথায়ও তাহা নাই। এইজন্যই সিংহল-বিজয় ভারতের ঐতিহাসিক একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই সিংহলের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্বন্ধের সংস্কারমূলক কাহিনী বঙ্গসাহিত্যের অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে, একথা আমরা এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। উপসংহারে আমরা সিংহল-কলোম্বো-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরমের স্বলিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে নিম্নের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি; এই প্রবন্ধ গত জুন মাসের (১৯১১) "কালকাতা রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে:—

"The Singalese who form the vast majority of the Ceylonese are descendants of Vijay the Bengali Prince, and hence in language specially the Singalese has close affinity with the Bengali. Fifty per cent. of words

* যাঁহারা বঙ্গের দাবীর প্রতিকূলতা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন দ্বীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীনতম পুস্তকে যে বঙ্গ ও মগধের কথা আছে, তাহা বৌদ্ধের কল্পনা। এই যুক্তিটা শারীরিক জবরদস্তি মাত্র, ইহা উত্তর দেওয়ার যোগ্য নহে।

আবার কেহ কেহ বলেন, সিংহবাহুর মাতার নাম সুর্পাদেবী,—গুজরাটের সুপ্পারিক বন্দরের নাম হইতে ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। যদি কোন লোকের নাম দেখিয়াই তাহার বাড়ীর খবর পাওয়া যায়, তবে বঙ্গদেশে গয়ারাম, অযোধ্যাপ্রসাদ, যমুনা, সিন্ধু, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, নবদ্বীপ প্রভৃতি শত শত দেশ-বাচক নামধারী লোককে তত্তৎ দেশবাসী বলিতে হয়। "সুর্পাদেবী"র নাম স্বরূপা কি "সুপ্রিয়ার" রূপান্তর হইতে পারে।

কিন্তু আসল কথা, সিংহবাহুর মাতার নাম সুসীমা, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই নামটি দ্বীপবংশে পাওয়া যায়। দ্বীপবংশই সিংহলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস,—উহাই গ্রাহ্য। আমরা মহানাম-কৃত মহাবংশের অনুবাদ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, তাহাতে শুধু "বঙ্গরাজকন্যা" এই ভাবের উল্লেখ আছে, তাঁহার নাম নাই। এই অনুবাদ একান্ত ভাবে মূলানুগত বলিয়া গ্রন্থকার দাবী করিয়াছেন।

যদি দ্বীপবংশ ও মহাবংশের বহু পরবর্ত্তী কোন টীকায় সিংহবাহুর মাতার অন্যরূপ নাম থাকে, তবে দ্বীপবংশকে অগ্রাহ্য করিয়া সে নাম কেনই বা গ্রাহ্য হইবে? বিজয়ের সিংহল অধিকার-সম্বন্ধে দ্বীপবংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বীপবংশ ও মহাবংশই সিংহলের আদিগ্রন্থদ্বয়।

of class'cal Singalese are identical with those of Bengali. So though Ceylonese as a whole is a ' Crown Colony " of greater India, Singalese Ceylon is an important part of greater Bengal. Both the Singalese and the Bengali belong to the same stock of North Indian Aryans and so have many things in common with them. Comparative Philology of Bengali and Singalese will reveal great treasures of linguistic wealth of greater Bengal. In my paper " Bengal and Ceylon " read before the greater Bengal Section of Prabashi Banga Sahitya Sammilani, held last December in Allahabad under the esteemed prosidentship of Dr. Kali Das Nag, I emphasised the urgent need of founding a Greater Bengal Society or *Brihattara Banga Samity* in Calcutta early to carry an organised activity and research on this neglected but vitally important subject of Bengal's national history ; .. ..that modern Bengal will be richer in every way by the services of such a society is open to no doubt. In South Kanara there are people called Gonda Brahmins who claim that they are immigrants from Bengal. Then language called Kankani, only a colloquial tongue with no written script, is a South Indian edition of Bengali and nothing else. From this, Gujrat, Java and especially from Singalese Ceylon many things of Greater Bengal can be unearthed" (pp. 294-95).

ইহার মর্ম্মার্থ এই,—বর্ত্তমান সিংহলীগণ বঙ্গের রাজকুমার বিজয় ও তাঁহার সহচরদের বংশধর, এই জন্যই সিংহলী ও বাঙ্গলার এতটা সাদৃশ্য। প্রাচীন সিংহলীর অর্দ্ধেক শব্দ বঙ্গভাষার শব্দ। সুতরাং যদিও সিংহলদ্বীপকে বৃহৎ ভারতের উপনিবেশগুলির "মুকুট" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তথাপি সিংহলবাসিগণ বিশেষভাবে বৃহত্তর বঙ্গদেশবাসীদেরই স্বগণ। সিংহলী ও বাঙ্গালী—এই দুই জাতিই উত্তরাপথের আর্য্যবংশ-সম্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে এই জন্যই নানাবিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিংহলীভাষা এবং বঙ্গভাষার তুলনামূলক তত্ত্ব সন্ধান করিলে বৃহত্তর বাঙ্গলাভাষার এক অপূর্ব্ব ভাণ্ডারের পরিচয় পাওয়া যাইবে। গত ডিসেম্বর মাসে, বৃহৎ বঙ্গের প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যিকগণের সম্মিলনে আমি "বাঙ্গলা দেশ ও সিংহল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। মনীষী ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতি ছিলেন। আমি সেই প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া ইহাই বলিয়াছিলাম যে অগৌণে "বৃহত্তর বঙ্গ সমিতি" নামক একটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বৃহৎবঙ্গের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশের পক্ষে অতি মূল্যবান্ সন্ধান প্রদান করিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করিবে। আধুনিক বঙ্গদেশ যে এবংবিধ অনুষ্ঠান-দ্বারা প্রচুররূপে উপকৃত হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দক্ষিণ কানারায় গোণ্ডা নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা দাবী করেন যে তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের কথিত ভাষার নাম "কঙ্কণী." এই ভাষায় কোন লিখিত পুস্তক নাই, কিন্তু অনুমাত্র সন্দেহও নাই যে, এই ভাষা বাঙ্গলা ভাষারই একটি দাক্ষিণাত্য সংস্করণ

ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সমস্ত হইতে এবং গুজরাট, জাভা, বিশেষ করিয়া সিংহলী ইতিহাস হইতে, বৃহৎ বঙ্গের অনেক মূল্যবান্ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আমরা গুজরাট ও মধ্যভারতে বঙ্গীয় উপনিবেশের কথা বলিয়াছি। এইবার শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরমের প্রবন্ধ হইতে বাঙ্গালীর প্রাচীন বিস্তৃত উপনিবেশ-চেষ্টার আরও কিছু সমর্থন পাওয়া গেল। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপমালা, চীন, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি বহুস্থানে স্মরণাতীত কালের চিহ্নগুলি এখন বঙ্গের ইতিহাস-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে লুক্কায়িত আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ইতিহাস শিখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বহুব্যয় স্বীকার করিয়া দলে দলে ছাত্রগণ ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন, সেখানে তাঁহারা এ দেশের পুরাতত্ত্ব শিক্ষার পর কখনও কখনও জার্ম্মেনী ও প্যারীতে যাইয়া পাঠ সাঙ্গ করিয়া উপাধি লইয়া আসেন। ভারতের পুরাতত্ত্বের খনি বাড়ীর কাছে, তাহার সন্ধান লওয়াও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়-সাধ্য। কিন্তু তাহাই খোঁজ করিতে আমরা দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই এবং আমাদের বিলাতের গুরুগণ যতটুকু দিয়াছেন—তাহার বেশী অগ্রসর হইতে ভয় পাই, যেহেতু পাছে তাঁহাদের সঙ্গে মতান্তর হয় এবং ডিগ্রিলাভ না ঘটে। পরাধীন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের লইয়া নিয়তি কতরূপই বিদ্রূপ ও রহস্যের খেলা খেলিতেছেন, তাহার জন্য দুঃখ করিলে কি হইবে?

বিজয়ের মৃত্যুর পর পাণ্ডুবাসুদেব সিংহলের রাজা হন। ইহার পর তৎপুত্র অভয় এবং অভয়ের মৃত্যুর পর তাহার ভাগিনেয় পাণ্ডুকাভয় ৭০ বৎসর সিংহলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পাণ্ডুকাভয়ের পুত্র মুতাশিব ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন, মুতাশিবের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তিষ্য সিংহলের রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৩০৯ অব্দে অশোকের পুত্র, বিদিশার (বর্ত্তমান ভিল্‌সার নিকটবর্ত্তী বেশ নগরীর) দেবী নাম্নিকা মহিষীর গর্ভজাত মহেন্দ্র এবং তাঁহার কন্যা সঙ্ঘামিত্র ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচারার্থ সিংহলে আগমন করেন। হিউনসাঙ ইঁহাদিগকে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সিংহলীদের ইতিবৃত্ত-অনুসারে ইঁহারা অশোকের পুত্র-কন্যা।

মহারাজ তিষ্য যুবরাজ মহেন্দ্রের কাষায়-বস্ত্র-পরিহিত প্রতিভাপূর্ণ দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে স্বতঃই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে এরূপ বেশধারী কতজন আছেন?" মহেন্দ্র বলিলেন, "গৈরিক বসনে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন ও সমুজ্জ্বল, তথায় বুদ্ধশিষ্যের সংখ্যা অগণিত।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব

[বুদ্ধদেব—৫৬৩-৪৮৩ খৃঃ পূঃ]

"উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর—জয় জগদীশ হরে!"

—জয়দেব।

এই যুগে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে) ব্রাহ্মণশাসিত ভারতবর্ষে বৃহৎ বাঙ্গলা এক নূতন আদর্শ লইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিউনসাঙ এবং তাঁহার সময়কার চীনা লেখকগণের মতে বুদ্ধদেবের জন্মকাল ৮৫০ খৃঃ পূঃ। কপিলাবস্তুর * অনতিদূরে লুম্বিনী বনে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মায়াদেবীর পুত্র। † কথিত আছে, তাঁহার পূর্ণগর্ভা জননী স্বীয় পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে লুম্বিনী বনে ‡ তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। সেই বনে হয়ত তাঁহার উদরে

* কপিলাবস্তু শাক্যরাজাদের রাজধানী ছিল; শাক্যরাজ্য বর্ত্তমান বস্তি ও গোরক্ষপুর জেলার উত্তরে কোশল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

† রাজা শুদ্ধোদন কলি নামক স্থানের অধিপতি অঞ্জনের মহামায়া ও গৌতমী নাম্নী দুই কন্যা বিবাহ করেন। মহামায়া বা মায়াদেবী বুদ্ধের জননী, কিন্তু গৌতমীই মাতৃহারা বালক বুদ্ধের পালয়িত্রী; বৌদ্ধশাস্ত্রে ইনি "মহাপ্রজাবতী" নামে উল্লিখিত।

‡ লুম্বিনী বৌদ্ধদিগের বেথেলেহাম। রাজা অশোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার গুরু উপগুপ্ত বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "মহারাজ, এই স্থানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" উপগুপ্ত-উচ্চারিত ঠিক এই কথাগুলি অশোক তৎপ্রতিষ্ঠিত স্মারকস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। অক্ষরগুলি একটুও ম্লান হয় নাই, এখনও উজ্জ্বল ও স্পষ্ট আছে।

অস্ত্রোপচার করিয়া পুত্রকে বহির্গত করা হইয়াছিল। লৌকিক সংস্কার—গৌতমবুদ্ধ জননীর কুক্ষি ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপুরুষেরা প্রায়ই অযোনিসম্ভব; প্রবাদটি এই প্রাচীন সংস্কারের প্রতিপোষক হইতে পারে,—নতুবা ইহা অস্ত্রোপচারের ইঙ্গিত-সূচক। জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মাতৃহারা হইলেন। তাঁহার জন্ম হইতে তরুণ যৌবনাবধি জীবনকাহিনী অনেক উপগল্পজড়িত। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শাক্যসিংহ বলিয়া খ্যাত, তাঁহার অপর নাম গৌতম।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধের চরিতকথা কবিত্বচ্ছটায় উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, তৎপূর্ব্বে ললিতবিস্তরে সেই আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছিল। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত কবি এড্‌উইন আরনল্ড 'এশিয়ার আলোক' নামক কাব্য লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া বুদ্ধদেবের পূর্ব্বকার জন্মকাহিনী-সংবলিত বৌদ্ধজাতকগুলি নানারূপ অতিরঞ্জন ও গল্পের সাজসজ্জা লইয়া ভক্ত পাঠকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে। যদিও এই সকল জন্মকথার অধিকাংশেরই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তথাপি বুদ্ধজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী তৎকাল-প্রচলিত ভারতীয় নানা প্রবাদ এই জাতক-কাহিনীগুলিতে স্থান লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত জাতকগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে।

জাতকের গল্পকথা।

"পঞ্চ পঞ্চাসত পঞ্চাস" (৫৫০) জাতকে বুদ্ধদেবের ঐ সংখ্যক জন্মের বৃত্তান্ত আছে; ইহা ছাড়া আরও অনেক জন্মের কথা নানা উপাখ্যানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।* বুদ্ধ মনুষ্যরূপে, অথবা পক্ষী, কুক্কুর, মৃগ, মৎস্য, মর্কট, ইন্দুর প্রভৃতি যেরূপেই যেখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেইরূপেই কোন না কোন মহৎ গুণের আদর্শ দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধগণ যে সকল গুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, জাতকের উপগল্পে মনুষ্য ও জীবজন্তুরূপে বুদ্ধ সেই সকল গুণের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যদিও অনেকগুলি উপাখ্যানেই ত্যাগধর্ম্মকে খুব বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে, তথাপি সাহস, তেজ, বীর্য্য প্রভৃতি গুণও কোমলতর গুণরাশির আড়ালে পড়ে নাই। গৌতম কাঠবিড়াল-জন্মে বিন্দু বিন্দু জল তুলিয়া সমস্ত সমুদ্র শোষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন,—এই জন্মে তিনি "বীর্য্যপারমিতা" সম্পন্ন করেন। এইভাবে সিংহ-জন্মে "সত্যপারমিতা" এবং বেস্সান্তরজাতকে "শীলপারমিতা" এবং মর্কট-জন্মে "প্রজ্ঞাপারমিতা" সম্পাদন করেন। কিন্তু ত্যাগমূলক কাহিনীগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা এখানে একটি জাতকের বৃত্তান্তের উল্লেখ করিব, আরনল্ড এই গল্পটি তাঁহার কাব্যে মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

* কথিত আছে, যুগে যুগে জগতে অসংখ্য বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ বুদ্ধ চতুষ্টয়ের নাম—ক্রকুচ্ছন্দ (খৃঃ পূঃ ৩১০১), কনকমুনি (খৃঃ পূঃ ২০৯৯), কাশ্যপ (খৃঃ পূঃ ১০১৪) এবং শাক্যসিংহ ৫৬৩ খৃঃ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই বুদ্ধত্ব-প্রাপ্ত চারিটি মহাপুরুষ যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা "মহাভদ্রকল্প" নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন এক জন্মে বুদ্ধদেব একজন তপস্বী ছিলেন। সেই সময়ে একদা ভীষণ অনাবৃষ্টি ও রৌদ্রের তেজে সমস্ত দেশ শুকাইয়া গিয়াছিল। অগ্নি-সদৃশ রৌদ্রের উত্তাপে ও আহার্য্যের অভাবে সমস্ত জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তপস্বী তাঁহার গন্তব্য আশ্রমে যাইবার পথে এক বৃহৎ ভূভাগ জীবকঙ্কালে ও শবদেহে পূর্ণ দেখিতে পাইলেন। একটি খালের ধারে এক করুণ দৃশ্য বিশেষভাবে তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। বহুদিবসের উপবাসক্লিষ্টা একটা ব্যাঘ্রী অনাহারে অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহার দুইটি শাবক তাহার স্তনে মুখ সংলগ্ন করিয়াছিল, কিন্তু স্তনে বিন্দুমাত্র দুগ্ধ ছিল না; তাহারা বৃথা সেই মুমূর্ষু মাতৃবক্ষ হইতে সুধা আহরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। খড়ের ঘরের বাঁশের বেড়ার উপর জোরে হাওয়া বাহিলে উহা যেরূপ কাঁপিয়া উঠে, ব্যাঘ্রীর প্রবল অন্তিম নিঃশ্বাসে তাঁহার মাংস-শূন্য, ত্বক্‌মাত্রে-আবৃত অস্থিপঞ্জর তেমনই কাঁপিতেছিল। আর কিছুকালের মধ্যে এই তিনটি প্রাণীর জীবনান্ত ঘটিবে। তপস্বীর হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তিনি ভাবিলেন, "আমি কি এই তিনটি জীবের কোনই উপকার করিতে পারি না?" তিনি সম্মুখে ও দূরে চাহিয়া দেখিলেন—মাটি রৌদ্রের তাপে তাম্রবর্ণ, তাহাতে তৃণ কি ঘাসের চিহ্ন নাই। খালে একবিন্দু জল নাই, উহা একেবারে শুষ্ক। তখন তপস্বী স্বীয় সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি মাথার পাগড়ী, গায়ের অঙ্গরক্ষা ও পায়ের উপানৎ দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং একটুক্‌রা নেংটি মাত্র রাখিয়া নগ্নদেহে ব্যাঘ্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন "মাতঃ, এই দেখ, তোমার খাদ্য সম্মুখে।" সেই আহ্বানে মুমূর্ষু ব্যাঘ্রীর অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু উন্মুক্ত হইল, হিংস্র বুভুক্ষু মাংসাশীর নয়নতারকা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রী এক লম্ফে সন্ন্যাসীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহার শোণিত পান করিতে লাগিল। সেই হিংস্র উল্লাস-লীলার সঙ্গে যখন তপস্বীর প্রাণবায়ু শেষ হইল, তখন দেখা গেল—তাঁহার চক্ষে ত্যাগজনিত একফোঁটা পুলকাশ্রু।

তপস্বীর মহৎ আত্মোৎসর্গ।

আমি কি এই তিনটি মৃতকল্প জীবের কোনই উপকার করিতে পারি না?

মহেন্দ্রসেনাবদানে বুদ্ধের আর একটি জন্মবৃত্তান্ত আছে। কাশীরাজ মহেন্দ্রসেন খুব উদারচিত্ত ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার শত্রু—সামন্ত রাজারা—রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে। বনবাসী রাজা নির্ব্বিকারচিত্তে সমস্ত দুঃখ বরণ করিয়া লইলেন। একদা জীবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! রাজা মহেন্দ্রসেনের নিকট আমি যাইব, কোন্ দিকে তাঁহার রাজধানী?" মহেন্দ্রসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার নিকট আপনার কি দরকার?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "শুনিয়াছি তাঁহার মত দাতা জগতে নাই—আমি অর্থকামী, অর্থের আশায় তাঁহার নিকট যাইতেছি।" রাজা তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া বর্ত্তমান অবস্থা জানাইলেন। জীবশর্ম্মা অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বলিলেন, "আমার অদৃষ্ট এইরূপই, নতুবা আপনার ন্যায় মহাত্মার এই অবস্থা কেন হইবে?" তিনি বিমনা হইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রসেন

মহেন্দ্রসেন ও জীবশর্ম্মা।

সেই সকল বিলাপ শুনিয়া বড়ই দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন; কিছুকাল চিন্তা করিয়া তিনি জীবশর্ম্মাকে বলিলেন, "আপনি এক কাজ করুন, এই তরুলতাগুলি দিয়া আমার হাত বাঁধুন, তারপর এখন যিনি আমার স্থলে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া গিয়া বলুন, 'মহারাজ! আমি আপনার শত্রুকে ধরিয়া আনিয়াছি। আমাকে পুরস্কৃত করুন।' এই কথা শুনিয়া তিনি প্রীত হইয়া আপনাকে প্রচুর অর্থ দিবেন এবং আমাকে বধ করিবেন।" ব্রাহ্মণ এরূপ মহামনা রাজার হত্যার ব্যবস্থা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অত্যন্ত অর্থ-লালসায় অবশেষে তাহাই করিতে সম্মত হইলেন।

পূর্ব্ব এক জন্মে বুদ্ধদেব ছিলেন কাশীরাজ মহেন্দ্রসেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কত জন্মের সুকৃতি ও ত্যাগস্বীকারের ফলে যে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন—এই সকল জাতক-কাহিনীতে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বুদ্ধ বিশ্বের যাবতীয় জীবজন্তুর জীবন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া তিনি অর্জ্জন করিয়া বুদ্ধত্বের যোগ্য হইয়াছিলেন,—জাতক-পরিকল্পনা সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্য সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা-প্রসূত। ইতর জীব ও মানবের মধ্যে যে বিভিন্নতার রেখা য়ুরোপীয়েরা টানিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাহা কোন কালেই স্বীকার করেন নাই।

আর্য্যাবর্ত্তে অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা যুদ্ধবীর, ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরগণের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত ছিল,—হিন্দু ও জৈনেরা তাঁহাদের পুরাণে এবং বৌদ্ধগণ তাঁহাদের জাতকে নিজ নিজ উপাস্যদেবতা ও দেবকল্প ব্যক্তিকে কেন্দ্র-স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সেই সকল তাঁহাদের স্বকীয় মুদ্রালাঞ্ছিত করিয়া নিজ নিজ শাস্ত্রে চালাইয়াছেন।

মহাভারত ও হিন্দু পুরাণাদিতে যে সকল কথা আছে, বৌদ্ধজাতক ও জৈনপুরাণে অনেক স্থলেই তাহা রূপান্তরিত হইয়া স্থানলাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক শ্রেণীই তাঁহাদের উপাস্যদেবতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন উপকথাগুলিকে স্বীয় শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়াছেন। সুপ্রাচীন ইতিহাস ও উপকথার ভাণ্ডার সেই সকল দেবতার জন্ম-জন্মান্তরীণ লীলার যোগান দিয়াছে। এইভাবে শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বরাহপুরাণ, দেবীপুরাণ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধজাতকগুলি বৌদ্ধদিগের সেইরূপ পুরাণ ভিন্ন আর কি?

গৌতমের জন্মের পর মহর্ষি কালদেবল (অসিত) রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই শিশুর শরীরে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়; যদি ইনি সংসারে থাকেন, তবে জগজ্জয়ী সম্রাট্ হইবেন, যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বনবাসী হন, তবে এমন ধর্ম্মপ্রচার করিবেন যাহা সমস্ত জগদ্বাসী গ্রহণ করিবে। কালদেবল শিশু-গৌতমের শরীরে ২২টি মহাপুরুষের লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে হনুমান্ অশোকবনস্থিতা সীতাদেবীর নিকট রামচন্দ্রের শরীরের যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, উহাদের সঙ্গে ললিতবিস্তরের এই সকল লক্ষণের অনেকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়।

পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া যশস্বী হইবেন, ইহা সচরাচর কেহ চান না ; জনকজননী ইচ্ছা করেন, যেন পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী হন। কিন্তু অল্পবয়স হইতেই দেখা গেল, গৌতম ভাবুকের মত বসিয়া চিন্তা করেন এবং তিনি কতকটা উদাসীন। এক সময়ে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র দেবদত্ত একটি কপোতের প্রতি শরক্ষেপ করেন, প্রাণের ভয়ে পক্ষীটা শিশুগৌতমের ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। গৌতম তাহার বক্ষ হইতে শর তুলিয়া ফেলিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার ক্ষতস্থানে ঔষধের প্রলেপ দিয়া প্রাণরক্ষা করেন। তাঁহার ভ্রাতা সেই কপোতটি স্বয়ং শিকার করিয়াছেন বলিয়া তাহা লইয়া যাইতে চান, গৌতম তাহা দেন না। শুদ্ধোদনের কাছে বিচারার্থ এই শিশুদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন "গৌতম, তুমি ইহাকে কপোতটি দাও না কেন? উহা ইহারই প্রাপ্য, যেহেতু উহা সে শিকার করিয়াছে।" পঞ্চম বর্ষীয় গৌতম বলিলেন—"যে প্রাণ হরণ করিতে চাহে সে ইহা পাইবার যোগ্য কিংবা যে জীবন দান করিয়াছে, তাহারই এই জীবের উপর অধিকার, আপনি বিচার করুন।"

প্রাণ-হত্যাকারী এবং প্রাণ-দাতা, ইহাদের মধ্যে কাহার দাবী বেশী?

এই ভাবের কার্য্যকলাপ ও উক্তি-দ্বারা সংসারের প্রতি উপেক্ষা ও সর্ব্বজীবের প্রতি করুণার ভাব লক্ষ্য করিয়া গৌতম যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া উত্তরকালে বনবাসী হইবেন, শুদ্ধোদনের মনে এই আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল।

অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন, রাজা লোকের অগোচরে এক রাজকীয় প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া বুদ্ধদেবকে তথায় রাখিলেন। সেখানে অতি সুকুমার-বয়স্ক, সুদর্শন বালকবালিকা ও কিশোরকিশোরীরা তাঁহার সম্মুখে থাকিত। কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে প্রাসাদসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে নানা বর্ণের ফুল ফুটিত, কিন্তু ঝরিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই তাহা স্থানান্তরিত করা হইত। একটি শুক্‌না ফুল বা পাতা তথায় থাকিতে পাইত না। প্রাসাদের কোন স্থানে আবর্জ্জনা বা বিসদৃশ দ্রব্য রাখিবার হুকুম ছিল না।

সমস্ত জগৎ একটি নন্দনকানন।

সুতরাং নিরবধি গান, বাদ্য, ফুলের শয্যা, ফুলমালা, রত্নময় দীপাবলী, দুগ্ধফেননিভশয্যা এবং প্রিয়দর্শন তরুণতরুণী ছাড়া বালক গৌতমের চক্ষে আর কিছুই পড়িত না। পৃথিবীতে যে, রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং নানাবিধ কষ্ট আছে, রাজকুমার তাহা কিছুতেই জানিতে পাইতেন না। মাঝে মাঝে রাজা স্বয়ং নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পুত্রকে দর্শন দিতেন। এদিকে ধূপধুনা, অগুরু ও চন্দনাদির গন্ধে প্রাসাদ আমোদিত থাকিত এবং মৃদু সমীর সদ্যঃপ্রস্ফুটিত ফুলগন্ধে মাতোয়ারা হইয়া যখন কুমারের অঙ্গ স্পর্শ করিত, তখন তিনি ভাবিতেন, আমার পিতার রাজ্য কি সুন্দর! পৃথিবী কি সুখের! এই সংসারের কোলাহল হইতে সুদূরে অবস্থিত প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে পৃথিবী তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই শৈশব-স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া গেল এবং তাঁহার চক্ষে সমস্ত জগৎটা একটা নন্দনকাননে পরিণত হইল।

একদিন বালক রাজপুত্র তাঁহার পিতার নিকট কপিলাবস্তু রাজধানীটা দেখিবার জন্ত অনুমতি চাহিলেন। শুদ্ধোদন আদেশ করিলেন, যেন সেদিন রাজধানীতে অশোভন কিছু না থাকে; বৃদ্ধ, জরাতুর, রুগ্ন, মৃত, শুষ্ক ও মলিন কিছু যেন কুমারের চক্ষে না পড়ে। সমস্ত রাস্তা-ঘাট চন্দন-জলে ধৌত হইয়া কুসুমাকীর্ণ করা হইল। কুমার গৌতমকে লইয়া সারথি ছন্দক * রাজপথে রথারোহণে চলিলেন। তাঁহার পিতৃরাজ্যের শোভাসম্পদ্ দেখিয়া গৌতম মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু কোথা হইতে হঠাৎ এক বৃদ্ধ রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া রাজপথে আসিয়া পড়িল! সেই পক্ককেশ, স্খলিতদন্ত, লোলচর্ম্ম, কুব্জদেহ বৃদ্ধকে দেখিয়া গৌতম শিহরিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি! একি? একি মানুষ?" সারথির উত্তরে তিনি বুঝিলেন,—বাঁচিয়া থাকিলে সকলকেই এক সময় এইরূপ বৃদ্ধ হইতে হইবে; তাঁহার পিতা শুদ্ধোদনেরও এইরূপ অবস্থা হইবে এবং স্বয়ং তিনিও এই দশা প্রাপ্ত হইবেন। আর এক দণ্ডও তিনি রাজপথে থাকিতে চাহিলেন না,—"তবে কি আমাদের সকলের দশাই এইরূপ হইবে?" এই ভাবনার শেষ নাই; রাজকুমার বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত হইলেন। এতদিন যে সত্য তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ঢাকা ছিল—সেই সত্য উলঙ্গ ও বীভৎসরূপে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

প্রথম বার পুরীদর্শন।

একদিন যাহা ব্যর্থ হইয়াছে, দ্বিতীয় দিন তাহা শোধরাইতে পারে, এই ভাবিয়া শুদ্ধোদন গৌতমকে আবার স্বীয় রাজধানী দেখাইলেন। এবার অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বিত হইল,—অপ্রিয়-দর্শন কিছু যেন কুমারের চক্ষে না পড়ে। কিন্তু মৃত্যুর আহ্বান অলঙ্ঘ্য। কখন কে কি অবস্থায় মরিবে তাহা কে বলিতে পারে? সেদিন রাজপথে একটি লোক মৃত হইল এবং তাহাকে দাহ করিবার জন্ত শোকার্ত্ত আত্মীয়েরা লইয়া চলিল। পুনরায় প্রশ্ন হইল—"একি আর উঠিবে না, কথা কহিবে না, ইহার পিতামাতারা কি চিরদিনের জন্ত ইহাকে হারাইলেন? এরূপ হওয়া কি শুধু ইহারই অদৃষ্টলিপি, না আরও কেহ কেহ এইভাবে চলিয়া যাইয়া থাকে?" উত্তরে শুনিলেন, "সকল জীবেরই এই নিয়তি সুনিশ্চিত,—কুমার স্বয়ং, তাঁহার পিতা এবং আত্মীয়গণ এবং জীব মাত্রেরই এই শেষ পরিণতি। বেশীদিন নয়, ১০০ জোর ১২০ বৎসর মানুষের পরমায়ু, ইহার পূর্ব্বেই অধিকাংশ লোককে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আত্মীয়গণের স্নেহ-জনিত আর্ত্তনাদ প্রভৃতি কিছুতেই এই অনিবার্য্য নিয়তির গতি রোধ করা যায় না।" চিন্তাকুল গৌতম

দ্বিতীয় বার দর্শন।

* সংস্কৃত বা পালী প্রাচীন সাহিত্যে যে সারথি শব্দ দৃষ্ট হয়—তদ্দারা কোন প্রধান ব্যক্তিকে বুঝাইত; কেহ যেন সারথিকে 'কোচওয়ান' মনে না করেন। সূর্য্যবংশের সারথি সুমন্ত্র দশরথ রাজার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। রাম-বনবাসোপলক্ষে রাজগৃহে যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়, অযোধ্যা কাণ্ডের সেই বর্ণনা পড়িলে দৃষ্ট হইবে সুমন্ত্র রাজাকে শুধু পরামর্শ দিতেন না, রাজ্ঞীদিগের আদেশ অমান্ত করা, এমন কি ভর্ৎসনা করার সাহসও তাঁহার ছিল। মহাভারতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন।

সেদিনও বিষণ্নমুখে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতা যে সত্য তাঁহার চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই ধ্রুব সত্য আবার তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল।

কি জানি, প্রথম ও দ্বিতীয় বার যে সকল উপায় ব্যর্থ হইয়াছে, তৃতীয় বারে তাহা সফল হইতে পারে! কুমারের মনোভাব হয়ত এবার ভাল হইবে, এই আশায় যথাবিহিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধোদন আবার তাঁহার পুরী ও রাজপথ সাজাইতে আদেশ করিলেন। এবার কুমার গৈরিকমণ্ডিত কমণ্ডলুহস্তে এক সাধুর দর্শন পাইলেন। যুবরাজের প্রশ্নের উত্তরে সারথি বলিলেন, "সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া ইনি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন।" গৌতম বুঝিলেন, ইহাই মানুষের প্রকৃত পথ; জরা, রোগ, শোক ও মৃত্যুর অধীন মানুষ কেন এই সংসারে আসক্ত হইয়া থাকিবে? এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

তৃতীয় বারে সাধুদর্শন।

শুদ্ধোদনের চেষ্টা থামিল না। কুমার অল্পকালের মধ্যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে, তিনি বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী, মাগধ প্রভৃতি চতুঃষষ্টি ভারতীয় লিপি শিখিয়াছিলেন এবং ধনুর্বিদ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজয় করিয়া দণ্ডপাণি রাজার কন্যা অনুপমা সুন্দরী গোপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। ইনিই

বুদ্ধ-পুত্র রাহুল। (তিব্বত দেশীয় প্রাচীন চিত্র হইতে)

শেষে পিতার প্রকৃত সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক "রাহুল" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

জীবের দুঃখ গৌতমের মনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিল। এই কষ্ট কি নিবারণ করা যায় না? সংসারের এই গ্লানি কি করিয়া তিরোহিত করা যায়? ইহাই তাঁহার ভাবনার মুখ্য বিষয় হইল। তিনি একদিন রাজপ্রাসাদ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ২৯ বর্ষ বয়সে ছন্দককে লইয়া কপিলাবস্তু ত্যাগ করিলেন। কপিলাবস্তু ছাড়িয়া গৌতম ছন্দক-সহ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুপথ অতিক্রম করিয়া ইঁহারা "অভমি" বা 'আনোমা' নামক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। যেখানে তিনি অশ্বের গতি বন্ধ করিলেন, সেই স্থানটির নাম "মনিয়া" * (অযুবৈস্তির জেলার অন্তর্গত); এইস্থান হইতে তিনি ঘোড়ার পিঠেই নদী অতিক্রম করিয়া ছন্দককে ঘোড়ার সহিত বিদায় দিলেন। ছন্দক কাঁদিয়া তাঁহাকে কাকুতিমিনতিপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন: গৌতম উত্তরে বলিলেন,—

"বজ্রাশনি-পরশু-শক্তি-শরাশ্ববর্ষে।
বিদ্যুৎপ্রভাপ্রোজ্জ্বলিতং কথিতঞ্চ লোহম্॥
আদীপ্তশৈলশিখরাঃ প্রপতেয়ুর্মূর্দ্ধি।
নো বা অহং পুনর্জনয়ে গৃহাভিলাষম্॥"

অর্থাৎ বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় প্রজ্বলিত লৌহ, আগ্নেয়গিরি-শেখর ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হউক, তাহাতেও আমার গৃহাশ্রয়ে অভিলাষ জন্মাইতে পারিবে না। তীব্র বিরাগের বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে জীবের দুঃখ নিবারণ করা যাইতে পারে—ইহাই একমাত্র চিন্তার বিষয় করিয়া রাজপুত্র মনিয়া নগর অতিক্রম করিলেন। প্রাচীন মনিয়া উক্ত নামের বর্ত্তমান নগর হইতে এক মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। পরিত্যক্ত নগর এখন এক বিরাট্ ভগ্নাবশেষবিশিষ্ট স্তূপে পরিণত। এখন লোকে উহাকে "তমেশ্বর দিল" বলে। এইস্থানে "তমেশ্বর" নামক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গৌতমের যাত্রা-পথের যে সকল প্রাচীন বৃত্তান্ত আছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত স্তূপগুলির স্থান-নির্দ্দেশ এখনও খুব ঠিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

১। ছন্দক-নিবর্ত্তন স্তূপ—আনোমা নদীর পূর্ব্বতীরে গৌতম পৌঁছিয়া যেখানে ঘোড়াসহ ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন, সেখানে এই স্তূপ বিদ্যমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, "চন্দভরি" (বর্ত্তমান চন্দবরু) নামক পল্লীতে এই স্তূপ ছিল। অপরেরা বলেন, সে স্থানটি বর্ত্তমানে "ছন্দবাড়ী" গ্রাম, হিউনসাঙ ও ফাহায়েন তথায় একটি চৈত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, এখনও উহা তথায় আছে।

* মনিয়ার বর্ত্তমান নাম ম্যোনিয়া (Mhencea); ইহা কপিলাবস্তু হইতে ৩৩ মাইল এবং রামগ্রাম হইতে ৬ মাইল দূরে। আনোমা নদী হইতে রামগ্রাম (হিউনসাঙের লেখানুসারে) ১০০লি, অর্থাৎ ১৬২ মাইল।

২। ছন্দক-নিবর্ত্তন স্তূপের কিছু পূর্ব্বদিকে আর একটি ক্ষুদ্র স্তূপের উল্লেখ পাওয়া যায়; এইস্থানে গৌতম তাঁহার বহুমূল্য কাশীনির্ম্মিত বস্ত্রাদি এক ব্যাধকে দিয়াছিলেন। এই স্তূপের নাম "কাষায় গ্রহণ"—লোকে এখন "ভিটা" নামক একটা পল্লী দেখাইয়া সেই স্তূপের স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

৩। কাষায় গ্রহণ স্তূপের অনতিদূরে আর একটি স্তূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার নাম "চূড়াপতি গ্রহণ।" এইখানে বুদ্ধদেব কেশচ্ছেদপূর্ব্বক সন্ন্যাসীদের মত চূড়াধারণ করিয়াছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চুদ্রাস নামক একটি গ্রামে উক্ত স্তূপ অবস্থিত ছিল। চুদ্রাস গ্রাম "ভিটা" হইতে উত্তর-পূর্ব্বে চার মাইল দূরে অবস্থিত।

নানাস্থান অতিক্রম করিয়া রাজকুমার বৈশালী নগরে উপস্থিত হইলেন (কাশী হইতে ১৪১ মাইল পূর্ব্বোত্তর কোণে)। জেনারেল কানিংহামের মতে বৈশালী (বিশার) পাটনার উত্তরে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে কোন সন্ন্যাসীর নিকট তিনি কিছুকাল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তথা হইতে মগধে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব-শৈলে তিনি ধ্যানধারণা প্রভৃতি অভ্যাস করেন। তখন বিম্বিসার মগধের রাজা। মগধ হইতে নানাস্থান ঘুরিয়া তিনি নিরঞ্জন-(বর্দ্ধমান ফল্গু) তীরে উপস্থিত হইলেন এবং দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন; তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ়-কঠিন, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং। ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং। নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"—'শরীর এই আসনে শুকাইয়া যাক্, অস্থি, মাংস, ত্বক্ লীন হইয়া যাক্,—তথাপি যে জ্ঞানে জীবের দুঃখের প্রশমন হয় তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত এই আসন হইতে বিচ্যুত হইব না।' পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য একি অসাধ্য-সাধন পণ! এই দয়ার অবতার ঋষির তুলনা জগতে কোথায়?

গৌতমের এই সময়ের কঙ্কালসার দেহের প্রতিমূর্ত্তি কতস্থানে প্রস্তরে গঠিত হইয়াছে; দেহে মাংসের আবরণ নাই—কেবল কয়েকখানি অস্থি। জীবের দুঃখ কিসে দূর করিবেন তজ্জন্য ধ্যানধারণা, অনাহার, শীতবাত-উপেক্ষা এবং অস্থিসার দেহ। বহুবৎসর এইভাবে চলিয়া গেল, একদিন তিনি অনাহারে ক্লিষ্ট দেহে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হিন্দুশাস্ত্রে যতি-ধর্ম্মের কঠোরতার যত নিয়ম আছে, সংযমী হইয়া তিনি তাহার সমস্ত প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না।

একদিন বটবৃক্ষের নীচে উপবাস-শুষ্ক মুখে রাজপুত্র তপস্যা করিতেছেন, রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। তখন বহু কৃচ্ছ্র সাধনের পর তাঁহার মন সন্দেহে বিচলিত হইল। অমনই দেখিলেন, ভীষণ ব্যাঘ্র ও সর্প, দৈত্য ও দানব বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তমাত্র। এ জীবনের কোন প্রয়োজন নাই, যখন লক্ষ্য মিলিল না, তখন বাঁচিয়া ফল কি? এই নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়া মাত্র মন হইতে ভয়ের ভাব তিরোহিত হইল। প্রশান্ত নির্ভীক চক্ষে সেই সকল বিভীষিকাকে তিনি উপেক্ষা

মার-বিজয়।

করিলেন। রজনীর দ্বিতীয় যামে দেখিতে পাইলেন, পরমসুন্দরী ষোড়শী যুবতীরা নগ্নদেহের নিরুপম সৌন্দর্য্য মদিরা-পাত্রের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। মুহূর্তের জন্য গৌতমের চক্ষু মুগ্ধ হইল, পরক্ষণেই দীর্ঘ তপস্যাজাত বিবেকবাণী তিনি শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন "আমি সুখের জন্য জন্মি নাই, তোমরা অন্যত্র যাও, দুঃখীদের বোঝা আমি মাথায় লইব, ইহাই আমার ব্রত।" রজনীর তৃতীয় যামে তিনি দেখিলেন, দেবাদিদেব ইন্দ্র স্বয়ং যেন তাঁহাকে জগতের আধিপত্য দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার এক হস্তে রাজদণ্ড এবং অপর হস্তে অভিষেক-তিলকের জন্য চন্দন ও মাল্য; গৌতম সেই রাজদণ্ড, মাল্য বা রাজটীকা গ্রহণ করিলেন না—আমি দুঃখীর ঝুলি গ্রহণ করিয়াছি, এ সকল ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার আমি প্রয়াসী নহি। এক সময়ে নচিকেতাকে যম বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু নচিকেতা বলিয়াছিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"—যাহা নশ্বর, ভঙ্গশীল তাহা আমি চাই না। অবিনশ্বর নিত্য-পদার্থের সন্ধান আমাকে দিন।

কথিত আছে, মার তাহার পুত্রকন্যা ও অসংখ্য সৈন্যসামন্ত লইয়া নানারূপ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বুদ্ধকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারই পরাভূত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইয়াছিল। মারের তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিল; পুত্রদের নাম বিলাপ, হর্ষ ও দর্প, এবং কন্যারা রতি প্রীতি ও তৃষ্ণা। ইহারা প্রত্যেকেই বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। মারের সেনাপতিদের মধ্যে উগ্রতেজা, সুনেত্র, দীর্ঘবাহু, প্রসাদ, প্রতিলব্ধ প্রভৃতি প্রধান ছিল। প্রলোভন এখানেই থামিল না। তারপর আর এক দৃশ্য। গৌতম দেখিলেন, শুদ্ধোদন বৃদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রশোকে তিনি মুহ্যমান, গোপা স্বামি শোকে যৌবনে যোগিনী, তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত, অনাহারে অনিদ্রায় কৃশদেহে সে লাবণ্য নাই। এই অপূর্ব্ব পারিজাত-মাল্য তো দেবতার দান,—তিনি দেবতার এই অমূল্য প্রসাদ পদদলিত করিয়া আসিয়াছেন। জননীর পার্শ্বে শিশু রাহুল বিমনা হইয়া বসিয়া আছে, "তুমি কি পাষাণ? আমাদিগের এত কষ্টে কি তোমার মমতা হয় না? ফিরে এস, জীব-দুঃখের নিয়তি তুমি খণ্ডাইবে কিরূপে?" এই দৃশ্য গৌতমকে মুহূর্ত্তকাল অভিভূত করিল, কিন্তু উহা মুহূর্ত্তমাত্র, "আমি বড় পথ ধরিয়াছি, আমাকে অলিগলি দেখাইওনা—আমার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, সুখ ও স্নেহের ডুরি দিয়া আমাকে সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইও না।"

এই সকল দৃশ্য গৌতম যাহা দেখিলেন তাহা কাল্পনিক বা স্বপ্নদৃষ্ট নহে। উহাদের কথাবার্ত্তা, হাবভাব, রূপ ও ভঙ্গী জীবন্ত; এরূপ মনে হইল, যেন তাহাদের নিঃশ্বাস তাঁহার গায়ে লাগিতেছে। তাঁহার চরিতাখ্যানগুলিতে কথিত আছে যে মার বা কামনার দেবতা তাঁহাকে ভীত, আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করিয়া মায়ার কূপে ফেলিবার জন্য এই সকল প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সকল ভয়ে নির্ভয় ও সকল প্রলোভনে অটল ছিলেন।

এই উপাখ্যানটি "মার-বিজয়" নামে পরিচিত। প্রকৃত বিরাগ জন্মিবার পূর্ব্বে মনুষ্যহৃদয়ের বল পরীক্ষার জন্য এক সময়ে সমস্ত সাংসারিক প্রলোভন যেন একত্র হইয়া সাধককে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই প্রলোভন দমন করিতে না পারিলে সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। কথিত আছে তান্ত্রিকগণ অহরহঃ এইভাবে সাংসারিক ভয়, লোভ ও আকর্ষণের সম্মুখীন হইয়া শ্মশানে মৃত দেহের উপর বসিয়া তপস্যা করেন। মার-বিজয়ের পর বুদ্ধের উপাধি হইয়াছিল "অর্হন" (অর্হৎ)—অরি হনন্ করিতে সমর্থ—শব্দটি এই অর্থ সূচনা করে। অজন্তা-গুহায় গৌতম-জীবনের এই অধ্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। আর একটি চিত্রে গৌতম যে রাজপথে বৃদ্ধ, মৃত ও সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা অতি সুচারুরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

অপদেবতা প্রলোভনের শেষশর নিক্ষেপ করিয়া নিরস্ত হইল। যিশু সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ আছে এবং আমাদের শিবের কামভঙ্গও এই জাতীয় সংস্কারজাত। আমার মনে হয়, যিশুর শয়তানকৃত প্রলোভন-দমন এবং শিবের কামজয় বৌদ্ধকাহিনীর নিকট ঋণী। কামদেব যখন শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন শিবের চক্ষু অকস্মাৎ গৌরীর বিম্বাধরের প্রতি পড়িয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল—"শিবস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ।"

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি।

যাহা হউক রজনীর শেষ যামে গৌতমের তপঃসিদ্ধি হইল। কামজয়ী পুরুষের মনের দৃঢ়তা অটল অচল হইলে রাত্রি-শেষে গৌতম দেখিলেন অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে—সত্যের আলোক পূর্ণভাবে তাঁহার চক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে: সেই তপোনির্ম্মল চক্ষে জগতের চারিদিকে তিনি সত্যের স্বর্ণাক্ষর উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন।

তাঁহার নিকট এই কয়েকটি কথা জাজ্বল্যমান হইল। প্রত্যেক জীব নিজের কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখ পায়—জীবন দুঃখময়, জন্মে জন্মে কামনা পরিহার করিতে পারিলে জন্মান্তরের পথে চিরভ্রাম্যমাণ জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে।

উৎকট কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া নিজেই দেহ ক্ষয় করা উচিত নহে। কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিবে না, নিষ্কাম হইয়া মধ্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক সুকর্ম্ম করিয়া যাইবে।

বুদ্ধ শব্দের অর্থ লব্ধ-জ্ঞান; তিনি যে তত্ত্বের অধিগম-দ্বারা এই উপাধি গ্রহণ করেন, সেই তত্ত্বের পারিভাষিক "প্রতীত্যসমুৎপাদ।" অবিদ্যার ধ্বংসই দুঃখমোচনের একমাত্র উপায়—এই মহাতত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করিলেন। পৃথিবীর যত দুঃখ তাহা এই অবিদ্যার ডালপালা হইতে জাত; অবিদ্যা-তরুর ক্রমবিকাশ এইরূপ—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরামৃত্যু, শোক, পরিদেব, দৌমনস্য, উপায়াসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্যন্তিক দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা। এই কথাগুলি কতকটা গীতার "মোহাৎ সঞ্জায়তে ক্রোধঃ" প্রভৃতির মত শোনায়। অবিদ্যা ধ্বংসের আটটি উপায় ভগবান্ বুদ্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক সমাধি—এই আটটি উপায়ের নাম আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। গৌতম অবিদ্যার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই দুঃখের গৃহ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাকে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি। এখন সেই নির্ম্মাতা আর গৃহ রচনা করিতে পারিবে না।" "অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সম্ অনির্ব্বিসং। গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥ গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি। সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকুটং বিসংকিতং। বিসংখার গতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।"

ভাবার্থ:—এই গৃহ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে, জন্মজন্মান্তরের পথ পর্য্যটন করিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ পাইয়াও তো এতদিন তাহার সন্ধান পাই নাই। হে গৃহ নির্ম্মাতা। এতদিন পরে আজ তোমার নাগাল পাইয়াছি, আর তুমি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিব না। গৃহের থাম ও ভিত চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। আমার চিত্ত আজ বিকারশূন্য—সংস্কার ও কামনা লয় পাইয়াছে।

অবিদ্যাজাত কামনাই এই দুঃখের ঘর বারংবার রচনা করিয়াছে। চিত্ত কামনা ও সংস্কার-শূন্য হইলে কে আর এই দুঃখের ঘর রচনা করিবে?

বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান শিক্ষা অহিংসা। শুধু মনুষ্য-জগতে এই অহিংসানীতি পালনীয় নহে, জীবমাত্রের প্রতিই ইহা আচরণীয়। এজন্য বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন, "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্। সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্" পশুবলি-সংবলিত যজ্ঞানুষ্ঠান নিন্দা করিয়া তিনি করুণ হৃদয়ে পশুহত্যার প্রতি লোক-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দয়ামূলক নীতির ফলে অশোক রাজা কর্ত্তৃক দেশ-বিদেশে শত শত পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ নিজে জীবনের সমস্ত কষ্ট বরণ করিয়া লইবেন এবং জগৎকে দুঃখমুক্ত করিবেন, এই মহানীতি পালন করিতেন:—

"যৎ কিঞ্চিদ্ জগতো দুঃখং তৎ সর্ব্বং ময়ি পচ্যতাম্।
বোধিসত্ত্ব শুভৈঃ সর্ব্বৈঃ জগৎ সুখিতমস্তু চ॥"

(জগতে যত কিছু দুঃখ-কষ্ট, তাহা সমস্তই আমাতে আসুক। বোধিসত্ত্বদের পুণ্যফলে জগৎ দুঃখমুক্ত হইয়া সুখী হউক।) বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে নানা উপদেশ-সংবলিত কত যে গল্প আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটি এইরূপ:—একদা ভরদ্বাজ নামক এক বণিকের গৃহে বুদ্ধ ভিক্ষুবেশে মুষ্টিভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। বণিক্ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—"তুমি সুস্থদেহ, অন্যের শ্রমলব্ধ শস্য লইতে আসিয়াছ কেন? আমি তোমাকে কিছু জমি দিতেছি, তুমি উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে শিখ।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমি কৃষিকার্য্যই করি, তবে আপনাদের কৃষির সহিত আমার কৃষির একটু তফাৎ আছে। মানুষের মনই আমার জমি, যত্ন ও উৎসাহ দুটি বলদ, লাঙ্গলের ফাল

বিনয়, জ্ঞান হল এবং বিশ্বাসই আমার বীজ। এই বীজ হইতে নির্ব্বাণ-ফল উৎপন্ন হয়।" প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও এক সাধুর মুখে বুদ্ধমুখোচ্চারিত উপদেশের প্রতিধ্বনি বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শোনা গিয়াছিল, "মনরে কৃষিকাজ জান না—এমন মানব-জনম রৈল পতিত, আবাদ কোর্লে ফল্‌ত সোনা।"

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ কি, তৎসম্বন্ধে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন "যে অবস্থায় সুখও নাই, দুঃখও নাই, যাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে না; যাহাতে উৎপত্তি ও নিরোধ তুল্যভাবে নিষ্পন্ন হয়, এবং যদ্দ্বারা একত্ব ও বহুত্বের ভেদ নিরস্ত হয়—সেই ভাবাভাব-বিনির্ম্মুক্ত অবস্থাকে নির্ব্বাণ বলে।" এই ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা যায়, তবে নির্ব্বাণ আধ্যাত্মিক জগতের "নেতি" আখ্যা পাইতে পারে। ইহ জগতের সতত অনুষ্ঠেয় নীতিসূত্র বৌদ্ধদের কর্ম্মকাণ্ডে পালনীয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদ্ "আনন্দ" যাহা উপনিষদ্ দিয়াছিলেন এবং শৈব ও বৈষ্ণবেরা বিশেষ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ গড়িয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে সেই আনন্দ বা অপর কোন আধ্যাত্মিক বাস্তব দানের স্থান কোথায়? প্রতিবাদীরা কহিয়া থাকেন, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য, উহাতে আর কিছু দেওয়ার নাই। কেহ কেহ এই ধর্ম্মকে "দুঃখবাদ" নাম দিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। কেন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল, তৎপ্রসঙ্গে আমরা আবার আলোচনা করিব।

যাহা হউক সম্যগবুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির পর গৌতম চরু ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। স্নানান্তে শুচি হইয়া শুদ্ধভাবে সুজাতা * তাঁহাকে যে উৎকৃষ্ট চরু খাইতে দিয়াছিলেন, গৌতম তাঁহার উপবাস-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সেই চরু আহার করিয়াছিলেন। এই চরু-সম্বন্ধে সুজাতা ভগবান্ বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন, "সদ্যঃপ্রসূত একশত কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধে আমি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি। তাহাদের দুগ্ধে পঁচিশটি গাভী, এবং সেই পঁচিশটির দুগ্ধে আবার বারটি গাভী—তৎপরে সেই বারটি গাভীর দুগ্ধে ছয়টি গাভী পোষণ করিয়া তাহাদের দুগ্ধদ্বারা এই চরু উৎকৃষ্ট চাউল ও মশলা সহকারে প্রস্তুত করিয়াছি। দেব, আপনি ইহা আহার করিয়া তৃপ্ত হউন।"

বটবৃক্ষমূলে নির্ব্বাণতত্ত্ব তাঁহার লাভ হইয়াছিল, এবং এইভাবে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি সেইদিন হইতে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই বটবৃক্ষটি "বোধিবৃক্ষ" নামে জগতে পরিচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে মৌর্য্যবংশের ধ্বংসকারী পুষ্যমিত্র নামক রাজা এই বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অক্ষয়বটের বীজ ধ্বংস হইবার নহে—পুনঃ পুনঃ অত্যাচারীর হাতে লাঞ্ছিত হইয়াও অক্ষয়বটের বংশধর এখনও গয়ায় বিরাজ করিতেছে।

* উরুজাতা রুবিবগ্রামের এক ধনাঢ্য গোপের পত্নী ছিলেন। উরুবিবগ্রামের সেনপল্লীতে ইঁহাদের বাড়ী ছিল।

গৌতম গয়া হইতে রওনা হইয়া কোণ্ডাল্য ও আর চারিটি সঙ্গী লাভ করেন। তাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের যে বিরাট্ শক্তি উত্তরকালে জগতের ¾ অংশ গ্রাস করিয়া অপর ¼ অংশের নিকটও আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক তাহাও স্বকীয় প্রভাব প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল সঙ্ঘশক্তি। এই পাঁচটি শিষ্যের দ্বারা সেই সঙ্ঘের পত্তন হইয়াছিল।

সঙ্ঘ।

বুদ্ধের ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিকাশ পায় নাই, উহা প্রধানতঃ নীতিমূলক। হিন্দুধর্ম্মের জটিল আধ্যাত্মিক-বাদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এই নীতিমূলক ধর্ম্ম সহজেই ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য দেশের গ্রহণীয় হইয়াছিল। কেন যে তিনি আধ্যাত্মিক উপদেশ দেন নাই তৎসম্বন্ধে পালি "অম্বট্ঠসুত্ত" নামক পুস্তকে একটি গল্প আছে, তাহা এইখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

একদা সারিপুত্র গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যটন করিতেছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—গৃহত্যাগ করিয়া আমি কি লাভ করিলাম? যে সকল জটিল সমস্যা আমার মনে সর্ব্বদা একটা তিবার সৃষ্টি করিয়াছে, গৌতম তো তাহার কোনটিরই সমাধান করিলেন না, আমার বনবাস বৃথা হইল। আমি আজই তাঁহাকে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইব। বুদ্ধদেব যখন আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন সারিপুত্রের মুখে যেন বর্ষাগমের সমস্ত মেঘের ছায়া পড়িয়াছে, তিনি শিষ্যের একপ বিমর্ষভাব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারিপুত্র বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি আমাকে গৃহ হইতে আনিয়া কি শিক্ষা দিয়াছেন? আপনার উপদেশ শুধু অষ্টমার্গ অনুসরণ করা। সেগুলি তো কয়েকটি নীতি সূত্র মাত্র, অধ্যাত্ম জগতের কোন তত্ত্ব তো বিন্দুমাত্রও আপনি আমার নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিলেন না। আমার প্রশ্নগুলি এই :—

সারিপুত্রের অভিমান।

"আত্মা কি? ইহা কোথায় থাকে, ইহার অস্তিত্ব আছে কি নাই? যদি আত্মা থাকে, তবে দেহের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ? এবং দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা কোথায় যায়? ঈশ্বর আছেন কি নাই? যদি থাকেন তবে জীবের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ? দেহ নষ্ট হইলে তাহার অণুপরমাণু কোথায় যায় এবং বিদেহী আত্মা কোথায় কি ভাবে থাকে?"

সারিপুত্র।

"যদি আপনি এই সকল প্রশ্ন-সম্বন্ধে আমাকে সম্যক্ রূপে অবহিত করিতে পারেন, তবে আমি আপনার কাছে থাকিব, নতুবা এখানে কষায় ফলমূল খাইয়া বন-ভ্রমণের কোন সার্থকতাই তো আমি দেখিতে পাই না।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমি তোমাকে ডাকিয়া গৃহ হইতে এখানে আনি নাই। তুমি সংসারজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শান্তি খুঁজিতেছিলে এবং সেই শান্তির জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলে। আমি তোমাকে সেই মহাশান্তি লাভের একমাত্র উপায় অষ্টমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি। তুমি ব্যস্ত হইলে চলিবে না, যদি তুমি আমার উপদেশের বশবর্ত্তী না হও, তবে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পার।

বুদ্ধের উপদেশ।

"দেখ, যেন একজনকে কেহ বাণ মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে,—অপর এক ব্যক্তি তাহার হৃদয় হইতে বাণটি তুলিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, তখন যদি সে বলে 'আগে বল, এই বাণটি উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণ—কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে, তবে আমি তোমাকে উহা তুলিতে দিব; আগে বল, উহা কি কোন ব্যাধ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তবে তোমাকে উহা তুলিতে দিব।' তোমার প্রশ্ন কি সেই শরাহত অবোধ ব্যক্তির মত নহে?

"তোমার চিত্ত একান্ত অশান্ত হইয়া শান্তি খুঁজিতেছিল, আমি তোমাকে শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ এই অষ্টমার্গ দেখাইয়া দিয়াছি। এই সকল পন্থা অনুসরণ করিলে তুমি স্বয়ং সত্য দর্শন করিবে, তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—তাহাদের উত্তর তুমি হাতে হাতে পাইবে। সত্যের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তুমি দ্বিধাশূন্য হইয়া সকলই চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে। কিন্তু এখন আমি যদি ঐ সকল প্রশ্নের এক একটি উত্তর বলিয়া দিই এবং তুমি অন্যত্র গমন করিয়া তোমা অপেক্ষা বিজ্ঞ বা প্রবীণ লোকের সঙ্গ লাভ কর, তখন তোমার মতগুলি বলিলে তিনি হয়ত অধিকতর যুক্তি ও পাণ্ডিত্যবলে সেগুলি খণ্ডন করিয়া অন্য মত স্থাপন করিবেন, তুমি তখন তাহার উত্তর দিতে পারিবে না এবং ভাবিবে যে আচার্য্য তোমাকে ভুল শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু যদি তুমি অষ্টমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধনার পথে স্বয়ং অগ্রসর হও এবং তোমার কামনা নিরস্ত হইয়া যায়, তখন তুমি তোমার তপোনির্ম্মল চক্ষে সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর নিজেই পাইবে। তখন তোমাকে সহস্রবার অন্যরূপ বুঝাইলেও কেহ তোমার বিশ্বাস টলাইতে পারিবে না। তুমি যদি একটা ঘোড়া তোমার সম্মুখে দেখ, তবে যদি খুব পণ্ডিত ব্যক্তিও তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে সেই জীবটা উট, তথাপি তুমি তাঁহার মত কিছুতেই গ্রহণ করিবে না।"

বুদ্ধ সমস্ত জগৎকে নীতিমার্গের সহজপথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, অধ্যাত্মরাজ্যের জটিল পথ পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন সুনীতির পথ অবলম্বন করিয়া লোক সত্য লাভ করিতে পারে। নতুবা অধ্যাত্মরাজ্যের কথা কেবল কূটতর্ক ও সূক্ষ্মবুদ্ধির লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়ে। ঋষির মত দ্রষ্টা হইতে পারিলে অধ্যাত্মরাজ্যের সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়, নতুবা

যাহার তাহার কাছে সেগুলি বলিলে তাহা শুধু পরস্পর বিরোধী মতবাদের জটিল ও সংশয়পূর্ণ সমস্যায় পরিণত হয়। অধ্যাত্মরাজ্য-সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার অষ্টমার্গ কুলুপের ন্যায়, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রত্যেকে স্বয়ং উদ্ঘাটন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে।

বুদ্ধ গৃহাশ্রমকে নিন্দা করেন নাই, কিন্তু ভিক্ষুকে গৃহস্থ হইতে উচ্চতর সম্মান দিয়াছেন। 'সামণ্যফলসুত্ত' পুস্তকখানি পাঠ করিলে এবিষয়ে তাঁহার মতামত অতি স্পষ্টভাবে জানা যাইতে পারে। বুদ্ধের তিরোধানের পর তাঁহার এবং তদীয় ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। শুধু জাতক গ্রন্থগুলি নহে, বহু পুস্তকে তাঁহারই মুখে শোনা-কথার দোহাই দিয়া নানা জনে নানা মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল গ্রন্থের উক্তি কতটা খাঁটি তাহা বলা যায় না।

পালি "সামণ্যফলসুত্তে" (শ্রমণ্যফলসূত্রে) লিখিত আছে, মগধ-রাজকুমারগণের চিকিৎসক জীবকের রাজগৃহস্থ মনোহর আম্রবাটিকায় ভগবান্ বুদ্ধদেব দ্বিশত-পঞ্চাশদধিক এক সহস্র সংখ্যক শিষ্যপরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন।

একদা মগধাধিপ মহারাজ অজাতসত্তু (অজাতশত্রু) স্বীয় রাজপ্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে নৈশগগনের শোভা উপভোগ করিতেছিলেন; তখন শরৎ কালের প্রসন্ন অম্বরে পূর্ণচন্দ্র শীত সুন্দর রশ্মি বিতরণ করিতেছিল। বিমুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাজা অনাহূত কাব্যকথায় তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন:—

"বন্ধুগণ! এই জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী কি সুন্দর! কি প্রিয়দর্শন! কি সান্ত্বনাদায়িনী! পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের কি মহৎ চিহ্ন!

"আজ এই জ্যোৎস্না-শীতল যামিনীতে এমন কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহার নিকট গেলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারিব?"

এই প্রশ্নের উত্তরে একজন সচিব বলিলেন, "মহারাজ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত লোকপূজ্য প্রবীণ পূরণ কস্সপ (পূরণ কাশ্যপ) মুনির নিকট চলুন, তাঁহার উপদেশে অভীপ্সিত শান্তিলাভ করিতে পারিবেন।" এই কথা শুনিয়া রাজা নীরব হইয়া রহিলেন। তৎপরে আর পাঁচজন সচিব পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রশংসাবাদ করিয়া মক্খলিপুত্ত গোসাল (মস্করিপুত্র গোসাল) অজিত-কেশকম্বল, ককুদ-কচ্চায়ণ (ককুদ-কাত্যায়ন), সঞ্জয়বেলট্‌ঠি-পুত্ত (সঞ্জয়-বেলাষ্টি-পুত্র), নিগণ্ঠঞাত-পুত্ত (নির্গ্রন্থজ্ঞাতি-পুত্র) এই পঞ্চ পণ্ডিতের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাদের কথা শুনিয়া পূর্ব্ববৎ নীরব হইয়া রহিলেন।

এই সময়ে ভিষক্‌প্রবর জীবক মহারাজ অজাতশত্রুর অনতিদূরে বসিয়াছিলেন, অজাতশত্রু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুহৃৎশ্রেষ্ঠ জীবক, তুমি কিছু বলিলে না যে?"

জীবক বলিলেন, "সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধদেব আমাদের আম্রোদ্যানে বাস করিতেছেন, তিনি জ্ঞান এবং পবিত্রতার আধারস্বরূপ, তিনি মুমুক্ষুজনের একমাত্র পথপ্রদর্শক। মহারাজ, তাঁহার নিকট চলুন, শান্তি পাইবেন।"

"প্রিয় জীবক, তুমি আমার হস্তীগুলি সুসজ্জিত করিতে বল।" তখন রাজার আদেশে পাঁচশত হস্তিনী সুসজ্জিত হইল, সেই ৫০০ হস্তিনীর উপর সুবেশপরিহিতা পাঁচশত সুন্দরী আলোকবর্ত্তিকা ধারণ করিয়া নানাভূষণশোভিত বিশালকায় দ্বিরদে সমারূঢ় মহারাজ অজাতশত্রুকে বেষ্টন করিয়া চলিল। রাজা সেই রাত্রিকালে মহাসমারোহের সহিত রাজগৃহ হইতে জীবকের আম্রবাটিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিশাল আম্রোস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজা সহসা ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন, আশঙ্কায় তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি ভীত ও উত্তেজিতকণ্ঠে জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন— "জীবক! তুমি কি আমাকে ছলনা করিয়া আনিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতেছ? দ্বিশত-পঞ্চাশদধিক একসহস্র ব্যক্তি যে স্থানে সমবেত, সেস্থান এমন নীরব কিরূপে হইতে পারে? একটি কাশী কিংবা হাঁচির শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না।"

"মহারাজ, আমি আপনাকে ছলনা করিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে আনি নাই, আমি তদ্রূপ পাষণ্ড নই। ঐ পটমণ্ডপে দীপ জ্বলিতেছে, ঐ দিকে চলুন।"

রাজা হস্তিপৃষ্ঠে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া যেস্থানে হস্তী আর চলে না, সেই স্থানে অবতরণ করিলেন এবং বস্ত্রমণ্ডপের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবক, ভগবান্ বুদ্ধদেব কোথায়?"

"ঐ মধ্যস্থ স্তম্ভের সম্মুখে পূর্ব্বমুখ হইয়া শিষ্য-পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব উপবিষ্ট আছেন।"

তখন রাজা অগ্রসর হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। রাজা দাঁড়াইয়া একবার সেই নিঃশব্দ বিশাল জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; ঊর্ম্মিহীন, নির্ম্মল হ্রদের ন্যায় শিষ্যমণ্ডলী নীরব ও প্রশান্ত। রাজা উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর! কি প্রশান্ত! আমার প্রাণাধিক কুমার উদায়িভদ্দের (উদায়িভদ্রের) জীবন যেন এইরূপ শান্তিপূর্ণ হয়।"

অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবান্ বুদ্ধদেবের আদেশ হইলে আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি।"

"মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

"হে দেব! সংসারে নানা শ্রেণীর লোক কাজ করিয়া থাকে। সারথি, অশ্বরক্ষক, তীরন্দাজ, নিশানবাহক, সেনাপতি, সৈনিক, পাচক, নাপিত, মালাকর, মোদক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, জ্যোতির্বিদ্, সচিব প্রভৃতি শত শত শ্রেণীর লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। ইহারা স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহজীবনেই স্বকৃত কর্ম্মের পুরস্কার লাভ করিতেছে। তাহারা স্বীয় পরিশ্রমজাত অর্থে পরিবার পালন করিয়া বন্ধুবান্ধবসহ নানারূপ সুখভোগ করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। শ্রমলব্ধ অর্থ দানধ্যানাদি ব্যাপারে ব্যয় করিয়া পরকাল-সম্বন্ধেও তাহারা সুখের পথ স্থির করিয়া রাখিতেছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম্মের পুরস্কার ইহজীবনেই লক্ষিত হইতেছে কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের কোন পুরস্কার কিংবা লাভ আপনি এরূপ দেখাইতে

পারেন কি, যাহার ফল এই জীবনেই ভোগ করা যায়?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন?"

"হাঁ, করিয়াছিলাম।"

"আপনার আপত্তি না থাকিলে, তাঁহাদের নিকট আপনি কি উত্তর পাইয়াছেন, আমাকে বলিতে পারেন?"

"আমি একবার পূরণ কস্‌সপ (পূরণ কাশ্যপ) মুনির নিকট গিয়াছিলাম, নানারূপ ভদ্রতা এবং সৌজন্যসূচক আলাপের পর আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'যে ব্যক্তি লোক-পীড়ন করে, দস্যুতা কিংবা চৌর্য্যবৃত্তি করে, তাহার কোন পাপই হয় না। যে অসত্য কথা বলে, পরদার-গমন প্রভৃতি সমাজ-গর্হিত কাজ করে, তাহার প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি কেহ তীক্ষ্ণধার অসিদ্বারা সমস্ত মানবমণ্ডলীর দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এক স্তূপাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত করে তথাপি সে কোন পাপকার্য্য করিল বলিয়া আমি মনে করি না। যদি কোন ব্যক্তি গঙ্গার দক্ষিণোপকূলস্থ সমস্ত জনপদ নির্ম্মনুষ্য করিয়া ফেলে, তথাপি সে কোন দুষ্কর্ম্ম করিল বলিয়া আমার প্রতীতি হইবে না। যদি কেহ গঙ্গার উত্তরোপকূলের সমস্ত জনপদ ব্যাপিয়া মুক্তহস্তে দান করিতে করিতে অগ্রসর হয় এবং প্রতিস্থানে পূজা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় মনে কৃতার্থ হয়, তথাপি সে কোন পুণ্যকর্ম্ম করিল বলিয়া আমি মনে করিব না। পরোপকার, আত্মসংযম, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা কোনরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।' হে দেব, কাশ্যপ এইভাবে 'সন্ন্যাসাশ্রমের ইহকালের পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ম্মের অসারতা সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কেহ আম্রফল-সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে তদুত্তরে নিম্বফলের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিলে যেরূপ হয়, এই উত্তর তেমনই হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে আমি তাঁহার এই কথাগুলির নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই করি নাই, এবং যদিও এ উত্তরে আমার কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তি হয় নাই, তথাপি আমি অসন্তোষসূচক কোন কথা বলি নাই, এবং তাঁহার কথা গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীরবে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

"অতঃপর মক্‌খলিপুত্ত (মস্করিপুত্র) গোসালের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'জীবগণের পাপপুণ্যের কারণ নাই। ব্যক্তিবিশেষের জীবন যে ভাবে গঠিত হইতেছে, তার উপর তাহার কিছুমাত্র হাত নাই। পুরুষকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিদ্ ও জড় পদার্থ একই অলক্ষ্য নিয়মের বশবর্ত্তী, তাহাদের কিছুমাত্র স্বশক্তি নাই, তাহারা অন্ধভাবে ভাগ্যের অধীন হইয়া বিচরণ করিতেছে। তাহারা যে শ্রেণীতে, যে অবস্থায়, যেরূপ প্রকৃতি লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে কাজ করে এবং সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জীবই ৮৪ লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং অসংখ্য উপায় এবং অসংখ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহজগতে বারংবার গমনাগমন করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ভাবিতে পারেন,—আমি এই সকল

পুণ্যানুষ্ঠান-দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিব, মূর্খও জ্ঞানানুসারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি স্বীয় মানদণ্ডে জীবের সুখদুঃখ পরিমাণ করিয়াছেন, তাহার তিলমাত্রও ব্যতিক্রম হইবার নহে। জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহা অসম্ভাবিরূপে জীবের ভোগ করিতে হইবে। তীর হইতে গুলি নিক্ষেপ করিলে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গমন করে, সেই সীমা হইতে অধিকতর নিকটে কিংবা দূরে পড়ে না; সেইরূপ জ্ঞানী হউন কিংবা অজ্ঞানীই হউন, কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। জন্মজন্মান্তরক্রমে স্বভাবাধীন-ভাবে কর্ম্মক্ষয় হইলে জীব চরমশান্তি পাইয়া থাকেন।' হে দেব! মক্খলিপুত্র গোশাল 'সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে জন্মজন্মান্তর-দ্বারা কিরূপ পাপক্ষয় হয় তদ্বিষয়ক উপদেশ দিয়াছিলেন।

"অজিত-কেশকম্বলকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যাগযজ্ঞের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে, পরকাল বলিয়াও কিছু নাই। কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না, প্রাকৃত মানবের পক্ষে তাহা সুদূরপরাহত। মৃত্যুর পর পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, কিছুই থাকে না। মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহারা মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বা সংকারাদির দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকারের কথা বলেন, তাঁহারা হয় অজ্ঞ, না হয় মিথ্যাবাদী। মৃত্যুর পর মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেরই অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহাদের কিছুই থাকে না।' দেব! এই ভাবে অজিত-কেশকম্বল 'সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে দেহ এবং আত্মার ধ্বংস-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

"তৎপর আমি ককুদ-কচ্চায়নকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সপ্তপ্রকার দ্রব্যে জগৎ নির্ম্মিত, ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহারা নির্লিপ্ত এবং অবিনশ্বর, এগুলি হইতে আর কিছু উৎপন্ন হয় নাই, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ইহারা অটল। জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং আত্মা এই সপ্তদ্রব্য, ইহাদিগকে কেহ নিধন করিতে পারে না, ইহারা চিরস্থায়ী। যদি কেহ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা কাহারও জীবন নষ্ট করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সপ্ত-দ্রব্যের অভ্যন্তর দিয়া অসি চলিয়া গিয়াছে মাত্র।' এইভাবে ককুদ-কচ্চায়ন 'সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রত্যক্ষ পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন।

"তৎপরে আমি নিগ্রর্ন্থ জ্ঞাতি-পুত্রকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'নিগ্রর্ন্থগণ চারি প্রকার সংযম অভ্যাস করেন, তাঁহারা সাধারণভাবে জল পান করেন না (জীবহননা-শঙ্কায়) এবং সর্ব্বদা পাপ হইতে বিরত থাকেন।' 'সন্ন্যাসাশ্রমের ফল কি?' ইহার উত্তরে নিগ্রর্ন্থ জ্ঞাতি-পুত্র আমাকে চারি প্রকার সংযম-সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

"তৎপরে আমি সঞ্জয়বেলট্‌ঠিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর পরকাল আছে কিনা, আমি কি উত্তর দিব মনে ভাবিতেছ? পরকাল আছে কিংবা পরকাল নাই, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না। এই ভাবে "পাপপুণ্যের ফলাফল এবং সত্যরক্ষণশীল ব্যক্তির পরকালের পুরস্কার কি?" প্রভৃতি প্রশ্ন-সম্বন্ধেও আমি সেই

একই উত্তর দিব।' সঞ্জয়বেলট্‌ঠি 'সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতি কিংবা পূর্ব্বোক্ত অপরাপর পণ্ডিতগণের প্রতি আমি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করি নাই। তাঁহাদের বাক্য গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য না করিয়া আমি নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়াছি।

"এইক্ষণ ভগবন্! আমি আপনাকে সেই প্রশ্নই করিতেছি। এই সংসারে সন্ন্যাস অবলম্বন-দ্বারা কি পুরস্কার লাভ হইতে পারে, সংসারাশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসরণ করিয়া যেরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্ন্যাসলব্ধ তদ্রূপ কোন প্রত্যক্ষ ফলের বিষয় আমাকে বলিতে পারেন কি?"

"মহারাজ, আমি তাহা বলিতে পারিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনাকে একটি প্রশ্ন করিব। মহারাজ, আপনার দাসগণ প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাণান্ত-পরিশ্রমে আপনার সেবা করিয়া থাকে। তাহারা পরিশ্রম স্বীকার করে কিন্তু আপনি সমস্ত সুখ-সম্ভোগ করেন। ইহাদের মধ্যে যদি একজন মনে করে, অপরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সে যদি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষুর বৃত্তি অবলম্বন করে, ক্রমে যদি তাহার সন্ন্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং আপনি শুনিতে পান যে, আপনার ভৃত্যগণের মধ্যে একজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে সামান্য আহারে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিতেছে তখন আপনি কি তাহাকে পুনশ্চ দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিবেন?"

"কখনই না, বরং তাহার সহিত দেখা হইলে আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সম্মান দেখাইব, তাহার সেবাশুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিব।"

"এরূপ হইলে, মহারাজ, আপনাকে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সন্ন্যাসধর্ম্মের কিছু ফল ইহজীবনেই লাভ করা যাইতে পারে।"

"হাঁ, ভগবন্, তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ফলের বিষয়ে আপনি আমাকে বলিতে পারেন কি?"

তখন বুদ্ধদেব স্বাধীনজীবী গৃহস্থ যদি সম্পত্তি ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সেও নির্জ্জনে ইন্দ্রিয়সংযমাদি যতিধর্ম্ম আচরণের জন্য লোকপূজিত হয়, প্রমাণ করিলেন। রাজা এবারও সন্ন্যাসাশ্রমের কতক ফল ইহলোকেই লব্ধ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন,—"অন্য কোন উৎকৃষ্টতর ফলের বিষয়ে আমাকে বলুন।"

"সেরূপ ফল অনেক আছে, বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শুনুন। যদি পৃথিবীতে এরূপ কোন প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শন-লাভ হয়, যিনি বিগতস্পৃহ, কামনাশূন্য এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, লোভমোহাদি যাঁহাকে ক্রীড়নকের ন্যায় করিয়া রাখে নাই, যিনি নিজ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত উদ্বেগশূন্য, যিনি পরমরম্য পরমপ্রিয় সত্যের অনুসন্ধান করিয়া তল্লাভে চিরপ্রসন্ন হইয়াছেন,—এইরূপ সন্ন্যাসীর দর্শনমাত্র বদ্ধ গৃহস্থগণের মায়াপাশ কাটিয়া যাইবে। এই বিপদ্ ও বিঘ্ন-সঙ্কুল

সাংসারিক জীবন তখন তাহার ভাল লাগিবে না। শৃঙ্খলিত পক্ষী যেরূপ উড্ডীয়মান পক্ষিদর্শনে তাহার স্বীয় স্বাধীন শক্তির কথা স্মরণ করে, মুক্ত পুরুষের দর্শন লাভ করিয়া বিড়ম্বিত গৃহস্থ সেইরূপ মুমুক্ষু হইবে। এক উন্নততর উৎকৃষ্ট জীবনের চিত্র তাহার চক্ষে পড়িবে। সে তখন ভিক্ষু হইয়া শান্তিলাভ করিবে। ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিলে নির্জ্জনে তাহার আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মিবে, সে প্রতিপদে সতর্ক হইবে; যে কামনা বিপদসঙ্কুল, যাহা সূচনায় লোভের উদ্রেক করিয়া পরিণামে কষ্টের প্রান্তসীমায় উপস্থিত করে, সেইরূপ বাসনার অনুসরণে তাহার স্বাভাবিক ভীতি উৎপন্ন হইবে। সে শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে প্রতিকার্য্যে মহান্ আত্মসংযমের উদ্দেশ্য স্মরণ করিবে। এইভাবে ভিক্ষু মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে শিক্ষা করে, শেষে কামনা আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, ভোগের ইচ্ছা তাহার ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া যায়। সংসারাশ্রমে তাহার এই নিবৃত্তি-শিক্ষার পক্ষে বহু অন্তরায় আছে।

"মহারাজ, যেমন কোন রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি অতি কষ্ট পাইতেছিল, তাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল এবং চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, সে যদি পুনরায় স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, তবে পূর্ব্বাবস্থা ও পরের অবস্থা স্মরণ করিয়া সে কত সুখী হয়!

"মহারাজ, যেরূপ কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তি শৃঙ্খলিত অবস্থায় এক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকে, কিন্তু মুক্তি পাইলে সে পূর্ব্বাবস্থা ও পরের অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রফুল্ল হয়।

"মহারাজ, যেমন কোন ক্রীতদাস পরের আদেশ-পালনে নিযুক্ত থাকে, তাহার স্বচ্ছন্দ গতিবিধির শক্তি থাকে না, সহসা যদি সে মুক্তি পায় তবে সে কত সুখী হয়।

"মহারাজ, মনে করুন কোন সম্পন্নব্যক্তি মরুভূমির পথে পড়িয়া অনাহারে ও তৃষ্ণায় বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি যদি সহসা এক ধনধান্যশালিনী পল্লীর উপান্তে উপস্থিত হন, তাহা হইলে কত সুখী হন।

"সেইরূপ ভিক্ষু ক্রমে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া যখন কামনা হইতে মুক্তিলাভ করেন, তখন সেই রোগমুক্ত, কারামুক্ত, মরুভূমি-উত্তীর্ণ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার আনন্দ লাভ হয়। তাঁহার প্রফুল্লতা হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে উৎপন্ন হয়, বাহিরের অবস্থাচক্রে তাহার হ্রাস বা উপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যেরূপ কোন নদী, স্বর্গ হইতে বৃষ্টিধারা পড়ুক বা না পড়ুক, দুইকূল স্পর্শ করিয়া পরিপূর্ণ প্রবাহে চলিয়া যায়, তদ্রূপ তিনিও সমভাবে চলিয়া যান।

"হে মহারাজ, সন্ন্যাসাশ্রমে এই সকল ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে কিন্তু ইহা ছাড়া আরও ফল আছে।

"আত্মসংযমের ফলে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যেরূপ এক পদ্মপুকুরে অনেকগুলি পদ্ম বিকাশ পাইয়াছে, জলধারা তাহাদের প্রত্যেকটি পুষ্ট হইয়াছে, শীতলজলস্পর্শে তাহারা নির্ম্মল এবং নবীনভাব ধারণ করিয়াছে, রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ অথবা নীলবর্ণ পদ্মের কোনটির একটি অংশ নাই যাহা সৌরভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে;—যেরূপ আপাদমস্তক শ্বেতবর্ণ পরিষ্কৃত বস্ত্রে পরিবৃত হইয়া কেহ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার শরীরের

এমন কোন স্থান নাই, যাহাতে সেই শ্বেত পরিধেয়ের সংস্পর্শ নাই, সন্ন্যাসাশ্রমে নিষ্কলঙ্ক জীবন লাভ করিয়াও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন পবিত্রতা লব্ধ হইয়া থাকে।

"যখন চিত্ত এইরূপে প্রশান্তভাব ধারণ করে, তখন পাপ উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন দেহসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। এ দেহ ক্ষণিক তৃষ্ণা ও ক্ষুধার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ধান্যের সঙ্গে তুষের যে সম্পর্ক, তরবারির সঙ্গে কোষের যে সম্পর্ক, দেহের সঙ্গে আত্মারও সেইরূপ সম্পর্ক। তখন দেহ হইতে আত্মাকে ইচ্ছানুসারে বিচ্যুত করিতে পারা যায়; ইন্দ্রিয়াদি-সংযমশীল মুক্ত সন্ন্যাসীর এই লাভ হয়, যে কোন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তিনি তাহা পরিগ্রহ করিতে পারেন, তিনি কঠিন ভূমি ভেদ করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, জলের উপর ছুটিয়া যাইতে পারেন, এক হইয়া বহু রূপ গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি ইচ্ছানুসারে দৃশ্য বা অদৃশ্য হইতে পারেন, বিহঙ্গের ন্যায় শূন্যমার্গে উড্ডীন হইতে পারেন। কুম্ভকার যেমন ইচ্ছানুসারে যে কোন রূপ ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে, স্বর্ণকার কিংবা হস্তিদন্ত-ব্যবসায়ী যেরূপ যে কোন মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে, সেইরূপ সন্ন্যাসী যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন।

"ইহা ছাড়াও সন্ন্যাসের আরও ফল আছে। চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হইলে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের অবস্থা স্মৃতিতে উদিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বহুজীবনের বিবরণ তাহার মনে জাগরিত হয়; অমুক স্থানে আমি অমুক নামে পরিচিত ছিলাম, অমুক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম, আমি অমুক পরিবারভুক্ত ছিলাম, আমার আয়ুর পরিমাণ এইরূপ ছিল; সেই স্থান হইতে আমি অমুক স্থানে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিলাম, তথায় আমি এই কাজ করিয়াছিলাম, তারপর আবার আমার অমুক স্থানে জন্ম হয়, ইত্যাদি। এইভাবে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয়।

"মহারাজ, যেরূপ কোন ব্যক্তি এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে, সে গ্রাম হইতে পুনরায় গ্রামান্তরে যাইয়া শেষে নিজগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে, তখন অধ্ব-ক্লান্তি দূর হইলে, প্রশান্ত অন্তঃকরণে যেরূপ তাহার মনে হয়, আমি অমুক স্থানে গিয়াছিলাম, তথা হইতে অমুক স্থানে যাইয়া এই কার্য্য করিয়াছি, অমুক স্থানে উপবেশন করিয়াছি, অমুক স্থানে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াছি, এবং শেষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছি; সন্ন্যাসাশ্রমের এই প্রত্যক্ষফল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ছাড়াও উৎকৃষ্ট এবং উন্নততর আরও ফল লব্ধ হইয়া থাকে।

"মুক্ত সন্ন্যাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ হয়, তিনি বস্তু ও জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। কোন্ ব্যক্তি কি কর্ম্ম করিতেছে এবং তাহার কি প্রকার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতে হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারেন। যেরূপ, মহারাজ! প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া কেহ নিম্নে জনস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পায় লোকগণ কে কি ভাবে কাজ করিতেছে, কে আসিতেছে, কে কোন্ পথে যাইতেছে ইত্যাদি, মুক্ত সন্ন্যাসী কামনার পরিণতি সেইরূপ সূচনায়ই দেখিতে পান, কোন্ কামনার পরিণাম বিষময়, কোন্ পথ কণ্টকময়, কোন্ কার্য্যদ্বারা উদ্বেগ ও অনর্থ সৃষ্ট হয়, কোন্ কার্য্যদ্বারা উহা নিবারিত হয়,

তিনি উহা জানিয়া কামাসব, ভবাসব এবং অবিদ্যাসব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হন। তাঁহার বর্ত্তমান কামনা, ভবিষ্যৎ কল্পনা এবং অজ্ঞানজনিত মোহ এই ত্রিবিধ কষ্টের কারণ একেবারে দূর হইয়া যায়, ঈদৃশ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চির প্রশান্তিতে সুস্থিত হন। যেরূপ, মহারাজ, কেহ পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া নির্ম্মল জলস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সেই নির্ম্মল জলের ভিতর যে সকল শঙ্খ, কাঁকর, প্রস্তর এবং হাঙ্গর রহিয়াছে, তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন, বাসনাতাড়িত জীবনের কষ্টগুলিও মুক্ত সন্ন্যাসী সেইরূপ দেখিতে পান। এই জ্ঞানই সন্ন্যাস-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ, এই জ্ঞানের তুল্য উৎকৃষ্ট ফল মনুষ্য-জীবনে আর কিছু লব্ধ হইতে পারে না।"

ভগবান্ বুদ্ধ এই ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে অজাতশত্রু বলিলেন, "হে পরমারাধ্য দেব, পতিত দ্রব্যকে পুনঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া দিলে, অথবা যাহা লুক্কায়িত ছিল তাহা সম্মুখে ধরিলে, অথবা ঘোর তিমিরাবৃত স্থানে আলোক ধরিলে, অথবা পথহারা বিপন্ন পথিককে পথ দেখাইয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ ভগবন্, আপনি নানা উজ্জ্বল এবং বিচিত্র উপমাদ্বারা আমাকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন হে দেব, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয়দানে যেন ত্রুটি না হয়। ভগবন্, আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন, আমি যাবজ্জীবন আপনাতে অনুরক্ত থাকিব। আমি মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ, দুর্ব্বল এবং ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন। আমি রাজ্যলাভের জন্য আমার পরম পূজনীয় সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতারস্বরূপ পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি। তিনি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ নৃপতি এবং অতি উদার-চরিত্র দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। আমার ন্যায় নরাধমকে আশ্রয়দান করুন, যেন ভবিষ্যতে আর আমি পাপ না করিতে পারি।"

"মহারাজ, তুমি পাপাসক্ত হইয়া এরূপ কার্য্য করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি যখন ইহা পাপ বলিয়া মনে করিতেছ এবং সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না, তখন আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া জানিয়াছে, সে ভবিষ্যতে আর পাপ করিতে পারে না।"

সেই রমণীয় জ্যোৎস্নাশীতল নিশীথে রাজা হৃদয়ের ব্যথা জুড়াইবার জন্য ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকট গিয়াছিলেন। অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পর কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠ-ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। শারদ নিশীথের পূর্ণচন্দ্র অনুতপ্ত প্রাণে পিপাসা জাগাইয়া তাহা এইভাবে পুণ্যপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। *

এই 'সামণ্যফলসুত্তে' বুদ্ধদেবের সময়কার নানা দার্শনিক মতের অতি সংক্ষেপে একটা বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, সেই সময়ে উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ অতি জটিল

* মল্লিখিত এই প্রবন্ধটি সন ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা তাঁহার "বুদ্ধদেব" নামক পুস্তকে ২০৪-২১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

চিন্তার আবর্ত্তে পড়িয়া কতকটা বিলয় পাইবার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। বুদ্ধদেব কামনা, তাহার প্রগতি ও তাহার শেষ পরিণতি, ঠিক একটা অঙ্কুরের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও ধ্বংসের মত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া তাঁহার ধর্ম্মমত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই যুক্তিতর্কের প্রাবল্যের দিনে তিনি অনির্দ্দিষ্টের সন্ধানে লোককে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন নাই, কিন্তু প্রায় প্রত্যক্ষ ফলের মত নির্ব্বাণতত্ত্বকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পূরণ-কাশ্যপ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন। মক্খলিপুত্ত গোশাল অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং ককুদ-কাত্যায়ন কতকগুলি নিত্য বস্তুর তালিকা দিয়া মানুষের কিছু করণীয় আছে ইহা স্বীকার করেন নাই। এই সকল মতের কোনটিতেই সমাজ-রক্ষার ব্যবস্থা নাই। ইহারা অবাধ-চিন্তাশীলতার ফল মাত্র; সাম্প্রদায়িক, সামাজিক, নৈতিক এবং পৌরোহিত্যের সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড এই মতবাদীরা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, অথচ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা ইহাদের কোনটিরই মধ্যে ছিল না।

বুদ্ধ আধ্যাত্মিক কোন নূতন চিন্তার বাহাদুরি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি দুঃখবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখাইয়া সমস্ত বিশ্বকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জগতের সকলেই দুঃখী, সকলেই ত্রিতাপ-দগ্ধ সুতরাং জগতের সর্ব্বস্থান হইতেই তাঁহার আহ্বানের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। যে সকল সমস্যার উপর সমস্ত জগতের শান্তি নির্ভর করে, তিনি সেই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া যে রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অচিরকাল মধ্যে সর্ব্বজন-গ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

বুদ্ধের সময় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল মত প্রচলিত ছিল তাহার সকলগুলিই কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণীতে বৌদ্ধমত বলিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় অজাতশত্রু-কথিত ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতের সমস্তগুলিই শেষযুগে বৌদ্ধগণের কোন না কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে বৌদ্ধমত এই ভাবের বলিয়া লিখিত হইয়াছে :—

"অভিলষিত দ্রব্যভোজনই স্বর্গ। নিজ পত্নীতে ও পরদারে যথেচ্ছ বিহার করিবে।" (স্বদার-পরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা)। "প্রত্যক্ষান্ন মানং ন সকলফলভুগ্ দেহভিন্নোঽস্তি কশ্চিন্মিথ্যাভূতে সমস্তেঽপ্যনুভবতি জনঃ সর্ব্বমেতদ্বিমোহাৎ।" "কা সৃষ্টৌ পরিবেদনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোদ্ভবঃ। কুম্ভাদ্যাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তত্তৎকুলালাদিতঃ॥" অর্থাৎ দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগী কোন আত্মাদি নাই। এই মিথ্যা-ভূত অখিল সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে। যখন মাতা-পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির জন্য ভাবনা কি আছে? অর্থাৎ সৃষ্টি কিরূপে হয়, তাহাতো চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছ, এজন্য পৃথক্ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শুধু পূরণ-কাশ্যপের মত নহে, মস্করিপুত্র গোশাল, অজিত কেশকম্বল, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র এবং সঞ্জয় বেলট্‌ঠের মত—ইঁহাদের কোন মতই ভারতবর্ষে হারাইয়া যায় নাই; বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের পর বাউল ও সহজিয়া গুরুদের মধ্যে যে সকল মত প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও বিকৃত বৌদ্ধমত। আমরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইব, বুদ্ধের সময়ের প্রচলিত যে ছয়টি চিন্তাধারা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলি বৌদ্ধদিগের সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং তৎকালের কোন মতই এদেশ হইতে চলিয়া যায় নাই। সমাজের অধস্তনস্তরে সেই সকল মত সহজিয়াদিগের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। অধুনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদের নিম্নস্তরে যেরূপ বৌদ্ধমত প্রচ্ছন্ন-ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, বুদ্ধের সময়কার ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতও তদ্রূপ কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়াছিল। সহজিয়াদের বিস্তৃত সাহিত্য পাঠ করিলে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। বঙ্গদেশের এই সকল মত এখনও যেরূপ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তদ্রূপ উহা আছে কি না তাহা আমরা জানি না। বুদ্ধের নীতিমূলক ধর্ম্মের সঙ্গে এই সকল মতের গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। বুদ্ধ জটিল আধ্যাত্মিক চিন্তার দিকে একেবারেই যান নাই, কিন্তু এই সকল মতে ব্যাপকভাবে স্বাধীন চিন্তার খেলা দৃষ্ট হইয়া থাকে (পরিশিষ্টে সহজিয়া প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

অজাতশত্রু যে তাঁহার পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে বহুপ্রবাদ ও উপাখ্যান বৌদ্ধজগতে প্রচলিত আছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, যথা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ,—এই সকল প্রবাদ বিশ্বাস করেন নাই। আমরা এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্ম যে গৃহস্থের আশ্রম অপেক্ষা ভাল, তৎসম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত অপ্রত্যয় করিবার কোন কারণ নাই। সেই মতবাদটি বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে। এখনও এদেশের লোকের বিশ্বাস যে মুক্তিকামী কোন লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার সাত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার পায়। সেদিনও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'সন্ন্যাসাশ্রম ভাল না গৃহস্থাশ্রম ভাল?' পরমহংসদেব স্বীয় অভ্যস্তভাবে একটা প্রবচন দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন—"খোলার মধ্যে খৈ যখন তৈরী হয়, তখন কতকগুলি খৈ আগুনের উত্তাপে বাহিরে আসিয়া পড়ে। কতকগুলি খোলার ভিতরেই থাকিয়া যায়। যেগুলি বাহিরে আসিয়া পড়ে সেগুলি যেরূপ ধব্‌ধবে সাদা হয়, কড়ার ভিতরের খৈ তেমনটি থাকে না, সেগুলি একটু লাল্‌চে হয়।"

বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে তপঃসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ধর্ম্মার্থ অতিরিক্ত কঠোরতা এবং দৈহিক স্বচ্ছন্দতা—এই উভয় পন্থা পরিহারপূর্ব্বক 'মধ্যপথ' অবলম্বন করিয়াছিলেন। বোধহয় জগতে নৈতিক জীবনের প্রতি সর্ব্বপ্রথম তিনিই এতটা জোর দিয়াছিলেন। এই নৈতিক তরুর অমৃতফল অশোক রাজার সময় ফলিয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

প্রথম পঞ্চ শিষ্যের পর ৬০ জন নূতন শিষ্যকে বুদ্ধদেব দীক্ষা প্রদান করিলেন। বর্ষাকালটি তিনি কয়েক বৎসর "মৃগ-দাব" নামক স্থানে বাস করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন। এই

মৃগদাবের বর্ত্তমান নাম সারনাথ। এখানে অশোকরাজা (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) ১২৮ ফিট্ উচ্চ একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মৃগদাব-সংলগ্ন জনপদের পূর্ণনাম ছিল, "ইষিপতনমিগদায়" (ঋষিপত্তনমৃগদাব)। পরবর্ত্তীকালে এই স্থানে হিন্দুরা সারঙ্গ-নাথের মন্দির স্থাপন করেন এবং তদবধি ইহার নাম সারঙ্গনাথ বা সারনাথ হইয়াছে। বুদ্ধদেবের শিষ্যসংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিল। অনামা নদীর তীরে আনন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ, শুভোদন, অমৃতোদন প্রভৃতি বহু ব্যক্তি তাঁহার মতে দীক্ষিত হন, ইঁহাদের অধিকাংশই কপিলবস্তুর রাজবংশজাত। কপিলবস্তুতে ফিরিয়া আসিয়া বুদ্ধ কতক দিন তথায় ছিলেন। এখানে রাজা শুদ্ধোদন তাঁহার বাসের জন্য ন্যগ্রোধ মঠ স্থাপন করেন, এই মঠ রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই মঠের ভগ্নাবশেষ শিবপুরের উত্তরে বরগস্থিয়া নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। বোধ হয় বর (বট) গস্থিয়া ও ন্যগ্রোধ একই সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন। এখানে বুদ্ধপুত্র রাহুল তাঁহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া নির্ব্বাণ ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ঋষিপত্তনে তিনি শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ ও কৌণ্ডিন্যকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব বহুস্থানে নানারূপ উপদেশ দিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে নরলীলা শেষ করিয়া অনন্তধামে প্রয়াণ করেন (৪৮৩ খৃঃ পূঃ)। বৈশালীর নিকট বেলুর নামক স্থানে আসিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, মৃত্যু সন্নিহিত। এই স্থানে তিনি প্রিয় শিষ্য কাশ্যপের সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন। রাজগৃহ হইতে গণ্ডকী নদীতীরে কুশীনগরে পৌঁছিয়া 'পাবা' নামক স্থানে তিনি শিষ্য সহ চুন্দ নামক এক কর্ম্মকারের আতিথ্য স্বীকার করেন। তৎপ্রদত্ত শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া বুদ্ধ নিদারুণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তথায় একটা যমজ শালবৃক্ষ তলে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়।

বুদ্ধের সখা এবং প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, বিম্বিসার হইতে বুদ্ধ পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন।

যখন বুদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিপূর্ব্বক রাজগৃহে ফিরিয়া আসেন—তখন বিম্বিসার তাঁহাকে আদরে অভিনন্দিত করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন :—

"আদিত্যপূর্ব্বং বিপুলং কুলং তে।
নবং বয়ো দীপ্তমিদং বপুশ্চ ;
গাত্রং হি তে লোহিত-চন্দনার্হং
কষায়-সংশ্লেষমনর্হমেতৎ ॥
কস্মাদিয়ং তে মতিরক্রমেণ
ভৈক্ষ্যাক এবাভিরতা ন রাজ্যে।
হস্তঃ প্রজা পালন-যোগ্য এবং
ভোক্তুং ন চার্হং পরদত্তমন্নম্ ॥"

আপনার সূর্য্যবংশের বিপুল কুল, নূতন বয়স, দীপ্তমান দেহ, আপনার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিল কেন? রক্তচন্দনে শোভা পাওয়ার যোগ্য অঙ্গ কি কষায় বস্ত্রের উপযুক্ত? আপনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন কেন? আপনার বিশাল ভুজ প্রজাগণের আশ্রয়-স্বরূপ হইবে, ইহা কি পরদত্ত অন্ন গ্রহণের যোগ্য?

এই প্রশ্নগুলি পড়িয়া রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের তৃতীয় সর্গে লক্ষ্মণের প্রতি হনুমানের উক্তি মনে পড়ে :—

আয়তাশ্চ সুবৃত্তাশ্চ বাহবঃ পরিঘোপমাঃ।
সর্ব্বভূষণভূষাহাঃ কিমর্থং ন বিভূষিতাঃ॥ ইত্যাদি।

[আপনার পরিঘতুল] দুইবাহু আয়ত ও বৃত্তাকৃতি (সুগোল), এই বাহু সমস্ত ভূষণ-ধারণের যোগ্য, অথচ আপনি ভূষণহীন কেন?]

কথিত আছে বুদ্ধদেব ত্রিশজন রাজাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। কাশ্যপ, সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, অনিরুদ্ধ, পূর্ণ, কাত্যায়ন, উপানি ও রাহুল—ইঁহারাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথমকার শিষ্য। বুদ্ধের মাতামহের নাম অঞ্জন ছিল। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে-বুদ্ধমাতা মায়াদেবীকে 'অঞ্জনা' বলা হইয়াছে।

মৌদ্গল্যায়ন।

বুদ্ধ ২৯ বৎসর বয়সে (৫৯৪ খৃঃ পূঃ) সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ছয় বৎসর তপস্যা সাধনের পর (৫৮৮ খৃঃ পূঃ) গয়াতে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি গয়ায় এক মাস একুশ দিন অবস্থান করেন; তৎপরে কাশীতে আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হন।

বুদ্ধ যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা নূতন বলা যায় না। হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র খুঁজিলে তাঁহার সকল মতের আদির সন্ধান মিলিবে। কামনা জয়, ইন্দ্রিয়ের প্রশমন, জন্মান্তর বাদ, অহিংসা, দুঃখনিবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত কথাই আমরা হিন্দু দর্শন ও মহাভারতাদি পুরাণে প্রাপ্ত হই। অতিশয় দুষ্কর তপস্যা এবং বিলাস উভয়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্যপথ অবলম্বনীয়,—এই নীতি বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন—এই মধ্যপথ মহাভারতও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ্যারিষ্টটল গ্রীকদিগের মধ্যে এই মাধ্যমিক পন্থার উপদেশ দিয়াছিলেন।

(বুদ্ধদেব যে সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব। ঋষিদের যে আশ্রম ছিল—তাহা পারিবারিক জীবনেরই অঙ্গীয়। শিষ্য কয়েক বৎসর মাত্র গুরুর আশ্রমে থাকিতে পারিতেন। বুদ্ধের নির্দ্দিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার সহজ উপায়,—উহাতে সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্,—প্রজ্ঞাস্কন্ধ, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি—সমাধিস্কন্ধ এবং সম্যক্ বাচা, সম্যক্ কর্ম্মান্ত ও সম্যক্ আজীব—শীলস্কন্ধের অন্তর্গত। এই অষ্ট মার্গ ছাড়া দশটি নিষেধ-বিধির উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

১। পানাতিপাত—প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি।
২। অদিন্নাদান—অদত্তা দান বা চুরি।
৩। কামেসুমিচ্ছাচার—মিথ্যা কামাচার।
৪। মুসাবাদ—মিথ্যা কথা বলা।
৫। পিসুনবাদ—ভেদ বাক্য।
৬। করুদবাদ—কর্কশ কথা বলা।
৭। সম্মপ্পলাপ—নিরর্থক কথা বলা।
৮। অভিজ্ ঝা—পরদ্রব্যে লোভ।
৯। ব্যাপাদ—মানসিক হিংসা।
১০। মিচ্ছাদিট্‌ঠি—বিপরীত জ্ঞান।)

একথা সকলেই অবগত আছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়ধ্বজা য়ুরোপে প্রবেশ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; আদিযুগের খৃষ্টীয় 'চার্চ্চ' বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল। জন নামক এক ধর্ম্মযাজক (John the Monk) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বুদ্ধের কাহিনী "বারলাম এবং যোসেপের" কথা বলিয়া য়ুরোপে প্রচলিত করেন। এই পরিবর্ত্তিত নামে খৃষ্টানেরা বুদ্ধকে তাঁহাদের একজন ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করেন। মহাকবি ডান্টে তাঁহার প্রসিদ্ধ "ডিভাইনা কমেডিয়া"তে বুদ্ধদেবের সম্পর্কে এইরূপভাবে সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন :—"un uom nasce alla riva dell' Inds, e quive échi ragiom de christo, néchi, legga, nechi scriva e tuth suoi Volericd attibuoni Sono, quanto ragione umana vede Senza peccato in Vita o in Sermoni" (Paradiso, XIX 70-75). ইহার মর্ম্মার্থ এই—"তিনি সিন্ধুর উপকূলে জন্মিয়াছিলেন, যে দেশে কেহ কখনও খৃষ্টের কথা বলে না, তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না—তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্য এবং কাজ—মানবীয় যুক্তি অনুসারে শুদ্ধ। কাহাকেও তিনি বাক্যে ও কার্য্যে বাধা দেন নাই।"

ডাঃ কে. ই নিউম্যান বুদ্ধের উল্লেখ-সূচক ডান্টের এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মারকো পোলো (Marco Polo) বুদ্ধ সম্বন্ধে এয়োদশ শতাব্দীতে (১২৯৮-১২৯৯ খৃঃ) লিখিয়াছেন "এই সাগোমনি (শাক্যমুনি) ভারতীয় লোকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, এবং প্রথম সাধু। ইনি একজন ধনশালী এবং পরাক্রান্ত রাজার পুত্র ছিলেন, কিন্তু হৃদয়ের মহত্বগুণে সমস্ত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করেন।" তারপর বুদ্ধদেব কিরূপে তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক এক মনোরম নিভৃত গৃহে জগতের দৃষ্টির অন্তরালে সুরক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সহসা রাজপথে বাহির হইয়া এক স্খলিত দন্ত, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে ও একটি মৃত ব্যক্তির শব দেখিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, মার্কো পোলো তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি উপসংহারে লিখিয়াছেন, "যদি ইনি শুধু খৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষাটি পাইতেন, তবে ইনি জগতের একজন সর্ব্বপ্রধান সাধু হইতে পারিতেন।" মার্কো পোলো ব্রাহ্মণদিগের নিরামিষ ভোজন ও বৈরাগ্যের নানা দৃষ্টান্ত দিয়া উলঙ্গ জৈন-সন্ন্যাসীদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ইহারা উলঙ্গ থাকেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে উত্তরে বলিয়া থাকেন,—"আমরা জগতে কিছুই লইয়া আসি নাই—জগতের কোন জিনিষের উপর আমাদের দাবী নাই।"

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আর্য্য ও অনার্য্য সংমিশ্রণ

"হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হুন দল, পাঠান ও মোগল, এক দেহে হ'ল লীন।"
—রবীন্দ্রনাথ।

বেদের সময় হইতে আমরা দেখিতে পাই, এই দেশে আর্য্য ও অনার্য্যের অবাধভাবে মিলন হইয়াছে। সেই সময় হইতেই একদল যজ্ঞের পক্ষে, অপর দল যজ্ঞের বিপক্ষে। আর্য্যগণের মধ্যেও যজ্ঞ-বিরোধী ও ইন্দ্রের বিদ্রোহী লোকের অপ্রতুল ছিল না। যাঁহারা ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন ও সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক অনার্য্য রাজা ছিলেন, তাঁহারা আর্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এদিকে

ইন্দ্রের পক্ষ বিপক্ষ।

আর্য্যগণের একদল ইন্দ্রের বিপক্ষ হইয়া অনার্য্য কোন কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। বেদের সময় হইতে আর্য্য অনার্য্য মিশ্রণ আরব্ধ হইয়াছিল। যে ভাবে এই মিশ্রণ হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে একটা ইংরেজী প্রবচন সহজেই মনে পড়িবে :—

" When Adam delved and Eve span,
Who was then the gentleman ?"*

মহারাষ্ট্র ভাষায় একটি প্রবাদ আছে ("নদী চৈ পাঁহ নহে মুচ্চ অপি ঋষিচঁ পুসুং নয়ে কুচ্চ") "নদী এবং ঋষির আদি খুঁজিতে নাই।" ব্যাস ধীবর-কন্যার সন্তান, পরাশরের মাতা

* "যখন আদম খুঁড়তেন মাটি, আর ইভ্ কাটতেন সুতার রাশি,
তখন কে ছিল ভদ্রলোক, আর কে ছিল চাষী ?"

ছিলেন চণ্ডাল-কন্যা, (মহাভারত, বনপর্ব্ব)। বশিষ্ঠ বেশ্যাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ভাণ্ডারক—ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়েরী, জানুয়ারী [illegible]) এবং ঋগ্বেদের [illegible] মণ্ডলের ৪ এবং ২৪ সূক্ত রচকদ্বয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। নাভাগারিষ্ট নামক বৈশ্যের দুই পুত্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন (হরিবংশ)। ভারতবাসীদের মধ্যে শুধু আর্য্যে ও অনার্য্যে এবং আর্য্যদের নানা শ্রেণীর মধ্যে প্রতিলোম এবং অনুলোম বিবাহ দ্বারা যে মিশ্রণ হইয়াছিল,—ইহাই শেষ নহে; যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক যে আর্য্য সমাজে প্রচুর সংখ্যায় মিশিয়া গিয়াছি[ল] তাহা ডি. আর. ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরীর এক প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া প্রতিপ[ন্ন] করিয়াছেন (১৯১১, জানুয়ারী সংখ্যা)। বৌদ্ধধর্ম্মের আমন্ত্রণে নানাজাতীয় লোক এতদ্দে[শে] আসিয়া নাম পরিবর্তন করিয়া বৌদ্ধসমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ যবনবীর মিনেণ্ডা[র] নাগসেন কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত। ইহার পর ভারতবর্ষে এতটা জন-প্রিয় হইয়াছিলেন [যে] ভারতবর্ষের সাতটি সমৃদ্ধ নগরী তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় চিতাভস্মের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হই[য়া]ছিল; এই প্রবাদটি প্লুটার্ক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।* শকরাজরা বিদেশাগত; তাঁহাদে[র] কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম এবং কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিপুল ভারতীয় জনসমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। বহু যবন (গ্রীক) বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে দানের কথা নানা স্থানের প্রস্তর-লিপিতে পাওয়া যাইতেছে—গ্রীক দেশীয়েরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহ[ণ] করিয়া কেহ কেহ বিষ্ণু-মন্দির অথবা গরুড়-ধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন। শকরাজ ঋষভদ[ত্ত] ব্রাহ্মণদিগকে তিন হাজার গাভী দিয়াছিলেন এবং প্রভাসে আটজন ব্রাহ্মণের বিবা[হ] দেওয়াইয়া সে কথা তাম্রলিপিতে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতেন। রুদ্রদমন নামক এক শক-ক্ষত্রপ আয়ুর্ব্বেদ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এই শক রাজগণের আদিপুরুষেরা বিজাতীয় ছিলেন, তাঁহাদের নামেই তাহার পরিচয়, যথা স্পেলিরিসেস' 'আজেস' 'মোয়াস'। তাঁহারা পশ্চিম হইতে শাসনকর্ত্তা পাঠাইয়া এক কালে তক্ষশিলা, কাপিওয়ার মালব এবং দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। তাঁহাদের রাজারা হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 'স্পেলাহোরস,' 'স্পেলোগডামাস' প্রভৃতি রাজারা "ধর্ম্মিকা" উপাধি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মুদ্রায় ধর্ম্মচক্র চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এই সকল রাজাদের কেহ কেহ হিন্দু হইয়া স্বকীয় মুদ্রা বৃষভ-লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। আভীরগণ এক সময় আর্য্য [illegible] ছিলেন, তাঁহারা শেষে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া

যবন, ম্লেচ্ছ ও শক প্রভৃতি জাতির আর্য্যসমাজে প্রবেশ।

* এইরূপ সপ্ত নগরীর দাবী বিষয়ে হোমার-সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে —

"Seven wealthy cities claim for Homer dead,
Through which the living Homer begged his bread."

হিন্দু নামে পরিচিত হইয়া বিশাল হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এখন সিন্ধুনদীর তীর হইতে বঙ্গদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন। আভীর-লেখমালায় (১৮০ খৃঃ) এই বিষয় উল্লিখিত আছে।

অনার্য্য দাসগণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের এক স্তোত্রে লিখিত আছে—"আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যুজাতি আছে,—তাহারা যজ্ঞ করে না, তাহারা কিছু মানে না,—তাহারা মানুষের মধ্যেই নয়, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন রকমের। হে ইন্দ্র! তুমি ইহাদিগকে বিনাশ কর।" কথিত আছে ইন্দ্র দাসরাজ সম্বরের এক শত সংখ্যক প্রস্তর-নির্ম্মিত নগরী ধ্বংস করেন। ত্রস নামক এক অনার্য্যরাজা ইন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ছিলেন। অপর এক দাসরাজ—নমুচি—ইন্দ্রের সঙ্গে বহু বিরোধ করিয়াছিলেন। আর্য্যবংশীয় অর্ণ এবং চিত্ররথ যজ্ঞ করিতেন না, তাঁহারা ইন্দ্রকে মানিতেন না, ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করেন। বস্তুতঃ সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যাইবে, পুরাকালে যুদ্ধ-বিগ্রহগুলি আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধ নহে,—ইন্দ্রপক্ষীয় যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের সঙ্গে ইন্দ্রের বিপক্ষ যজ্ঞ-বিরোধীদের যুদ্ধ—উভয় দলেই আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন।

পণিজাতি।

বেদোক্ত পণিজাতি ফিনিশিয়ান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বিরোধী ও যজ্ঞের অনিষ্টকারী ছিলেন। ইন্দ্র সরমাকে পাঠাইয়া তাঁহার বলবীর্য্যের বর্ণনা ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পণিদিগকে হাত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"আমরা ইন্দ্রের বশুতা স্বীকার করিব না, আমরাও যুদ্ধ করিতে জানি।"

এই পণিরা অতি বিপুল ভাবে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহারা মাংসাশী ছিলেন না; গরু-সেবা এবং গোজাতির রক্ষা করিয়া গোদুগ্ধ হইতে মাখন, ছানা, ঘৃত প্রভৃতি উৎপন্ন করিতেন। সিভিলিয়ান স্বর্গীয় এ. সি. সেন মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইন্দ্র পণিদিগের নিকট পাঁচ প্রকার গব্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন—ছানা, মাখন, ঘি, দধি ও ক্ষীর। তথাপি ইন্দ্র কতবার যে ইঁহাদের নিকট হইতে গরু অপহরণ করিয়া হত্যা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। যজ্ঞে অসংখ্য জীবহত্যা হইত এবং যজ্ঞকারিগণ প্রচুর পরিমাণে মদ্য (সোমরস) পানপূর্ব্বক উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন,—পণিরা এই সকল আচারের বিরোধী ছিলেন। যজ্ঞক্রিয়ায় ঋষিদিগের প্রাপ্যের মাত্রা বেশ ছিল। তাঁহারা এই উপলক্ষে ইন্দ্রের স্তোত্র রচনা করিয়া বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইতেন। বভ্রুঋষি কোন এক যজ্ঞ উপলক্ষে ইন্দ্রের স্তোত্র রচনা করিয়া রুসমগণ হইতে চারি হাজার গাভী, একখানি সুন্দর বাড়ী এবং একটি উজ্জ্বল স্বর্ণকলসী পাইয়াছিলেন; সুতরাং ঋষি ও তদ্বংশীয়েরা যে যজ্ঞের বিশেষরূপ পক্ষপাতী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই সকল যজ্ঞ ও উৎসবে সর্ব্বদা পশুহত্যা হইত। ঋগ্বেদে লিখিত আছে, বৃত্রবধ করিয়া ইন্দ্র যে বিপুল উৎসবের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তিন শত মহিষ মারিয়াছিলেন। সেকালে ভারতবর্ষ সিংহ, ব্যাঘ্র

প্রভৃতি শ্বাপদ-সংকুল ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সুতরাং এই জঙ্গল পরিষ্কার করা ও পশুহত্যাপূর্ব্বক জন-নিবাসের প্রসার বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া যদি কোন স্থানে সুবৃহৎ বৃক্ষসমূহ দাহ করা হয়, তবে তজ্জাত জলীয় ধূমে আকাশে মেঘোৎপত্তি হইতে পারে,—এজন্ম অনাবৃষ্টি নিবন্ধনও রাজারা মেঘ-কামনায় সময়ে সময়ে যজ্ঞ করিতেন।

আর্য্যগণের নির্ম্মম পশুহত্যা ও যজ্ঞের বীভৎসতা তৎবিরোধী পশুপালক পণি ও অপরাপর জাতীয় লোকেরা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত ও বিমর্ষ হইতেন। এই পশু-হত্যার বিরোধী দল জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ সংখ্যায় প্রবল হইয়া ক্ষুব্ধ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। মহাভারতের সময় জনমত অনেকটা পশুহত্যার বিরোধী হইয়াছিল।

মহাভারতকার পশুহত্যার বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিয়াছেন, আমরা তাহা পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি (১ম অ, ৭ম প, ৫১ পৃঃ)। কিন্তু মহাভারত মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবান্বিত। জীবহত্যার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়া ব্যাস জনমতের প্রাবাল্য স্বীকার করিয়াছেন মাত্র, অপিচ জীবহত্যার পক্ষে এতগুলি রক্ষাকবচের বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাহাতে পশুহিংসার নিবৃত্তি হয় নাই। বঙ্গদেশের সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, টিকিটি টানিলে যেরূপ মাথাটা চলিয়া আসিতে বাধ্য, সেইরূপ বাঙ্গলার কথা-প্রসঙ্গে সমস্ত ভারতীয় ইতিবৃত্তের উল্লেখ মাঝে মাঝে অপরিহার্য্য।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও জনমত।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছি যে, আদিকাল হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও জনমতের মধ্যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কোনও সময় গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার ও যাগযজ্ঞ চালাইয়াছেন,—কখনও বা বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মের আচারে অহিংসা-মূলক জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের বহু আচার-বিচার এবং কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের করতলগত ক্ষমতার লীলা একদিকে, অপর দিকে প্রাচীন যাগযজ্ঞের দুর্গের লৌহ প্রাচীর ভেদ করিয়া মুক্ত আকাশের আলো ও বায়ু আনিবার প্রচেষ্টা—এই দুই প্রবাহ ভারতীয় সভ্যতাকে যুগে যুগে রূপান্তরিত করিয়াছে।

রক্তশুদ্ধি।

আমরা আরও দেখাইয়াছি, বর্ণাশ্রমের ভিত্তি—রক্তের বিশুদ্ধি—কতটা অসার। সেই পুরাকাল হইতে নানাজাতীয় লোক—আর্য্য ও অনার্য্য—ভারতীয় সমাজ গঠন করিয়াছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বৃত্তি-হিসাবে শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করা যাইতে পারে—কিন্তু রক্তের বিশুদ্ধতা একটা অলীক স্বপ্ন। অনুলোম ও প্রতিলোম উভয়বিধ বিবাহ বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধাধিকারে সমাজে যাঁহাদের স্থান খুব উচ্চ ছিল, পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িল। অনেকে মনে করেন, ডোম, হাড়ী ইত্যাদি জাতির পূর্ব্বপুরুষদের কেহ কেহ শ্রমণ ও আচার্য্য ছিলেন। বৌদ্ধগণ সমস্ত জগৎকে ভারতবর্ষের দ্বারে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তখন এ দেশে একটা সামাজিক উলটপালট ঘটিয়াছিল, তাহা সমাজতত্ত্ব অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞাত আছেন। মাথার খুলি পরীক্ষা করিয়া টিবেটো-বর্ম্মণ, দ্রাবিড়, তামিলী প্রভৃতি কত শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যে এই দেশের নানা শ্রেণীরই সম্পর্ক অবধারিত হইবে, তাহা বলা যায় না। অম্বষ্ঠসূত্রে (পালি অম্বঠ্‌ঠসুত্ত) বুদ্ধদেবের মুখে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, এক সময়ে ক্ষত্রিয় জাতিই সমাজে প্রধান ছিলেন, ব্রাহ্মণের পদ-মর্য্যাদা সমাজে হীনতর ছিল। পরশুরামের সময় ক্ষত্রিয়েরা অতিদর্পী হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিতেন; এইজন্য "নবলং ক্ষত্রিয়স্য, ব্রাহ্মণস্য বলং বলম্" এই যুদ্ধবাণী ঘোষণা করিয়া পরশুরাম রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উচ্চবর্ণগুলির কুলগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নানারূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। সুতরাং শুধু বেদ, উপনিষদ্, শিখা, উপবীত ও উপাধি দেখাইয়া আপনাদিগকে "ভূদেব" বলিয়া প্রচার করা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা যাঁহাদিগকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত করিয়া অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, পবিত্র দেব-মন্দিরে—যেখানে ভগবান্ সর্ব্বজগতের পিতা, সর্ব্বজগতের মাতা, সর্ব্বজগতের পিতামহ ('পিতাহং সর্ব্বজগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ) একমাত্র আরাধ্য,—সেই পিতৃমাতৃ ও পিতামহদেবের অঙ্কে যাইবার প্রবেশদ্বারে খাড়া পাহারা রাখিয়া—বিশ্বাধিপের সন্তানগণকে তাঁহার উদার মন্দিরের দ্বারে ঠেকাইয়া রাখিয়াছি—তাহাদিগের প্রতি এই আচরণ ইতিহাস সমর্থন করে না। এই আচারের অস্ত্রদ্বারা আমরা অখণ্ড দেশকে শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সমস্ত জাতিকে নিবীর্য্য ও বলহীন করিয়া ফেলিতেছি। বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক নিম্ন জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট আর্য্যলক্ষণযুক্ত নরনারীর অভাব নাই, অথচ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকদিগের মধ্যে অতি দুর্লক্ষণ অনার্য্য-মূর্ত্তিও আমরা দেখিতে পাই—উপবীত, তিলক, কণ্ঠী বা অন্য কোন ছাপে সেই অনার্য্যত্ব ঢাকা পড়ে না।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার "নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য" নামক সন্দর্ভে একটি সুপ্রাচীন গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, আদিকালে ত্রিশঙ্কু নামক এক চণ্ডাল উত্তর-ভারতে শার্দ্দূলকর্ণ নামক তাহার পুত্র-সহ বাস করিত। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিফলে ইহারা বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিল। ত্রিশঙ্কু একটি ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের স্পর্দ্ধায় ক্রোধান্বিত হইলে চণ্ডাল তাঁহাকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিল :—

"সোণাতে আর ছাইতে খুব একটা পার্থক্য আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণে আর অপর জাতির

লোকের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য ত নাই। কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন জন্মে, ব্রাহ্মণ তেমন কোনও কাণ্ড হইতে ত জন্মে না, আকাশ হইতে পড়ে না, ভূঁই ফুঁড়িয়া উঠে না। ঠিক চণ্ডালের মতই ব্রাহ্মণও মায়ের পেট হইতে পড়ে। যখন মরে তখন অন্য জাতির মত তাহার শবও অশুচি হয়; এ বিষয়ে কোন ভেদ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণেরা মাংস খাওয়ার লোভে ভয়ানক নিষ্ঠুর যজ্ঞ করে। তাহারা বলে—ছাগল ইত্যাদি পশুকে মন্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া যজ্ঞে বধ করিলে স্বর্গে যায়। যদি স্বর্গে যাওয়ার পথ ইহাই হয়, তবে তাহাদের বাপ মা ভগিনীদিগকেই কেন সেই উত্তম পথেই স্বর্গে পাঠাইয়া দেয় না? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ সকল নামে মাত্র, এগুলিতে কোনও বিশেষ ভেদ বুঝায় না; সমস্ত মানুষেরই পা, উরু, নখ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গগুলি ঠিকই এক রকম, কোনও কিছুতে এতটুকুও ভেদ নাই। সেজন্য চারিটা আলাদা আলাদা শ্রেণী থাকিতে পারে না। ছেলেরা পথে খেলিতে খেলিতে খানিকটা ধূলা জড় করিয়া উহাকে ভাগ ভাগ করিয়া রাখিয়া বলে এই রহিল জল, এই দুধ, এই দই, এই মাংস, এই ঘি ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া ধূলিরাশি এই সকল জিনিষের কোন একটাও হয় না। তেমনি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কতকগুলি নাম মাত্র, উহারা বিভিন্ন জিনিষ নয়। জন্তুদের মধ্যে—গরু, ঘোড়া ইত্যাদির মধ্যে আকৃতির ভেদ আছে। সেই জন্য গরু একটা জাতি, ঘোড়া আর একটা জাতি এবং আর আর জন্তু আর এক এক জাতি। তেমনি আম, জাম, খেজুর ইত্যাদিও বিভিন্ন জাতের। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে কোনও আকারের পার্থক্য না থাকায় উহারা ভিন্ন জাতের হইতে পারে না। বলা হয় যে, ব্রাহ্মণেরা দেবতা হয়, ক্ষত্রিয়েরা হয় যক্ষ, বৈশ্যেরা হয় নাগ ও শূদ্রেরা হয় অসুর। যদি তাই হইত, যদি শ্রুতির এই কথা সত্য হইত যে ব্রাহ্মণ হইতেই ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য হইতেই বৈশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য বিশেষ কোনও চিহ্ন থাকিত। চারিটা বর্ণের সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলে স্বর্গলাভ করিতে পারে, জাতিবিশেষের কোনই বাধা সে বিষয়ে নাই। সেই জন্য জাতিগত কোনও বিশেষ ভেদও নিশ্চয়ই নাই। মানুষের মধ্যে যাহারা জমি চষে, বীজ বোনে, শস্য জন্মায় তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলে। যাহারা বিবাহ না করিয়া বনে গিয়া ঘাস-পাতার ঘর বানাইয়া ধ্যানে দিন কাটায় তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাহারা গ্রামে থাকে ও মন্ত্র শিক্ষা দেয়, তাহাদিগকে অধ্যাপক বলে। যাহারা লাভের আশায় এটা-সেটা কাজ করে তাহাদিগকে শূদ্র বলে। যাহারা রথ বা হাতী চালনার কাজ লয় তাহাদিগকে মাতঙ্গী বলে। যাহারা চাষ করে তাহাদের নাম চাসা। যাহারা বাণিজ্য করে তাহাদের নাম বণিক্। যাহারা গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লয় তাহাদিগকে প্রব্রাজক বলে। যাহারা সৎ আচরণ-দ্বারা প্রজা রঞ্জন করে তাহাদিগকে বলে রাজা। ইহাদের কোনটাতেই জন্মগত বিশেষত্ব নাই।" ইং হরিজন, ৩০ সংখ্যা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লিখিত এই বিষয়টি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হরিজন পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বাং ১৩৪০ সনের ২৯শে ভাদ্রের

বঙ্গবাসী তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। আমি সেই অনুবাদ অবলম্বনে ইহা এখানে দিলাম।

বৌদ্ধযুগের আদি সময়ে এবং তৎপূর্ব্বের হিন্দু সমাজে জাতি-ভেদ অনেক পরিমাণে শিথিল ছিল, নতুবা চণ্ডালের পক্ষে ব্রাহ্মণের নিকট এবংবিধ প্রস্তাব করা কখনই সম্ভবপর হইত না। জাতি-ভেদের এরূপ কড়াকড়ি ও শক্ত আইন-কানুন বঙ্গদেশে বিগত ৫।৬ শতাব্দীর মধ্যে হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের সেই সকল গোড়ামি সত্ত্বেও তান্ত্রিকগণ ও সহজিয়ারা জাতি-ভেদের বন্ধন শিথিল করিয়া সেই সমাজের খিড়কির দরজা অনেকটা মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে সর্ব্বজাতির মিলন ঘটিতে পারিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামায়ণ, সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতিবাদ

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অহিংসনীতির জয় ঘোষণা করিয়াছে। জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া পণি বা বণিক্-সম্প্রদায়, এই অহিংসনীতিকে সংবর্দ্ধনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধ গার্হস্থ্য আশ্রমকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমকে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই স্থানে আর্য্যসমাজ বিশেষ ঘা পাইয়াছিলেন। ঋষির আশ্রম অন্যরূপ ছিল, সেখানে বেদবেদান্তের চর্চ্চা হইত, কিন্তু দারাপুত্র ও শিষ্যমণ্ডলী-পরিবৃত ঋষির ধর্ম্ম—সংসারের ধর্ম্ম ছিল, তাহাতে গো-সেবা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থের সমস্ত কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে নানাভাবে সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। পালি সামণ্য ফলসুত্ত-পুস্তকে তাহাদের কথা আছে। ষড় দর্শনকারেরা এইরূপ সম্প্রদায়গুলির কোন-কোনটির মতের পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ভিক্ষুধর্ম্মের প্রতি পিতামাতার আতঙ্ক।

রাজপুত্র মহাবীর ও রাজপুত্র বুদ্ধ ভিক্ষু হইয়া দুই মহৎ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। দলে দলে উচ্চকুলের বংশধরেরা গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুধর্ম্মের উপর জনসাধারণের একটা ভীতির ভাব সঞ্চারিত হইল। কন্দর্প-সমান রূপ, অটুট নবযৌবন, উজ্জ্বল প্রতিভাশালী রাজকুল-সম্ভূত তরুণেরা এমন কি তরুণীগণও রাজপ্রাসাদ ও রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘে নাম লিখাইতে লাগিলেন। আসমুদ্র-হিমাচলবাসী ভারতীয় পিতামাতারা প্রমাদ গণিলেন। এই সার্ব্বজনীন আতঙ্ক ও ত্রাসের ভাব আমরা

আমাদের শিশুকালেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের মা ও দিদিমারা আমাদিগকে পাড়হীন কাপড় পরিতে ও কুশাসনে বসিতে দিতেন না। ইহা সেই বহুযুগ পূর্ব্বের সার্ব্বজনীন সন্ন্যাসভীতি হইতে উৎপন্ন আতঙ্ক।

হিন্দু সমাজ ভিক্ষুধর্ম্মের ঘা সহিয়া দাঁড়াইল—একখানি গ্রন্থের বলে। সেই গ্রন্থের তুল্য প্রিয় গ্রন্থ হিন্দুর আর একখানিও নাই—উহা রামায়ণ। গ্রন্থখানি এই সত্য প্রচার করিল যে, ধর্ম্ম, মোক্ষ, ইহকাল, পরকাল এই সমস্ত লক্ষ্যের সন্ধানই নিজ পরিবারের গণ্ডীতেই পাইবে। পারিবারিক জীবনই সর্ব্বার্থসিদ্ধির শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র। এই পারিবারিক জীবন তুমি নিজে গঠন কর নাই, উহা ভগবানের দান, তুমি উহা কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। তোমার পারিবারিক দায়িত্ব অপরিহার্য্য।

ভিক্ষুধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদ।

তুমি যদি পিতৃমাতৃ-সেবা কর—তাঁহাদের আনুগত্য কর, তবে তোমার মোক্ষলাভ হইবে। সুতরাং সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতীক পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া কে কি শিখিবে? তুলসীতরু-সমাশ্রিত মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া সেওড়া-গাছের সেবা করিতে বনে যাইব কেন? একমাত্র পিতৃসত্য পালন করার জন্য রাম ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ এবং তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তী হইলেও মোক্ষলাভ হইতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে যদি কনিষ্ঠের অনৈক্য হয়, তথাপি কনিষ্ঠ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেই তদীয় জীবন চরিতার্থ হইবে। লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে নানাবিষয়েই মতদ্বৈধ দেখাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার ক্ষুরধার যুক্তিতর্ক তিনি সরযূর জলে ভাসাইয়া দিয়া ছায়ার ন্যায় রামের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ভরত স্বগৃহে থাকিয়াও ভ্রাতৃস্নেহের আদর্শ দেখাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সীতা স্বামিভক্তির মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। কৌশল্যা বাৎসল্যের প্রতীক। পরিবার বলিতে শুধু ইঁহারাই নহেন, দাসদাসীরাও পরিবারের জন। হনুমান্ প্রভুভক্তিকে অতি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ সখ্যভাবের আদর্শ কিরূপ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গার্হস্থ্য আদর্শ।

রামায়ণ বলিতেছেন—পরিবারের গণ্ডীই ধর্ম্মের সুপ্রশস্ত আঙিনা। এই পারিবারিক ধর্ম্মের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে। ভিক্ষুধর্ম্মের কঠোর পথ পরিহার করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন উপভোগ করিবার জন্য পারিবারিক ধর্ম্ম পরিকল্পিত হয় নাই। মুণ্ডিতশির হইয়া উপবাস ও ব্রতাদি পালনপূর্ব্বক ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হওয়া অপেক্ষা গৃহের জীবন্ত দেবতাদের সেবা উৎকৃষ্ট, ইহাই রামায়ণের প্রতিপাদ্য। এই পারিবারিক ক্ষেত্র দুশ্চর তপস্যারই ক্ষেত্র, ইহা অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও অবিঘ্নিত সুখভোগের পন্থা নহে। কোন্ জটিল সন্ন্যাসী পিতৃভক্তিতে ভরপুর রামসন্ন্যাসীর মত দুশ্চর ব্রত পালন করিয়াছে? জটাজূটধারী, মলিন, পাংশু-দিগ্ধাঙ্গ, পাদুকার উপর ছত্রধারী, রাজর্ষি ভরত ভ্রাতৃভক্তির যে আদর্শ দেখাইয়াছেন—সেই অতুল ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার সমতুল তপস্যা কোন্ ভিক্ষু কবে দেখাইয়াছে? কে লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃসেবায় আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া সংযমের

রামায়ণী নীতি।

পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছে বা সীতার ন্যায় আজীবন পাতিব্রত্যের ব্রত পালন করিয়া অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে? কে কবে বিভীষণের মত সাশ্রুনেত্রে স্বকুলের সংহার প্রত্যক্ষ করিয়াও সত্যচ্যুত হয় নাই? এই সকল চরিত্রের প্রত্যেকটি একটি বিশাল পটের ন্যায়। ইহারা বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুর জীবন্ত প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ তীক্ষ্ণ বৈরাগ্যের লৌহ-শলাকা-দ্বারা লিখিত হয় নাই, দুশ্চর তপস্যা-ক্ষেত্রে অনুরাগের সুবর্ণ-অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। এই পথ বিচার, তর্ক, নীতি-জ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রভৃতি উৎকট উপায়জাত নহে—ইহা গঙ্গাতরঙ্গের মত পরম স্নেহমমতার সুবিমল বিস্ময়কর উৎস। ইহা স্বভাবসঞ্জাত প্রীতি, ভক্তি ও অনুরাগের ঝরনার বিন্দু চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া লীলা-চঞ্চল গতিতে ছুটিয়াছে। জীবন-মরুভূমিতে ইহা অমৃতের সন্ধান দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যেরূপ নেংড়া আমের বীজটি যেখানে পুঁতিবে, সেইখান হইতেই ইহা তাহার অপূর্ব্ব সুরভি ও অতুল রসাস্বাদের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিবে—সেইরূপ ভগবান্ যেখানে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন—তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধির পথও সেইখানে গড়িয়া দিয়াছেন—তুমি বাহিরের আঁকাবাঁকা অনিশ্চিত পথ খুঁজিতে বনে যাইবে কেন?

বৌদ্ধধর্ম্মের পর এই রামায়ণী নীতি ভারতের সর্ব্বত্র বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়া ভারতীয় সমাজকে এক অপূর্ব্ব শান্তির আদর্শ দিয়াছিল। এখনও যে এক পরিবারে বহুসংখ্যক লোক আদরে, সোহাগে, শ্রদ্ধায় ও ত্যাগের মহিমায় গৌরবজনক স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা এই একখানি মহাগ্রন্থের শিক্ষার প্রভাবে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে ইহার শক্তি হ্রাস হইতেছে, রামায়ণী শিক্ষা বুঝি এদেশ হইতে তিরোহিত হয়! কিন্তু এক সময়ে ইহা অত্যুজ্জ্বল ছিল, তাহা আমরা শৈশবে দেখিয়াছি। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আজমীড়ের রাজপুত্র সারঙ্গদেবকে—বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী আশঙ্কা করিয়া তৎপিতা রাজা বিশালদেব নানা উপদেশ দিয়া কুমারকে শেষে বলিয়াছিলেন :—

"ইহ নষ্টজ্ঞান জ্ঞান সুনিয়েণ কাণ।
পুরুষোত্তম ভজ্জে কিত্তীহান॥
পরমোধ ভজ বোধক পুরাণ।
রামায়ণ সুনহ ভারত নিদান॥"—চাঁদ-গাথা।

মহাভারত ভারতীয় নানাধর্ম্ম, নানামত, যুগধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম এক বিশাল চিত্রপটে আঁকিয়া দেখাইতেছে। ইহাতে যেরূপ পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও সামঞ্জস্য আছে, তেমনই উহার বিরোধ ও বিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহাতে দান, ধ্যান, তপ, সামাজিক কর্ম্মকাণ্ড সকলই একস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি চরিত্রে সতীধর্ম্মের আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে, অপরদিকে স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলতাগুলি জঘন্য অতিরঞ্জনের সহিত নারদ-পঞ্চচূড়া-সংবাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে সৌভ্রাত্র, অপরদিকে জ্ঞাতিবিরোধ,—একদিকে

সূচ্যগ্র ভূমির জন্য জীবনপণ যুদ্ধ, অপরদিকে স্বীয় দেহের মাংস কাটিয়া পক্ষীকে প্রদান এই ভাবের বিরুদ্ধ আদর্শ মহাভারতের নানা অঙ্ক জটিল ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে স্ত্রীলোকের চরিত্র দুর্ব্বলতার চিত্র এত অধিক অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে—যাহা মনে হয় কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী ভিক্ষুর ধর্ম্মে মানুষকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই রমণীচরি[illegible] সেইরূপ বীভৎসতা দেখান হইয়াছে, একথা আমরা একবার উল্লেখ করিয়াছি।

(মহাভারতে সংসার ও সন্ন্যাস এই দুই আশ্রমের প্রতিপোষক কথাই পাওয়া যা[illegible] কিন্তু রামায়ণের লক্ষ্য এক, উহাতে কোন জটিলতা নাই, উহা পারিবারিক জীবনে[র] আদর্শমূলক কাব্য। একটিমাত্র আদর্শ উহাতে দৃষ্ট হয়---তাহা সূত্র বা অনুশাসনরূ[পে] উপস্থিত করা হয় নাই, কাব্যকথায় পারিবারিক জীবনকে লোভনীয় ও উজ্জ্বল করি[য়া] দেখান হইয়াছে)

মহাভারত যুগে যুগে ভৃগুপদলাঞ্ছিত বিষ্ণুর বক্ষের ন্যায় নানারূপ ধর্ম্মমত দ্বারা চিহ্নি[ত] হইয়াছে। উহাকে একখানি আদত গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় না। পৃথিবী খন[ন] করিলে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন [illegible] মৃত্তিকার উপাদান প্রাপ্ত [illegible], এই বিপু[ল] গ্রন্থে সেইরূপ নানা যুগের স্মৃতি ও ধর্ম্মমতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

(রামায়ণী নীতি [illegible] ভারতীয় সভ্যতার চক্রবালে অস্তমিত প্রভার দীপ্তি দেখাইয়া বিলীন হইতেছে, ইহা কি কেবলই পরিতাপের বিষয় অথবা ইহা সভ্যতার অপর কো[ন] উন্নততর পন্থার রহস্য—কোন নব আদর্শের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে—তা[হা] কে জানিবে?)

[illegible] পরিচ্ছেদ

জৈন ধর্ম্ম

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে [illegible] তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধদেব ও মহাবীর উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র ছিল বৃহৎ বঙ্গে---মগধ ও পাটনায়। জৈ[ন] [illegible] মহাবীর বহুকাল রাঢ়দেশে স্বকীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবি-রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যৌবন কালেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং ৪০ বৎসর বয়সে বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মিথিলার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার মাতৃকুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল এবং

মহাবীর ([illegible] —৪৭৭ খৃঃ পূঃ)।

এই সূত্রে তিনি বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজসভায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বে তাঁহার নির্ব্বাণ ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কিন্তু ঐ সময় স্বীকার করিয়া লইলে অজাতশত্রুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার ও খারবেলের প্রস্তর-লিপির কথিত বৃত্তান্তের সহিত তাঁহার জীবনের সামঞ্জস্য কতকটা কষ্ট-কল্পনা করিয়া করিতে হয়। এজন্য অধ্যাপক জেকবি ৪৭৭ খৃঃ পূঃ বীর-নির্ব্বাণের সময় [illegible] করিয়াছেন, তাহা হইলে ৫৪৭ খৃঃ পূঃ তাঁহার জন্মকাল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধ [illegible] খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং [illegible] খৃঃ পূঃ অব্দে অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ হয়, জৈন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত [illegible] হইলে জেকবি, ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের কথিত জন্মাব্দ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের পার্থক্য।

বুদ্ধের মত ও মহাবীর প্রচারিত মতের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়েই জীবহত্যার বিরোধী ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতিবাদী ছিলেন। উভয়েই হিন্দুর বর্ণাশ্রম কতকাংশে মানিয়া লইয়াছিলেন এবং হিন্দু দেবতা স্বীকার করিতেন। এইজন্য কেহ কেহ জৈন ধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা-স্বরূপ অনুমান করিতেন। কিন্তু এখনকার গবেষণায় উভয় ধর্ম্মের পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে এবং জৈন ধর্ম্ম যে বুদ্ধের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল তাহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম [illegible] একই [illegible] করিয়াছে; মহাবীরও বুদ্ধের ন্যায় [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন, জৈন ধর্ম্ম [illegible] বৌদ্ধ ধর্ম্মের এত [illegible] জগতের এক-তৃতীয় অংশ গ্রাস করিয়া এখনও [illegible] ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকিয়া শুধু নিজের [illegible] রহিয়াছে ?

ঐতিহাসিকেরা বলেন [illegible], হিন্দু [illegible] দেব-দেবতার উপর বেশী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ভারতের [illegible] আবদ্ধ হইয়া রাজ্য [illegible] ও বিদেশীর প্রবেশ-পথ কতকটা [illegible] করিয়াছে। জৈনেরা বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক তরুলতারও আত্মা আছে। তাঁহারা জীবের দুঃখ-কষ্টের প্রতি এত মমতাশীল ও সদয়, যে একটি গাছের পত্রপল্লব ছিঁড়িতেও কষ্টবোধ করেন, পাছে তাহাদের আত্মা কষ্ট পায়। তাঁহাদের একদল শিরে ময়ূরপুচ্ছ লইয়া রাজপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সরাইয়া পথ পর্য্যটন করেন, পাছে কোন জীব পদপীড়নে বিনষ্ট হয়। তাঁহারা নিজের শরীরের রক্তদ্বারা মশক ও ছারপোকার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ধর্ম্মের অঙ্গীয় মনে করেন এবং পিপীলিকাকেও কোন কোন জৈনধর্ম্মাবলম্বী নিত্য শর্করা প্রদান করিয়া "জীবে দয়া" সূত্রের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। সাধারণতঃ কাব্য-নাটকে ইহারা 'নিগ্রন্থ' নামে পরিচিত।

এইভাবের দয়ার অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা আতিশয্য আছে, যাহাতে হিন্দুস্থানের গণ্ডী পার হইয়া এই ধর্ম্ম দেশান্তরে গৃহীত হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া বৌদ্ধদের সজ্ঞ

কটা মস্ত বড় অস্ত্র, এই অস্ত্র-দ্বারা বৌদ্ধগণ জগজ্জয় করিয়াছিলেন; এই সঙ্ঘের উন্মুক্ত দ্বারপথে দেশান্তর হইতে সমাগত লোকেরা আসিয়া ভগবান্ বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লইতে পারিয়াছিলেন, বিশ্বের সঙ্গে এই ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ রাখার দরুন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবেশ-দ্বার অবারিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম্ম নানারূপ কঠোরতা ও বিধি-ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুস্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বাহিরের আগন্তুকগণকে তাঁহাদের পঙ্‌ক্তিতে টানিতে পারে নাই। এইজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম যখন হিন্দুস্থান হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইয়া দেশ-দেশান্তরে অভিযান করিতেছিল, তখন জৈন ধর্ম্ম স্বীয় জন্মস্থানকে অধিকতর জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের কুক্ষীগত হইয়াছিল।

সামাঞ্ঞ ফল সুত্তে (শ্রমণ্য-ফল-সূত্রে) দেখা যায় যে বুদ্ধদেবের সময়েই উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক নানারূপ মতবাদের দরুন ধর্ম্মনীতি অতি জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। অজাতশত্রু তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচার ও গবেষণামূলক চিন্তার আড়ম্বর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই; বুদ্ধদেবের উপদেশে তিনি শান্তি পাইয়াছিলেন—সেই সকল কথা পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে আমরা লিখিয়াছি। অজাতশত্রুর সময়েই নিগ্রর্ন্থ জ্ঞাত-পুত্রের কথা আমরা পাইয়াছি, ইনি একজন জৈন তীর্থঙ্কর। বস্তুতঃ বুদ্ধের পূর্ব্বেই জৈন ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। জৈনগণ কহিয়া থাকেন, ঋষভদেবই তাঁহাদের প্রথম তীর্থঙ্কর। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, ইনি রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া নগ্ন সন্ন্যাসিরূপে বনে যাইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ঋষভদেব কোশলরাজ নাভী ও রাজ্ঞী মরুদেবীর পুত্র। তৎকালে প্রচলিত রীতি-অনুসারে তিনি স্বীয় যমজ ভগিনী সুমঙ্গলাকে বিবাহ করেন। ঋষভদেবকে কেহ কেহ 'আদিনাথ' নামে অভিহিত করেন।

প্রথম তীর্থঙ্কর হইতে পার্শ্বনাথ ২৩শ স্থানীয় এবং মহাবীর ২৪শ তীর্থঙ্কর। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রে এই সম্প্রদায় নানা নামে পরিচিত। ইঁহারা সংসারের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এজন্য "নিগ্রর্ন্থ", ইঁহারা ইন্দ্রিয়বিজয়ী এজন্য "অরিহন্তা" (অর্হৎ)। ইঁহারা পৃথিবীর সমস্ত লোভ ও আকর্ষণ তপোবলে জয় করিয়াছেন, এজন্য ইঁহারা "জিন" (জয়ী)। ইঁহাদের সন্ন্যাসীরা 'শ্রাবক' ও সন্ন্যাসিনীরা "শ্রাবিকা" নামে অভিহিত। জৈনগণ দাবী করেন বৌদ্ধধর্ম্ম জৈন ধর্ম্মের শাখা-মাত্র ("It is very likely that future researches will throw a flood of light on the theory that Buddhism is rather a branch of Jainism"—An Epitome of Jainism by Puran Chand Nahar & K. C. Ghosh—Introduction, p. 3)। বস্তুতঃ জৈন ধর্ম্মের ধর্ম্মমতের সহিত বৌদ্ধমতের একটি স্থানে বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়, উভয় ধর্ম্মই নিরীশ্বরবাদী। জৈনদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও ন্যায় এরূপ বিপুল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ যে সারাজীবনের আলোচনায়ও তাহার কিনারা করা যাইতে পারে না। জৈনেরা অর্থশালী ও প্রভাবাপন্ন সম্প্রদায়, তাঁহারা এককালে মঠ-মন্দিরাদির জন্য যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী ভারতীয়

প্রাচীন কীর্তিশালার একটি বিশেষ অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে। অথচ দুঃখের বিষয় তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও ইতিহাসের উদ্ধার-কল্পে তাঁহারা বিশেষ কিছুই করেন নাই।

মথুরার স্তূপ জৈনকীর্তির প্রায় দুই সহস্র বৎসরের সাক্ষ্য দিতেছে; কেহ কেহ বলেন, বেদে জৈনদের যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়—তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে জৈনমত বেদের সমকালিক কিংবা তদপেক্ষাও প্রাচীন।

যাহা হউক ২৩শ সংখ্যক তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও তৎপরবর্ত্তী মহাবীরের সময় হইতেই জৈন ধর্ম্ম এদেশে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ ভিন্ন জৈন ধর্ম্মাবলম্বী অন্য কোন দেশে আছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু এদেশে—রাজপুতনা, গুজরাট, পঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে—ইঁহারা সংখ্যায় প্রবল। ইঁহাদের অর্থসম্পদ্ ও বাণিজ্যে কৃতিত্ব ভারতবর্ষে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত।

এই বাঙ্গলা দেশে ইঁহাদের প্রভাব খুবই বেশী ছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায়, জৈন ধর্ম্মও বিলুপ্ত হইয়াছিল; তথাপি সেদিন পর্য্যন্তও জগৎ শেঠ ভ্রাতারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ছিলেন। খাস বাঙ্গালীদের মধ্যে জৈন ধর্ম্ম অল্পই আছে। যখন ভক্তির বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল, সেই সঙ্গে এদেশবাসীরা নিরীশ্বরবাদের কলঙ্ক এস্থান হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিলেন। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, হাতীর পায়ের নীচে নিষ্পেষিত হইলেও জৈন মন্দিরে প্রবেশ করিবে না—এরূপ নিষেধ-বিধি জনসাধারণের মধ্যে এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্তিকা-নিম্নে এ দেশের নানা স্থানে এত অধিক পরিমাণে তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে যে এক সময়ে এই ধর্ম্মের প্রভাব যে খুব বেশী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যে সকল মন্দিরে ভগবানের স্থলে মানুষকে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে—এবং তাঁহার জন্য আরতি জ্বলে না, ভোগ প্রস্তুত হয় না, প্রেম-ভক্তির আতিশয্যের দিনে হিন্দুগণ সেই সকল মন্দির অস্পৃশ্য মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপ জৈন তীর্থঙ্করদিগের বহু প্রাচীন মূর্ত্তি-দ্বারা এককালে এই ধর্ম্মের প্রভাব প্রমাণিত হয়, তেমনই অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণঘটিত কূট তর্কে আমাদের নব্যন্যায় যে এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়ের চিন্তাশীলতা-দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহাও সহজেই অনুমেয়। অনুমানকে হিন্দুগণ বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষবাদের শ্রেষ্ঠত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এদেশের মহাস্থানে এক সময়ে জৈন ধর্ম্ম-নেতা ভদ্রবাহু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি অশোকের পিতামহ সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। এক সময় মগধ, অঙ্গ ও কোশল রাজ্যে জৈন ধর্ম্ম প্রবল হইয়া তাহা রাষ্ট্র-কেন্দ্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশে ধারাবাহিক ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে, আমরা যাহা এখন দেখিতে পাই না, তাহা কোন কালেই ছিল না, বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং যাহা আছে—তাহা সৃষ্টিকাল হইতেই বিদ্যমান, এরূপ সংস্কার পোষণ করি।

এদেশে এককালে জৈনধর্ম্মের প্রাধান্যের প্রধান প্রমাণ এই যে নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থঙ্করদের এই অঞ্চলটি এক সময়ে প্রধান ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ছিল। পার্শ্বনাথ পাহাড় (সমেৎ শেখর) এখনও জৈনদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

পার্শ্বনাথ খৃঃ পূঃ ৮৭৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ৭৭৭ অব্দে বঙ্গদেশের তন্নামে অভিহিত পাহাড়ে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর-সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বৈশালী নগরের নিকট কুণ্ড গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বৈশালীর রাজা চেতকের ভগিনী ত্রিশূলাদেবী ইঁহার মাতা। চেতক রাজার কন্যা চেলেনা বিম্বিসার রাজার রাজ্ঞী; সুতরাং ঐ সকল রাজাদের দরবারে এক সময় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর মহাবীর ৩১ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ইনি জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ৪১ বৎসর বয়সে জীবন্মুক্ত হইয়া ৭২ বৎসরে তিরোহিত হন; পোয়াপুরী পাহাড়ে তাঁহার লীলাবসান হয়। ঐ স্থান বর্ত্তমান বেহারের অতি নিকটবর্ত্তী, তাঁহার তিরোধান খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে ঘটিয়াছিল।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে মগধের জৈন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ, রাজ-গুরু ভদ্রবাহু তাঁহার শিষ্যদিগকে লইয়া কর্ণাটে গমন করেন। তথায় তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, বিদেশে অবস্থানকালে তৎস্থলে অভিষিক্ত মগধের জৈন ধর্ম্মাধ্যক্ষ স্থূলভদ্র পূর্ব্বাচরিত জৈন ধর্ম্মের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেন। জৈন ভিক্ষুমাত্রই সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকিবেন এই ছিল নিয়ম, কিন্তু স্থূলভদ্রের দল শ্বেতাম্বর পরিধানের পক্ষপাতী হইলেন। ভদ্রবাহু দ্বাদশবৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া নব-প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার মত ছিল, নির্গ্রন্থগণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কার-বর্জ্জিত হইবেন। যাঁহারা পার্থিব সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জৈনদের সনাতন উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি ও তাঁহার দল পঙ্‌ক্তিরক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। দুই দলের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া তর্কযুদ্ধ চলিল, অবশেষে ৭৮ খৃঃ অব্দে ইঁহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। দিগম্বরেরা বলেন—দেহ এবং দেহের সংস্কার যে রক্ষা করিবে সে আবার নির্গ্রন্থ হইবে কেমন করিয়া? শ্বেতাম্বরীরা লোকসমাজে চলাফেরার সময়ে শ্বেতবস্ত্র পরিয়া বাহির হইবার পক্ষপাতী হইলেন।

কিন্তু কি বৈষ্ণবধর্ম্ম, কি সহজিয়াধর্ম্ম, কি ত্যাগধর্ম্ম বাঙ্গালীরা যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আদর্শের ঈষন্মাত্র ক্ষুণ্ণতা তাঁহারা অনুমোদন করেন নাই। পার্থিবতার অনুরোধ বা সমাজবিধি তাঁহাকে ভূমা হইতে একটুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সুতরাং কপটাচারী ভ্রাতার হস্তে খড়্গ দিয়া কালু ডোম নিজ গ্রীবা বাড়াইয়া দিলেন; কল্পতরু সাজিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজ্ঞীকে পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিলেন; কর্ণ একফোটা চোখের জল না ফেলিয়া স্বীয় পুত্র বৃষকেতুর মস্তক নিজে ছেদন করিলেন,, এই সকল প্রবাদ ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন হইলেও বঙ্গের চিন্তাধারার যে উচ্চাঙ্গ প্রদর্শন করে—তদ্দ্বারা বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয় যে এ জাতি তাঁহাদের চিন্তা বা কর্ম্মে কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট হইবার নহে, যাহা কিছু বাঙ্গালী করিবে—তাহার চূড়ান্ত অভিনয় না করিয়া ছাড়িবে না। দৈহিক সংস্কার ত্যাগ করিয়া যিনি নির্গ্রন্থ হইবেন—তাঁহার আবার

বস্ত্রের উপর লোভ অথবা নগ্ন হওয়ার ভীতি কেন? বাঙ্গালী ভদ্রবাহু দিগম্বরত্বের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। এইরূপ দিগম্বর সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি বাঙ্গালী চিত্রকরেরা অনেক আঁকিয়াছেন। সহজিয়ারা প্রচার করিলেন, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলেও তাহার প্রতি ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন অঙ্গ পায় না সে" (চণ্ডীদাস); পরের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা—স্বকীয় হইতে শ্রেষ্ঠ—এই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শমূলক সতীত্বের রাজ্যে নির্ভীকভাবে বৈষ্ণব-কবি গাহিলেন—

"ননদিনী বল গিয়া নগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্কসাগরে।"

এইরূপ সমাজবিধি, শাস্ত্রবিধির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সাধারণের অনধিগম্য ভাবের রাজ্যে শেষ পর্য্যন্ত ডঙ্কা বাজাইয়া স্বীয় মত প্রচার করার দুঃসাহস বোধ হয় বাঙ্গালীর মত অন্য কোন জাতি খুব কমই দেখাইয়াছে।

সুতরাং লোকসমাজে চলিতেও নিগ্রন্থদিগকে উলঙ্গ হইয়া চলিতে হইবে,—আদর্শকে একটুকুমাত্র খর্ব্ব করিতে দেওয়া হইবে না, এই মতে বাঙ্গালী ভদ্রবাহু ও তাঁহার দল দৃঢ় হইয়া রহিলেন। এদিকে পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থঙ্করগণের সঙ্গে বাঙ্গালার দীর্ঘকাল-ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের ফলে জৈন ধর্ম্ম যে এই দেশে কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। বঙ্গদেশের সঙ্গে জৈন ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব হইয়াছিল—সে ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

ভদ্রবাহুপ্রমুখ দিগম্বরের দল মেয়েদিগের জন্য তাঁহাদের আশ্রমে একটুমাত্র স্থান রাখিলেন না। সকলেই অবগত আছেন ১৯শ তীর্থঙ্কর (তীর্থঙ্করী (?)) মল্লীকুমারী চিরকুমারী ছিলেন, কিন্তু দিগম্বর জৈনেরা তাঁহার স্ত্রীত্ব স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা তাঁহাকে পুরুষরূপে পরিকল্পনা করিয়া তীর্থঙ্কর-তালিকার অন্তর্গত করিয়া লইলেন এবং তিনি "মল্লীনাথ" হইলেন।

নিম্নে আমরা ২৪জন তীর্থঙ্করের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতেছি।

১। আদিনাথ (ঋষভ দেব)। ২। অজিতনাথ—রাজা জিতশত্রু ও রাজ্ঞী বিজয়ার পুত্র। ইনি বঙ্গদেশের পার্শ্বনাথ পাহাড়ে (সমেৎ শেখর) তিরোধান করেন ইহার বর্ণ ছিল স্বর্ণের ন্যায় এবং ইহার চিহ্ন (লাঞ্ছন) ছিল হস্তী। ৩। সম্ভবনাথ—রাজা জিতারি এবং রাজ্ঞী সেনার পুত্র। স্বর্ণবর্ণ, অশ্বলাঞ্ছন। ৪। অভিনন্দন—রাজা সম্বর ও রাজ্ঞী সিদ্ধার্থার পুত্র। বঙ্গদেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান,—স্বর্ণবর্ণ, কপিলাঞ্ছন। ৫। সুমতিনাথ—রাজা মেঘ এবং রাজ্ঞী মঙ্গলার পুত্র। স্বর্ণবর্ণ, (ক্রৌঞ্চ-লাঞ্ছন)। ৬। পদ্মপ্রভ—রাজা শ্রীধর ও রাজ্ঞী সুষিমার পুত্র। বঙ্গদেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। রক্তবর্ণ,

পদ্ম-লাঞ্ছন। ৭। সুপার্শ্বনাথ—রাজা প্রতিষ্ঠ ও রাজ্ঞী পৃথ্বীর পুত্র, সমেৎ শেখরে তিরোধান। সবুজবর্ণ, স্বস্তিকলাঞ্ছন। ৮। চন্দ্রপ্রভ—পিতা রাজা মহাসেন, মাতা রাজ্ঞী লক্ষ্মণা। এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। শ্বেতবর্ণ, চন্দ্রলাঞ্ছন। ৯। সুবুদ্ধিনাথ—রাজা সুগ্রীব এবং রাজ্ঞী রমার পুত্র। এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। শ্বেতবর্ণ, মকরলাঞ্ছন। ১০। শীতলনাথ—রাজা দৃঢ়রথ ও সুসনন্দার পুত্র। এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন। ১১। শ্রেয়াংশনাথ—রাজা বিষ্ণু এবং রাজ্ঞী বিষ্ণার পুত্র। বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান। ইঁহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় এবং গরুড়-লাঞ্ছন। ১২। বসুপূজ্য—বাসুপূজ্য রাজা এবং রাজ্ঞী জয়ার পুত্র—ভাগলপুরে জন্ম ও নির্ব্বাণ। রক্তবর্ণ ও মহিষলাঞ্ছন। ১৩। বিমলনাথ—রাজা কৃতবর্ম্মা ও রাজ্ঞী শ্যামার পুত্র—বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে নির্ব্বাণ। স্বর্ণবর্ণ, বরাহলাঞ্ছন। ১৪। অনাথনাথ—রাজা সিংহসেন ও রাজ্ঞী সুযশার পুত্র। বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, শ্যেনলাঞ্ছন। ১৫। ধর্ম্মনাথ—রাজা ভানু এবং রাজ্ঞী সুব্রতার পুত্র। বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, বজ্রলাঞ্ছন। ১৬। শান্তিনাথ—রাজা বিশ্বসেন এবং রাজ্ঞী অচিরার পুত্র। সমেৎ শেখরে নির্ব্বাণ। পিঙ্গলবর্ণ, মৃগলাঞ্ছন। ১৭। কুন্থনাথ—রাজা সুর ও রাজ্ঞী শ্রীর পুত্র—সমেৎ শেখরে তিরোধান, ছাগলাঞ্ছন। ১৮। অরনাথ—পিতা রাজা সুদর্শন ও মাতা রাজ্ঞী দেবী। সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ—স্বর্ণবর্ণ, নন্দ্যাবর্ত্ত। ১৯। মল্লীনাথ—রাজা কুম্ভ ও রাজ্ঞী প্রভাবতীর কন্যা—সমেৎ শেখরে তিরোধান। নীলবর্ণ, কুম্ভলাঞ্ছন। ২০। মুনি সুব্রত—রাজা সুমিত্র এবং রাজ্ঞী পদ্মাবতীর পুত্র—সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ। কৃষ্ণবর্ণ, কূর্ম্মলাঞ্ছন। ২১। নেমিনাথ—রাজা বিজয় এবং রাজ্ঞী বিপ্রার পুত্র। পিঙ্গলবর্ণ, নীলোৎপল লাঞ্ছন। সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ। ২২। নেমিনাথ (২য়)—হরিবংশোদ্ভূত রাজা সমুদ্র-বিজয় এবং রাজ্ঞী শিবার পুত্র। কৃষ্ণবর্ণ, শঙ্খলাঞ্ছন। ইঁহার পিতা সমুদ্র-বিজয়, কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভ্রাতা ছিলেন। ২৩। পার্শ্বনাথ—রাজা অশ্বসেন ও রাজ্ঞী বামাদেবীর পুত্র—জন্ম ৮৭৭ খৃঃ পূঃ। ৭৭০ খৃঃ পূর্ব্বে সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ। ইনি ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীরের প্রায় ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। সমেৎ শেখরে তিরোধান। নীলবর্ণ, সর্পলাঞ্ছন। ২৪। মহাবীর (বর্দ্ধমান)—রাজা সিদ্ধার্থ ও রাজ্ঞী ত্রিশলার পুত্র, পবাপুরীতে নির্ব্বাণ (৪২৭ খৃঃ পূঃ)। পিঙ্গলবর্ণ, সিংহলাঞ্ছন।

এই তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—২।১ জন তীর্থঙ্কর ব্যতীত ইঁহাদের সকলেই বৃহৎ বঙ্গের সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ করেন, সুতরাং বাঙ্গলাদেশ যে জৈন ধর্ম্মের একটি প্রধান লীলাক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তীর্থঙ্করেরা সকলেই রাজকুলোদ্ভূত; এবং দুইজন ব্যতীত সকলেই ইক্ষ্বাকু-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মিঃ পূরণ চাঁদ নাহার তাঁহার Epitome of Jainism পুস্তকে (৬৮৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন:—"পার্শ্বনাথ পাহাড় বঙ্গদেশের হাজারীবাগ জেলায় অবস্থিত, ইহা জৈনদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। ২৪জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২০ জনই এই স্থানে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদিগের অসংখ্য মঠ-মন্দির আছে। তীর্থঙ্করদিগের পদাঙ্কের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু পার্শ্বনাথের মন্দিরে পার্শ্বনাথের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।"

আদিনাথের একটি মূর্ত্তি ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত কুলপী থানার অধীন ঘণ্টেশ্বরী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি একটু অল্প নীল রঙের বালি পাথরের উপর ক্ষোদিত (পঞ্চপুষ্প, সুন্দরবনে আবিষ্কৃত জৈন মূর্ত্তি প্রবন্ধ, ১৩৩৯ আষাঢ়, ১৩৪ পৃঃ)। মহাবীর (বৰ্দ্ধমান স্বামী) ৫২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জৈন দিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ আয়ারঙ্গ সূত্রে লিখিত আছে তিনি ১২ বৎসর কাল বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি।

পার্শ্বনাথের এই প্রস্তর-মূর্ত্তিটি সুন্দরবনের অন্তর্গত কাঁটাবেনিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। সুন্দরবনের ২৪ নং লাটে এইরূপ আর একখানি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে উদীয়মান ঐতিহাসিক ডায়মণ্ড হারবারের অধীন জয়নগর মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের গবেষণা-মূলক ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জৈন শাস্ত্র ও সাহিত্য অতি বিরাট্, এ পর্য্যন্ত তাহাদের বিশেষ সন্ধান হয় নাই। ইঁহাদের বহুগ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে—বহুসংখ্যক প্রাকৃতে এবং অবশিষ্টগুলি প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত। ইঁহাদের ব্যবহৃত প্রাকৃত অৰ্দ্ধ-মাগধী, সুতরাং এক সময়ে এ দেশে যে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, ইঁহারা তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙ্গালী ভদ্রবাহু—ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মুখ্য লেখকগণের অন্যতম। ইঁহার রচিত কল্পসূত্র (দশাশ্রুতি স্কন্দ নামক বিরাট্ পুস্তকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে ৮ম অধ্যায় জৈনদিগের প্রধান গ্রন্থ। চাতুর্মাস্য উৎসবের সময় ইহা জৈনমন্দিরে ভক্তির সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্তের সময় নিখিল জৈন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ছিলেন। জৈন (প্রাকৃতে লিখিত) পদ্মচরিত (পউম চরিত্তাম) একখানি প্রাচীনতম প্রাকৃত কাব্য। জৈনদিগের আখ্যায়িকা গ্রন্থও বিস্তর; ন্যায়, দর্শন সম্বন্ধে ইঁহারা এক সময়ে ভারতীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অগ্রণী ছিলেন। তীর্থঙ্কর ও প্রধান জৈন সাধুদের জীবনচরিতও বহু বিদ্যমান। প্রফেসর হারতাল (Hertal) বলেন, ইঁহাদের বর্ণনাত্মক

রচনা—শুধু ভারতীয় সাহিত্য নহে—সমগ্র মনুষ্য-জাতির সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে। ("With respect to its narrative part, it holds a prominent position not only in Indian Literature but in the Literature of mankind.")

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতেতিহাসের ধারাবাহিকত্ব

কুরুপাণ্ডব, পরবর্ত্তী শিশুনাগ ও নন্দবংশ

মহাভারতের সময়-নির্ণয় এবং মগধের আদিকথা।

কুরুপাণ্ডবেরই হউক বা কুরুপাঞ্চালেরই হউক, কিংবা ভিন্সেণ্ট স্মিথ, হফ্‌কিংস্ সাহেবের মতানুসারে পাণ্ডুবর্ণ কোন ভুটিয়া জাতির সহিত আর্য্যসমাজের এক মুখ্য শাখারই হউক, কুরুক্ষেত্রনামক স্থানে যে একটা মস্তবড় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন মতান্তর নাই। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থেরও কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। সাজাহানের দিল্লী ও হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী যমুনা-তীরের কতকটা স্থান প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের একাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নিগমবোধঘাট এবং তাহার উত্তরস্থিত সলিমগড়ের সন্নিহিত নীলছত্রী-মন্দির ইন্দ্রপ্রস্থের সীমানার মধ্যে ছিল, অনেকের ইহাই ধারণা। বুদ্ধদেব, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হিমাদ্রির পার্ব্বত্য জাতীয় লোক ছিলেন বলিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করিয়াছেন। এরূপ মত আমরা আরও অনেক শুনিয়াছি,—শিবঠাকুর অনার্য্য দেবতা, সীতা অর্থে লাঙ্গলের ফাল, রামের লঙ্কা-জয় অর্থ দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণের কৃষিবিদ্যার চর্চ্চা—প্রভৃতি মত আমরা ওয়েবার সাহেবের কল্যাণে শুনিয়াছি। মানুষের কঙ্কাল ও রক্তের উপাদান কি, সেই শবচ্ছেদ বিদ্যার অনুশীলন করা আমাদের কার্য্য নহে। বহুযুগ হইতে সন্ধ্যাকালে শিব-মন্দিরে ভোগ ও আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে—তাহা আরও বহুযুগ বাজিবে। বহুযুগ যাবৎ মুমূর্ষু ব্যক্তি পিপাসার্ত্তের ন্যায় রাম নামামৃত শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়া আসিয়াছে ও আরও বহুযুগ সেইরূপ উৎসুক থাকিবে এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা আমাদের আদর্শ আছেন ও থাকিবেন। আমরা ইতিহাসের কঙ্কাল লইয়া টানাহেঁচড়া করিব না এবং এই সকল জীবন্ত দেবতা ভাঙ্গিয়া মাটির পুতুল গড়িব না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়-সম্বন্ধে প্রচলিত মত, উহা ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন—পাণ্ডবদের নাম পাণ্ডু শব্দ হইতে হইয়াছে—এই শব্দের অর্থ

pale বা yellow (পীত)। সুতরাং পাণ্ডবেরা নেপালী বা ভুটিয়া দেশের লোক। দ্বিতীয়তঃ, পাণ্ডবদের মধ্যে অনার্য্য আচার প্রচলিত ছিল—যথা, এক স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা, সুতরাং তাঁহারা পাহাড়িয়া কোন অসভ্য সম্প্রদায়-ভুক্ত।

এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে আর্য্যদিগের আচার-ব্যবহার চিরদিনই একরূপ ছিল না। আর্য্যদিগের ক্রমবিকশিত সামাজিক ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যুগে যুগে নানা প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। উদ্দালক মুনির স্ত্রীকে যখন অপর এক ঋষি ধরিয়া লইয়া যান, তখন সেই স্ত্রীর প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রোষপূর্ণ চক্ষে সেই দৃশ্য দেখিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ;—তখন তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন :—"বৎস! ইহাই প্রথা, যে যাহাকে ইচ্ছা করিবে, সে তাহাকে পাইবে, ইহাতে বাধা দেওয়ার শক্তি সমাজ আমাকে দেন নাই।" দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তাঁহার 'সামাজিক ইতিহাসে' লিখিয়াছেন, পুরাকালে আর্য্যসমাজে যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিত, তাহাকে সেই পুরুষের অনুগামিনী হইতে হইত। নতুবা সেই স্ত্রীর সমাজে নিন্দা হইত এবং লোকে তাহাকে "কর্কশা" বলিয়া ঘৃণা করিত। দশরথ-জাতকে দৃষ্ট হয়, সীতা রামের সহোদরা ছিলেন এবং শেষে তাঁহার পত্নী হন। এককালে আর্য্যসমাজের কোন কোন শাখায় সহোদর-সহোদরার বিবাহের প্রথা বিদ্যমান ছিল। দ্রৌপদীর বিবাহের সময় যুধিষ্ঠির দ্রুপদ রাজার নিকটে এক রমণীর বহুপতি হইবার কতকগুলি প্রাচীন নজীর উপস্থিত করিয়াছিলেন, যথা :—"ধর্ম্মশীলা জটিলা নাম্নী গৌতম বংশীয়া এককন্যা সাতজন ঋষিকে বিবাহ করেন, এবং বাক্ষী নাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতাঃ নামক দশভ্রাতার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন।" (মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১৯৬ অঃ।) শুধু পাণ্ডবদের জন্মবৃত্তান্তটিই আধুনিক আদর্শ-অনুসারে বিসদৃশ নহে, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের জন্মকথাটাও খুব সুরুচিসঙ্গত নহে। ইহাছাড়া নারদঋষি ও সত্যকামের জন্ম-কথা, ব্যাসঋষির উৎপত্তি ইত্যাদি বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি সর্ব্বজনপূজ্য ঋষিরা ব্যভিচারোৎপন্ন হইয়াও সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হইয়াছিলেন। মণিপুরের বৃদ্ধরাজা এই সর্ত্তে তাঁহার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জ্জুনের হস্তে দিয়াছিলেন যে, দৌহিত্র তাঁহাদের সিংহাসনের অধিকারী, সুতরাং অর্জ্জুনের পুত্র হইলে সে মণিপুরেই থাকিবে, তাহার উপর অর্জ্জুনের কোন দাবী থাকিবে না।

বিরাট্ আর্য্যসমাজে যৌনসম্পর্ক ও আহারাদি-সম্বন্ধে অসম্ভব রকমের শিথিলতা বিদ্যমান ছিল। যুগে যুগে আর্য্যসমাজ নানারূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। এক সময়ে আর্য্যগণ এত বেশী গরু খাইতেন যে, অতিথি আসিলেই একটি গরু মারিতে হইত। এইজন্ত অতিথির এক নাম "গোঘ্ন।" রাম বনবাস-কালে সুস্বাদু বলিয়া শূকরের মাংস সীতাকে খাইতে দিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগ হইতে আর্য্যগণ কোন একটা বিশেষ আচারের খুঁটি ধরিয়া বসিয়া থাকেন নাই। এখন যে সকল আচার ও রীতিনীতি লুপ্ত হইয়াছে, তাহা চীনাম্যান বা ভুটিয়াদের মধ্যে পাইলে আমাদের আর্য্যবংশীয় পূজ্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের দলের মধ্যে লইয়া ফেলিব, ইহা কি খুব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে?

স্মিথ সাহেব আরও লিখিয়াছেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা একটা জাতি-বিরোধ লইয়া হইতেই পারে না। একটা সামান্ত পারিবারিক কলহ কি ভারতীয় সমবেত রাজশক্তির উপস্থিতি ও যুদ্ধবিগ্রহাদির কারণ হইতে পারে? কথিত আছে পূর্ব্বদেশের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা পর্য্যন্ত এতটা পথ পর্য্যটন করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। ঘরোয়া লড়াই হইলে এরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল। এই পাশ্চাত্ত্য জাতিদের মধ্যে পারিবারিক ব্যাপারগুলি কিছুই নহে, যুদ্ধাদি হইতে হইলে একটা জাতীয়তা-সম্পর্কিত কারণ থাকা চাই। তাঁহারা জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝেন, ভারতবর্ষে তাহা কোন কালেই ছিল না। ভারতীয় সভ্যতার মূল কেন্দ্র পারিবারিক জীবন ও জ্ঞাতিত্বের বন্ধন। যাঁহারা সার্ব্বভৌম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত দেশে অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই রাজপরিবারের যুদ্ধবিগ্রহে যে সমস্ত মিত্র ও সামন্তরাজ যোগ দিবেন, উহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এখন হইতে দুই তিন হাজার বৎসর পরে, যখন বর্ত্তমান ইতিহাসের অনেক কথাই লোকে ভুলিয়া যাইবে, তখন যদি কেহ বলে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ ও মীরজাফর প্রভৃতি কয়েকজন সভাসদ্ মুরশিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শত শত যোজন দূরে—বহু সাগর, শৈল, ও ভূধর অতিক্রম করিয়া কেন ইংরেজ জাতি যোগ দিবেন, বিশেষ তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন? তবে সেই প্রশ্নটির অনুরূপ প্রশ্নই ইহা হইবে। পাণ্ডু শব্দ দেখিয়া জাতি নির্ণয় করিতে হইলে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ফক্স্ সাহেবকে তদর্থ-ব্যঞ্জক জীব-বিশেষের শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, পূর্ব্বভারতে ব্রাহ্মণবিরোধী যে সকল জাতি রাজত্ব করিতে ছিলেন—যথা, লিচ্ছবি, শিশুনাগ বংশীয় এবং মগধ ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেশের রাজগণ, তাঁহারা কখনই আর্য্য ছিলেন না, তাঁহারা ভুটিয়া, গুর্খা এবং তিব্বত-বাসীদেরই জ্ঞাতি ও অনার্য্য ছিলেন,—এই জন্যই তাঁহারা ব্রাহ্মণদের বেদবিধি গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য বুদ্ধদেবের নাক চেপ্টা ছিল কিনা তৎসম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজনীয়। এই সকল মতের সঙ্গে ওয়েবারের রামায়ণের টীকা, অর্থাৎ সীতা অর্থ লাঙ্গলের ফাল এবং লঙ্কাকাণ্ডটা দাক্ষিণাত্যে কৃষিশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মত জুড়িয়া দেওয়া উচিত। হুইলার দশরথের মৃত্যুর যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও কি আমরা বিজ্ঞান-সম্মত বলিব? একাকী রাত্রে এক ঘরে দশরথ রাজাকে পাইয়া শোকসন্তপ্তা কৌশল্যা পুত্র-নির্ব্বাসনের প্রতিশোধার্থ স্বামীকে গলা টিপিয়া মারিয়াছিলেন; নতুবা এত বড় রাজাটা মরিলেন, তাঁহার কোন ব্যারাম-পীড়া হইল না ও তাঁহার জন্য কোন চিকিৎসক ডাকা হইল না, ইহাও কি হইতে পারে?

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অদ্ভুত অদ্ভুত মত।

আমরা এসকল বৈজ্ঞানিক মতের আলোচনা করিব না। পাণ্ডবেরা চীনদেশের লোক হউন বা বুদ্ধদেব নাক চেপ্টা ভুটিয়া হউন, তাহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। রামায়ণ-মহাভারতোক্ত নায়ক ও নায়িকাগণের সঙ্গে আমাদের শুধু একটা বাহ্য ইতিহাসের সম্পর্ক বিদ্যমান নহে, তাঁহারা এ দেশে শুধু নরকঙ্কাল অথবা ঐতিহাসিক কৌতূহলের তৃপ্তিদায়ক

পুরাকালের কর্ম্মবীর নহেন। বুদ্ধদেব যদি ভুটিয়া-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই কি তাঁহার প্রতি জগতের শ্রদ্ধা লুপ্ত হইবে? (চণ্ডাল মাতার সন্তান পরাশর ও গণিকার সন্তান সত্যকাম, তাহাতে কি হইয়াছে? আর যদি বল ইহারা কবি-কল্পনা মাত্র, ইহাদের অস্তিত্বই ছিল না, তথাপি আমরা দুঃখিত হইব না। যে মন্ত্রবলে সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের মায়িক দেহ দিয়াছেন, তেমনি কোন দৈবশক্তির ইন্দ্রজালে ঋষিরা এই সকল কাব্যনায়কের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতবাসীর হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া তাঁহারা অধিষ্ঠিত আছেন—তাঁহাদিগকে লোক-শ্রদ্ধা হইতে কে অপসারিত করিবে? খৃষ্ট অযোনি সম্ভব, কুমারী মেরীর পুত্র, এই সকল কল্পনাও পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক অবাধে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টের প্রতি তজ্জন্য তাঁহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই।)

কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ হইতে যে বংশলতা পুরাণাদিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা পার্‌জিটার সাহেব মূলতঃ গ্রাহ্য করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা তাঁহাকে একঘরে করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, পুরাণোক্ত রাজবংশাবলীর সঙ্গে শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রায় প্রাপ্ত রাজগণের নামের আশ্চর্য্যরূপ মিল রহিয়াছে, তখন স্বয়ং ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনেকটা ঘাড় চুলকাইয়া বলিতেছেন, এই পুরাণের বংশাবলী একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। "The Pauranic genealogies of kings in prehistoric times seems to be of doubtful value but those of the historical period of Kaliyuga from about 600 B.C., are records of high importance and extremely helpful in reconstructing the early political history of India." (Oxford History of India, 1921, p. 34.) ইহার সারার্থ এই যে কলিযুগের ইতিহাস-পূর্ব্ব অধ্যায়ের, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসর পূর্ব্বের যে বংশলতা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তাহা কতকটা সন্দেহজনক—কিন্তু ৬০০ খৃঃ পূঃ হইতে যে বংশলতা দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ভারতের প্রাচীন কালের ইতিহাস গঠনের পক্ষে অপরিহার্য্য। এই ঐতিহাসিক যুগটা তাঁহারা বুদ্ধদেবের জন্ম ও আলেকজাণ্ডারের অভিযানের সময় হইতে গণনা করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ইতিহাসের কোন আলোরেখা বিদেশ হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ভারতবর্ষের স্থানীয় ইতিহাস-লেখকগণের উক্তি তাঁহারা সম্যক্‌রূপে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসরের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারাই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বংশলতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং আলেকজাণ্ডার আসিবার পর হইতে যে ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যয়-যোগ্য যুগ আরম্ভ হইবে—ইহা তাঁহারা আভাসেও জানিতেন না। আমরা পারজিটারের সহিত একমত হইয়া বলিতে পারি যে, পুরাণোক্ত রাজবংশলতা মূলতঃ গ্রাহ্য, কিন্তু নানা কারণে কতকটা বিকৃত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রত্যেকেই তাঁহাদের বংশাবলী ও ইতিহাস রক্ষা করিতেন। তাঁহারা শুধু ইতিহাস স্বতন্ত্র ভাবে লিখাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, শিলালিপি, তাম্রলিপি, এবং ধাতব পত্রে স্বীয়

বংশলতা।

কীর্ত্তি ও পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া—ইতিহাস রক্ষা করিবার সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ইতিহাস-বিরোধী হইয়াছিল, শুধু ভাবক ব্রাহ্মণেরা অর্থলোভে রাজকীয় অনুশাসনের শ্লোক রচনা করিতেন সত্য,—কিন্তু মূলতঃ পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণগণ জড়শক্তির বিরোধী ও নিবৃত্তি-ধর্ম্মাশ্রয়ী ছিলেন। পার্থিব ঐশ্বর্য্য—গৌরব ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করে নাই। বৌদ্ধ-যুগে প্রতাপান্বিত রাজাদের অনেক ইতিহাস ছিল এবং পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্য সমুত্থানে তাহাদের অধিকাংশ ধ্বংস পাইয়াছে। অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পুরাকালে আদত পুরাণগুলি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত ছিল। নব ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের দিনে তাহারা সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সম্পাদিত মহাভারতের একখানি সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি মনে করেন যে কলি ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন (১৯৩১) কল্যব্দ ৫০৩২ এবং এই সময়ই মহাযুদ্ধের সময়। এ সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। এখন ১৯৩১ খৃঃ অব্দ, সুতরাং তাঁহার মতে ১৯৩১ + ১৯৩৩ = ৩৮৬৩ বৎসর পূর্ব্বে মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বিষ্ণুপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় বলিয়া স্বীকার করেন।* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে "যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম। এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।" বঙ্কিমবাবু এই মত গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন "নন্দের পুরানাম নন্দ-মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে—মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি, কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।" ইহার অর্থ, মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ একশত বর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কৌটিল্য-নামক ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়দিগকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।

---

* উইলসন ও কোলব্রুক সাহেবের অনুমান-অনুসারে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১৩৭০ খৃঃ পূঃ, বুকাননের মতে খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, প্রাট সাহেবের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন "ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের কোন মারাত্মক মতভেদ নাই।" (কৃষ্ণচরিত্র, ৯পৃঃ।) সম্প্রতি ভারত-যুদ্ধের কাল লইয়া অধ্যাপক হেমচন্দ্র চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায় এবং প্রবোধচন্দ্র সেন অনেক গবেষণা করিয়াছেন। শেষোক্ত পণ্ডিতদ্বয় তাঁহাদের যুক্তি জ্যোতিষিক গণনার ভিত্তির উপর দাঁড় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এই সকল মতের রেখায় রেখায় ঐক্য না থাকিলেও বঙ্কিমবাবুর কথায় বলা যাইতে পারে মহাভারতের কাল-সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "কোন মারাত্মক মতভেদ নাই।" এই সকল জটিল প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা এখানে আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নন্দবংশ, আলেকজাণ্ডারের অভিযান

(যুধিষ্ঠির এবং মহাপদ্ম-নন্দের মধ্যে মোটামুটি হিসাব করিলে প্রায় [illegible] বৎসরের ব্যবধান।) এই সময়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু এই সময় যে ভারতে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা বিষম সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপদ্ম-নন্দকে ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরামের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে [illegible] রাজন্য বা ক্ষত্রকুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়াও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। পুনরায় সেই শক্তি দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবং হীন কুলজাত নন্দবংশ ক্ষত্রিয়দিগকে পুনরায় নিরস্ত করিয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকত্ব কোন কালেই নষ্ট হয় নাই।

(হফ্‌কিন্স সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, মহাভারতে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বেদের সূক্তের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। মহাভারতেই অহিংসনীতির সৃষ্টি এবং নানা আধ্যাত্মিক মতের বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে বহুধর্ম্ম মত ও আধ্যাত্মিক সূত্র প্রচার করিয়া জননেতৃগণ আর্য্যাবর্ত্তে কর্ম্মশীলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতের আভাস মহাভারতেই পাওয়া যাইবে এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়।)

বেদে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, মহাভারত ও বৌদ্ধ জৈন-শাস্ত্রে এবং পুরাণাদিতে সেই সূত্রাকার তত্ত্বগুলি পল্লবিত ও শাখা-প্রশাখা-যুক্ত বৃহৎ বিটপীর ন্যায় ভারতে ব্যাপকতা [illegible] এই সভ্যতার কোন কালেই ক্রম-ভঙ্গ হয় নাই, কতকগুলি রাজার নাম ও কর্ম্মের তালিকা আমরা নিশ্চয়ই হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু ভারতীয় নিবৃত্তি মূলক সভ্যতা কোন কালেই নষ্ট হয় নাই। দেশলক্ষ্মীর কনক-কিরীটের একটি অংশেরও জ্যোতি ম্লান হয় নাই।

পরবর্ত্তী ধর্ম্মমতগুলিকে গ্রাস করিয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে দুই মহাশক্তি—জৈন ও [illegible] এদেশে বিরাজিত হইয়াছিল। (আমাদের এই বঙ্গদেশে উক্ত দুই কল্পতরুজাত অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল) তাহা আমরা পরে দেখাইব।

কিন্তু বঙ্গদেশের চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে গেলে রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের কতকটা আভাস দেওয়া প্রয়োজনীয়।

মহাপদ্ম-নন্দ দ্বিতীয় ভার্গব।

মহাপদ্ম-নন্দ-সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত হইয়াছে (১০ম স্কন্ধ) "মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্ম অতি প্রবল রাজা হইবেন, তিনি শূদ্র মাতার গর্ভজাত। তাহা হইতে উৎপন্ন রাজারা শূদ্র এবং দয়াশূন্য। মহাপদ্ম সমস্ত দেশ নিঃক্ষত্রিয় করিয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন। সুমল্য এবং তাঁহার অপরাপর পুত্রগণ একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন। কিন্তু একজন

ব্রাহ্মণ নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই বংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তকে সেই ব্রাহ্মণ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন।"

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, "শিশুনাগ বংশীয় রাজগণের শেষ রাজা মহানন্দী। ইঁহারা সর্ব্বসমেত ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করিবেন। মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্ম শূদ্র মাতার গর্ভজাত। তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিবেন এবং তৎকুলজাত রাজগণ শূদ্র-বংশীয় বলিয়া গণ্য হইবেন। মহাপদ্ম সমস্ত পৃথিবী একদেশের অধীন করিবেন। সুমল্য নামে তাঁহার পুত্র এবং অপরাপর পুত্রগণ একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন। কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণ নয়জন নন্দের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মৌর্য্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

এ সম্বন্ধে সোমদত্ত-প্রণীত 'বৃহৎকথা'য় অনেক উপগল্প আছে। তন্মধ্যে নন্দ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি কোন কারণে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সকাতলের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তাঁহাকে তাঁহার পুত্রগণ সমেত একটা কূপে নিক্ষেপ করা হয়। সেইখানে অল্প একটু ডাল ও জলের ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্য ছিল, কিন্তু সেই খাদ্য ও পানীয়-দ্বারা এক জনের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিত। মন্ত্রী কহিলেন, "যে প্রতিহিংসা লইতে পারিবে সেই বাঁচুক।" পুত্রেরা একবাক্যে বলিল "আপনিই এ বিষয় যোগ্যতম, সুতরাং আপনিই এই অল্লাহারে কোনমতে জীবনরক্ষা করুন।" সকাতলের চোখের সম্মুখে একে একে সব কয়টি পুত্র অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহার পরে মন্ত্রী কোন ক্রমে উদ্ধার পাইয়া কূপ হইতে উঠিয়া আসিলেন। তিনি প্রতিহিংসার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া একদা কোন প্রান্তর-ভূমিতে ঘুরিতেছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, একটি হীন পরিচ্ছদ-পরিহিত ব্রাহ্মণ প্রান্তরটা খুঁড়িতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি করিতেছেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তাঁহার পাদ কুশ-বিদ্ধ হওয়াতে ক্ষত হইয়াছে—এইজন্য তিনি প্রান্তরের সমস্ত কুশচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মন্ত্রী বুঝিলেন, প্রতিহিংসা কিরূপে লইতে হয় তাহা এ ব্যক্তি জানেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন ইতিহাসবিশ্রুত চাণক্য। সকাতল ইঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে শীঘ্রই নন্দের রাজভবনে প্রচুর সমারোহের সহিত এক শ্রাদ্ধ হইবে; তিনি যদি পুরোহিতের কাজ করেন, তবে অনেক অর্থলাভ হইতে পারিবে; তিনি স্বয়ং তাঁহাকে পুরোহিত-স্বরূপ নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁহার উপদেশমত নির্দ্দিষ্ট দিনে চাণক্য শ্রাদ্ধসভায় পুরোহিতের আসনে বসিলেন। মহাপদ্ম-নন্দ এই অপরিচিত ব্রাহ্মণের ধৃষ্টতাদর্শনে তাঁহার টিকি ধরাইয়া সেই আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং তৎস্থলে রাজপুরোহিত সুবন্ধুকে নিযুক্ত করিলেন। মুক্তশিখ চাণক্য আর শিখা বন্ধন করিলেন না, সেইখানেই প্রতিশ্রুত হইলেন যে সাত দিনের মধ্যে যদি তিনি নন্দের বধ সাধন করিতে না পারেন, তবে তিনি আর জীবনে

মন্ত্রী সকাতলের প্রতিহিংসা।

চাণক্যের অপমান ও প্রতিহিংসা।

শিখা বন্ধন করিবেন না। ইহার পর অভিচার-প্রক্রিয়া-দ্বারা তিনি নন্দের হত্যা সাধন করেন এবং তাঁহার পুত্র হিরণ্যগুপ্তকেও বধ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাচীন পুরাণগুলির মত অনুসরণ করিলে নিম্নলিখিতরূপ বংশাবলীও তাহাদের সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণেরও মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ১৪৩০ খৃঃ পূঃ। শিশুনাগবংশীয় ১০ জন রাজার সময় ৩৬২ বৎসর। ইহাদের মধ্যে শেষ দুইজন নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দ ৮৩ বৎসর, মহানন্দ ও তাঁহার ৮ পুত্র, এই ৯ জনের রাজত্বকাল ১০০ বৎসর। কোন কোন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক নিম্নলিখিত ভাবের বংশাবলী ও সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

শিশুনাগ	ইনি প্রথমতঃ কাশীর রাজা ছিলেন	৬৪২ খৃঃ পূঃ
কাকবর্ণ ক্ষেমধর্ম্ম ক্ষেমজিত	ইহারা রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করেন	৫৮২ খৃঃ পূঃ
বিম্বিসার	... ...	৫৫৫ খৃঃ পূঃ
অজাতশত্রু	... ...	৫৫৪ খৃঃ পূঃ
দর্শক	... ...	৫২৭ খৃঃ পূঃ
উদাসীন	... ...	৫০০ খৃঃ পূঃ
নন্দিবর্দ্ধন	... ...	৪৭০ খৃঃ পূঃ
নয়জন নন্দবংশীয় রাজা (মহাপদ্ম এবং তাঁহার ৮ পুত্র)		৩২২ খৃঃ পূঃ
চন্দ্রগুপ্ত	... ...	৩২২-২৯৮ খৃঃ পূঃ

৬৪২ খৃঃ পূঃ শিশুনাগের সময় ধরিলে দেখা যায় যুধিষ্ঠিরাব্দ অর্থাৎ ১৪৩০ খৃঃ পূঃ হইতে উহার ব্যবধান মাত্র (১৪৩০—৬৪২) ৭৮৮ বৎসর। *

* দীপবংশ ও মহাবংশের মতে বুদ্ধের সমকালীন বিম্বিসার হইতে বংশাবলী এইরূপ :—

				রাজত্ব-কাল
১।	বিম্বিসার	...	...	খৃঃ পূঃ ৫৪৩—৪৯১
২।	অজাতশত্রু	...	...	খৃঃ পূঃ ৪৯১—৪৫৯
৩।	উদয়িভদ্র	...	...	খৃঃ পূঃ ৪৫৯—৪৪৩
৪। ৫।	অনিরুদ্ধ মুণ্ডা	...	...	খৃঃ পূঃ ৪৪৩—৪৩৫
৬।	নাগ দাসক	...	...	খৃঃ পূঃ ৪৩৫—৪১১
৭।	সুসুনাগ	...	...	খৃঃ পূঃ ৪১১—৩৯৩
৮।	কালাশোক	...	...	খৃঃ পূঃ ৩৯৩—৩৬৫
৯।	কালাশোকের দশ পুত্র		...	খৃঃ পূঃ ৩৬৫—৩৪৩
১০।	নয় জন নন্দ...	...	...	খৃঃ পূঃ ৩৪৩—৩২১

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পোরস্ (পুরু) নামক রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার পরাক্রম দেখিয়া মাসিডনীয় বীর বিস্মিত হইয়াছিলেন।

আলেকজাণ্ডার।

আলেকজাণ্ডার, প্রাচীন মুদ্রা হইতে।

যদিও কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব দুর্ঘটনায় পঞ্জাবাধিপতি পরাজিত হন, তথাপি "গ্রীকগণ স্বীকার করিয়াছেন যুদ্ধ-বিদ্যায় আর কোন এসিয়াটিক জাতি হিন্দুদের সমকক্ষ ছিলেন না।" পুরু দৈর্ঘ্যে ৬½ ফিট ছিলেন।

যাহা হউক পুরুর সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব বিজয়ের পরে পূর্ব্বাঞ্চলে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার সৈন্যেরা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পাটলীপুত্রের (কুসুমপুর) রাজার সৈন্যসংখ্যা ও পরাক্রমের যে কাহিনী তিনি পুরু ও ফিগিয়ুস হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও আরও পূর্ব্বে অভিযান করিবার তাঁহার দুর্দ্দমনীয় বাসনা নিরস্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া গিয়াছিল। মাসিডনিয়া মহাবীর, যাঁহার ইঙ্গিতে বিপুল গ্রীক সৈন্য উঠিত বসিত, তাহারা একেবারে ফিরিয়া বসিল, এমন কি তিনি সাশ্রুনেত্রে তাঁহাদের নিকট কাকুতি-মিনতি করিয়াও তাহাদিগের মনের গতি ফিরাইতে পারিলেন না। গ্রীকগণ শুনিলেন যে প্রাচ্যের রাজা গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সাজসজ্জা করিয়া আছেন। তাঁহার ২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, দুই লক্ষ পদাতিক, তিন হাজার হস্তী ও দুই হাজার যুদ্ধরথ সেই স্থানে প্রস্তুত হইয়া আছে। মেগাস্থিনিস আলেকজাণ্ডারকে

চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবল।

বলিলেন যে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন; সেখানে তাঁহার শিবিরে চার লক্ষ সশস্ত্র সৈনিক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। গ্রীক দূত পাটলীপুত্র নগর-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"এই নগর দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল এবং ইহা দুই মাইল প্রশস্ত। সমস্ত নগর প্রাকার-বেষ্টিত। এই প্রাকারে ৫৭২টি গম্বুজ আছে এবং ইহার তোরণের সংখ্যা ৬৪টি

১১।	চন্দ্রগুপ্ত	...	...	খৃঃ পূঃ ৩২১—২৯৭
১২।	বিন্দুসার	..	...	খৃঃ পূঃ ২৯৭—২৬৯
১৩।	অশোক	...	...	খৃঃ পূঃ ২৬৯—২২৭

আলেকজাণ্ডারের জীবনীলেখক প্লুটার্ক বলেন—"গঙ্গারিডির রাজাদের ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দুইলক্ষ পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধরথ এবং ৬০০০ হস্তী ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ছয়লক্ষ সৈন্য লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান করিয়া এই বিশাল দেশ জয় করিয়াছিলেন।" এরিয়ান লিখিয়াছেন- "এই সকল বিক্রমের কথা শুনিয়া আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদের মধ্যে এরূপ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে তাহারা একবাক্যে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে অসম্মতি জানাইল; তাহারা এবিষয়ে এরূপ দৃঢ়তার সহিত আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিল যে আলেকজাণ্ডারের স্বীয় সৈন্যগণের উপর সম্যক আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও এইবার তাঁহাকে তাহাদের মতানুসারে পারশ্যদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।"
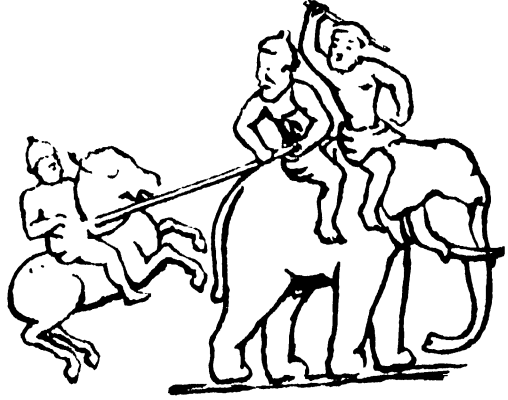
পুরুর হস্তী পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়াছে। আলেকজাণ্ডার অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতেছেন; হস্তি-পৃষ্ঠে দুই ব্যক্তি, তন্মধ্যে যাঁহার মাথায় মুকুট তিনিই পুরু।

পুরু ও আলেকজাণ্ডার (প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)।

আলেকজাণ্ডারের অভিযান-সম্বন্ধে এ্যারিয়ান, জষ্টিন্, মেগাস্থিনিস প্রভৃতি লেখকগণের বর্ণিতকাহিনীর সামঞ্জস্য নাই; উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই পাঠক তাহার কিছু কিছু নমুনা পাইবেন। কিন্তু হইলে কি হয়? পশ্চিম হইতে যে আলো আসে তাহাই বৈজ্ঞানিক।

মেগাস্থিনিসের বিজ্ঞান সঙ্গত বর্ণনা।

ভারতবর্ষের নাকি কোন ইতিহাসই ছিল না, আলেকজাণ্ডারের আগমন হইতেই সেই ইতিহাস ধরা পড়িয়াছে। ঐ সকল ঐতিহাসিকের মধ্যে মেগাস্থিনিসই প্রধান। আমরা কথায় কথায় তাঁহার দোহাই দিয়া অতি দুর্ভেদ্য ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাই। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে নানা কথাই বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দুই একটির নিদর্শন দিতেছি: "ভারতবর্ষে এরূপ একশ্রেণীর লোক আছে যাহাদের কান এত লম্বা যে দুটি কান দিয়া তাহারা সর্ব্বশরীর জড়াইতে পারে।" "আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহাদের মুখ নাই, নাক নাই,—কেবল একটি করিয়া চক্ষু আছে। তাহাদের পদতল বিষম লম্বা এবং পদাঙ্গুলী সকল উল্টাদিকে ফিরান। আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চি মাত্র। সেখানে কতকগুলি অরণ্যবাসী লোক আছে যাহাদের মাথার নীচের দিকটা শক্ত ও পুরু এবং উপর দিকে খুব সূক্ষ্ম ও পাতলা।* ভারতবর্ষের পিপীলিকাগুলি

* মাথার উপরের শিখাটাকে হয়ত গ্রীকদূত মাথার একটা অংশ মনে করিয়া থাকিবেন, কি জানি?

শৃগালের মত বড়, ইহারা মাটীর নীচে হইতে স্বর্ণ খুঁড়িয়া তুলিবার বিদ্যায় অভিজ্ঞ।" (ষ্ট্রাবো Lib XX 1032 A 1037 C)। এই সকল বর্ণনার সঙ্গে হনুমানের পাহাড় তোলার কথাটি জুড়িয়া দিলে এমন কি বিসদৃশ হয়! আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বিজ্ঞানবিৎ গ্রীক লেখকেরাই আমাদিগের চক্ষে সত্যের পথ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন, এবং মহাভারত রামায়ণ, ও অপরাপর পুরাণগুলি একেবারে বাজে কথা।

পৃথিবীতে এমন কোন প্রাচীন সাহিত্য বা ইতিহাস নাই যাহাতে অতিরঞ্জন ও কাল্পনিক উপাখ্যান না আছে। মেগাস্থিনিস্ যে সময়ে লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বহু শতাব্দী পূর্বে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের ধারণা কতকটা হরিবংশের সিদ্ধান্তের অনুকূল। সেই যুদ্ধের বৃত্তান্তে যে, কল্পনা, পরবর্ত্তী যোজনা ও অতিরঞ্জন থাকিবে না একথা কে বলে? কিন্তু তাই বলিয়া মূল বিবরণগুলিকে অগ্রাহ্য করিবার পক্ষে কি সুযুক্তি থাকিতে পারে? পূর্ব্বাপর এদেশে রাজাদের বংশলতা ছিল, তাহার অনেকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহা কি সম্ভব যে মহাভারতকার স্থূল কথাগুলি পর্য্যন্ত বিকৃত করিয়াছেন? অথচ তাঁহারা বলেন, পাণ্ডু অর্থ ম্লান, চাইনিস্‌দিগের বর্ণ, সুতরাং পাণ্ডবেরা চীনদেশবাসী। চীন জাতির কি মঙ্গলিয়ান্‌দের বর্ণ পাশ্চাত্ত্য ধারণায় ম্লান হইতে পারে; আমাদের ধারণায় তাহারা পাণ্ডুবর্ণ নহে। যাঁহারা একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞাতি-যুদ্ধে অধীন বা মিত্ররাজ্যসমূহ উভয় পক্ষের কোনটিতে অবশ্যই যোগদান করিবেন কিন্তু ঘরাও যুদ্ধে এমন হইতে পারে না যাহাতে দিল্লীর নিকট যে যুদ্ধ হইয়াছিল, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের রাজার তাহাতে যোগদান করা সম্ভব হইতে পারে—এই সকল যুক্তি অসার। কৌশল্যা দশরথকে প্রতিহিংসা-প্রণোদিত হইয়া হত্যা করিয়াছেন—এইভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের সম্বন্ধে কতকগুলি অসার কষ্ট-কল্পিত মত প্রমাণ করিতে যাঁহারা চেষ্টিত, তাঁহাদের সেই সকল তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কি মেগাস্থিনিস্-কথিত ভারতবাসীর শ্রেণীবিভাগের এক পর্য্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য নহে? আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ এই যে য়ুরোপের সকল কথাই আমাদের চক্ষে বেদ-বেদান্তের স্থান পাইয়াছে, এবং ভারতীয় যাহা কিছু—যাহা দেবনির্ম্মাল্য বা তুলসীর মত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শিরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অর্ব্বাচীনের মত আমরা তাহা পদদলিত করিতেছি।

ইতিহাসের অনুসন্ধান সতর্ক হইয়া করা উচিত, কিন্তু বিদেশীয় পণ্ডিতদের মতামত-সম্বন্ধে আমরা অন্ধের মত সব সিদ্ধান্ত নির্ব্বিচারে মানিয়া লই। আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাস-লেখকগণ বর্ত্তমানযুগের ইতিহাসকে যেভাবে বিকৃত করিতেছেন, তাহাতে ইতিহাসের সম্মান রক্ষিত হয় নাই। য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি একই ঘটনাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণনা করিতেছেন, এই স্বার্থদুষ্ট বর্ণনাগুলি-সম্বন্ধে কোনই সতর্কতা অবলম্বিত হয় না—আমরা তাহা মানিয়া লইতেছি। কিন্তু আমাদের দেশের শাস্ত্র ও পুরাণ-সম্বন্ধে আমরা সেই সতর্কতার এতটা বাড়াবাড়ি করি যেন সেগুলি ঘর হইতে ঝেঁটিয়া ফেলিলেই আমরা বেশী করিয়া বৈজ্ঞানিক বলিয়া গণ্য হইব। পুরাণের ছয়খানি
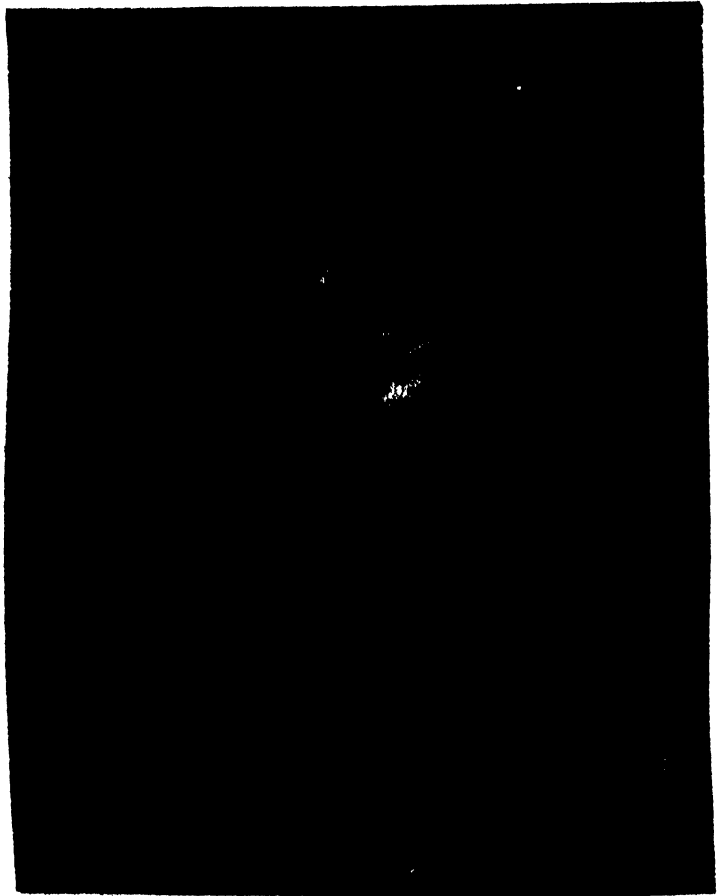
মহিষ-লাঞ্ছন শিরস্ত্রাণ সহ দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজেণ্ডার (প্রাচীন চিত্র হইতে)।
শিশুভারতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারীদের আনুকূল্যে প্রাপ্ত।

বাদ দিলেও দশ খানির ভিত্তি খুব শক্ত, আধুনিক গবেষণার ফলে তাহা ক্রমশঃ প্রমাণিত হইতেছে।

আলেকজাণ্ডারের অভিযান সম্ভবতঃ হিন্দুরা একটা পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিণত করিয়া জাতীয় গৌরবের স্মৃতি এখন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; আমি যাহা বলিব, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুই নাই—কিন্তু তথাপি আমার অনুমান একান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। সকলেই অবগত আছেন, আলেকজাণ্ডার মহিষের শিং শিরস্ত্রাণ-স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। ইনিই কি চণ্ডীর কথিত মহিষাসুর? কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ হিন্দুর চক্ষে স্বর্গলোক—পুরু প্রভৃতি তদ্দেশবাসী রাজগণ আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিতে পারেন নাই। মহিষাসুরের দ্বারা দেবতাদের পরাভব এই সূত্রে পরিকল্পিত হইতে পারে; এত ঘটা করিয়া জয়দৃপ্ত গ্রীক-বীর পূর্ব্বদিকে অভিযান করিয়া হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া যান ও অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দেবলীলার দ্বারা এই অচিন্তনীয় পরাভবকাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দুরা হয়ত দেবী-যুদ্ধপরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রায় চারিশত বৎসর পরে "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী" রচিত হইতে পারে। যেহেতু পুষ্যমিত্রের সময় নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের যে জাগরণ হয়—তাহার সঙ্গে উপাখ্যানটির সময়-সম্বন্ধে কতকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়। তখন হিন্দুর চক্ষে বৌদ্ধগণ হেয় হইয়াছেন। চণ্ডীতে মহিষাসুরের দলের মধ্যে "মৌর্য্যগণের" উল্লেখ দৃষ্ট হয় * এবং সুরথ রাজা চৈত্র বংশ সমুদ্ভূত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। উড়িষ্যার রাজা খারবেল সম্ভবতঃ এই চৈত্র বংশ সমুদ্ভূত। প্রস্তর-লিপিতে যে "চেতি" বংশের কথা পাওয়া যায়, তাহাই সম্ভবতঃ "চৈত্র" শব্দের রূপান্তর। পরবর্ত্তী যুগে মৌর্য্যগণকে দানব বলিয়া হিন্দুদের বর্ণনা করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য কথা নহে—তখন বৌদ্ধগণের কীর্ত্তি হিন্দুরা অনেক ধ্বংস করিতেছিলেন এবং মৌর্য্যগণ হিন্দুর চক্ষে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। চণ্ডী সম্ভবতঃ ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাগুলিকে একটা ধর্ম্মমূলক উপাখ্যানে পরিণত করিয়া এই সময় রচিত হইয়া থাকিবে, আমার ইহা একটা অনুমান মাত্র।

মহিষশৃঙ্গ শিরস্ত্রাণযুক্ত আলেকজাণ্ডারের মস্তক।

---

* কালকা দৌর্হৃদা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম॥ —চণ্ডী, [illegible]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য

আমরা পূর্ব্বে যাহাকিছু শিখিয়া থাকি না কেন, এ কথা কখনই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গ্রীকদিগের আগমন এবং অশোক প্রভৃতি রাজন্যবর্গের শিলালেখ-আবিষ্কার আমাদিগের ইতিহাসে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন যুগের যে কাহিনী দেশময় নানাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার মূল্যও উপেক্ষণীয় নহে।

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। চন্দ্রগুপ্ত মুরা নামক এক শূদ্রবংশীয় কোন রমণী হইতে উদ্ভূত, এজন্য এই বংশকে মৌর্য্যবংশ বলা হইয়া থাকে। ডিওডোরাস্ সিকুলাস্ নামক আলেকজাণ্ডার-অভিযানের কাহিনীর জনৈক লেখক বলেন—নন্দের মুরা নাম্নী এক মহিষী ছিলেন। একটি সুদর্শন নাপিতের প্রেমে তিনি মুগ্ধ হন এবং চন্দ্রগুপ্ত সেই নরসুন্দরের ঔরসজাত পুত্র। আলেকজাণ্ডারের অভিযান প্রসঙ্গে জষ্টিন্ বলেন, "চন্দ্রগুপ্ত অতি নীচবংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি একদা আলেকজাণ্ডারের শিবিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাক্যে আলেকজাণ্ডার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত কোনরূপে পলাইয়া এই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান।"

(চাণক্যের অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত, কিন্তু তাঁহার পিতার নাম ছিল চণক, এজন্য তিনি চাণক্য নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ তাহার রাষ্ট্রনীতি অতি কুটিল ছিল, এজন্য তিনি কৌটিল্য নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। মহাবংশের বর্ণনা-অনুসারে তিনি খর্ব্বাকৃতি ও কদাকার ছিলেন। তৎপ্রণীত কৌটিল্য শাস্ত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তক তদানীন্তন কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের একখানি দর্পন-স্বরূপ। চাণক্যের এই অসাধারণ কীর্ত্তিস্তম্ভ তৎকালীন ভারতের উপর যে উজ্জ্বল আলো প্রক্ষেপ করিতেছে, তাহা একরূপ অমূল্য। ভারতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে উহা অন্ধের পক্ষে চক্ষুর মত। এই কৌটিল্য শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বিলাতে ও এতদ্দেশে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাময় পুস্তক বৎসর বৎসর লিখিত হইতেছে। শ্যামশাস্ত্রী মহাশয় এই মহাগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।)

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিশাখদত্ত লিখিত মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে চাণক্যের চরিত্র পরিস্ফুট করিয়া দেখান হইয়াছে। যদিও চাণক্যের বহু শতাব্দী পরে এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে, তথাপি ইহা পড়িলে স্পষ্টই মনে হইবে যে গ্রন্থখানি দূরাগত দেশীয় সংস্কারের একখানি বিশ্বস্ত অনুলিপি। চাণক্য একসময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে নানা কাহিনী, প্রবাদ,

মুদ্রারাক্ষসের চাণক্য।

গল্প ও উপগল্প আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল, তাহার অনেক কথাই হয়ত কাল্পনিক, কিন্তু চাণক্যের চরিত্র-সম্বন্ধে লোকের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল, মুদ্রারাক্ষস তাহার একটি অনুকূল ছবি; বহুদিন পরেও সেই চরিত্রের মুখ্যভাব ও বৈশিষ্ট্যটুকু লোকস্মৃতিতে হারাইয়া যায় নাই। এই হিসাবে মুদ্রারাক্ষসের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সেক্সপীয়র ও স্কট যেরূপ কল্পনার মধ্য দিয়া ঐতিহাসিক সত্যের কিরণরেখা আনিয়াছেন, বিশাখদত্তও মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যের ছবির উপর তেমনই আলোপাত করিয়াছেন। কি অদ্ভুত সে ছবি! কত অপূর্ব্ব উপায়ে চাণক্য রাক্ষসের ন্যায় প্রবীণ ক্ষুরধার ধী-সম্পন্ন মন্ত্রীর সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল করিয়া দিতেছেন! চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে রাক্ষস-মন্ত্রী যতগুলি শাণিত ছুরিকা প্রক্ষেপ করিয়াছেন, চাণক্যের অসাধারণ রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞান সেই অস্ত্রগুলির গতিপথে মুখ ফিরাইয়া দিয়া তদ্দ্বারা রাক্ষসকেই ঘা দিয়াছেন। যতগুলি অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও বন্ধুদের দ্বারা রাক্ষস পরিবেষ্টিত ছিলেন, ও যাঁহাদিগকে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তিনি গুপ্তচরস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার মর্ম্মের দ্বার তাঁহাদের নিকট অকপটে উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন, শেষকালে দেখা গেল—তাঁহারা রাক্ষসের কেহ নহেন, চাণক্যেরই গুপ্তচর। শেষ মুহূর্ত্তে তিনি চাণক্যের ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে এমনইভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, হতাশাপূর্ণ বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "অহো! শত্রু আমার হৃদয়েব অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।" যাঁহার বুদ্ধির বলে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের সমুত্থান হইয়াছিল, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী। তাঁহার মত গুণীর গুণ বুঝিতে সমর্থ দ্বিতীয় লোক ছিল না—অথচ গুণী হউন, নির্গুণ হউন, তাঁহার আশ্রিত নৃপতির উন্নতির পক্ষে যে ব্যক্তি বাধা দিয়াছে, তাঁহার হস্তে তাহার উদ্ধার বা নিষ্কৃতি ছিল না। কি ঘোর অভিসন্ধি বিফল করিয়া তিনি অভয়দত্তকে হত্যা করিলেন! চন্দ্রগুপ্তের একটি কেশেরও হানি হইল না। পুষ্পপুরের উৎসব উপলক্ষে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিথ্যা দ্বন্দ্বের অভিনয় করিলেন!) এই নাটকে চাণক্যের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, কোন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রগুরুর এরূপ জীবন্ত চিত্র জগতের সাহিত্যে আর একখানিও নাই। উইলসন্ সাহেব মুদ্রারাক্ষসের ইংরেজী অনুবাদের উপসংহারে বলিয়াছেন, "The plot of the drama singularly conforms to one of the unities, and the occurrences are all subservient to one action—the concilation of Raksha. This is never lost sight of from first to last, without being made unduly prominent. It may be difficult in the whole range of dramatic literature to find a more successful illustration of the rule. * * * The succession of incidents is active and interesting, although women form no part of the Dramatis Personæ, except in the episodical introduction of Chandan Das's wife, a peculiarity that would be scarcely possible in the dramatic literature of Europe (p. 254).—ইহার মর্ম্মার্থ এই যে "মুদ্রারাক্ষসে নাটকের মূল ঘটনার প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য আছে, অথচ সেই লক্ষ্যের উপর নাটককার কখনই অসঙ্গতভাবে জোর দেন নাই,

ঘটনার মূল কেন্দ্র রাক্ষস মন্ত্রীকে চন্দ্রগুপ্তের দিকে টানিয়া আনা। গ্রন্থকার সেই লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত হন নাই, এই লক্ষ্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নাটকের সমস্ত ঘটনার এতাদৃশ কেন্দ্রগ-গতি, জগতের নাটকীয় সাহিত্যে বিরল। নাটকে একবারমাত্র কার্য্যোপলক্ষে চন্দনদাসের স্ত্রী উঁকি মারিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর কোন স্ত্রী-চরিত্র নাই। অথচ পরপর ঘটনার সন্নিবেশ হেতু নাটকখানি সর্ব্বদা সক্রিয় ও কৌতূহল-উদ্দীপক। এই বৈশিষ্ট্য ইউরোপের কোন নাটকে সম্ভবপর নহে।" (২৫৪ পৃঃ)

বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে চাণক্যের সম্বন্ধ।

বঙ্গদেশের সঙ্গে চাণক্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কিছুদিন পূর্ব্বেও চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ করিয়া পাঠশালার ছেলেরা লেখাপড়া শুরু করিত। পণ্ডিতদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে এরূপ সাধারণ গৃহস্থ, এমন কি একটু উচ্চ শ্রেণীর চাষা নাই যে চাণক্যের দুই একটি শ্লোক আবৃত্তি না করিতে পারে। গিরিব্রজ ও পাটনার সভ্যতার খুব বড় ঢেউ আমাদের দেশে আসিয়াছিল—পাটলিপুত্রের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৈভবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী বাঙ্গালীরা। চাণক্য শুধু চন্দ্রগুপ্তের নহেন, তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজসভায়ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। যে সকল শ্লোক বাঙ্গলাদেশে চাণক্যের রচিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়।

জরাসন্ধ যেখানে একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন এবং সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত, এমন কি দাক্ষিণাত্যের কতকাংশ বিজয় করিয়াছিলেন—সেইখানে উত্তরকালে মহানন্দ-পদ্ম এরূপ এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার বৈভব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া তৎকালে পাশ্চাত্ত্য জগতের সর্ব্বপ্রধান জাতি গ্রীকেরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নন্দকে পুরাণকারেরা ভার্গবের সঙ্গে উপমা দিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (২৯৮ খৃঃ পূ. পর্য্যন্ত); আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সেনাপতিদ্বয় এ্যান্টিগোনাস ও সেলিউকস তাঁহার এসিয়া মহাদেশস্থ সাম্রাজ্যের অধিকার লাভের জন্য পরস্পর শত্রুতাসাধনে নিযুক্ত হন। সেলিউকস এ্যান্টিগোনাসকে পরাভূত করিয়া ৩১২ খৃঃ অব্দে ব্যাবিলন অধিকার করেন এবং অল্পকালের মধ্যে অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। এসিয়ার পশ্চিম ও মধ্যাংশ তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছিল এবং ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সেলিউকস নিকেটর অতঃপর ভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্যে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়াই চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেলিউকস মৌর্য্যসম্রাটের হস্তে ভারতের বহির্ভূত পারোপনিসদই (কাবুল), এরিয়া (হেরাট) ও এ্যারাকোসিয়া (কান্দাহার) প্রভৃতি রাজ্য অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। এরূপ উক্ত আছে, সেলিউকস নাকি তাঁহার এক কন্যা চন্দ্রগুপ্তকে উপঢৌকনস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। গ্রীক সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস নামক

এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়াছেন এবং সমসাময়িক ভারত-সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৯,০০০, হস্তী, ৬০,০০০ পদাতিক ও বহু যুদ্ধবল ছিল। গ্রীকদূত পাটলীপুত্র নগর-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এই নগর দৈর্ঘ্যে ৯ মাইল এবং ইহা দুই মাইল প্রশস্ত। সমস্ত নগরটি প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই প্রাকারে ৫৭২টি গম্বুজ আছে এবং ইহার তোরণের সংখ্যা ৬৪টি।" ভিন্সেট স্মিথের মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের সীমা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

আফগানিস্থানের শেষসীমা হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত পর্বতের যুক্ত-প্রদেশ (আগ্রা, অযোধ্যা, বিহার, কাথিওয়ার, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ)। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন, আফগানিস্থান এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি মহীশূরের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ করিয়া বলেন—যে হয়ত মহীশূর পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। নর্ম্মদার উত্তরবর্ত্তী সমস্ত ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান যে তাহার অধীনস্থ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্ত ৩২২ খৃঃ পূঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ২৯৮ খৃঃ পূঃ স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের জীবনী ৩২২ খৃঃ পূঃ-২৯৮ খৃঃ পূঃ।

চন্দ্রগুপ্ত উত্তরকালে জৈনধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার জৈন-গুরু ছিলেন, ভদ্রবাহু। ভদ্রবাহুর বাড়ী ছিল বঙ্গদেশের অন্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে। একসময়ে দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, উত্তর-ভারতে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইবে। এই গণনার অচিরকাল-মধ্যেই উক্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয়। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার প্রজাদের বাসের জন্য উর্ব্বর স্থান খুঁজিয়া বহু জৈন শ্রমণসহ মহীশূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তাঁহার গুরু ভদ্রবাহু এইসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হন। তাঁহার প্রজাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি মহীশূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় জীবদুঃখে বেশী মর্ম্মাহত হইতে লাগিল, এবং ২৯৮ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি নর্ম্মদার উপকূলে প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসরের নীচে ছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সেলিউকসের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল এবং তিনি গ্রীকদের স্থাপিত ব্যাক্‌ট্রিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ, সেলিউকস্ তাঁহার কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। মুদ্রারাক্ষসে প্রায়ই যবন সৈন্যদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের সংশ্রবের কথা উল্লিখিত আছে। ভারতের এই যুগে গ্রীক ও হিন্দু—জগতের দুই শ্রেষ্ঠ সভ্যজাতির বিশেষরূপ মিলন হইয়াছিল। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বদা শত্রুবেষ্টিত হইয়া একটি দিনের বেশী রাজ-প্রাসাদের কোন এক প্রকোষ্ঠে রজনী যাপন করেন নাই।

প্রায়োপবেশনে মৃত্যু।

ভারতীয় রাজগণের এই ভাবের অপূর্ব্ব জীবনের দৃষ্টান্ত অন্যত্র কোথায় পাইব? আজ যিনি বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্, কাল তিনি স্বেচ্ছায় ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী। চন্দ্রগুপ্ত জীবের

দুঃখে প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার জগৎবিশ্রুত বংশধর অশোক শুধু তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার অসামান্য-লোকহিতৈষণা, প্রজাবাৎসল্য ও অহিংসাবৃত্তির বীজ তাঁহার শোণিতেই ছিল। সেই গুণগ্রামের জীবন্ত নিদর্শন, প্রস্তর-স্তম্ভে ও শিলা-গাত্রে এখনও অমর হইয়া রহিয়াছে।)

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিন্দুসার ও অশোক

"অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার অবধি জলধি-শেষ,
তুই কিনা মাগো তাদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।"
—দ্বিজেন্দ্রলাল।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের উপাধি ছিল "অমিত্রঘাত।" তিনি দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশ বিজয় করিয়াছিলেন। লামা তারানাথ বলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপক ছিল। ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রীক্‌রাজ এ্যাণ্টিওকাসের সোটারের সঙ্গে বিন্দুসারের আত্মীয়তাসূচক পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল, গ্রীকদূত ডেমিওকাস্ তাঁহার সভায় আসিয়াছিলেন। ইজিপ্টরাজ টোলেমির দূত এই সময়ে পাটলীপুত্র রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিন্দুসার ২৯৮ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজা হইয়া ২৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিন্দুসার ২৯৮-২৭৩ খৃঃ পূঃ।

মৌর্য্যবংশতিলক দেবতাদিগের প্রিয় মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকবর্দ্ধন ২৭৩ হইতে ২৩২ পর্য্যন্ত ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কীর্ত্তিকথা বাল্মীকি তাঁহার অমর কাব্যে লিখিয়াছেন, পাণ্ডবদের গাথা ব্যাস মহাভারতে কীর্ত্তন করিয়াছেন, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে সাক্ষাৎ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের জীবন-আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু বিবিধ অবদানে অশোকবর্দ্ধনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইলেও তাহারা তাঁহাকে অমর করিতে পারে নাই। তিনি নিজের মর্ম্মকথা পাথরে উৎকীর্ণ করিয়া যে দেবত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি নিজেকে নিজে অমর করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী কোন দৈববরে অমর হন নাই, তিনি স্বকীয় কর্ম্ম-প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

অশোক ২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ।

দীপবংশ ও মহাবংশে মগধের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী রাজগণের বংশলতা এই পুস্তকের ১৪৩।৪৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। অশোক সমেত এই বংশের ২০ জন রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। দিব্যাবদানের তালিকার সঙ্গে এই তালিকার গরমিল আছে। দিব্যাবদানের তালিকা এইরূপ—১। বিম্বিসার ২। অজাতশত্রু ৩। উদায়িভদ্র ৪। মুণ্ড ৫। কাকবর্ণী

ভিন্ন ভিন্ন বংশতালিকা।

অশোক।

৬। সহলী ৭। তুলকুচি ৮। মহামণ্ডল ৯। প্রসেনজিৎ ১০। নন্দ ১১। বিন্দুসার ১২। অশোক ১৩। কুনাল ১৪। সম্পদি ১৫। বৃহস্পতি ১৬। বৃষসেন ১৭। পুষ্যধর্ম্ম ১৮। পুষ্যামিত্র।

বিষ্ণুপুরাণের তালিকা এইরূপ—শিশুনাগ বংশ ১। শিশুনাগ ২। কাকবর্ণ ৩। ক্ষেমধর্ম্ম ৪। ক্ষেত্রসেন ৫। বিম্বিসার ৬। অজাতশত্রু ৭। দর্শক (হর্ষক) ৮। নন্দীবর্দ্ধন ৯। মহানন্দী ১০-১৮। তাঁহার ভ্রাতা মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁহার আট পুত্র ১৯। (মৌর্য্য) চন্দ্রগুপ্ত ২০। বিন্দুসার ২১। অশোক ২২। সুযশ ২৩। দশরথ।

জৈন স্থবিরাবলী চরিত্রে ইহা ছাড়া শ্রোণিক, ভূনিক, উদায়ী এই তিন রাজার নাম উল্লিখিত আছে।

এই কয়েকটি বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে যে অনৈক্য দৃষ্ট হয় তাহা নিম্নলিখিত কারণগুলির দরুন হইতে পারে। এক রাজা কখনও ভিন্ন ভিন্ন নামে

অভিহিত হইতেন, কেহ বা তাঁহার প্রচলিত নাম আর কেহ বা তাঁহার উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন (যেরূপ—সেলিম ও জাহাঙ্গীর)। দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বা রাজার ভ্রাতার নাম ও বংশাবলী দিয়াছেন। রাজকুমারেরা প্রায় সকলেই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন এবং রাজবংশের মর্য্যাদাবশতঃ রাজা বলিয়াই গণ্য হইতেন। তৃতীয়তঃ, পুরাণকারদের হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে নাম সম্বন্ধে ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অপরাপর কথা পাঠক না বুঝিতে পারিলেও অনুমান করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি ও স্থানের নাম সম্বন্ধে লেখা না পড়িতে পারিলে পাঠকগণের ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং পুঁথিলেখকদের এই সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ, যাঁহারা যে রাজবংশের সঙ্গে বিশিষ্টরূপে ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ তাঁহারা সেই বংশের তালিকা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ এবং দিব্যাবদানের বংশাবলী অনেকটা একরূপ,—কিন্তু যাঁহারা সেই বংশের সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা অনেক সময় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

অনৈক্যের কারণ।

কিন্তু তথাপি এই সকল বংশাবলী সুদূর অতীত কাল হইতে এতটা যে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যুধিষ্ঠিরের সময়ের সঙ্গে এই বংশাবলী-কথিত সময়ের খুব বেশী ব্যবধান নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের রাজগণের একটা ধারাবাহিক বংশলতা আমরা পাইতেছি। কতকটা ভুল থাকা অনিবার্য্য, জগতে কোন্ জাতিরই বা অতিদূরতর সময়ের এরূপ ইতিহাস আছে? যে সময় হইতে পুরাণ লেখা বন্ধ হইয়া গেল, ভাগ্যক্রমে সেই সময় হইতে আমরা মুদ্রা, তাম্রশাসন ও শিলালেখ প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি। এখনও ভারতীয় ইতিহাস লিখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। বিদেশীয়দের সাহিত্যে আমরা আরও অনেক উপাদান পাইব বলিয়া আশা করি। এদেশেরও উপাদানও যথেষ্টরূপে সংগৃহীত হইতে আরও দীর্ঘকালের প্রচেষ্টার দরকার হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অশোক সম্বন্ধে অপবাদ

অশোক মগধরাজ বিন্দুসারের পুত্র, তিনি সুভদ্রাঙ্গী নাম্নী পরমা সুন্দরী এক ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অশোক দেখিতে কুৎসিত ছিলেন, এজন্য রাজা তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। রাজার প্রিয় পুত্র ছিলেন সুসীম। অশোক তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমন করিয়া পথে সংগৃহীত সৈন্য

ভ্রাতৃহত্যা।

সামন্ত লইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন। বিন্দুসারের ঐ সময় মৃত্যু হইয়াছিল—অশোক রাজধানীর তোরণ বন্ধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে কৌশলক্রমে সুসীমকে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার হত্যাসাধন করেন। রাধাগুপ্ত নামক এক মন্ত্রী অশোককে বিশেষ সহায়তা করেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত আখ্যায়িকাগুলি হইতে এই কথাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। সিংহলের মহাবংশে বিস্তারিতভাবে অশোকের জীবনচরিত প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থানুসারে চন্দ্রগুপ্ত ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপুত্র বিন্দুসার ২৮ বৎসর কাল মগধ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অশোক তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে নানা কৌশলে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুবরাজ "সুমন" ও তাঁহার ৯৯ জন ভ্রাতাকে হত্যা করেন। কেবলমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

সুমনের পত্নী পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন—স্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, নিগ্রোধ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। চণ্ডালেরা তাঁহাকে পালন করে। কিন্তু অল্পবয়সেই রাজকুমার বৌদ্ধশ্রমণগণের কৃপা প্রাপ্ত হন। কথিত আছে গৈরিক-পরিহিত অজ্ঞাতকুলশীল এই বালকই অশোকের চিত্তে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দেয়। অশোক-অবদানে তাঁহার ভ্রাতৃহত্যার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাঁহার অন্যবিধ নৃশংসতার অনেক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে; কথিত আছে—একদা মন্ত্রিসভা তাঁহার কোন মতের প্রতিবাদ করিয়াছিল, এজন্য তিনি স্বহস্তে পাঁচ শত অমাত্যের শিরশ্ছেদ করেন।

পাঁচ শত অমাত্যের শিরশ্ছেদ।

তাঁহার অন্তঃপুরের মহিলারা একদা তদীয় কদাকারের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ব্বক একটা পত্রশূন্য অশোক বৃক্ষ অঙ্গভঙ্গী সহকারে দেখাইয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাহা জানিতে পারিয়া পুরমহিলাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করেন।

পুরমহিলাদিগকে দাহ।

তাঁহার এই ভীষণ কার্য্য দর্শন করিয়া জনৈক মন্ত্রী তাঁহাকে স্বহস্তে এই সকল নৃশংস কার্য্য করিতে নিষেধ পূর্ব্বক একটা জহ্লাদ রাখিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি 'চণ্ডগিরিক' নামক তন্তুবায়কুলে জাত এক জহ্লাদ নিযুক্ত করেন। বাহিরে কারুকার্য্যময় একটা অতি সুদর্শন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তিনি চণ্ডগিরিকের দ্বারা লোকহত্যা করিতেন। সেই গৃহ দর্শনার্থিগণ লুব্ধ হইয়া তথায় প্রবেশ করিলে তখনই চণ্ডগিরিকের হস্তে তাহাদের নিধন সম্পাদিত হইত। এই বধ্যগৃহের নাম ছিল 'নরক'।

নরক।

এইরূপ শত কলঙ্ক অশোক চরিত্রে আরোপ করা হইয়াছে। ভারতীয় আখ্যানগুলিতেই এইরূপ কাহিনীর প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনি এই অতি নৃশংস চণ্ডনীতি অনুসরণ করার জন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল "চণ্ডাশোক।" চণ্ডাশোক শেষ সময়ে "ধর্ম্মাশোক" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

চণ্ডাশোক—ধর্ম্মাশোক।

উপরি উক্ত যে সকল কলঙ্কের কথা তাঁহার নামে আছে, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকিতে পারে। এতগুলি বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত আখ্যান একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা পরে দেখাইব, তাঁহার প্রতি ব্রাহ্মণগণের ক্রোধের কারণ ছিল, তাঁহারা কতকগুলির সৃষ্টি করিয়া

থাকিবেন। বৌদ্ধগণও তাঁহাদের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্ত কতকগুলি আখ্যান রচনা করিতে পারেন। তাঁহাদের ধর্ম্মবলে কত বড় পাষণ্ড যে কত বড় সাধুতে পরিণত হইতে পারে, তাহাই হয়ত প্রদর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও তাঁহার প্রিয় মন্ত্রীদিগকে প্রথমতঃ হত্যা করিয়াছিলেন, সেই কাহিনীগুলি মঞ্জরিত ও পল্লবিত হইয়া এইরূপ আখ্যায়িকার আকার ধারণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু যেরূপ রাশি রাশি দুষ্কর্ম্ম তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, তাহার সিকিভাগও যদি সত্য হইত, তবে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী কি তজ্জন্ম অনুতপ্ত হইতেন না? কলিঙ্গক্ষেত্রের সাময়িক অভিযানে রাজন্ম-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধে কতকগুলি লোক হত্যা করিয়াছিলেন—তজ্জন্ম তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী অনুতাপ পাথর গাত্রের উপরে অক্ষয় অক্ষরে ব্যক্ত রহিয়াছে, আর নিজের আত্মীয় সুহৃৎদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া কি তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুতপ্ত হইলেন না? এদিকে এইরূপ পরস্পরবিরোধী যুক্তি তর্ক সত্বেও আমরা একথা বলিতে পারি না যে তিনি নিষ্কলঙ্ক। যুধিষ্ঠিরও মিথ্যাচার করিয়াছিলেন, ধর্ম্মাশোকও প্রথম-জীবনে হয়ত রাজ্যলোলুপ হইয়া কতকগুলি হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মগধের রাজা অজাতশত্রুর নামেও পিতৃবধের কলঙ্ক আছে। ধর্ম্ম যে মানুষজীবনে কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, তাহার উদাহরণ এদেশের ইতিহাসে অনেক আছে। দস্যু রত্নাকর প্রথমে চণ্ডাশোকের মতই নরহন্তা ছিলেন। তিনিই না শেষে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির মৃত্যু দেখিয়া করুণাবিগলিতহৃদয়ে অনুষ্টুভ্ছন্দে কাব্যকথার জন্ম দিয়াছিলেন? প্রাচীন উপাখ্যান বাদ দিলেও আমাদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বনবিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর, গৌড়দ্বারাধিপ চান্দরায়, নবদ্বীপের রাজকুমারদ্বয়, জগাই-মাধাই, দস্যু নারেজি, ভীলপন্থ বেশ্যা বারমুখী, দস্যু কেনারাম প্রভৃতি বহুলোকের জীবন এই মহাসত্য প্রমাণ করে। অন্ধকার রজনীর অবসানে যেরূপ তপনের উজ্জ্বল আলো ফুটিয়া উঠিয়া জাগতিক দৃশ্য উজ্জ্বল করে, দৈবকৃপায় প্রাক্তনের শুভ ফলে হঠাৎ কোন কোন ব্যক্তির জীবনে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়—যখন কলঙ্কিত জীবন নিষ্কলঙ্ক হইয়া অমল-ধবল রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের চক্ষে স্বর্গীয় সুষমা প্রকাশ করে।

অশোকের বহু ধর্ম্মগুরু ছিলেন। তন্মধ্যে উপগুপ্তের নামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি চম্পা (অঙ্গের রাজধানী) নগরের প্রধান বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু দূরদূরান্তরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তৎসম্বন্ধে বহু প্রবাদ ও উপাখ্যান মথুরা, কাশ্মীর, এমন কি মঙ্গলিয়ায়ও প্রচলিত আছে। বৌদ্ধগ্রন্থে নানাবিধ আখ্যায়িকা দ্বারা তাঁহার জীবনের ত্যাগ ও ধর্ম্মবিশ্বাস দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে একটিকে কতকটা রূপান্তরিত করিয়া রবিবাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'সন্ন্যাসী উপগুপ্ত' কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে অশোকের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধদেবের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, অশোকের মত দাতা কেহ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দান অর্থ নহে—তিনি স্বীয় প্রিয়তম সুদর্শন তরুণ পুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে কনিষ্ঠ

উপগুপ্ত।

ভ্রাতা) ও অষ্টাদশবর্ষীয়া রূপসী কন্যা (মতান্তরে কনিষ্ঠা ভগিনী) সঙ্ঘমিত্রাকে বৌদ্ধসঙ্ঘে ভিক্ষুসম্প্রদায়কে দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহলে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্ঘমিত্রা আদত নাম নহে, সঙ্ঘে প্রবেশ করার পর তিনি এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অশোক-নীতি

এখন আমরা অশোকের অনুশাসনগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কথিত আছে, অশোক ৮৫০০০ অনুশাসন বা ধর্ম্মরাজিকা স্থাপন করেন।

উপনিষদের পরের যুগে ভারতবর্ষে যে নানা প্রকার মত প্রচলিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম যে সকল মতের সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহা বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ পশুহননের বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ জনসমাজের মধ্যে যে ঘোর আন্দোলন করিয়া বৈদিকধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিল—তাহার প্রমাণ রামায়ণে পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। অযোধ্যাকাণ্ডে শততম স্বর্গে ৩৮-৩৯ শ্লোকে বেদবিরোধী শুষ্ক তর্কাশ্রিত অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে দৃষ্ট হয় নানারূপ ক্ষপণক ও উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দল তখন খুবই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। মহাভারতখানি ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে সঙ্কলয়িতা যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে তিনি গ্রহগণের গতির কথা উল্লেখ করিয়া কালনির্ণয়ের এরূপ একটা দৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন যে মহাভারতের আধুনিক টীকাকার সেই সূত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, ভীষ্ম, দুর্য্যোধন প্রভৃতির কাহার কি বয়স ছিল—তাহার একটা ঠিকুজি করিয়া ফেলিয়াছেন। যে সকল প্রমাণ বলে মহাভারতের ভারতকৌমুদী নামক টীকা-প্রণেতা মহা-মহো° শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না। জ্যোতিষিক গণনা বলে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠিরের ৭২, ভীমের ৭১, অর্জ্জুনের ৭০ এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস বয়স ছিল। *

মহাভারত-প্রসঙ্গ, প্রামাণিকতা।

* বোম্বাই নির্ণয়সাগরযন্ত্রে মুদ্রিত মহাভারতের ১৩৪ অধ্যায়ে যে কয়েকটি শ্লোক দৃষ্ট হয়, তদনুসারে যুধিষ্ঠির ২৬ বৎসর, ভীম ১৫ বৎসর, অর্জ্জুন ১৪ বৎসর এবং নকুল ও সহদেব ১৩ বৎসর বয়সে হস্তিনাপুরে আসেন, সেখানে দুর্য্যোধনাদির সহিত ১৩ বৎসর থাকেন। জতুগৃহে যাইয়া ৬ মাস থাকার পর একচক্রা

মহাভারতের প্রতিপর্ব্বশেষে কতটি অধ্যায় এবং শ্লোকে তাহা শেষ হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

১। আদিপর্ব্ব, ২২৭ অধ্যায় এবং ৮৮৮৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ।

২।	সভাপর্ব্ব—	৭৮	টি অধ্যায়	এবং	২৫১১	টি	শ্লোক
৩।	বনপর্ব্ব—	২৬৯	,,	,,	১১৬৬৪	,,	,,
৪।	বিরাটপর্ব্ব—	৬৭	,,	,,	[illegible]	,,	,,
৫।	উদ্যোগপর্ব্ব—	১৮৭	,,	,,	[illegible]৯৮	,,	,,
৬।	ভীষ্মপর্ব্ব—	১১৭	,,	,,	৫৮৮৪	,,	,,
৭।	দ্রোণপর্ব্ব—	১৭০	,,	,,	৮৯০৯	,,	,,
৮।	কর্ণপর্ব্ব—	৬৯	,,	,,	৪৯৬৪	,,	,,
৯।	শৈল্যপর্ব্ব—	৫৯	,,	,,	৩২২০	,,	,,
১০।	সৌপ্তিকপর্ব্ব—	১৮	,,	,,	৮৭০	,,	,,
১১।	স্ত্রীপর্ব্ব—	১৭	,,	,,	৭৭৫	,,	,,
১২।	শান্তিপর্ব্ব—	৩৩৯	,,	,,	১৪৭০৭	,,	,,
১৩।	অনুশাসনপর্ব্ব—	১৪৬	,,	,,	৮০০০	,,	,,
১৪।	অশ্বমেধপর্ব্ব—	১৩০	,,	,,	৩৩২০	,,	,,
১৫।	আশ্রমিকপর্ব্ব—	৪২	,,	,,	১১১১	,,	,,
১৬।	মৌসলপর্ব্ব—	৮	,,	,,	৩২০	,,	,,
১৭।	মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব—	৩	,,	,,	১২৩	,,	,,
১৮।	স্বর্গারোহণপর্ব্ব—	৫	,,	,,	৩২৩		

শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ পুস্তকে সমস্ত বিষয় এত পরিষ্কারভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, সঙ্কলয়িতা পাঠকচিত্ত হইতে যথাসম্ভব দ্বিধার ভাব দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল এবং দুর্য্যোধনের সৈন্য সংখ্যা ছিল একাদশ অক্ষৌহিণী। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—একটি হাতী, একখানি রথ, পাঁচটি পদাতিক এবং তিনটি ঘোড়া—ইহাতে একটি পংক্তি হয়। তিন পংক্তিতে এক সেনামুখ, এবং তিন সেনামুখে এক গুল্ম হয়। তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী এবং তিন বাহিনীতে এক পৃতনা হয়, তিন পৃতনায় এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অক্ষৌহিণীতে রথের সংখ্যা করিয়াছেন ২১৮৭০, হস্তীর সংখ্যাও তাহাই। "হে পণ্ডিতগণ এক অক্ষৌহিণীতে পদাতিক সংখ্যা এক লক্ষ

গ্রামে এক বৎসর বাস করেন, হস্তিনাপুরে ফিরিয়া দুর্য্যোধনাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া পাঁচ বৎসর বাস করেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর পাশা খেলায় হারিয়া ১৩ বৎসর নির্ব্বাসিত হইয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া যুধিষ্ঠির ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।)

নয় হাজার তিন শত পঞ্চাশ জানিবেন” (আদিপর্ব্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯-২৭ শ্লোক)। এই হিসাব অনুসারে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫৩০৯০০, কৌরব পক্ষে ২৪০৫৭০০। প্রধান অস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম দশ দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন, কর্ণ দুই দিন, শল্য অর্দ্ধ দিবস, ইহার পরে গদাযুদ্ধ হয় (আদি, ২য় অধ্যায়, ৩০-৩১ শ্লোক)। হফকিন্‌স্ সাহেব দেখাইয়াছেন, মহাভারতের মধ্যে অসংখ্য লেখা বেদের অনুবৃত্তি মাত্র। যদিও মহাভারতে বিস্তর স্থানে কল্পনার লীলাখেলা দৃষ্ট হয়, আদি ইতিহাস-পূর্ব্বযুগের চিরাগত কাহিনীগুলি বাদ দেওয়াও মহাভারতকারের পক্ষে সমীচীন হইত না। বহুযুগাগত সংস্কারের অন্তর্বিধ—এমন কি একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। কিন্তু যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যের এতটা পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনকালে কোন্ ঋষির মুখে সেই তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন, কাল ও সৈন্যসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যিনি অতি সূক্ষ্মভাবে গণনা ও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে ভুলেন নাই, তিনি যে গ্রন্থোক্ত প্রধান নায়ক-নায়িকাদের সম্বন্ধে অবাধ কল্পনা চালাইবেন, তাহাত মনে হয় না। কুরুক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার কথা আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত কোটী কোটী লোকের মধ্য হইতে একেবারে উড়িয়া যাইবে এবং মহাভারতোক্ত কতকগুলি কল্পনামাত্র এত বড় দেশের আপামর সাধারণ সশ্রদ্ধ হইয়া শুনিবে, এ কথা ত বিশ্বাস করা যায় না। ওয়েবার ও ভিন্সেন্ট স্মিথের পাণ্ডুগণের ব্যাখ্যার কোন প্রমাণ কি এ দেশে আছে? বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী দলের ত অসংখ্য শাস্ত্র আছে, কোন শাস্ত্রে কি ভীমার্জ্জুন ও বুদ্ধদেব কখনও ভুটিয়া বা মোঙ্গলিয়ান বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন? সাতসমুদ্রের ওপার হইতে পণ্ডিতেরা ব্যাসদেবের টিকি এমন কড়াভাবে ধরিলে আমরা সহ্য করিতে পারিব না। যদি প্রাচীনতম শাস্ত্রের কোন কোনটিতে পাণ্ডবদের নাম না থাকে তবে সেই অনুল্লেখই কি পাণ্ডবদের যুদ্ধের বিষয়ে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ?

মহাভারতাদির নীতি এবং অশোক-নীতি।

(মহাভারতে বৈদিক কাল হইতে আগত সমস্ত ধর্ম্মমতের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে।) অশোকের অনুশাসন আলোচনা করিতে হইলে কোন্ কোন্ কথায় তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রাজাদের আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই বিচার্য্য। আমরা এক যুগকে 'আঁধার যুগ' বলিয়া এবং অপরকে 'আলোকের যুগ' নাম না দিয়া আদি অন্ধ্যায়টা চোখ বুজিয়া পথে চলিব না। ভারতের চিন্তাশীলতার যে ধারাবাহিকত্ব আছে তাহা আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, এই ধারাবাহিকত্ব একটা সত্যকার বড় কথা, এ প্রচেষ্টা আমরা ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা জোড়া দেওয়ার মত মনে করি না।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শততম অধ্যায়ে ভরতকে রাজনীতি-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষে রামচন্দ্র তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন আবার মহাভারতের সভাপর্ব্বে নারদ যুধিষ্ঠিরকে করিয়াছিলেন। এই দুই প্রসঙ্গ প্রায় এক, এমন কি কোন কোন

স্থানে রামকথিত রাজনীতি নারদের উপদেশের সঙ্গে প্রায় ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া রাজনীতি সম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। শুক্রনীতিসার, কামন্দকীয় নীতিসার, গৌতমসংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা, হারীতসংহিতা, অত্রিসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি বহু গ্রন্থে রাজনীতির আলোচনা দৃষ্ট হয়—মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা তাহাদের মধ্যে বেশী প্রচারিত। এই সকল সংহিতাগ্রন্থ ছাড়া কাশীখণ্ড, দেবীভাগবত, অগ্নিপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি পুস্তকে নীতিশাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। কয়েকবৎসর হইল কৌটিল্যসূত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে এই গ্রন্থ রাজনীতি-সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে।

রাজনীতি ধর্ম্মনীতি নহে।

এইসকল রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রায় একপ্রকার। রাজনীতি সর্ব্বদেশেই ধর্ম্মনীতির পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার দাবী করিতে পারে না। (রাজার শাসন-প্রণালীর মূলেই রহিয়াছে সাম দান, ভেদ, দণ্ড। শত্রুদের ছিদ্রান্বেষণ, স্বীয় প্রবল প্রজাদের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু প্রতাপ লক্ষ্য করিলে রাজার ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা অবলম্বন, গুপ্তচরগণের দ্বারা সংবাদ-সংগ্রহ—এসমস্তই রাজনীতির অঙ্গীয়। (রামায়ণে লিখিত আছে, শুধু যুবরাজ, প্রধান মন্ত্রী ও রাজপুরোহিত ব্যতীত অপর সকল রাজকর্ম্মচারীর প্রত্যেকের পাছে তিন তিনটি করিয়া গুপ্তচর থাকিবে। তাহারা সর্ব্বদা তাহাদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিবে। এই গুপ্তচরেরা প্রধান সেনাপতি, অন্তঃপুরাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী, বেতনাধ্যক্ষ, বেতনপ্রদানকারী, প্রধান বিচারপতি, নগরাধ্যক্ষ, রাজ্যসীমা-পালক, দুর্গাধ্যক্ষ, ব্যবহারদর্শী প্রভৃতি সকলেরই পাছে পাছে থাকিয়া অজ্ঞাতসারে সংবাদ সংগ্রহ করিবে। প্রজাদের গতি-বিধি ও কথাবার্ত্তার সংবাদ দেওয়ার জন্যও গুপ্তচরেরা গণিকাদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত আনাগোনা করিত—ইহাও কোন কোন নীতিসংহিতায় দৃষ্ট হয়। কৌটিল্য এই শাস্ত্রের অন্যতম গুরু, ইনি গুপ্তচরদের যে কার্য্যতালিকা দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় রাজ্যের কেহই এই শ্রেণীর লোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কৌটিল্যের শাস্ত্রে যে উচ্চাঙ্গের সভ্যতা ও রাষ্ট্রনীতির অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায় জগতে ঐ শ্রেণীর সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। তথাপি তিনি যখন লিখিয়াছেন "যিনিই ক্ষমতাপন্ন, যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য।" "যিনি উত্তরোত্তর স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বকার সন্ধির নিয়ম পালন করা চলে না।" "যে রাজা শান্তির নিয়ম পালন করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহার প্রতিপক্ষকেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ উভয়পক্ষ যদি তুল্যরূপ ক্ষমতাশালী হন, তবেই প্রকৃত শান্তি হইতে পারে। দুইটি লৌহদণ্ড তুল্যরূপ উত্তপ্ত না হইলে তাহাদের প্রকৃত মিলন ঘটিতে পারে না।" ইহাই রাজনীতি। রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে ব্যাবহারিক জীবনে এই নীতি পালনীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল চাণক্যনীতি পাঠ করিয়া অশোকের অনুশাসন পড়িলে মনে হইবে যেন আবদ্ধ গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুক্তাকাশের নীচে দাঁড়াইয়াছি। রাজ্যপালন ও রক্ষার জন্য কঠোরতা অপরিহার্য্য, তাহা হিন্দু রাষ্ট্রনীতিতে আছে।

রামায়ণী নীতি ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিন্দুদের রাজনীতির আদর্শের মত উচ্চনীতি জগতের আর কোন জাতির ছিল না। এই সকল নীতি ক্ষত্রিয়গণ যথাসাধ্য পালন করিয়া চলিতেন।

"যে ব্যক্তি 'তোমারই আমি' এই কথা বলে, প্রাণভয়ে কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশে পলায়মান, সুপ্ত, মদমত্ত, মূর্চ্ছান্বিত, নিরস্ত্র, বর্ম্মহীন, রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থলারূঢ়—এরূপ লোক অবধ্য" (মনু ৭ম অধ্যায়)। ঈদৃশ ব্যক্তিকে যে হত্যা করে সে ভ্রূণ হত্যাকারী বলিয়া কথিত হয়। মহাভারতে লিখিত আছে "দুর্ব্বল লোক ভয়বশতঃ উপস্থিত হইলে, শত্রু আসিয়া শরণাগত হইলে কিংবা কোন লোক যুদ্ধে বিজিত হইলে তাঁহাদিগকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করিতে হইবে। (সভা ৫ম অঃ, ৫৬ শ্লোক)। ইলিয়ড কাব্যে লিখিত আছে শত্রুপক্ষের কোন বিজিত রাজকুমার ইউলিসিসের পাদমূলে নিপতিত হইয়া প্রাণের জন্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাজ্ঞানী ইউলিসিস তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। উক্ত কার্য্যসম্বন্ধে সে দেশের সুধী-সমাজ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জ্ঞানী শিরোমণি ইউলিসিস সে পর্য্যন্ত যতগুলি কার্য্য করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার এই কার্য্যটিই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হিন্দু রাষ্ট্রনীতি।

গ্রীক নীতি।

যখন বিদেশীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখনই হিন্দুদিগের বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। যেহেতু যে ক্ষাত্রনীতি ভারতীয় রাজাদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ছিল, সেই নীতির দয়া-দাক্ষিণ্য শত্রুরা দেখান নাই। ভারতবর্ষের পরাজয়ের ইহাও অন্যতম কারণ। তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যশাসন এ সমস্তের মধ্যেই একটা মনুষ্যত্ব ছিল। একটা উদাহরণের উল্লেখ করিব। তাইমুরলেন ভারতের পশ্চিমাংশের কোন কোন স্থান স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার পৌত্র মির্‌চা সেই সকল দেশের অধিকার রাখিতে পারেন নাই। কঙ্কর নামে এক হিন্দু রাজা স্বাধীন হইলেন এবং মির্‌চা তাঁহাকে সাতবার আক্রমণ করিয়াও পরাজয় করিতে পারেন নাই; প্রত্যেক বারই মির্‌চা পরাস্ত হইয়াছিলেন। শেষবার কঙ্করের হাতে পরাজিত হইয়া তিনি বন্দী হন। হিন্দু রাজা শরণাগত শত্রুকে মুক্তিদান করিলেন, কেবল একটি মাত্র সর্ত্ত রহিল, যেন তাতার-রাজ আর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ না করেন এবং রাজস্বের দাবী উত্থাপন না করেন।

মির্‌চা নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় তাঁহার উদারহৃদয় শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এবার ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে ফিরিল, কঙ্কর বন্দী হইলেন। মির্‌চা বন্দীর চক্ষু দুটি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিলেন। ক্ষাত্রনীতি অনুসারে কঙ্কর শরণাগত শত্রুকে পুত্রবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ব্বর শত্রু তাহার হৃদয়হীনতা ও পশুভাব দেখাইতে ছাড়িল না। কিন্তু কঙ্কর এই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ দিলেন। মির্‌চার বিশ্বাস ছিল তাঁহার মত লক্ষ্যভেদ করিতে পারে এরূপ লোক জগতে নাই; একদা তিনি শুনিলেন, অন্ধ হইলেও কঙ্কররাজ কোন স্থানে শব্দ মাত্র শুনিলে তাহা না দেখিয়া শব্দভেদী বাণ দ্বারা লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন। মির্‌চা বন্দীকে সম্মুখে আনিয়া এই গুণের পরীক্ষা

দিতে বলিলেন। কঙ্কর বলিলেন, "আমি আপনার দ্বারা পরাস্ত হইয়াছি—আপনি আমার বিজয়ী, অন্য কাহারও মুখোচ্চারিত বাণী আমি শুনিব না, আপনারই আমাকে আদেশ করিতে হইবে।" মিরচা লক্ষ্যস্থান স্থির করিয়া কঙ্করকে আদেশপূর্ব্বক যাই সরিয়া পড়িবেন, তৎপূর্ব্বেই কঙ্কর-হস্তনিক্ষিপ্ত বাণ তাঁহার বক্ষ ভেদ করিল। এই ভাবে ১৪৫১ খৃঃ অব্দে মিরচা মৃত্যুমুখে পতিত হন (মোগল ইতিহাস, এফ্. এফ্. কারটনপ্রণীত, প্রথম সংস্করণ, লণ্ডন ১৭০৯, বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৯—৩১ পৃঃ)। এই পুস্তকের ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হিন্দুরা আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বেচ্ছায় অপর কাহারও রাজ্য আক্রমণ করিতে যায় না।)

এই ক্ষাত্রনীতি যে কিরূপ দৃঢ়ভাবে রাজগণ পালন করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহারাজ জরাসন্ধের বধ-সাধনার্থে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন ছদ্মবেশে গিরিব্রজপুরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ গুপ্তচরের মুখে জানিয়াছিলেন যে ইঁহারা গুপ্তদ্বার দিয়া তাঁহার চৈত্য ও ভেরী ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যে জরাসন্ধের পরাক্রম এরূপ ছিল যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈন্যের সঙ্গে যদি আমাদের যদুকুল অবিশ্রান্ত তিন শত বৎসর যুদ্ধ করে, তথাপি তাহার কিছু মাত্র ক্ষয় করিতে পারিবে না,—ভারতের তৎকালীন সেই অদ্বিতীয় সম্রাট্ তাঁহার শত্রুদের পরিচয় পাইয়াও ক্ষাত্রনীতি লঙ্ঘন করিলেন না; তিনি এই তিন অতিথি যুদ্ধকামী হইলে তন্মধ্যে ভীমকেই বিশেষ বলবান্ মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যেহেতু মল্লযুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে শারীরিক বলেরই অধিক দরকার। কৃষ্ণকে তিনি মনে মনে 'দাস' বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এজন্য উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইয়া উপবাসী হইয়াছিলেন, সেই উপবাসক্লান্ত দেহেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তথায় তাঁহার আত্মীয় সুহৃৎ ও বৃহৎ চমূ উপস্থিত ছিল, কিন্তু ক্ষাত্রনীতি পালন করিয়া সংযতভাবে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রলয়পয়োধি যেরূপ বেলা অতিক্রম করেন না, ক্ষাত্রধর্ম্মনীতি সেইরূপ সীমা উল্লঙ্ঘন করেন নাই, আমরা এই কথা ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখিয়াছি। এই ক্ষাত্র নীতি পালন করিয়া যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। যেহেতু দ্যূত-কার্য্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অনুমোদন করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না। যাঁহারা যমের মত ভীষণ, ইন্দ্র ও প্রভঞ্জনের মত দুর্দ্ধর্ষ—সেই ভীমার্জ্জুন মেষশাবকের মত যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনবাসী হইলেন, রাজনীতি ও রাজ-পরিবারে পালিত চিরাগত নীতির সংস্কার তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

হিন্দু রাষ্ট্রনীতি উদার হইলেও তাহা দোষযুক্ত।

হিন্দু রাজধানীতে উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মনীতি আছে, কিন্তু তথাপি রাজনীতি কোনকালেই একেবারে শুভ্র চন্দ্রকিরণবৎ হইতে পারে না। যেখানে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিতে হইবে, শত্রুর পরাজয় ইচ্ছা করিতে হইবে ও প্রজাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে হইবে, সেখানে যোগি-ঋষির ধর্ম্ম চলে না।

(চাণক্য-শাস্ত্রে ধূর্ত্ততাকে সম্মুখযুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বাহুবল হইতে ছল-কৌশল ভাল, কারণ যিনি কৌশল ও কূটনীতিতে অভিজ্ঞ, তিনি আপনার হইতে শ্রেষ্ঠ বিক্রমশালী দুর্জ্জয় প্রতিপক্ষকেও অনায়াসে জয় করিতে পারেন।) ((অর্থশাস্ত্র, ৯ম অধ্যায়, ১ পৃঃ)) এখানে চাণক্য তাঁহার নিজ জীবনের একাঙ্কের সফলতার ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র। তিনি বন্দীর মুখ হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য অষ্টাদশ প্রকার অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অনায়াসে লিখিয়া গিয়াছেন— "প্রত্যহ একটি একটি করিয়া নূতন যন্ত্রণা দেওয়া যাইতে পারে এবং দরকার হইলে এক সময়ে এক বন্দীর উপর সর্ব্বপ্রকার পীড়ন প্রয়োগ করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে।" আমাদের সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রই তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুশাসনগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়া থাকে। কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েও বন্দীর স্বীকারোক্তির জন্য তাহার উপর পীড়ন চলিত। অর্থশাস্ত্রের নীতিগুলির কত অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতির পুনরাবৃত্তি, এবং কতগুলি মৌলিক, তাহা বলা যায় না।

বাণভট্টের নিন্দা।

এই অর্থশাস্ত্র যে সকলেরই অনুমোদিত ছিল, তাহা নহে। বিশ্বজয়ী সম্রাটের পক্ষে কতকগুলি অপরিহার্য্য আইন প্রচলিত করিতে হয়, কিন্তু তাহা সকলের মনঃপূত বা অনুমোদিত হইবার কথা নহে। শ্রীহর্ষের বন্ধু বাণভট্ট অর্থশাস্ত্রের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—"কৌটিল্যের নির্ম্মম ও নিদারুণ রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কে অনুমোদন করিবে? তাহাতে রাজাদের এরূপ মন্ত্রী রাখিতে হইবে যাঁহারা প্রতারণা-শাস্ত্র ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। যাহাতে তুচ্ছ অর্থসংগ্রহের জন্য অর্থলক্ষ্মীর পদে প্রাণের অর্ঘ্য ঢালিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উন্নতিকর সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের ধ্বংস নিশ্চিত এবং যাহাতে সহোদরগণ এবং যাহারা স্বাভাবিক স্নেহ-প্রেমে মানুষের সঙ্গে আবদ্ধ, তাহারাই বধ্যভূমির উপযুক্ত বলি-স্বরূপ।"

(কৌটিল্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহু স্মৃতিকারের মতামত আলোচনা করিয়া তাঁহার গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। "পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা প্রাচীন নরপতিগণের রাজ্যশাসনে সহায়তা করিবার জন্য যে বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া পরিশিষ্ট-স্বরূপ এই অর্থশাস্ত্র লিখিত হইল" (১৫শ খণ্ড, ১ম অধ্যায়)।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অশোক-অনুশাসন

কিন্তু অশোকের নীতি এক অভিনব সামগ্রী। সমস্ত জগতে, এমন কি হিন্দুশাস্ত্রেও, তাহার তুলনা নাই। তিনি সমস্ত নীতিশাস্ত্রের উর্দ্ধে উঠিয়া খুব একটা উচ্চ স্থান হইতে জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন। কি ভাবে রাজ্য শাসন করিতে হইবে, রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে রাজ্য পালন করিতে হয়, অশোক তাহাই বলিয়াছেন। জগৎ তাঁহার চক্ষে একটা সাম্রাজ্য ছিল না—উহা ছিল একটি বৃহৎ পরিবার—তিনি উহা রক্ষা করিয়া কিরূপে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে একবারও ভাবেন নাই। কোন বৃহৎ পরিবারের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি কিরূপে সেই পরিবারভুক্ত সকলের মঙ্গল হইবে সর্ব্বদা তাহাই চিন্তা করেন, অশোকও স্বীয়-রাজ্য-সম্বন্ধে সেইরূপই করিতেন। এই পরিবার কেবল মনুষ্য-সম্প্রদায় লইয়া নহে, সমস্ত জীবই যেন সেই পরিবারভুক্ত ছিল। একটিমাত্র শিলালেখে দণ্ডের কথা উল্লিখিত আছে। কৌশাম্বী অনুশাসনে বলা হইয়াছে "ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের দলে যে কেহ সঙ্ঘে ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনি শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য হইবেন, এবং ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের দলে মিশিতে পারিবেন না।" এই দণ্ডের অভিপ্রায় যে ব্যক্তি ভিক্ষুধর্ম্মের অযোগ্য, তাহার গৈরিক বাস পরা বিড়ম্বনামাত্র। ইহাকে 'দণ্ড' বলা ঠিক নহে, সঙ্ঘের মধ্যে ঐক্যরক্ষার জন্য উহা একটি উপায়মাত্র। কিন্তু তাঁহার এত বড় রাজ্যে কি লোক দণ্ড পাইত না? অবশ্যই পাইত; কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে পুনঃ পুনঃ সেই দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস করাইবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা প্রজাপালক দেবমূর্ত্তিতেই দেখিতে পাই—শাসন-কর্ত্তৃরূপে নহে।

"সদয় হৃদয় দর্শিত পশু-ঘাতম্।"

নির্ম্মমভাবে পশুবলির কাজ চলিতেছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞে দেশ পরিপ্লাবিত ছিল। রাজা সমস্ত দেশ হইতে এই প্রথা উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেকালে তাহা অসাধ্যসাধন ছিল; একালেও কি তাহা নহে? তথাপি অপরিহার্য্য কিছু কিছু রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রাখিয়া অশোক পশুহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। জগতের এক ভগবৎকল্প ব্যক্তি এই পশু বধ দেখিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন, সদয় হৃদয়ে জীবহত্যার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই পুরাযুগে একমাত্র অশোকের চক্ষে তেমনই জীবকষ্টে সহানুভূতিজাত এক ফোঁটা করুণার অশ্রু পড়িয়াছিল; তাঁহার প্রায় সমস্ত শিলালিপিতে পশুহত্যা-নিবারণের প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। "পূর্ব্বে রাজ-রন্ধনশালায় রাজার [illegible] জন্য শতসহস্র প্রাণিহত্যা করা হইত—এখন তিনটি

মাত্র পোণী হত্যা করা হয়—পশ্চাৎ আর তিনটি প্রাণীও হত্যা করিতে দেওয়া হইবে না।" (চতুর্দ্দশ গিরিলিপি।) অষ্টম শিলালিপিতে মৃগয়া-নিবারণের ইঙ্গিত আছে। পঞ্চম স্তম্ভ-লিপিতে কয়েকটি রক্ষাকবচের উল্লেখ আছে—কিন্তু সকলগুলিতে দৃষ্ট হইবে, অশোকের জীবনের অন্যতম মহাব্রত ছিল—মৌন পশুজাতির কষ্টমোচন। এদেশে মৎস্যের প্রাচুর্য্য সর্ব্বজনবিদিত, মৎস্যপ্রিয় জনসাধারণকে মৎস্যাহার হইতে সেকালে নিবৃত্ত করা একান্ত অসম্ভব ছিল; তথাপি তিনি ধীরে ধীরে তাহাদিগকে নিবৃত্তির পথে আসিতে কতই না চেষ্টা করিয়াছেন। "আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে, কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও প্রতিপদ এবং বৎসরের উপোসথ দিবসে মৎস্য বধ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।" (পঞ্চম স্তম্ভলিপি।)

বৃষদিগকে যে উত্তপ্ত লৌহ-দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধেও তিনি ধীরে ধীরে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে বলা হইয়াছে—"পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিবসে প্রত্যেক চাতুর্ম্মাসিক পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিবসে এবং চাতুর্ম্মাস্যের শুক্লপক্ষে বৃষকে লৌহশলাকা-দ্বারা কোনরূপ চিহ্নিত করিতে পারিবে না।" চতুর্দ্দশ গিরিলিপিতে অশোক 'সমাজ' সম্বন্ধে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ 'সমাজ' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক লিখিয়াছেন—পশুদিগের মধ্যে নির্ম্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিয়া পুরাকালে কোন বৃহৎ আঙ্গিনায় তাহাদের মারাত্মক ক্রীড়া দেখান হইত, এইরূপ উৎসবই 'সমাজ' শব্দের অভিপ্রেত। স্ত্রীলোকের আচার ও মঙ্গলানুষ্ঠানের যে যে অংশে পশুহত্যার প্রথা ছিল, তিনি তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন। (নবম গিরিলিপি।) তৎকৃত পশুচিকিৎসালয়ের উল্লেখ এই শিলালিপিগুলিতেই আছে।

তিনি পথে পথে যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, এবং কূপ খনন করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য তিনি সপ্তম স্তম্ভলিপিতে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন—পথে পথে বটবৃক্ষ সকল রোপণ করাইয়াছি। উহারা পশু ও মনুষ্যগণকে ছায়া দান করুক। আম্রবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছি এবং অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে কূপ খনন করাইয়াছি এবং সেই সেই স্থানে জলদানের ব্যবস্থা করাইয়াছি। মনুষ্য ও পশুগণের উপকারের জন্য অনেক আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছি।" (সপ্তম স্তম্ভলিপি।)

তিনি শুধু তাঁহার নিজের প্রজাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন নাই,—হৃদয়ের শুদ্ধ বাৎসল্যভাব ও দয়াবৃত্তি সীমাতে সন্তুষ্ট হয় না, কলিঙ্গ অনুশাসনে তিনি বলিয়াছেন "সকল মনুষ্যই আমার পুত্রতুল্য। আমার পুত্রেরা ঐহিক ও পারলৌকিক সকল মঙ্গল ও সুখের অধিকারী হউক, ইহা আমি যেরূপ ইচ্ছা করি তেমনই প্রার্থনা করি সকল মনুষ্যই সেইরূপ হউক।"

মনুষ্য ও পশু-চিকিৎসালয় তিনি শুধু স্বীয় রাজ্যের নানাস্থানে স্থাপন করেন নাই, ম্যাসিডোনিয়া এবং এ্যান্টিগোনেসের রাজ্য পর্য্যন্ত সুদূর পশ্চিম এবং দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত এই ভাবের দাতব্য চিকিৎসালয় তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "যে যে স্থানে

মনুষ্য ও পশুগণের উপকারক ঔষধ এবং ফলমূল নাই, সেই সেই স্থানে ঐ সকল সংগৃহীত ও রোপিত হইয়াছে।" (দ্বিতীয় গিরিলিপি।)

তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকগণকে তিনি তৎকালপরিজ্ঞাত জগতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়াছিলেন, টলেমি, মিশর (২৬১—২৪৬ খৃঃ পূঃ) ম্যাসিডনিয়ারাজ আন্টিগোনাস্ (২৭৭—২৩৯ খৃঃ পূঃ), সাইরিনীর মগাস (২৫৮—খৃঃ পূঃ মৃত্যু), এপিরসের রাজা আলেক্সান্দ্রস্ (২৭২—২৫৮ খৃঃ পূঃ)—ইঁহাদের রাজ্যে তিনি মনুষ্য ও পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম কি তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—প্রধান ধর্ম্ম অহিংসা ও জীবে দয়া, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও দান-দ্বারা সন্তুষ্ট করা, উপকার বৃত্তি ইত্যাদি। তাঁহার ধর্ম্মে আধ্যাত্মিকত্ব কিছুই ছিল না—তাঁহার প্রধান ভিত্তি সুনীতি, তিনি অতিরিক্তমাত্রায় স্বীয় ধর্ম্ম-ধ্বজাধারী ও কোন হেতুতেই পরধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন "অভিষেকের দ্বাদশ বর্ষ হইতেই আমি সর্ব্বলোকের হিত ও সুখের জন্য এইরূপ ধর্ম্মলিপি লিখাইতেছি। তাহারা যাহাতে পূর্ব্বপাপ-আচরণ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। এইরূপে আমি প্রজাগণের হিত ও সুখ দেখিয়া থাকি। আরও জ্ঞাতিদিগকে, প্রত্যাসন্নদিগকে এবং দূরবর্ত্তীদিগকে কি কি উপায়ে সুখী করিতে পারা যায়, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি। এইরূপ সর্ব্বজীবের ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি আমার লক্ষ্য থাকে। সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বীকেই আমি বিবিধ প্রকারে পূজা ও সম্মান করিয়া থাকি, তথাপি আমার মতে স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগই শ্রেয়।" (ষষ্ঠ স্তম্ভলিপি।) "আমার ধর্ম্মমহামাত্রগণ কি গৃহস্থ, কি উদাসীন সকলের জন্য এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা সঙ্ঘের কার্য্যেও নিযুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ ও আজীবকগণের জন্যও আমি এইরূপ করিয়াছি। নির্গ্রন্থদিগের (জৈন সম্প্রদায়) জন্যও এইরূপ করিয়াছি। ইঁহারা তাঁহাদিগের জন্যও ব্যাপৃত আছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্যও এইরূপ করিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যেও ব্যাপৃত আছেন।"

পরধর্ম্মনিন্দা নিষিদ্ধ।

একদিকে পারস্যের উপান্তভাগ, অপরদিকে বঙ্গ, বিহার ও আসাম। একদিকে গান্ধার ও হিমালয়ের উত্তর হইতে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য, এই বিশাল রাজ্যের তিনি একচ্ছত্র অধীশ্বর, তাঁহার এতগুলি অনুশাসনের কোনটিতে এত বড় সাম্রাজ্য কি করিয়া রাখিতে হইবে কিংবা দণ্ডমুণ্ডের বিধিব্যবস্থা কি প্রকারে হইবে এসম্বন্ধে একটি কথাও নাই। তাঁহার শিলালিপি পাঠ করিলে মনে হয় যে সুবিশাল এক পরিবারের পিতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি দিনরাত্র সমস্ত সন্তান পালনের চিন্তায় বিভোর হইয়াছেন—স্নেহ, প্রীতি ও দয়ামায়া কি ভাবে তাহাদের জীবনের উন্নতি করিবেন, তিনি এই চিন্তায় ব্যস্ত। মনে হয় যেন তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য একটি বিরাট্ চিকিৎসাশালা—তাহার ভারপ্রাপ্ত মহাভিষক্ সকলের আধিব্যাধি দূর করিতে ওষধি তৃণ গুল্ম খুঁজিতেছেন,—মনে হয় যেন কোন বিশাল মরুভূর পথের অন্যতম-স্বরূপ, তিনি প্রতি মাইল ব্যবধানে কূপ ও শীতল বিটপী ছায়ার

কিরূপে ব্যবস্থা করিবেন—তজ্জন্য চিন্তায় নিবিষ্ট; আত্মরক্ষা, দুর্গসংস্কার, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যের কথা নাই। যেন ভারতবর্ষে দয়ার এক বিরাট্ উৎসবক্ষেত্র, মহাদাতা—কর্ম্মকর্তৃরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাহার কি দরকার তাহার সন্ধান নিতেছেন—যেন সমস্ত ভারতব্যাপী দয়ার এক মহোৎসব চলিতেছে। পশুবলি নাই, নৈবেদ্যের ঘটা নাই, অনুষ্ঠানাদির বাহুল্য বা আড়ম্বর নাই; দুঃখীর দুঃখ বুঝিতে, আর্ত্তের মর্ম্মে সান্ত্বনা দিতে, পৃথিবীর সমস্ত জীবের আতঙ্ক নিবারণ করিতে, দানসত্র খুলিয়া সর্ব্বলোকের অভাব মোচন করিতে, গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য শিখাইতে, মহাপুরোহিত সেই মন্দির হইতে অবিরত ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহার শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, কৌটিল্য, শুক্র-কথিত রাজনীতি কোথায় আর অশোক রাজার রাজনীতি কোথায়? উভয় নীতির মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ব্যবধান। জগতের আর কোন্ দেশে এরূপ রাজা জন্মিয়াছেন তাহাত জানি না।

অশোক দিনরাত্র জগতের হিতার্থ উদ্যোগী ছিলেন; "সর্ব্ব লোক হিতের জন্য সতত জাগ্রত ও উদ্যোগী থাকা চাই। তাহাদের ইষ্টচিন্তা ছাড়া আমার কর্ম্মান্তর নাই। আমি জগতের কাছে যেন অঋণী হইতে পারি।" (ষষ্ঠ অনুশাসন।) পূর্ব্বে রাজগণ মৃগয়াদির জন্য অভিযান করিতেন, তৎস্থলে অশোক অন্যরূপ অভিযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মৃগয়ার পরিবর্ত্তে লোক-হিতার্থে অভিযান।

তিনি তাঁহার ভ্রমণ পবিত্র উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিলেন। "ব্রাহ্মণ, সাধু ও সন্ন্যাসিগণের সঙ্গলাভ, তাঁহাদিগকে দান করা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে স্বর্ণদান, পল্লীর লোকদিগের সঙ্গে মেলামেশা ও তাহাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবহিত করা, গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম আচরিত হইতেছে কি না, তাহার সন্ধান লওয়া—আমার ভ্রমণের এইগুলি মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে যে মৃগয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা হইতে এইরূপ ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও উৎকৃষ্ট।" (অষ্টম অনুশাসন।) তিনি প্রতিষ্ঠা চাহিতেন না—তাঁহার লক্ষ্য ছিল বহু ঊর্দ্ধে স্বর্গের দিকে, সুতরাং লৌকিক যশের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যশ বা কীর্ত্তির বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন না।" (দশম অনুশাসন।) তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি তাহা জটিল অধ্যাত্ম বাদ নহে, সরল ও অবিসম্বাদিত সার্ব্বজনীন সত্য। "ক্রীতদাস ও সাধারণ ভৃত্যদিগের প্রতি সদাশয়তা, গুরুজনের পূজা, প্রাণীদিগের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্য্যকে সাধুকার্য্য এবং এইরূপ অন্যান্য কার্য্যকে ধর্ম্ম-মঙ্গল কহে।" (নবম গিরিলিপি।) বাক্য-সংযমের উপর অশোক খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন—"সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই সারবুদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু তাহার মূলে বাক্য-সংযম। কিরূপে? স্বধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা সামান্য বিষয়েও যেন আদৌ না হয়। কোন কোন কারণে পরধর্ম্মীদিগের পূজা কর্ত্তব্য। উহা-দ্বারা স্বধর্ম্মীদিগের উন্নতি ও পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়। এরূপ না করিলে স্বধর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের

গৌরব বর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স-সম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায় (সামঞ্জস্য) ভাল। কিরূপে? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক, এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক।" (দ্বাদশ অনুশাসন।) আমরা যে আধুনিক কালে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আন্দোলন করিতে চেষ্টিত, কত শত শতাব্দী পূর্ব্বে অশোক তাহার বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন।

যাহারা অপরাধ করিয়া কারাগারে যায়, তাহাদের জন্য এই রাজর্ষির কত দয়া। নিজের সন্তান যদি ঐরূপ শাস্তি পায়, তবে মানুষের মনে যেরূপ কষ্ট হয়, ইহা সেইরূপ ব্যথা। ধর্ম্ম-মহামাত্রদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি ৫ম গিরিলিপিতে বলিয়াছেন—"দণ্ডিত ব্যক্তির অনেকগুলি সন্তান আছে কি না, দুঃখে তাহারা আত্মহারা হইয়াছে কি না, অথবা সে বৃদ্ধ কি না, এই সকল বিবেচনাপূর্ব্বক ধর্ম্মমহামাত্রগণ অন্যায় অবরোধ ও অন্যায় দৈহিক দণ্ডের প্রতিবিধানে ও বন্ধনমুক্তির জন্য ব্যাপৃত আছেন।"

দণ্ডিতের প্রতি দয়া।

"দণ্ডিত ব্যক্তির স্বগণেরা কষ্ট পাইতেছে কি না এবং দণ্ডিত ব্যক্তির বহুসন্তান আছে কি না এবং সে বৃদ্ধ কি না"—এসকল কি বিচারকগণ কোথাও দেখিয়া থাকেন? অশোক আদৌ শুষ্ক বিচারক ছিলেন না। পিতামাতা সন্তানকে দণ্ড দিয়া গোপনে আর এক চক্ষে চাহিয়া দেখেন, তাহার ব্যথা হইতেছে কি না—ইহা সেই মাতাপিতার দণ্ড। "নগরের শাসনকর্ত্তারা সর্ব্বদা দেখিবেন যেন নগরবাসীগণের অকারণ অবরোধ ও দৈহিক দণ্ডভোগ না ঘটে।" (ধৌলীর অতিরিক্ত অনুশাসন।) মোটকথা তাঁহার অনুশাসনগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি সাম্রাজ্যের সম্রাট্ নহেন, শাসনকর্ত্তা নহেন,—পালনকর্ত্তা। তাঁহার উক্তিগুলি সিংহাসন হইতে উচ্চারিত বলিয়া মনে হয় না, বেদী হইতেই উচ্চারিত বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ এগুলি শাসন বা অনুশাসন নহে—পালন-নীতি। উহাদের মধ্যে শাসনের নামগন্ধ নাই।

যাহার যে প্রয়োজনে রাজদরবারে আসার দরকার, তাহার জন্য প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত রাত্র অবারিত দ্বার। "সুতরাং আমি নিয়ম করিয়াছি—সকল সময়ে—আমি ভোজনেই ব্যাপৃত থাকি বা অন্তঃপুরে, নিভৃতকক্ষে, শৌচগৃহে, যানে বা প্রমোদ-উদ্যানেই থাকি, সর্ব্বত্রই আমার বার্ত্তাবহগণ আছে, তাহারা আমাকে প্রজাগণের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবে।" (ষষ্ঠ গিরিলিপি।)

রাজগৃহ সুবিচারার্থ সর্ব্বদা মুক্ত।

যদি কোন জরুরী কার্য্য সম্বন্ধে মৌখিক আদেশ লইয়া মন্ত্রীদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয় "বা কোন বিশেষ জনসমাজে কোন বিবাদ বা প্রবঞ্চনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেস্থানেই হউক বা যে সময়েই হউক, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাইবে; আমি এইরূপ আদেশ করিতেছি। কারণ রাজকার্য্য বা পরিশ্রম করিয়া কর্ত্তব্য পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না।" (ষষ্ঠ গিরিলিপি।) তিনি যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা রাজকীয় আইনের ধারায় বন্ধন নহে। মন্ত্রীদের লইয়া খসড়া তৈয়ার করাইয়া শেষে উহা তিনি প্রচার করেন নাই। উহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। উহা পরকে বলিয়া দিয়া লেখান যাইতে

পারে না। তিনি আদেশ প্রচার করিয়া ভাবিয়াছেন হয়ত রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না—সতত দয়ার্দ্রচক্ষে তিনি প্রজাহিতের উদ্যোগী ছিলেন। বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিনি সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন—তাঁহার উপদেশগুলি যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে কি না, যাঁহারা তাহা বুঝাইয়া দিবার ভার প্রাপ্ত, তাঁহারা তাহা বুঝাইতে পারিতেছেন কি না? প্রজারা তাহা বুঝিতেছে কি না? কলিঙ্গ জৌগড় অনুশাসনে তিনি বলিতেছেন "আপনারা হয়ত সম্যক্‌রূপে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। হয়ত কেহ কেহ আংশিক বুঝিয়াছেন—কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বুঝেন নাই—প্রতি-তিষ্য দিবসে এই লিপি শ্রবণ করাইবেন, অন্ততঃ এক ব্যক্তিকেও শ্রবণ করাইবেন।" এইরূপ কথা অপরকে দিয়া লিখান যাইতে পারে না। অশোকলিপির প্রত্যেকটি আদেশ, প্রত্যেকটি উপদেশ তাঁহার নিজের। উহা এরূপ সৌহার্দ্দ্যের ভাবমাখা, এরূপ প্রবল স্নেহ, দয়া ও মমতার ছাপমারা—উহার মধ্যে রাজার ব্যক্তিগত শুভেচ্ছার এত প্রবল প্রেরণা দৃষ্ট হয় যে উহার একটি শব্দ, একটি বর্ণও পরের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তৎসাময়িক পাশাপাশি নৃপতিদের শিলালেখ দৃষ্টি করুন, সেগুলিতে উৎকট রাজকীয় গৌরবের ঘোষণা, আদেশের প্রভুত্ব পাঠকচক্ষুকে ঝলসিয়া দিবে। তাহাদের সঙ্গে অশোক-শিলালেখমালার কোন তুলনাই হইতে পারে না। অশোকলিপিতে আমরা রাজার রাজবেশ দেখিতে পাই না; বিশ্বের মঙ্গলকামী সচেষ্ট সাধুর দেখা পাই। প্রস্তরলিপিগুলির মধ্য হইতে রক্তমাংসের সাধু যেন জীব জগতের ব্যথায় দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার অনুশাসন প্রচার করিতেছেন। সেই অনুশাসনগুলি এত জীবন্ত, তাহাতে জগতের হিতকল্পে এত দয়া, এত বাৎসল্য, এত দুশ্চিন্তা যে তাহাতে এখনও প্রাণে সাড়া দিয়া উঠে; আমরা বর্ত্তমান কালের সমস্ত কোলাহল বিস্মৃত হইয়া সেই সর্ব্বকালোপযোগী বাণী শুনিয়া চরিতার্থ হই—উহা যে ২০০০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইতে ইতিহাসের অতি প্রাচীন এক নিবিড় যুগ হইতে আসিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাই, মনে হয় যেন কোন সাধুর পার্শ্বে এখানে এখনই বসিয়া সেই জগৎ-মঙ্গল সর্ব্বজনঃহিতকর পরমার্থ জীবনের উপদেশ শুনিতেছি।

শিলালেখ ও স্তম্ভগুলির স্থান-নির্দ্দেশ। অশোকের শিলা-লেখগুলি নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে—

১৪টি প্রধান গিরিলেখ, তন্মধ্যে ১০টি এই ছয়স্থানে পাওয়া গিয়াছে—

১। সাহাবাজ গড়ী (কপরদিগিরি) পেশোয়ারে।
২। সাহারাণপুরের দেরাডুন সবডিভিসনে কলসী গ্রামে।
৩। হাজরা জেলায় মনসরায়।
৪। কাথিওয়ারে গ্রিণার পাহাড়ে।
৫। ভুবনেশ্বরের নিকট ধৌলিতে।
৬। গঞ্জাম জেলায় (মান্দ্রাজ) জৌগড়ে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সোপোনামক স্থানের অনুশাসনে ষষ্ঠ শিলালেখের কতকাংশ পাওয়া যায়।

সাতটি প্রধান স্তম্ভলেখ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পাওয়া গিয়াছে :—

১। তোপ্রানামক স্থান হইতে ফিরোজসাহ কর্ত্তৃক আনীত স্তম্ভ—দিল্লীতে স্থাপিত।

২। ফিরোজসাহ কর্ত্তৃক মীরাট হইতে আনীত, দিল্লীতে স্থাপিত।

৩। কৌশাম্বি স্তম্ভ—অধুনা এলাহাবাদ-দুর্গের নিকটে স্থিত।

৪। চম্পারণ জেলায় অররাজ শিবের মন্দির পার্শ্বে লওড়িয়া গ্রামের স্তম্ভ।

৫। চম্পারণ জেলায় মথিয়া গ্রামে নন্দনগড় স্তম্ভ।

৬। ঐ জেলায় বি. এন্. আর—গৌণহা ষ্টেশনে রামপুর পিলার।

৭। সপ্তম স্তম্ভ দিল্লীতে।

ছোট ছোট শিলালেখ মহীসুরে তিনটি, নিজামের অধিকারে একটি, বিহারে একটি, জব্বলপুরে একটি, রাজপুতনায় একটি।

অশোকের গুরু উপগুপ্ত সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন কোন লেখকের মতে মহেন্দ্র অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ভারতীয় সমস্ত গ্রন্থে এবং হিউনসাঙ্গের ভ্রমণ কাহিনীতে মহেন্দ্রকে এইরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সিংহলের মহাবংশে তিনি অশোকের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মহেন্দ্র সমস্ত সিংহল বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এই হিসাবে তিনি বিজয়ের মতই সিংহল জয় করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। সমস্ত সিংহল দেশ মহেন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নে পূর্ণ। অশোকাবদানে মহেন্দ্রের অসামান্য ধৈর্য্য, ত্যাগ-স্বীকার এবং সর্ব্বংসহ চরিত্র-দৃঢ়তা সম্বন্ধে অনেক গল্প উল্লিখিত আছে। অশোকের বহু নির্য্যাতন ও কঠোরতম দণ্ড তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন। এ দেশে মহেন্দ্রের চলিত নাম ছিল বিগতশোক। বঙ্গদেশের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তিনি কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। বাঁকীপুরে ভিক্‌না পাহাড়ীতে ছোটলোকেরা এখনও মহেন্দ্রের ভিক্ষুমূর্ত্তি মাটীতে গড়িয়া বৎসর বৎসর পূজা করিয়া থাকে। তদ্দেশে মহেন্দ্র 'ভিক্‌না-কুঁয়ার' (ভিক্ষু-কুমার) নামে পরিচিত।*

মহেন্দ্র।

অশোকের পুত্র কুনাল সম্বন্ধেও অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। বিমাতা তিষ্যরক্ষিতা কুনালের রূপে মুগ্ধা হন—কিন্তু যখন এই গর্হিত প্রস্তাব কুনাল ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়া অশোকের প্রিয় পুত্রটিকে তক্ষশীলায়

* Even now at Bhiknapahari in Bankipur, a crude earthen image of the Bhikna Kuar (the monkprince Mohendra) is annually erected and worshipped by *low class people*. Such things indicate that the traditions are not altogether baseless.

Piyadasi Inscriptions by Ramavatar Sarma, Patna, Introduction, *pp. vi & vii.*

প্রেরণ করেন। রাজার শিলমোহরটি রাণী কৌশলে হস্তগত করিয়া কুনালকে রাজাদেশ জাল করিয়া একটা চিঠি লিখেন, তাহাতে আদেশ ছিল, যেন তিনি চিঠি প্রাপ্তি মাত্র তাহার দুইটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলেন। কুনাল এই অদ্ভুত আদেশ কোন ষড়যন্ত্রের ফল বলিয়া অনুমান করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা উপদেশ দিলেন যে তিনি রাজাকে একবার চিঠি লিখিয়া আদেশের সত্যতা নিরূপণ করুন। কুনাল সে উপদেশ না লইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া অন্ধ হইলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি তাঁহার পত্নী কাঞ্চনমালার হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পাটলীপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন, বহুকষ্টে রাজপ্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কুনাল বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। চিরাভ্যস্ত কর্ণের পরম তৃপ্তিদায়ক সেই অমৃততুল্য বংশীধ্বনিতে অশোক বংশীবাদককে নিজের সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। পুত্রের মুখে তাঁহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া অশোকের চিত্ত করুণা ও দুঃখে ভরিয়া গেল। তিনি ষড়যন্ত্রীদের সমুচিত দণ্ডের বিধান করিলেন। জৈন-সাহিত্যে এই গল্পটি পাওয়া যায়। অশোক তাঁহার স্নেহশীলা কন্যা চারুমতির সঙ্গে লুম্বিনি বনে তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। লুম্বিনি বনের নাম ছিল রুক্মিনি বন। তথায় তিনি বুদ্ধের জন্মের স্মারক স্তম্ভে একটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ বহু উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে,— সেগুলি লিখিবার এখানে স্থানাভাব। সিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার পূর্ব্বক তাহা শুদ্ধভাবে প্রচারিত করিবার জন্য অশোক প্রথমবারের 'মন্ত্রণা সভা' আহ্বান করিয়াছিলেন। কথিত আছে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য অশোক ১০ কোটি স্বর্ণ দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন। অশোক তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। মন্ত্রীরা কুনালপুত্র সম্পাদিকে বলিলেন এরূপ অজস্র দান করিলে রাজকোষে আর কপর্দ্দকও থাকিবে না। সম্পাদি আর অর্থ বিতরণ নিষেধ করিয়া দিলেন। তখন অশোক কোষাগারে কিছু না পাইয়া তাঁহার নিজের বহুমূল্য সমস্ত আসবাব বিতরণ করিয়া ফেলিয়া নিজে মৃন্ময় পাত্রে আহার করিতে লাগিলেন। একদিন অশোক কুক্কুটারামের ভিক্ষু সঙ্ঘকে একটি মাত্র আমলকী দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—ইহাই তাঁহার শেষ দান। তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন রাধাগুপ্ত। একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সাম্রাজ্যের অধিপতি কে?" রাধাগুপ্ত বলিলেন "আপনিই এই বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্।" অশোক তখন বলিলেন—"এই সাগর-মেখলা হীরামুক্তামণি-পূর্ণা বহু প্রজা ও জীব সঙ্কুলা বসুমতী আমি সঙ্ঘকে দান করিলাম। আমি ইন্দ্রত্ব চাই না, ব্রহ্মার পদ চাই না। আমি সহস্র পৃথিবীর সম্রাট্ হইতে চাই না; কারণ এই সকল বাহ্য ঐশ্বর্য্য সলিলস্রোতের ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য। সাধুদিগের একমাত্র কাম্য আত্মসংযমই আমি একমাত্র প্রার্থনা করি।" তখনই এক দান-পত্র লিখাইয়া অশোক তাহা মোহরাঙ্কিত করিয়া দিলেন। কথিত আছে অশোকের মৃত্যুর পর তৎপৌত্র সম্পাদি শূন্যসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

অশোকের দান।

অশোকের অনুশাসনগুলির মধ্যে কলিঙ্গলিপিই (ত্রয়োদশ অনুশাসন) নানা কারণে সমধিক ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। কলিঙ্গ যুদ্ধে একলক্ষ পঞ্চাশ সহস্র লোক বন্দী হয়, একলক্ষ লোক নিহত হয়, এবং তদপেক্ষা অনেকগুণ লোক আহত হয়।

বিখ্যাত ত্রয়োদশ অনুশাসনে অশোকের অনুতাপ।

এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড প্রিয়দর্শীর মনে যে কষ্ট, অনুতাপ ও দয়ার ভাব উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা যেন শৈল কঠিন পাহাড়ের আবরণ হইতে চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই মর্ম্মন্তুদ সুরটি দ্বিসহস্র বৎসরের উচ্চকালের পরেও যেন একটি শিশুর করুণ কান্নার ন্যায় আমাদের কাণে আসিয়া বাজিতেছে। এই শৈললেখের মর্ম্মান্তিক ভাব-প্রবণতা দেখিয়া অনেকে অনেক রকম অনুমান করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন কলিঙ্গ যুদ্ধের ঘোর নিষ্ঠুরতায় তাঁহার চিত্ত এরূপ দ্রবীভূত হইয়াছিল যে তিনি তৎপরেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন; কেহ কেহ বলিয়াছেন, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর তিনি কোন যুদ্ধই করেন নাই; আবার কেহ অনুমান করিয়াছেন চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের পর এক কলিঙ্গ ছাড়া তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য আর বাড়ান নাই—যেহেতু তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশাল মৌর্য্যসাম্রাজ্য চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারই এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই সকল মতের সমস্তই সম্পূর্ণ ঠিক না হইলেও ইহাদের অনেকগুলিই যে আংশিক ভাবে সত্য তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। বস্তুতঃ কলিঙ্গ যুদ্ধ জয় করিয়া তিনি প্রাণে বড় দাগা পাইয়াছিলেন। কলিঙ্গ অনুশাসনের শিলালিপিতে সূঁচ ফুটাইলে তাহা হইতে যেন রক্ত বাহির হয়, তাহা এত জীবন্ত। "কলিঙ্গ বিজয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুশোচনা হইয়াছে" কেন হইয়াছে? তাহা তিনি বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন। "সেই দেশে কত মহামনা সাধু আছেন যাঁহারা ধর্ম্ম মানিয়া চলেন, যাঁহাদের জীবন নিষ্কলঙ্ক, তাঁহাদের আত্মীয়গণ এই যুদ্ধে মারা পড়িয়াছেন। আমি সাধুহৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি, যত লোক হতাহত হইয়াছে—তাঁহাদের শত সহস্রের একাংশও দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুতাপের কারণ।" "আমার পুত্র পৌত্রগণ যেন দেশবিজয় বাঞ্ছনীয় মনে না করেন। তাঁহারা যেন ধর্ম্ম বিজয়কেই যথার্থ বিজয় মনে করেন।" অনেক কারণে মনে হয়—কলিঙ্গের অন্তর্গত মেদিনীপুরের লোকেরাই অশোকের সঙ্গে এই প্রাণান্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিশিষ্টে 'মেদিনীপুর' শব্দ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৌর্য্য, সুঙ্গ ও কাম্ববংশ

"দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধপতাকা—
উড়িতে দেশ বিদেশে ও
তিব্বত, চীনে, ব্রহ্ম তাতারে—
ভারত স্বাধীন যেদিন ও।"

আমার পুনঃ পুনঃ একটা কথা মনে হইতেছে। বাঙ্গলার কথা লিখিতে গিয়া, তাহা "বৃহৎবঙ্গ" অথবা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, অশোক এমন কি বুদ্ধদেবের কথাগুলি আমি এত বেশী করিয়া লিখিতে যাইতেছি কেন? এজন্ত হয়ত কেহ কেহ আমার কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন।

সুতরাং এই কথাটা আমাকে একটু বিশদ করিয়াই বলিতে হইবে। আমার সরল আন্তরিক বিশ্বাস যে এই পূর্ব্বভারতের সভ্যতার—বিশেষ করিয়া মগধের শিক্ষা দীক্ষার—আমরা বাঙ্গালীরাই উত্তরাধিকারী হইয়াছি, অন্ততঃ আমরা তাহা যতটা পাইয়াছি, আমাদের প্রতিবেশিগণের মধ্যে কেহই, এমন কি খাস্ বিহারবাসীরাও, ততটা পান নাই। মগধের দীপ নিবু নিবু হইলে তাহা গৌড়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই দীপ—একই দেশলাই কাঠির। গৌড়ের দীপ যখন নির্ব্বাণোন্মুখ, তখন তাহার পরবর্ত্তী শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল নবদ্বীপে। সেই দীপই এখন কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে জ্বলিতেছে। ইহা প্রমাণযোগ্য যে মাগধী ত্যাগধর্ম্ম, মাগধী উচ্চশিক্ষা, মগধের শৌর্য্য বীর্য্য—এ সমস্তই বাঙ্গালীরা যেমন করিয়া পাইয়াছে, অন্ত কেহ তেমন করিয়া পায় নাই। মগধ মুসলমান কর্ত্তৃক ধ্বংস হইলে তাহার ধর্ম্ম আরও পূর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছিল।

মগধের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী।

এককালে মগধেশ্বরগণ সমস্ত ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ছিলেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহাদের পদানত ছিল। মগধের রাজচ্ছত্র ভগ্ন হইলে গুপ্তদের অবনতির পর গৌড় সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়রাজধানী বহু প্রাচীন, এবং মগধের অবনতির পর গৌড়ই সেই দেশের বিনষ্ট গৌরবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত গৌড়ের মহিমায় মহিমান্বিত ছিল।

মগধের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ।

সারস্বত, কান্তকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চরাজ্য লইয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য পালগণ অধিকার করিয়াছিলেন—তাহার নাম ছিল পঞ্চগৌড়। এ সম্বন্ধে সকল কথা আমরা ১৯ পৃষ্ঠায় বিশেষ ভাবে একবার উল্লেখ করিয়াছি।

এককালে গৌড়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রীতি "গৌড়ীয় রীতি" নামে পরিচিত হইয়াছিল। দণ্ডাচার্য্য প্রভৃতি লেখকগণ তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ময়ূরভট্ট, রূপরাম, ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলী প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মমঙ্গল লেখকগণই যেখানে সেখানে গৌড়েশ্বরগণের 'নবলক্ষ সৈন্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। মগধের প্রতাপের শেষ শিখা যে কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াও গৌড় প্রাসাদকে দীপ্ত করিয়াছিল—তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জরাসন্ধের পর মহানন্দ, তৎপর চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি রাজন্যবর্গ—তৎপর গুপ্তরাজগণ এবং সর্ব্বশেষ পাল ও সেন রাজারা সেই একই দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া—পরবর্ত্তী রাজাদের প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও—পূর্ব্বভারতের গৌরবের ধারাবাহিকত্ব বজায় রাখিয়াছেন।

নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদন্তপুর, জগদ্দল, সুবর্ণ, বাজাসন প্রভৃতি বিহারের শিক্ষাদীক্ষার বাঙ্গালীদের যথেষ্ট সাহচর্য্য, দান এবং প্রভাব ছিল এবং যখন এই সকল বিদ্যালয় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল—তখন পূর্ব্বভারতে ভারতী কণেকের জন্য মিথিলা কেন্দ্র পরিক্রম করিয়া নবদ্বীপে সিংহাসন স্থাপন করিলেন। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব বেহারের বিহার-সমূহের সংস্কার বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের মহাশিক্ষা ত্যাগ, বৌদ্ধ রাজগণের ভিক্ষুবেশ এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মহৎ দৃষ্টান্ত বাঙ্গলাদেশেই বিশেষ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অস্থি-মজ্জাগত হইয়াছিল এবং সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলি সহজিয়া তান্ত্রিকদের মধ্যে কখনও উন্নত, কখনও পরিবর্ত্তিত, কখনও বা বিকৃত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধের পর চৈতন্য ;—অশোক, মহেন্দ্র, উপগুপ্ত প্রভৃতির পর বাঙ্গলার গোপীচন্দ্র রাজা, রূপসনাতন, নরোত্তম, রঘুনাথ এমন কি সেদিনকার লালাবাবু পর্য্যন্ত বাঙ্গলার রাজর্ষিগণ ভিক্ষাভাণ্ড হাতে করিয়া আদি ভিক্ষুকের অনুসরণ করিয়াছেন। দীপঙ্কর, শীলভদ্র, শান্ত রক্ষিত, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি ভারতবন্দিত পণ্ডিতগণ—সেই মগধের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির প্রভা ও সংস্কার যুগোপযোগী ভাবে বিকীর্ণ করিয়াছেন। একালেও পরমহংসদেব, রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, পূর্ব্বভারতের জ্ঞান-প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দেখাইব যে বাঙ্গালীরাই মাগধী গৌরবের উত্তরাধিকারী এবং সেই মগধের শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির সংস্কার বঙ্গদেশ যতটা রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে, আর কেহ তাহা পারে নাই। আমাদের এই পুস্তক রাজনৈতিক ইতিহাস নহে। রাজনৈতিক একটা চালচিত্র না থাকিলে বিষয়গুলির যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া প্রদর্শন করা কঠিন

হয়, এজন্য আমরা রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ বাদ দিতে পারিব না। কিন্তু বৃহৎ বঙ্গের শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস এখনও দুর্ভেদ্য তিমিরাবৃত—ঘন সন্নিবিষ্ট অন্ধকারের নিবিড়তা ভেদ করিয়া সুস্পষ্ট আলোকে সেই ঐতিহাসিক পট উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আমাদের চিন্তাশীলতা, শিক্ষাদীক্ষা, কলাবিদ্যা ইত্যাদির ধারাবাহিক ইতিকথার একটা ভিত্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইব। রাজনৈতিক ইতিহাসে যথেচ্ছাচার শাসনকর্ত্তারা রাষ্ট্রীয় সুবিধানুসারে রাজ্য-বিভাগ করিয়া থাকেন; কতবার বঙ্গদেশের এক প্রধান অংশ—কলিঙ্গের কুক্ষিগত হইয়াছে। কাশী, গয়া, ভাগলপুর জেলা প্রাক্জ্যোতিষপুর প্রভৃতি প্রদেশ ক্ষণে বঙ্গাধিকারান্তর্গত ক্ষণে বঙ্গমুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে। সেই ভাঙ্গাগড়ার বিরাম নাই। এখন পর্য্যন্তও সেই রাষ্ট্রবিভাগের সীমার রেখা নূতন নূতন করিয়া টানা হইতেছে। এই নিত্যচঞ্চল, পদ্মদলগত বারিবিন্দুর মত অস্থায়ী রাষ্ট্রীয় সীমানা লইয়া আমার এই ইতিবৃত্ত নহে। আমরা যাহা—তাহা কিরূপে হইয়াছি, আমাদের চিন্তা, শিক্ষা, বিশেষতঃ মনের সংস্কার এ সকল কোথায় কি ভাবে পাইয়াছি—সেই ভাবধারায় পৌর্ব্বাপর্য্য ও ক্রমপুষ্টি প্রদর্শন করিতে হইলে আমরা মগধকে বাদ দিতে পারি না। তাহা করিলে আমাদের আত্মপরিচয়ে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে। এই জন্যই মগধকে লইয়া আমরা এতটা নাড়াচাড়া করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব

মৌর্য্য অধিকার কালে দেশের অবস্থা যেরূপ উন্নত ছিল তাহা বিদেশী পর্য্যটকগণ বিস্ময়ের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে ময়দানব-কৃত যুধিষ্ঠিরের রাজসভা এবং রামায়ণে লঙ্কাপুরীর বর্ণনায় যে সুস্পষ্ট চিত্রপট আছে, তাহা হইতে অনুমান করা সহজ যে মৌর্য্যাধিকারের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতের বাহ্য সমৃদ্ধি উন্নতির চরম শেখরে পৌঁছাইয়াছিল। গ্রীক দূত বলিয়াছেন "চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ সুসা এবং একবটনের রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সমৃদ্ধ।" ফা'হায়েন লিখিয়াছেন, অশোকের কীর্ত্তি দেখিলে সেগুলি মনুষ্যকৃত বলিয়া মনে হয় না। কোন অশরীরী শিল্পী এই সকল বিরাট্ কীর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইবে।

অশোক-স্থাপিত পশু-চিকিৎসালয়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সেদিন পর্য্যন্তও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইত। হ্যামিল্টন সাহেব লিখিয়াছেন "আহমদাবাদ, সুরাট এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বহুস্থানে যে সকল পশু-চিকিৎসালয় আছে, তাহা সম্রাট্ অশোকের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়গুলির আদর্শ এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সুরাটের প্রতিষ্ঠানটির নিম্নলিখিত বর্ণনা (অষ্টাদশ শতাব্দীর) অনেকটা পাটলিপুত্রের পশুশালার রীতির পরিচয় দিতেছে। "সুরাটের বণিক্‌দের চিকিৎসালয়টিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নাই। পশুশালাটি প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া। ইহা চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। পশুদিগের জন্য এই বৃহৎ স্থানটিতে ছোট ছোট বহু প্রকোষ্ঠ আছে। কোনও জীবজন্তু পীড়িত হইলে এখানে অত্যন্ত সতর্ক ও স্নিগ্ধ যত্ন পাইয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চিকিৎসাগারটি বৃদ্ধ ও জরাতুর পশুদের শান্তির আগার স্বরূপ হয়।

"যখন কোন জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তৎস্বামী তাহাকে এই চিকিৎসালয়ে লইয়া আসে। সেই পশুর অধিকারীর কি জাতি, সে কি শ্রেণীর লোক ইত্যাদি কোন বিষয়েই প্রশ্ন করা হয় না। কেওয়া মাত্র পশুটি তথায় গৃহীত হয়। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে এই চিকিৎসালয়ে অনেকগুলি ঘোড়া, গাধা, ষাড়, ছাগ, মেষ, বানর, হংস, কুক্কুট, পায়রা এবং অন্যান্য নানা প্রকারের পাখী ছিল। সেখানে একটা কচ্ছপ ছিল, সেটা নাকি সেখানে ৭৫ বৎসর যাবৎ বসবাস করিতেছিল। ইহার মধ্যে রক্তলোভী জীবদিগের সম্পর্কিত বিষয়টিই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য-জনক ছিল। সেখানে ছারপোকা, ইন্দুর, ছুঁচো এবং অপরাপর অনেক হিংস্র ক্ষুদ্র জীব যথাযোগ্য খাদ্য প্রাপ্ত হইত।" (হ্যামিল্টনের হিন্দুস্থান-কাহিনী, ১৮২০ খৃঃ, ৭১৮ পৃঃ।)

এই ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ ঘুরিলে দেখা যাইবে যাহা কিছু অতি আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটিয়াছে তাহারও কিছু না কিছু নিদর্শন কোন না কোন স্থলে আছে।

হিন্দুরা গ্রীকদিগের সংসর্গে আসাতে গ্রীকদিগের কিছু না কিছু প্রভাব তাঁহাদের শিল্পের উপর অবশ্যই আসিয়া পড়িয়াছিল। ব্যাক্‌ট্রিয়ার দিকেই সেই প্রভাব একটু বেশী দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন ভারতীয় শিল্পের উপর হেলেনার প্রভাব অতি সামান্য,—যাহা আছে তাহাও বাহ্য মাত্র। গ্রীক সভ্যতা কখনই হিন্দুর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। অবশ্য একদল উগ্রপন্থী পাশ্চাত্য পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা কেবলই গ্রীক ও রোমের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। একদল ধর্ম্মযাজক সেদিনও বলিতেন যে ভগবান্ হিব্রুভাষায় কথা বলিতেন, যেহেতু বাইবেল হিব্রুভাষায় লিখিত এবং তজ্জন্যই জগতের যত ভাষা তাহা হিব্রু হইতে উৎপন্ন। সেইরূপ, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সমস্তই হেলেনার দান—এরূপ মতবাদী পণ্ডিতও এখন আছেন। কিন্তু ভারতীয় পুরাতত্ত্বের সঙ্গে খনিত্রীর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উগ্রপন্থীদের দল ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। গান্ধার অঞ্চলের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখিলে হিন্দু শিল্পের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব কতকটা হইয়াছিল

তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু এই প্রভাব সিন্ধুনদের পশ্চিমে কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও ঐ নদের পূর্ব্বে তাহা কণিকা প্রমাণ, এবং যদি কিছু থাকিয়া থাকে তাহা একান্ত বাহ্য। অপর দিকে, ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক কারিকরগণ যে হিন্দু শিল্পকলার আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা সেই দেশের কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তিতে স্পষ্ট প্রতিভাত। যে আধ্যাত্মিকতা গ্রীক কলায় নাই, ব্যাক্‌ট্রিয়ার বুদ্ধমূর্ত্তিতে কোথায়ও কোথায়ও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে।

ভারতীয় সভ্যতার উপর হেলেনার প্রভাব কতকগুলি সাহেব নানাদিক্ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন রামায়ণ ইলিয়াডের নকল; ভারতে স্থপতিবিদ্যা ছিল না, ব্যাক্‌ট্রিয়া হইতে গ্রীকেরা হিন্দুদিগকে তাহা শিখাইয়াছেন। মূর্ত্তি অঙ্কন বা গঠন ভারতে গ্রীকেরাই আমাদিগকে হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন, ইত্যাদি।

গ্রীকদিগের সঙ্গে অ্যালেকজাণ্ডারের পরে কিছু কিছু সম্পর্ক আমাদের দেশে হইয়াছিল। আমাদের পুরাণকারেরা রূপকস্থলে যে সকল গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে মৌর্য্যযুগের গ্রীকদিগের সঙ্গে ভারতীয় সংঘর্ষের একটু আভাস আছে বলিয়াই মনে হয়। পুষ্যমিত্র মৌর্য্যদিগকে অধিকারচ্যুত করেন এবং তিনি ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহার সময়ে হিন্দুধর্ম্মের একটা সমুত্থান হইয়াছিল—তখন অশোক প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দকে ব্রাহ্মণেরা হীন প্রতিপন্ন করিতে স্বতঃই চেষ্টিত হইয়াছিলেন। চণ্ডীতে দেবীযুদ্ধে দেখা যায় যে অসুরদের দলে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে "মৌর্য্যেরা" প্রবল ছিল। এই মৌর্য্যগণকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী দৈত্য-দলভুক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় হিন্দুশক্তি কোন বৈদেশিক আক্রমণে আত্মরক্ষার্থ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একত্র দাঁড়াইয়াছিল—চণ্ডী-কথিত অলৌকিক গল্পটির মধ্যে এইরূপ কোন সত্য নিহিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এ কথা পূর্ব্বেই (১৪৭ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে। কালিদাস প্রভৃতি কবির লেখায় গ্রীক রমণীরা যে রাজাকে বেষ্টিত করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে বীরবেশে শরীর-রক্ষীর কাজ করিতেন, তাহার উল্লেখ আছে। মুদ্রারাক্ষসেও সেইরূপ বর্ণনা আছে। আলেকজাণ্ডারের সময়ে বিদেশী গণিকারা হিন্দু রাজার সঙ্গে সঙ্গে রণক্ষেত্রে থাকিতেন। কিন্তু এই সকল উপাখ্যান ও বর্ণনার মধ্যে যদি কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব থাকে, তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুরাজগণ গ্রীকদিগের বাহ্য সাহচর্য্য পাইয়াছিলেন ও যোগ্যতা অনুসারে স্বীয় স্বীয় বিচিত্র কর্ম্মবিভাগে তাঁহাদিগকে কিছু স্থান দান করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগকে তাঁহারা সৈন্যস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মুদ্রারাক্ষসাদি নাটকে পাওয়া যায়।

গ্রীক প্রভাব।

কিন্তু অশোক যে বহু স্থবির ও স্থবির-পুত্র গ্রীস্, পারস্য ও অন্যান্য প্রদেশে পাঠাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বহু মনুষ্য- ও পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন ও তৎসঙ্গে ঔষধার্থ প্রয়োজনীয় তরু-গুল্ম বপন করাইয়া চিকিৎসা-জগতে ও ধর্ম্মরাজ্যে একটা মহাহিতকর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম প্রধান শাখা—বৌদ্ধধর্ম্মের

ভারতের গণ্ডী অতিক্রম করাইয়া পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্ত্য জগতে বহুলোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সাহেবরা নীরব। (গ্রীকদের কেহ কেহ গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিষ্ণুকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যবন ধর্ম্মরক্ষিত, যবন হরিদাসের মত তাঁহার পূর্ব্ব সম্প্রদায়ের নাম-গোত্র হারাইয়া, নব দীক্ষার প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং গুজরাটের ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—মহারক্ষিতকে অশোক ধর্ম্মপ্রচারার্থ গ্রীসদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য বহু গ্রীককে নব ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন।) এই সকল বহু প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা গ্রীকদিগের উপর হিন্দুপ্রভাব সম্বন্ধে তো কোন আলোচনা করিতেই স্বীকৃত নহেন। (বৌদ্ধ-আচার ও নীতি, প্রথম দিক্‌কার খৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকার ব্যাপ্ত করিয়াছিল। জারমানগণের মধ্যে কিছুকাল পূর্ব্বেও প্রাতঃকালে উঠিয়া পিতৃ-তর্পণ করার রীতি ছিল। এ সকল অনেক কথা তাঁহারাই প্রাসঙ্গিক ভাবে লিখিয়াছেন। তথাপি ভারতের নিকট যে গ্রীক বা রোমানগণ কোনরূপ দায়ী একথা তাঁহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সহজে স্বীকার করিতে যেন কুণ্ঠিত।)

(চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচারের জন্য অশোক রাজা পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে ভারতবর্ষ হইতে প্রবীণ বৈদ্যদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, এই সকল লোকদিগকে 'স্থবির' বা 'স্থবিরপুত্র' বলিত। চলিত কথায় ইহাদিগকে 'থেরা' বা 'থেরা-পুত' বলিয়া থাকে। সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ থেরা বা থেরা-পুত নামে অভিহিত। এখন পাশ্চাত্ত্য দেশে চিকিৎসা বিদ্যার নাম "থেরাপিউটিক্‌স্"। এত বড় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কি জানেন না যে এই শব্দ "থেরাপুত" হইতে উদ্ভূত? কিন্তু সে কথা জানিয়াও তাঁহারা স্বীকার করিবেন না, যেহেতু স্বীকার করিলে যে সমস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানটাকে হিন্দু-বিজয়-চিহ্ন-লাঞ্ছিত করিতে হয়। ওয়েবেষ্টারের অভিধানে "থেরাপিউটিক্‌স" অর্থে লিখিত হইয়াছে "'থেরাপিউট' শব্দ হইতে ঐ নাম উদ্ভূত। এই নামের কতকগুলি সন্ন্যাসী পুরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে বাস করিতেন, পণ্ডিতপ্রবর ফিলো এই বিবরণ লিখিয়াছেন—একথা এখন অনেকে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করেন।" *) তাঁহারা কেন বিশ্বাস করিতে চাহেন না? আমাদিগের নিকট এই অভিপ্রায় অতি স্পষ্ট। অশোকের দ্বিতীয় অনুশাসনে "দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী" রাজা তাঁহার রাজ্যে এবং তদ্রুপান্তে চোড়, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, তাম্রপর্ণী, আন্তিয়োক নামক যবন রাজার রাজ্যে দুই প্রকার চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, "পশু-চিকিৎসালয় এবং মনুষ্য-চিকিৎসালয়।" ত্রয়োদশ অনুশাসনে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে অশোক পাশ্চাত্ত্য জগতের সমস্ত পরিচিত স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্র অবহিত করাইবার জন্য এবং ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করাইতে যাইয়া যবনরাজ এ্যান্টিয়োকাস্, এবং এ্যান্টিয়োকাসের রাজ্য ছাড়াইয়া টোলেমি, এ্যান্টিগোনাস, মগস এবং

* "A name given to certain ascetics said to have anciently dwelt near Alexandria. They are described in a work attributed to Philo, the genuineness and creditability of which are now much discredited." Webster's Dictionary.

আলেকজাণ্ডারের রাজ্যেও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ পাঠাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কোন স্থানই অবশ্য বাদ ছিল না, চোড়, পাণ্ডু এবং সিংহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ধর্ম্মচক্রের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছিল।* এই পণ্ডিতগণের নাম যে 'থেরা' এবং 'থেরাপুত্র' ছিল তাহা বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ সকলেই জানেন। এবং এখনও ব্রহ্মদেশ ঘুরিয়া আসিলে কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক থেরাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া আসিতে পারেন।

য়ুরোপে আজকাল পালিভাষাবিৎ পণ্ডিতের অভাব নাই। তাঁহারা অশোকলিপি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং থেরা ও থেরাপুত্ত বলিতে কাহাদিগকে বুঝায় তাহাও ভাল করিয়া জানেন। 'থেরাপিউটিক্স্ অর্থ যে থেরাপুত্তদের-সম্বন্ধীয়' তাঁহাও তাঁহারা অবগত আছেন ও অভিধানে লিখিয়াছেন, ইহারা পূর্ব্বদেশীয় সন্ন্যাসী; আলেকজান্দ্রিয়ার বাজার পর্য্যন্ত যে এই সকল থেরা ও থেরাপুত্তদের কর্ম্মকেন্দ্র ছিল, ভিন্সেণ্ট-প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ সমস্ত লিখিয়া এবং ওয়েবেষ্টার তাঁহার অভিধানে এ কথা স্বীকার করিয়াও লিখিয়াছেন, 'যে সেকথা এখন অনেকে বিশ্বাস করিতে চান না।' এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে কেন চান না? ইহা কি প্রতীচ্যের স্পর্দ্ধিত অভিমানের ফল নহে? এদিকে তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও সামাজিক ঘটনার ছবি তিল তিল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া হেলেনার শ্রেষ্ঠত্বের কল্পিত প্রভাব-চিহ্ন আবিষ্কার করিতে কত না ব্যস্ত!

(অশোকের বহু পত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে সম্ভবতঃ কুরুবকী ও অসন্ধিমিত্রা প্রধানা ছিলেন। অসন্ধিমিত্রার মৃত্যুর পর তিনি তিষ্যরক্ষিতা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী ললনাকে বিবাহ করেন।

অশোক ও রাজ্ঞী তিষ্যরক্ষিতা।

এই মহিষী ও কুনাল-ঘটিত করুণ আখ্যায়িকার প্রতি আমি ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। কথিত আছে একদা অশোকের উদরে দুঃসহ যন্ত্রণা হয়। সেই সময়ে কোন রাখাল বালকেরও ঐরূপ রোগ হইয়াছিল। রাজ্ঞী গোপনে রাখাল বালককে হত্যা করিয়া তাহার উদর পরীক্ষা করেন, তাহাতে দৃষ্ট হয় উহাতে বহু কীটাণু জন্মিয়াছে। রাজ্ঞী তাহাদের উপর অনেক প্রকার রস প্রয়োগ করেন, তাহাতে সেগুলি বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু পিয়াজের রস দেওয়া মাত্র কীটাণুগুলি নির্ম্মূল হইয়া যায়। চিকিৎসকের অসাধ্য অশোকের রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন রাজ্ঞী তাঁহাকে পিয়াজের রস খাওয়াইয়া সুস্থ করেন। তদবধি এই সুন্দরী মহিষী রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কুনালের সঙ্গে রামচন্দ্রের ও তিষ্যরক্ষিতার সঙ্গে কৈকেয়ীর তুলনা চলিতে পারে।)

অশোকের কুরুবকীগর্ভজাত তাইবর নামক প্রিয়পুত্র হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজকুমার অল্পায়ু হইয়াছিলেন। (অশোকের আর এক পুত্র জলৌক কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

* The Missionaries of the Imperial Teacher (Asoka) and their successors carried the doctrines of Gautama from the banks of the Ganges to the snows of the Himalayas, the deserts of Central Asia and the bazars of Alexandria. Oxford History of India by V. Smith, p. 188 (1920).

অশোকের পৌত্র দশরথ সম্ভবতঃ জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি ২৩১ খৃঃ পূঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুইখানি পুরাণের মতে তিনি আটবৎসর কাল রাজত্ব করেন। কুনালের পুত্র সম্প্রতি (সম্পদি) কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; কথিত আছে ইনি অশোকের জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার হাত হইতে রাজ-শক্তি কাড়িয়া লইয়া অশোকের অবাধ দানশীলতা সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন।

অশোকের বংশধরগণ।

অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাশের (নিকেতার বিজয়ী নামে প্রসিদ্ধ) হাত হইতে সিন্ধুদেশ উদ্ধার করেন। এইভাবে পৌরস (Porus), অস্তি ও অভিসার রাজাদের রাজ্য তিনি পুনরায় হিন্দু-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং সেলিউকাশকে পরাজয় করার দরুন তিনি তাঁহার আরও কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই প্রকারে বেলুচিস্থান, খিলাট, মকেরন প্রভৃতি দেশ চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সেলিউকাশের দূত অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য সুবৃহৎ হইয়াছিল, এবং গ্রীকগণ নিরস্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সেলিউকাশ, ইজিপ্টের রাজা টোলেমির ভ্রাতার হাতে ৭৮ বৎসর বয়সে নিহত হন। ইজিপ্ট-রাজদূত দাইওসিসিয়াস চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজসভায় কতকদিন বাস করিয়াছিলেন।

বিন্দুসার তাঁহার পিতার রাজ্য হয়ত বা কতকটা বাড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু এবিষয়ে খাঁটি প্রমাণ নাই। অশোক তাঁহার রাজত্বের নবমাব্দে কলিঙ্গ জয় করেন। এই জয়ের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কলিঙ্গ-বিজয়ের ফলে মহানদী ও কাবেরীর মধ্যবর্ত্তী এবং সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দক্ষিণে মহীশূর-সুবর্ণগিরি পর্য্যন্ত তাঁহার আধিকৃত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং অশোকের রাজ্য পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং মধ্যভাগে (পশ্চিমোত্তরে) কাশ্মীর ও পূর্ব্বে নেপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে মহীশূর, দক্ষিণপশ্চিমে কাথিওয়ার এবং পূর্ব্বে অমুগাঙ্গ প্রদেশ এ সমস্তই তাঁহার অধিকারের অন্তর্গত ছিল। কাশ্মীরের প্রধান নগর ছিল প্রবরপুর (শ্রীনগর) এবং নেপালের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল মুণ্ডপত্তন ও ললিত-পত্তন। *

মেগেস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের শাসনপ্রণালীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অশোকের সময়েও কতকাংশে সেইরূপই ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সুবৃহৎ রাজ্য কতকগুলি প্রাদেশিক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, তোষলী, সুবর্ণগিরি এবং আরো কয়েকটি স্থান প্রাদেশিক প্রধান নগর ছিল; স্বয়ং যুবরাজ অশোক এক সময়ে তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

মেগেস্থিনিসের সময়ে মগধের সৈন্যবল, ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অশ্বারোহী, ৯ হাজার হস্তী এবং বহুসহস্র রথবিশিষ্ট ছিল। কোন স্থানে রাজকীয় শিবির থাকিলে তথায়

* প্রিয়দর্শী-প্রশস্তি (রামাবতার শর্ম্মা সম্পাদিত—ভূমিকা, ৫ম পৃঃ)।

রাজার সঙ্গে ৪,০০,০০০ সৈন্য থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সুবিখ্যাত সুদর্শন হ্রদ খনন করা হইয়াছিল। বৈশ্য পুষ্পগুপ্ত এই কার্য্য-সম্পাদনের ভার পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে (অশোকের রাজত্বকালে) যবনরাজ তুসস্প এই হ্রদের মেরামতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সময়াবধি গ্রীক ও পারস্যবাসীদের সঙ্গে মৌর্য্যবংশের ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়, মুদ্রারাক্ষস নাটকের যদি কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তবে স্বীকার করিতে হইবে গ্রীক সৈন্যেরা বহু পরিমাণে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদল-ভুক্ত ছিল। উত্তরকালে যবন ধর্ম্মরক্ষিতকে অশোক গুজরাটে বৌদ্ধমত প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যবন ধর্ম্মরক্ষিতের মূল নাম কি ছিল তাহা জানা যায় নাই। বৈষ্ণব হরিদাসের মুসলমানী নাম যেরূপ অজ্ঞাত, ধর্ম্মরক্ষিতের পূর্ব্বনামও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। কিন্তু তিনি ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবধর্ম্মে এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে অশোক তাঁহাকে প্রাদেশিক আচার্য্যের পদ দিয়াছিলেন। সাঁচির স্তূপে দেখা যায় অশোক ধর্ম্মপ্রচারার্থ গ্রীস দেশে আচার্য্য মহারক্ষিতকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি মহারাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ, নেপাল প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল আচার্য্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের নামও পাওয়া গিয়াছে। অশোক-অনুশাসনে তিনি কোন্ কোন্ দিনে কোন্ কোন্ পশু-বিনাশ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন। যে দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যজ্ঞধূমে আকাশ সমাচ্ছন্ন ছিল এবং ঢক্কা প্রভৃতি নানারূপ বাদ্য-যন্ত্রের উচ্চ শব্দে পশুর মৃত্যুকালের মর্ম্মান্তিক চীৎকার শ্রুতির অনায়ত্ত হইয়া যাইত, সেই দেশে একদিনে অশোক পশুহনন থামাইয়া দিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি কত দিক্ হইতে কতরূপ ওজুহাতে সে পশুহত্যা-নিবৃত্তির নীতি অতি ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে তিনি একরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, জৈন (আজীবক) দিগের প্রতিও তাঁহার সৌজন্য ও মহানুভবতা সেইরূপ স্মরণীয়। তাঁহার রাজ্যের ত্রয়োদশাব্দে তিনি খালতিগ পাহাড়ের গুহা ও ন্যগ্রোধ গুহা জৈনদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, এই দুইটি গুহা বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের বিশ বৎসর পরে সেইরূপ আবার "সুপ্রিয় গুহাটি"ও আজীবকদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ভাবে তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহার অনুশাসনে তিনি লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পরের ধর্ম্ম নিন্দা করে—সে নিজের ধর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধা আনয়ন করে।"

অশোকের পরে মৌর্য্যবংশীয় নিম্নলিখিত রাজগণের নাম শোনা যায়:—

১। দশরথ—(২৩২ খৃঃ পূঃ) নাগার্জ্জুনী গিরিগুম্ফা আজীবকদিগকে দান করেন ইহার পরেই মৌর্য্যবংশের অবনতি আরম্ভ হয়। (বায়ুপুরাণ)

মৌর্য্য-রাজত্ব ৩২৫—১৮৫ খৃঃ পূঃ, মোট ১৪০ বৎসর।

২। সংগত মৌর্য্য (উপাধি 'বন্ধুপালিত')। (বায়ুপুরাণ)

৩। সালিসুক (সারিশুক) মৌর্য্য ('দাস-বর্ম্মণ' এবং 'দেব-বর্ম্মণ' এই দুই উপাধিতে পরিচিত); ইনি উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ রাজা খারবেল-কর্ত্তৃক পরাস্ত হন।

৪। সোমশরমণ মৌর্য্য (দাস শরম্মণ বা দেবশর্ম্মণ)। (বায়ুপুরাণ)
৫। সত্যধনবান মৌর্য্য। (বায়ুপুরাণ)
৬। বৃহদ্রথ মৌর্য্য (মন্ত্রী পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত)।

(অশোক খৃঃ পূঃ ২৩২ অব্দে পরলোকগমন করেন এবং খৃঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে অশোকের ৪৭ বৎসর পরে মৌর্য্য-সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়। তাঁহার পরে ছয়জন নৃপতি মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন—তাঁহাদের সমগ্র রাজত্ব কাল ৪৭ বৎসর। ইঁহাদের মধ্যে দশরথ ৮ বৎসর। অপরাপর রাজার সময় সমভাবে বিভক্ত করিলে তাঁহারাও প্রত্যেকে প্রায় ৮ বৎসর করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বলা হইয়াছে, এই রাজত্বকাল মোটে ৪৭ বৎসর। কোন্ রাজা সাম্রাজ্যের কতটা শাসন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইঁহাদের মোট রাজত্বকাল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য হইতে অশোক পর্য্যন্ত—৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ১৪০ বৎসর কাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ কি? যাহা হঠাৎ এত বিস্তৃতি লাভ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বিশালতা লাভ করিয়াছিল—তাহার ধ্বংসের বীজ নিজের মধ্যে লইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়াছিল। অশোকের শাসনতন্ত্র সমস্ত জগতের প্রতি সার্ব্বজনীন উদারতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে সমভাবে শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। যাহারা চরিত্রবলে শ্রদ্ধার দাবী উপস্থিত করিতেন তিনি হঠাৎ তাঁহাদের চিরাগত অর্জ্জিত শ্রদ্ধা অগ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে, যাহা কিছু সনাতন কাল হইতে অধ্যাত্ম ও ধর্ম্মনীতির গুণে পূজা পাইয়া আসিয়াছিল, তাহা হঠকারিতা করিয়া তিনি উড়াইয়া দেন নাই। কাহারও প্রাণে পীড়া দান করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যতটা সতর্কতাই অবলম্বন করুন না কেন, যাঁহারা বহুযুগের ক্ষমতা ও প্রতাপ ভোগ করিয়া বংশমর্য্যাদা ও রক্তের গৌরবে সুচিরাগত আভিজাত্যে দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের সকল দাবী তিনি রক্ষা করিবেন কিরূপে? ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকার ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ছিল, সেই অধিকারের ভাগ অপর কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে ব্রাহ্মণেরা স্বতঃই কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন

ধর্ম্মের বিচার, ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা ও সত্যধর্ম্ম রক্ষিত হয় কিনা তাহার বিচারার্থ "ধর্ম্ম মহামাত্র" নামক একশ্রেণীর ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন, তখন সাধারণের উপর তাঁহাদের যে অমোঘ আধিপত্য ছিল, তাহা হইতে তাঁহারা সহজেই বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। এই কার্য্যের উপকারিতা ও প্রজাবর্গের হিতৈষণা কেহ অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের বিলোপ।

গির্ণার পর্ব্বতের অনুশাসনে অশোক পশুবলিযুক্ত হোমাদি নিষেধ করিয়াছেন। ধর্ম্মমহামাত্রের পদ এক সময়ে হিন্দুরাজ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহা উঠিয়া যায়, বহু শতাব্দী পরে তিনি এই পদের পুনরায় সৃষ্টি করিলেন; যেখানে যেখানে তখন ব্রাহ্মণগণের অখণ্ড আধিপত্য ছিল, ধর্ম্মমহামাত্রগণ ধর্ম্মগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ দেবতাস্থানীয় ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অপরাপর মনুষ্যের সমান করিয়া ঘোষণা করিলেন। (সিদ্ধপুর শিলালিপি।)

পশুবধযুক্ত হোম নিষেধ।

চতুর্থ স্তম্ভলিপিতে তিনি বলিয়াছেন, ব্যবহার ও দণ্ডদানে যেন পক্ষপাত না করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্থলে সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মের দণ্ডমুণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের কর্ত্তা ছিলেন ব্রাহ্মণেরা, তাঁহাদিগের সেই স্থান আর একচেটিয়া রহিল না, ধর্ম্মমহামাত্রগণ ও রাজুকগণ সেই সেই বিভাগে কর্ত্তা হইলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যতই গর্হিত কার্য্য করিতেন না কেন, তাঁহার প্রতি শারীরিক দণ্ড নিষিদ্ধ ছিল, সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করাইবার কোন উপায় ছিল না। যদিই বা তাঁহারা স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইতেন তাঁহাদিগের উক্তি মাত্র লিখিয়া লওয়া হইত। তাঁহাদিগকে কিছুতেই জেরা করা যাইত না। "দণ্ডের মধ্যে তাঁহাদের প্রধান দণ্ড ছিল শিখা-কর্ত্তন।" "ব্যবহার-সমতা বা দণ্ড-সমতা" এই দুই কথার দ্বারা অশোক ব্রাহ্মণ-শূদ্রে কোন পার্থক্য রাখিলেন না। এই সকল কারণে বিশেষ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে গুরুতর বাধা পাইয়া ব্রাহ্মণেরা যে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, অশোক কখনই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন না। চতুর্থ, ত্রয়োদশ এবং সপ্তম স্তম্ভলিপিতে তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যথাযোগ্য সম্মানের বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন। জৈনদিগের আজীবকগণের স্তুতিও বহু শিলালিপিতে স্থাপিত হইয়াছে।

ব্যবহার ও দণ্ডের সাম্য।

কিন্তু বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত স্থান ও গৌরব মানুষ সহজে হারাইতে চায় না। মহাভারতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি গৌরব থাকে, যাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা এখন সেই ব্যাস-বাক্যের বিরুদ্ধতা সহ্য করিতে পারিলেন না। সুতরাং অশোকের উদারতা এবং সর্ব্বজীবের প্রতি সমদর্শিতা অবলম্বনে ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক মৌর্য্যসাম্রাজ্য-ধ্বংসের মূল কারণ ব্রাহ্মণের বিলম্বিত ক্রোধ এবং প্রতিশোধেচ্ছা।

কেহ কেহ বলেন যে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষে এই পতন ততটা হয় নাই,—অপরাপর কারণও যথেষ্ট ছিল। অশোক ন্যায় ও ধর্ম্মের ভিত্তির উপর যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণ তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। আরাঞ্জীবের পর দ্বিতীয় আরাঞ্জীব জন্মগ্রহণ করেন নাই; সেইজন্যই মোগল সাম্রাজ্য হস্তান্তরিত হইয়া গেল। অশোকের বংশধরগণ সকলেই হীনবীর্য্য ও দুর্ব্বল ছিলেন। অর্জ্জুনের গাণ্ডীব অর্জ্জুনই ব্যবহার করিতে পারিতেন। অশোকের পরে, এই বিশাল সাম্রাজ্য যে সকল মহাগুণে দৃঢ়ীভূত হইয়া একত্র সম্বদ্ধ হইয়াছিল, সেই গুণরাশির অভাবে ইহার ভিত্তি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য। তথাপি আমরা বলিব, বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ থাকা সত্ত্বেও আরাঞ্জীবের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের অনুরাগের অভাবই মোগলরাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল; মৌর্য্যসাম্রাজ্যও সেইরূপ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-চক্রান্তেই যে হতবল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অশোকের বংশধরগণের অক্ষমতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্ষাত্রশক্তির পুনরভ্যুদয়

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব অনেক দিন হইতেই ছিল। মুরের সংস্কৃত টেক্‌স্ট পুস্তকে এই দ্বন্দ্বসূচক বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এক সময়ে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পালি অম্বঠ্‌ঠসুত্ত নামক পুস্তকে বিশেষভাবে দেখিতে পাইতেছি। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সময়ে কলহটা খুব ঘনাইয়া আসিয়াছিল। পরশুরাম ক্ষত্রিয়-কুলকে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।

দীর্ঘযুগের পর ক্ষত্রিয় শক্তি পুনরায় বল সঞ্চার করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে খুব শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্য-শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষত্রিয় নরনারায়ণ কৃষ্ণ এই যুগে ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া হিন্দুধর্ম্মকে নূতন এক আকারে গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টায় ক্ষত্রিয়-সমাজের সর্ব্বসম্মত সমর্থন তিনি পান নাই—যেহেতু তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে কেহ কেহ প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলটা—মগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও চেদী প্রভৃতি রাজ্য—কৃষ্ণদ্বেষীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। মগধের জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বাসুদেব, প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের নরক, মুর ও চেদির শিশুপালকে হত্যা করিয়া কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও তদীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্যের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ যুগও বেশীদিন টিকিল না। কুরুক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষত্রিয়শক্তি ধ্বংস পাইল। দুর্য্যোধন এবং যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যে সকল ক্ষত্রিয় বীর জীবিত রহিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করা যায়। মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয় পুনরায় হীনবল হইলেন। তখন হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর শির উত্তোলন করিতে লাগিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর আর কোন বড় ক্ষত্রিয় রাজার কথা অনেকদিন পাওয়া যায় নাই। তথাপি নিম্নস্তরের লোকদের ক্ষত্রিয়দিগকে ডিঙ্গাইয়া শ্রেষ্ঠপদ লাভ করা বড় সহজ কাজ হয় নাই। বিনষ্টপ্রায় ক্ষাত্র শক্তিরও একটা শৃঙ্খলা ও শাসনপ্রণালী অটুট ছিল—নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা সহজে কাড়িয়া নিতে পারে নাই। আর্য্যাবর্ত্তে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে পুনরায় একটি সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই দ্বন্দ্ব ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে নহে, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়ে নহে, ক্ষত্রিয়-শূদ্রে।

ক্ষাত্রশক্তির বিলয়।

মহানন্দকে সকলে একবাক্যে দ্বিতীয় ভৃগুরাম উপাধি দিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি হীনবংশজাত ছিলেন, এবং পরশুরামের ন্যায়ই ক্ষত্রিয়-কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ বিপুল আহবে ক্ষত্রিয়শক্তি হীনবীর্য্য হইয়া ধ্বংস পাইল। নবোত্থিত নন্দদিগকে চাণক্য সংহার করিলেন। মৌর্য্যবংশীয় অশোক সমাজের উপর ব্রাহ্মণগণের অসম্ভব প্রভুত্ব মানিলেন না।

ব্রাহ্মণগণ পুনঃ পুনঃ বিপদের মুহূর্ত্তে স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, অশোক সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়া গ্রীস্, ইজিপ্ট, ম্যাসিডনিয়া প্রভৃতি নানাদিকে শ্রমণ ও ভিক্ষু প্রেরণপূর্ব্বক বিদেশীয়দিগকে সঙ্ঘের পক্ষপাতী করিয়া তুলিতেছেন, দলে দলে গ্রীক সৈন্য আসিয়া মৌর্য্যদিগের আশ্রয় লইতেছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মোক্ত সত্য জনসাধারণের মনের কথা, তাহা ব্রাহ্মণদিগের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে—বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের অটুট ক্ষমতা বৌদ্ধেরা স্বীকার করেন না। ক্ষত্রিয়-শক্তি যাহা ব্রাহ্মণদের অনুকূল হইয়া আসিয়াছিল—তাহা শূদ্রনরপতিদের দ্বারা একেবারে পর্য্যুদস্ত। শাসনে, ধর্ম্ম ও সমাজে মত্ত হস্তীর বেগে নবগঠিত মহাযান-মত সমগ্র ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে উদ্যত। ব্রাহ্মণেরা এই বিপদের সময়ে ক্ষত্রিয়-শক্তি গঠন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। চারিদিকে অনার্য্য-সমাজ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া নিঃক্ষত্রিয় আর্য্যাবর্ত্তের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অশোকের মধ্যাহ্ন-ভাস্করতুল্য অপ্রমেয় তেজ ও জগদ্ব্যাপক অন্তরঙ্গত্বের প্রভাবে সেই সকল বিদেশীয় শত্রুরা নিরস্ত ছিল। কিন্তু এবার দলে দলে আসিয়া কেহ বা শত্রুভাবে কেহ বা বন্ধুভাবে দেখা দিল। শকদিগের এক প্রধান দল বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে অখণ্ড আধিপত্য স্থাপন করিলেন। তাঁহারা পর হইয়াও পর থাকিলেন না। কনিষ্কের প্রবর্ত্তিত অব্দ এখনও আমাদের পঞ্জিকার শিরোভূষণ।

অগ্নিকুল।

ভারতের চতুঃসীমার উপান্তভাগে যে সকল বিদেশীয়েরা আনাগোনা করিতেছিলেন, তাঁহারা ভারতের চন্দ্রসূর্য্যবংশের খ্যাতির সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। ভারত তখন সমস্ত এশিয়ার মধ্যমণি, এমন কি য়ুরোপের চক্ষুও তাহার দীপ্তিতে ঝলসিয়া গিয়াছিল। জগতের রাজন্যবর্গের কিরীটস্বরূপ চন্দ্রসূর্য্যবংশীয়দের কীর্ত্তিকথা হুন প্রভৃতি জাতিরা বিলক্ষণ

জানিতেন। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদিগের কোন কোন শ্রেণীকে লোভ দেখাইয়া আহ্বান করিলেন— আমরা তোমাদিগকে ক্ষত্রিয়পদে স্থাপন করিব, তোমরা চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় বলিয়া মানিয়া লইব এবং সমস্ত ভারতের অধিকার তোমাদিগকে দিব, তোমরা আমাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লও। আবু পর্ব্বতের কোন নিবিড় গুহায় এই গুপ্ত মন্ত্রণা চলিতেছিল। বর্ব্বর জাতিদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান পূর্ব্বক তথায় একটা যজ্ঞের ব্যবস্থা হইল—পেমর, প্রতিহার, চৌহান এবং সোলাঙ্কী (চৌলুক্য) এই চারিশ্রেণীর নাম হইল অগ্নিকুল—ইহারা নবসৃষ্ট ক্ষত্রিয়, অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহাই প্রবাদ। আবু পর্ব্বত রাজপুতনার দক্ষিণ দেশে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়কুলের অমিত বিক্রম, দেশানুরাগ তপস্যায় দৃঢ়তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতি উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। মাত্র এই চারিটি বংশ নহে, ভারতবর্ষের গিরিসঙ্কুল উপত্যকা-ভূমিতে বহু রাজবংশ এই ভাবে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া ব্রাহ্মণদের কৃপায় ক্ষত্রিয়-খাতায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গলা দেশেও এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের উদাহরণ অনেক দৃষ্ট হয়, ক্ষত্রিয়ত্বে দীক্ষিত জাতিরা ক্রমে ক্রমে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয়কুলের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া পুনরায় নবপ্রবুদ্ধ ক্ষাত্র-শক্তিকে ভারতব্যাপী করিয়া তুলিতেছিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের গৌরবের দীপ্তি এখনও লুপ্ত হয় নাই, এই বংশে প্রবেশের দাবী দৃঢ় করিবার জন্য কত রাজা-মহারাজা কুবেরের ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিয়াছেন। সেই যে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী এবং ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা, যাহা রাজপুতনার দক্ষিণাংশে শিলাতলে হোমাগ্নি হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহার জের এখনও চলিতেছে। একদিকে যখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রচণ্ডবেগে প্রাচীন বর্ণাশ্রমের সুরক্ষিত তীরদেশ ভগ্ন করিয়া ডাঙ্গা ও পানী এক করিয়া ফেলিতেছে, অপর দিকে এই বাঙ্গলা দেশই সেই আবু পর্ব্বতের ব্রাত্যশুদ্ধি কত অনুন্নত জাতিকে ক্ষত্রিয়পদ দিয়া ব্রাহ্মণের তৈলবটের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। বাঙ্গলার প্রায় এমন কোন হিন্দু পল্লী নাই, যাহা আবু পর্ব্বতের সেই অভিনয় করিয়া ঘরে ঘরে নব নব অগ্নিকুল উৎপাদন না করিতেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুঙ্গবংশ

মৌর্য্যবংশের মোট রাজত্বকাল ১৪০ (মতান্তরে ১৩৭) বৎসর। এই সময়ের মধ্যে অশোকের পর মৌর্য্যবংশের রাজাদের বিশেষ কোন কীর্ত্তিকথা শোনা যায় না। অশোকের পৌত্র দশরথ বৌদ্ধদিগের অপেক্ষা জৈনদিগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নাগার্জ্জুন গিরিগুহা এবং তৎসংলগ্ন উপত্যকা-ভূমি আজীবকগণকে দান করিয়াছিলেন। সালিসুখ (সাম্রিসুক) মৌর্য্য (বায়ুপুরাণ অনুসারে ইঁহাদের নাম ইন্দ্রপালিত) উড়িষ্যার সুবিখ্যাত রাজা খারবেল কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

শেষ মৌর্য্য রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র অতি সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমর-নীতি-বিশারদ ছিলেন। তিনি শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে ইঁহারা পুরুষপরম্পরা মৌর্য্যরাজগণের পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ও ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের ক্রম-অবনতি ইঁহারা খুব সুচক্ষে দেখেন নাই। রাজপ্রাসাদের বাহিরে ধীরে ধীরে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় ব্রাহ্মণ্য অভিসন্ধি ও ষড়্‌যন্ত্র মৌর্য্যকুললক্ষ্মীর সিংহাসনের ভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল। এদিকে গ্রীক বীর—মিনাণ্ডার পশ্চিম ভারত জয় করিয়া বিপুলবাহিনী সঙ্গে মৌর্য্যরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। এই বিদেশী শত্রুর দুর্নিবার গতি পুষ্যমিত্র নিবারণ করিয়াছিলেন। নানা কারণে পুষ্যমিত্রের প্রভাব দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ শূদ্র-শাসনে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দুগণ বৌদ্ধ-প্রভাবে ম্রিয়মাণ ছিলেন—এরূপ অবস্থায় বৃহদ্রথের শিথিল হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লওয়া পুষ্যমিত্রের পক্ষে কোনই কঠিন কার্য্য হইত না। কিন্তু চিরদিন যাঁহাদের আশ্রয়ে পালিত, তাঁহাদের এরূপভাবে সর্ব্বনাশ করিলে লোকচক্ষে তাহা নিন্দনীয় হইত। রাজাকে সমস্ত সৈন্য পরিদর্শন করিবার ছলনায় লইয়া আসিয়া কোনও সৈন্যের শরে তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে চাপিয়া বসা তিনি তদপেক্ষা সমীচীন নীতি মনে করিয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনা খৃঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল।

শুঙ্গবংশ ১৮৫—৭৩ খৃঃ পূঃ।

কথিত আছে পুষ্যমিত্র অশোকের ৮৪ হাজার ধর্ম্মরাজিকা ধ্বংস করেন এবং অক্ষয় বটের মূলচ্ছেদ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করিয়া নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহা ব্রাহ্মণ রাজা যে ঠিক বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। অশোকের বহুসংখ্যক (৮৪ হাজার [?]) শিলালিপি হিমালয় হইতে কুমারিকা, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থান হইতে বাঙ্গলা ও আসাম পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেগুলি শুধু পল্লীতে পল্লীতে শৈলগাত্রে অঙ্কিত ছিল এমন নহে; তাহার অর্থ লোক বুঝে কি না, তাহা লোকে সর্ব্বদা পড়িয়া স্মরণ রাখে কি না—ইহা পরিদর্শন করিবার ভার ধর্ম্মমহামাত্র ও রাজুকদের উপর ন্যস্ত ছিল। সেই অনুশাসনগুলি সংস্কৃত কিংবা শুধু রাজধানীর ভাষায়—শুধু ব্রাহ্মী বা কুটিল লিপিতে লিখিত হয় নাই। তাহা খোরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রাদেশিকলিপিতে এবং ভারতের নানা প্রাদেশিক অক্ষরে ও ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। সেই বিশাল অনুশাসন-সাহিত্য সমস্ত জনপদের লোকেরই অধিগম্য ছিল। এই অনুশাসন এরূপই সরল সহজ ও সুখপাঠ্য ছিল যে তাহা সর্ব্বসাধারণের কণ্ঠস্থ হইয়া থাকিবার কথা। স্তবমালার ন্যায় ইহারা নিত্যপাঠ্য ছিল।

পুষ্যমিত্রের বৌদ্ধদলন।

এই উপদেশগুলি ব্রাহ্মণগণ কখনই সুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। সমস্ত মানুষের সমান অধিকার, বিচারসাম্য, ব্যবহারসাম্য এসকল কথা বাহিরের লোকের কর্ণে কিছুই অদ্ভুত শোনায় না। কিন্তু এই ভারতবর্ষে বসিয়া কে তখন বলিতে পারিত যে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের বিচারশালায় স্থান এক? এই পশু-হনন-নিষেধ অর্থাৎ যজ্ঞলোপ—যে যজ্ঞ ব্রাহ্মণ্য-প্রতিপত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, যাহা ব্রাহ্মণকে নানা দান-দক্ষিণায় পুরস্কৃত করিত—সেই

যজ্ঞবিধি ও পশু-হনন-নিষেধ, এই সকল উপদেশ প্রস্তরগাত্র হইতে সরল পল্লীলোকের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত ও অঙ্কিত হইয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ্য-শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি ভারতবর্ষে এই শিলামালার সান্নিধ্যে কিরূপে অটুট থাকিবে? পুষ্যমিত্র এই শাস্ত্র জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ব্রাহ্মণের মনের জ্বালা নির্ব্বাণ করিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহেবদের মত মৌলিকত্ব দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন, যখন পুষ্যমিত্র ও তদ্বংশীয় অনেকেরই মিত্র উপাধি দৃষ্ট হয় এবং "মিত্র" শব্দের অর্থ "সূর্য্য", তদ্দ্বারা মনে হয় এই বংশ মূলে সূর্য্য-উপাসক পারসিক ছিলেন এরূপ অকিঞ্চিৎকর ভিত্তির উপর এতাদৃশ বিরাট্ ঐতিহাসিক মত স্থাপন করিতে ভিন্সেণ্ট স্মিথও সাহসী হন নাই। তিনি বিষয়টাকে একেবারে উড়াইয়া না দিয়া বলিয়াছেন, "আমি এ কথা মানিতে চাই না।" পুষ্যমিত্র সামবেদীয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বৌ ধর্ম্মকে দু'হাতে আছড়াইয়া মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি জা পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ম্মম বৌদ্ধ-পীড়িন-নীতি চালাইয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র সম্বন্ধে অনেক ক কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকে দৃষ্ট হয়। ইহারই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ পাণিনি তাঁহ অদ্বিতীয় ব্যাকরণ রচনা করেন। পুষ্যমিত্র অতি আড়ম্বরের সহিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠা করেন। পশুহননশীল যজ্ঞাগ্নি আর্য্যাবর্ত্তে একেবারে নিবিয়া গিয়াছিল, অশোকের পর পুষ্যমিত্র পুনরায় সেই যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। রাজকুমার অগ্নিমিত্র বিদর্ভ রাজকে জয় করিয়া সেই জয়োল্লাসে সার্ব্বভৌম নৃপতির গৌরবমাল্য তাঁহার পিতাকে পরাইবার জন্য এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই মগধ হইতে আত্ম রক্ষার্থ বৌদ্ধগণের নানাস্থানে পলায়নের আরম্ভ হয়। "Many Monks who escaped his sword are said to have fled into the territories of other rulers" (Smith, History of India, p. 213).

পুষ্যমিত্র	রাজত্বকাল	১৮৫ খৃঃ পূঃ
অগ্নিমিত্র	,,	১৪৯ ,, ,,
বাসুজ্যেষ্ঠ	,,	১৪১ ,, ,,
বসুমিত্র	,,	১৩৪ ,, ,,
অন্ধ্রক	,,	১২৪ ,, ,,
পুলিণ্ডক	,,	১২২ ,, ,,
বজ্রমিত্র	,,	১১৯ ,, ,,
ভাগবত	,,	১১০ ,, ,,
দেবভূমি	,,	৭৮—৭৩ খৃঃ পূঃ

(পার্জিটার—কলিযুগের রাজবংশ ; পৃঃ ৩০—৭০

একুনে যোগ করিলে মিত্রবংশের রাজত্বকাল ঠিক ১১২ বৎসর হয় না, যদিও ১১২ বৎসরই এই বংশের রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট আছে; সামান্য ৩।৪ বৎসরের তফাৎ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এক রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীর অভিষেক ঠিক তার পরের দিনই হয় না, শুভদিন ও অপরাপর কারণের প্রতীক্ষায় বিলম্ব হইয়া থাকে। অভিষেক হইতে অনেক সময়ে ৩।৪ মাস দেরী হইয়া যায়। সুতরাং ঠিক অভিষেক হইতে রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত সময় ধরিলে ঐ ১১২ বৎসরই ঠিক হইতে পারে।

নানা কারণে মনে হয় সুঙ্গ বংশের রাজত্ব খুব শান্তিপূর্ণ ছিল না, ঘরাও কারণে ও গৃহবিচ্ছেদে সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি চলিতেছিল। অগ্নিমিত্রের পুত্র সুমিত্র নাট্যামোদী ছিলেন, তিনি যখন তাঁহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া আনন্দ করিতেছিলেন তখন মিত্রদেব নামক একব্যক্তি তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। "পদ্মনাল হইতে পদ্ম যেমন খসিয়া পড়ে, সেইরূপ মিত্রদেবের তরবারির আঘাতে সুমিত্রের মস্তক কণ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল।" (বাণ—হর্ষচরিত, ৪র্থ অধ্যায়।) সুঙ্গবংশের শেষ রাজা দেবভূতি বা দেবভূমি লম্পট ছিলেন, এই লাম্পট্যের ফলে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হন।

সুঙ্গবংশীয় শেষ রাজার অপমৃত্যু।

খৃঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে পুষ্যমিত্র তাঁহার প্রভু বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তদীয় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। অনুমান ৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দে দেবভূতিকে হত্যা করিয়া সেইরূপে তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী বাসুদেব (কাণ্বংশীয়) মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। বাসুদেব ও তাঁহার বংশধরগণ মোট ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। সুঙ্গবংশ ১১২ বৎসর ও কাণ্বংশ ৪৫ বৎসর, মোট ১৫৭ বৎসর বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ছিল। খৃঃ পূঃ ১৮ অব্দে মগধে ব্রাহ্মণরাজত্বের অবসান হয়। কিন্তু কালের এই হিসাব ঠিক রাখিয়াও ভিন্‌সেন্ট স্মিথ ব্রাহ্মণরাজত্বের অবসানের তারিখ ২৭ কি ২৮ খৃঃ অব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা কি করিয়া হইল অনুমান করিতে পারিলাম না। কথিত আছে, কাণ্বংশের শেষ রাজাকে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রবংশের রাজা সিমুক (সিপ্রক) হত্যা করেন। অন্ধ্রবংশের রাজারা মগধ বিজয় করিলেও পূর্ব্বভারতের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক কমই ছিল।

সম্ভবতঃ অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল রাজত্বের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শাসন-শিথিলতা দৃষ্ট হইতেছিল—তাহার ফলে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন সামন্তরাজ ঠিক স্বাধীন না হইলেও আপনাদিগের অধীনতার পাশ অনেকটা ছেদন করিয়াছিলেন। অন্ধ্রনরপতিরা সেইরূপ কোন সামন্তরাজবংশীয় ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্ব ভারতের সঙ্গে অন্ধ্রদিগের সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল বলিয়া আমরা তাঁহাদের কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। কিন্তু বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে আকারে আমরা দেখিতে পাই, তাহা দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত ধর্ম্মের রূপান্তর। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের তামিল কবিদের শিবস্তোত্রের সঙ্গে বাঙ্গলার অনেক বৈষ্ণব এমন কি শাক্ত কবিদের স্তোত্রেরও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আমরা

কাণ্ব ও অন্ধ্রবংশ।

পরে তাহা কতকটা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিব। বাসুদেবের পূজাও অন্ধ্র রাজগণই উত্তরপূর্ব্ব ভারতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, এবং বাঙ্গলার নানাজাতির সঙ্গে তামিল-সংমিশ্রণ অন্ধ্ররাজগণের সময়েই বেশী হইয়া থাকিবে।

পুরাণকারেরা শিশুনাগ, ইক্ষাকু, অন্ধ্র, পৌরব এবং পাণ্ডুবংশের যে তালিকা দিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে দিলাম। বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও অগ্নিপুরাণ হইতেই আমাদের তালিকা মূলতঃ সঙ্কলিত হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ হইতে অপরাপর পুরাণোক্ত রাজগণের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছিল—পার্জিটার সাহেব এই মতাবলম্বী।

ইক্ষাকু বংশ:—১। বৃহদ্বল ২। বৃহৎক্ষয় ৩। উরুক্ষয় ৪। বৎসব্যূহ ৫। প্রতিব্যোম ৬। দিবাকর ৭। সহদেব ৮। বৃহদশ্ব ৯। ভানুরথ ১০। প্রতীতাশ্ব ১১। সুপ্রতীক ১২। মরুদেব ১৩। সুনক্ষত্র ১৪। কিন্নরাশ্ব ১৫। অন্তরীক্ষ ১৬। সুপর্ণ ১৭। অমৃতজিৎ ১৮। বৃহদ্ভ্রাজ ১৯। ধর্ম্মিন্ ২০। কৃতঞ্জয় ২১। রণঞ্জয় ২২। সঞ্জয় ২৩। শাক্য ২৪। শুদ্ধোদন ২৫। সিদ্ধার্থ ২৬। রাহুল ২৭। প্রসেনজিৎ ২৮। ক্ষুদ্রক ২৯। কুলক ৩০। সুরথ।

শিশুনাগবংশ:—১। শিশুনাগ ২। কাকবর্ণ ৩। ক্ষেমধর্ম্ম ৪। ক্ষত্রৌজস ৫। বিম্বিসার ৬। অজাতশত্রু ৭। দর্শক ৮। উদয়িন ৯। নন্দীবর্দ্ধন ১০। মহানন্দিন্ ১১। মহাপদ্মনন্দী ১২। সুকল্প বা সুমলয়।

মহাপদ্মনন্দী ক্ষত্রিয়বংশ-ধ্বংসকারী, তাঁহার ৮ পুত্র ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং কৌটিল্যের চক্রান্তে নিহত হন।

মৌর্য্যবংশ:—১। চন্দ্রগুপ্ত ২। বিন্দুসার ৩। অশোক ৪। কুনাল ৫। বন্ধুপালিত ৬। দর্শন ৭। দশরথ ৮। সম্প্রতি ৯। সালিশূক ১০। দেবধর্ম্ম ১১। শতধনবান্ ১২। বৃহদ্রথ (পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত)।

সুঙ্গবংশ:—১। পুষ্যমিত্র ২। অগ্নিমিত্র ৩। বসুজ্যেষ্ঠ ৪। বসুমিত্র ৫। অন্ধ্রক ৬। পুলিন্দক ৭। ঘোষ ৮। বজ্রমিত্র ৯। ভাগবত ১০। দেবভূমি (১০ জন সুঙ্গ)।

অন্ধ্রবংশ:—১। সিমুক ২। কৃষ্ণ (ভ্রাতা) ৩। শ্রীসাতকর্ণী ৪। পূর্ণোৎসঙ্গ ৫। স্কন্ধস্তম্ভি ৬। সাতকর্ণী ৭। লম্বোদর ৮। মেঘস্বাতি ৯। আপীলক ১০। স্বাতি ১১। স্কন্দস্বাতি ১২। মৃগেন্দ্রস্বাতি ১৩। পুলোমা ১৪। অরিষ্টকর্ণ ১৫। হাল ১৬। সুন্দর সাতকর্ণী ১৭। চকোর সাতকর্ণী ১৮। শিবস্বাতি ১৯। গৌতমীপুত্র ২০। পুলোমা ২১। সাতকর্ণী ২২। শিবশ্রীপোম ২৩। শিবস্কন্দ ২৪। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী ২৫। বিজয় ২৬। চন্দশ্রী সাতকর্ণী ২৭। পুলোমারি।

রঘুবংশ:—১। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ ২। অতিথি ৩। নিষধ ৪। নল ৫। নভঃ ৬। পুণ্ডরীক ৭। ক্ষেমধন্বা ৮। দেবানীক ৯। অহীনগু ১০। পারিপাত্র(?) ১১। উন্নাভ ১২। বজ্রনাভ ১৩। শঙ্খন ১৪। ব্যুষিতাশ্ব ১৫। বিশ্বসহ ১৬। হিরণ্যনাভ ১৭। কৌশল্য ১৮। ব্রহ্মিষ্ঠ ১৯। পুত্র ২০। পুষ্য ২১। ধ্রুবসন্ধি ২২। সুদর্শন ২৩। অগ্নিবর্ণ।—ইনি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও রমণীগণপ্রিয় ছিলেন এবং আঙ্গিক, সাত্ত্বিক ও বাচিক এই ত্রিবিধ নৃত্য দ্বারা রমণীদিগকে মুগ্ধ করিতেন; ইনি অল্প বয়সে রাজযক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। (কালিদাসের রঘুবংশ হইতে গৃহীত)।

পৌরববংশ :—১। **অর্জ্জুনপৌত্র (এবং অভিমন্যু-পুত্র) পরীক্ষিত** ২। **জন্মেজয়** ৩। **শাতানিক** ৪। **অশ্বমেধদত্ত** ৫। নিচক্ষু (**ইঁহার সময়ে হস্তীনাপুর গঙ্গাগর্ভজাত হয়, ইনি কৌশম্বি নগরে রাজধানী স্থাপন করেন**)। ৬। **উষ্ণ** ৭। **চিত্ররথ** ৮। **সুচিরথ** ৯। **বৃষ্ণিমৎ** ১০। **সুসেন** ১১। **সুনীথ** ১২। **রুচা** ১৩। **নৃচক্ষু** ১৪। **সুখিবল** ১৫। **পরিপ্লব** ১৬। **সুন্তায়** ১৭। **মেধাবীন** ১৮। **নৃপঞ্জয়** ১৯। **ধ্রুব** ২০। **তিগমাতমান** ২১। **বৃহদ্রথ** ২২। **বাসুদন** ২৩। **শতানিক** ২৪। **উদয়ন** ২৫। **বহিনারা** ২৬। **দণ্ডপাণি** ২৭। **নিরামিত্র** ২৮। **ক্ষেমক**।

পার্জিটার সাহেব অনুমান করেন, পুরাণগুলি পূর্ব্বে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় বংশাবলী-গাথারূপে লিখিত ছিল, গুপ্তদের রাজত্বের পূর্ব্বভাগে এই শাস্ত্র সংস্কৃতে ফিরিয়া লেখা হয়। ইহার পক্ষে তিনি ভাষাগত যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয় বলিয়াই মনে হয়। গুপ্তরাজত্বের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পুরাণগুলিতে কতকটা ইঙ্গিত আছে—তখন তাঁহাদের রাজ্য আনুগঙ্গ প্রদেশে—প্রয়াগ, সকেত এবং মগধ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পুরাণসঙ্কলনের আদিপর্ব্ব শেষ হয়, গুপ্তগণ তখন অপর কয়েক জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যের অন্যতম ছিলেন এবং পুরাণে ইঁহারা সকলে ব্যয়কুণ্ঠ, দয়াহীন, অনৃতাচারী খামখেয়ালী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের আলবিরুনীর কথা স্মৃতিতে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শৈব ধর্ম্মের বিবর্ত্তন, শিব বনাম বুদ্ধ।

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ-
মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-
ন্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥"—কালিদাস।

বোধ হয় বেদ পুরাণ ও কাব্যে মহাদেব যে ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছেন, অন্য কোনও দেবতা সে প্রকার রূপমহিমমণ্ডিত হইয়া দেখা দেন নাই।

বেদে তিনি বিনাশের দেবতা। তাঁহার উপর পুরাণ, উপপুরাণ ও কাব্য ক্রমে রং ফলাইয়া তাঁহাকে অতি উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার নর্ত্তন—আনন্দের আতিশয্য;—সেই আনন্দ তাঁহার বিষাণ-বাদনে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ত্রিশূলাঘাতে ও জগদন্তকর তাণ্ডবে পরিব্যক্ত। দিগ্বলয়ে গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক সেই আনন্দে নির্ব্বাপিত হয়। দিগ্‌হস্তিগণ স্কন্ধ হইতে ধরিত্রীর বোঝা ফেলিয়া দিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেই তাণ্ডব-নর্ত্তনে যোগ দেয়। নর্ত্তন কালে শিবের ভ্রূভঙ্গে জগতের বিলয় হয়। তথাপি জগৎ তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হয়।

ধ্বংসের আনন্দ, রুদ্রতাণ্ডব।

প্রদীপের চারিদিকে পতঙ্গের মত জগতের এই প্রগতি। মৃত্যু ও ধ্বংস নিশ্চয়, তথাপি জগতের এই প্রগতি। আনন্দ-স্বরূপের এই প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবের চিরানুচর বিশ্বমণ্ডলী,—মৃত্যুই ইহার নিয়তি। তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নর্ত্তনে যোগ দিয়া শুধু মৃত্যুর জন্যই অগ্রসর হয়। এই মৃত্যুর অগ্নিকুণ্ডে জ্বালামুগ্ধ রূপকামী পতঙ্গের মৃত্যু অনিবার্য্য, উহা তাহার ভালবাসার সহ-মরণ।

এই তাণ্ডব—এই বিশ্বধ্বংস এবং কৃষ্ণের রাসলীলা উভয়ই এক সামগ্রী। রাসে জীবের সমস্ত কামনা, লজ্জা, ভয়, ঐশ্বর্য্য, আত্মপরজ্ঞান নষ্ট হইয়া এক আনন্দময়ের খেলার সাহচর্য্য প্রতীক্ষা করে। তাণ্ডব পুরাতন ভাঙ্গিয়া চূরিয়া চূর্ণ করিয়া নূতন বিশ্বরচনার সূচনা করে।

প্রজ্বলিত দীপশিখায় পতঙ্গগুলি মরে কেন?—স্বেচ্ছায় ও অনিবার্য্য আকর্ষণে। মরে কেন?—জীবকে জিজ্ঞাসা কর। শিবতাণ্ডবে জগৎ নষ্ট হয় কেন?—জগৎকে জিজ্ঞাসা কর। যে এই জ্বালা বুকে লইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে সেই ইহার মর্ম্ম জানে। এই অন্তর-ব্রতের আকর্ষণ অন্যের অবোধগম্য।

শিবের তাণ্ডবনৃত্য ও জগতের ধ্বংস—পুরাণকারের কল্পনার এক অদ্ভুত সৃষ্টি।

নিত্যই সায়ংকালে জগৎ ধ্বংস পাইতেছে, নিত্যই বিঘোর তন্দ্রায় জীবের অস্তিত্ব ডুবিয়া যাইতেছে,—আবার অরুণালোকে কুসুম কুঁড়ির বিকাশের সঙ্গে জীবনের জাগ্রত স্পন্দন উপলব্ধ হইতেছে। বিশ্বদেবতার অঙ্কে চোখ মেলিয়া জাগরণ, এবং তাঁহারই তাণ্ডব বা আনন্দলীলার ঘুম-পাড়ানিয়া গানের সঙ্গে চক্ষু বুজিয়া সুনিদ্রা—বিশ্ব এই ভাবে নিত্য জাগিতেছে, নিত্য মরিতেছে। নিত্য না মরিলে নিত্যকার জগৎ পুরাতন হইয়া যাইত। মৃত্যুই জীবনকে নিত্য স্ফূর্ত্তি দিতেছে।

যিনি বিনাশের দেবতা তাঁহাকে লইয়া পুরাণকারেরা কত রূপেরই না পরিকল্পনা করিয়াছেন! ঢাকায় একটি পাগল ছিল—সে একটা খড়ি লইয়া অতি ব্যস্ততার সহিত বাড়ীর প্রাচীরে মনুষ্যের মূর্ত্তি, বৃক্ষ, পল্লব, ফুল ও ঘর-দরজা আঁকিয়া যাইত।

ঢাকার পাগল।

একটানে যে ছবি সে আঁকিত তাহা অতি নিখুঁত সুন্দর ও সুশ্রী হইত। সেই ছবি আঁকিয়া সে মুহূর্ত্তকাল ছবিটা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিত, তারপরে বলিত "বাঃ", সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা মুছিয়া ফেলিয়া অপর একটা প্রাচীরে সেইরূপ আঁকিতে মনোযোগ দিত। সারাদিন সেই আঁকার বিরাম ছিল না—সারাদিন এই মুছিয়া ফেলারও বিরাম ছিল না।

ধ্বংসের দেবতাটি কি তেমনই পাগল নন? এই পাগলামির একটা আকর্ষণ আছে;—উহা আকর্ষণ-হীনের আকর্ষণ। কিছুতেই যাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়। মানুষের অপর কাহারও উপর না থাকিলেও নিজের সৃষ্টির উপর এবং নিজের জনের উপর দরদ থাকা স্বাভাবিক।

অনাসক্ত স্রষ্টা।

যে বিষবৃক্ষ বপন করে সে বিষবৃক্ষটিকে কর্ত্তন করে না। কিন্তু এ কি দেবতা? এত সুন্দর তাঁহার এই বিশ্ব। শোভার ভাণ্ডারের দু'হাতে মুক্ত-পরিবেশন করিয়া ইচ্ছাসুখে হাত গুটাইয়া ফেলা এবং সমস্ত ধ্বংস করাই ইহার নিত্য-লীলা। এই সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পদ্ম, উদ্দাম গিরিনদী, ধনধান্যময়ী পল্লবিনী প্রকৃতি দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, [illegible] আবার দেখি। কিন্তু শিল্পী নিজে তাহার শিল্প একবারটি না দেখিয়া অমনি তাহা ধ্বংস করেন। এই যে প্রকৃতির শত শত বন্ধনের মধ্যে পরম দেবতা একটি [illegible] স্বরূপ ফুটাইয়াছেন, তাহা অন্য কোন জাতি এমন ভাবে কল্পনা করিতে পারেন নাই। এমন পাগল দেবতা, উন্মত্ত ভোলানাথ, আর কোন ধর্ম্মের শাস্ত্রে নাই। যাঁহার কুবের ভাণ্ডারী, তাঁহার শ্মশানে শয্যা,—হীরা, মণি পারিজাত-পুষ্পের বিজয়মাল্য পরিয়া দেবতারা যাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়েন তিনি নিজে হাড়মালা পরিয়া, ভস্ম ভূষণ করিয়া জটাজূট মুক্ত করিয়া চিতায় বসিয়া আছেন। দেবতাদের অন্যের

সুবাসে অর্দ্ধযোজন আমোদিত হইতেছে, আর শিবের জটাবদ্ধ কেশদাম হইতে "ফণী ফণ্" গর্জ্জন করিতেছে! কে চায় পারিজাত? কে চায় উচ্চৈঃশ্রবা? কে চায় ঐরাবত? কে চায় অমৃত? বুড়ো ষাঁড়ের উপর চাপিয়া দিক্‌দিগন্ত চষিতেছেন—'ডমু' 'ডমু' ডমরু বাজিতেছে। বস্তুতঃ এই হিমাদ্রিসীমান্ত আসমুদ্র প্রদেশ শিবেরই প্রকৃত রাজ্য বলিয়া মনে হয়। সৌম্য, শান্ত, তুষারাবৃত গঙ্গাশেখর হিমালয় শিবেরই লীলাভূমি। সেই চারুচন্দ্রনিভ মুখের উপরে অর্দ্ধচন্দ্রের সুচারু দীপ্তি তাঁহার তৃতীয় নয়ন।

ভারতের ধর্ম্মলক্ষ্মী বড় গুছানো মেয়ে। একালে যিনি যাহা কিছু ভাল লইয়া আসেন, তিনি তাঁহার একটা ভাগ নৈবেদ্যস্বরূপ তুলিয়া রাখেন। বুদ্ধ রাজপুত্র, তরুণ বয়সে জীবকষ্ট দেখিয়া সন্ন্যাসী, জীবের দশা দেখিয়া জগতের দুঃখের ভার তিনি নিজের উপর লইয়াছিলেন। আর শিব রাজপুত্র নহেন, রাজ-রাজেশ্বর,—কৈলাসের স্বর্ণময়পুরী তাঁহার রাজধানী, তাঁহার কোষাগারের অধ্যক্ষ স্বয়ং যক্ষাধিপতি কুবের। বুদ্ধ—সন্ন্যাসী, শিব ভিখারী—চিতা শয্যা। জীবের ব্যথায় ব্যথিত বুদ্ধ পরম দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য সঙ্কল্পিত। এদিকে যখন দেবগণ নিদারুণ মন্থনজাত সামুদ্রিক হলাহলে বিশ্ববিলুপ্ত হয় দেখিয়া শিবের শরণাপন্ন হইলেন, তখন তিনি সহাস্যবদনে সমস্ত বিষ স্বীয় কণ্ঠস্থ করিয়া জগৎ উদ্ধার করিলেন। তিনি সমুদ্র-মন্থনজাত কল্পতরু, অমৃত, কৌস্তুভ এই সকল বহুমূল্য দ্রব্যের কিছুই চান নাই,—তিনি ব্যথিত জগতের বুকের শৈল্য উদ্ধার করিয়া আসিলেন, পুরস্কার কণ্ঠের বিষ। এই বিষই তাঁহার অমৃত! পারিজাত দিয়া কি করিবেন! বিষের ফুল কাণে পরিলেন, সেই বিষাক্ত ধুস্তুর পুষ্প, তাঁহার হৃদয়ের বিষহর, সমাহিত, শান্তির হাওয়া পাইয়া শুভ্র-জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল হইয়া কানে ফুটিল। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে, এমন কে আছে! বিষধর সর্পেরা, তাঁহার জটাজুট আশ্রয় করিয়া রহিল, গর্জ্জনশীলা গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গের ক্রীড়া অবিরাম সেই জটাজুটে চলিতে লাগিল। এই ভীষণ পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মত শিব সমাধিমগ্ন। এই সমাধির সঙ্গে কাহার সমাধির তুলনা? শিব-সমাধি ভাঙ্গিতে যাইয়া কামদেব ভস্মাবশেষ হইয়া গেলেন।

শিব ও বুদ্ধ।

তরুণ বুদ্ধ, বুড়া শিবের কাছে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিবেন, শিব একটা কল্পনামাত্র, বুদ্ধ অবশ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ভারতবর্ষের মধ্যে শিব ও বুদ্ধের মধ্যে কে কে কতটা কল্পনার সামগ্রী ইহার বিচার আরম্ভ করিলে তাহা সহজে শেষ হইবে না। কারণ (Kern) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন—বুদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন না, নেপাল-উপত্যকার কোন জননায়কের পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতার গর্ভসময়ে সমস্ত দেবতারা অদৃশ্যভাবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অযোনিসম্ভব, মাতার কুক্ষি ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ললিতবিস্তারে এ সম্বন্ধে বহুবিধ গল্প আছে। জাতকগুলিতো সমস্তই উপগল্প। অবদানশতক, সামাজ্ঞ-ফলসুত্ত প্রভৃতি পুস্তকে বুদ্ধের স্বীয় উক্তি বলিয়া যে সকল কথা প্রচলিত আছে—

বুদ্ধ এখন শিবের মতই, অনেকাংশে কল্পনাজড়িত।

তাহা ঐতিহাসিকগণ তাঁহার উক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। কোন জন্মে বুদ্ধ হংস ছিলেন, কোন জন্মে তিনি বানর ছিলেন, কোন জন্মে সারস পক্ষী ছিলেন, ইত্যাদি জাতক-কথিত বহুবিধ উপাখ্যান সহস্র সহস্র মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ বুদ্ধজীবনী-সাহিত্য এক অদ্ভুত ও বিরাট্ কল্পনারাজ্য। শিবের মধ্যেও কি কিছু সত্য নাই? হয়ত কোন আদিযুগের এক বুড়ো সাপুড়ে শিঙ্গা বাজাইয়া ষাঁড়ের উপর চাপিয়া হিমাচলের কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া আদিগন্তের ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছিলেন, সেই ভিত্তির উপর কি অপরূপ এক পারমার্থিক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে! বুদ্ধসম্বন্ধে এত উপকথা প্রচলিত হইয়াছে এবং হিউনসাঙ্গের মত পণ্ডিত বৌদ্ধগণও এই উপকথার এত বাহুল্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে হিন্দু দেবদেবীগণের সঙ্গে তাঁহার এখন আর কোন বিশেষ ব্যবধান রাখেন নাই। ঐতিহাসিক বুদ্ধ ও কাল্পনিক শিব এখন প্রায় এক পঙ্‌ক্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সাদৃশ্য।

কিন্তু বুদ্ধ সে বিশাল চাল-চিত্র কোথায় পাইবেন, যাহা বুড়ো শিবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল শিবের লীলাভূমি, কোন স্থানে সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া অনাদি লিঙ্গ উঠিয়াছে, কোথাও ধূর্জ্জটির জটায় গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ-কম্পিত বিশাল জলপ্রপাত পড়িয়াছে; সে স্রোত ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, গিরিকন্দর শৈলশৃঙ্গ বিদলিত করিয়া দুর্নিবার গতিতে ছুটিয়াছে। শিবের জটার একটি কেশও সেই ভীষণ জলাঘাত নাড়াইতে পারিতেছে না। শিব তাণ্ডব, যাহাতে বিশ্ববিলয় হয়, তাহার উদাত্তকল্পনা মানুষকে যতটা উদ্বোধিত ও কবিত্বের প্রেরণাযুক্ত করিতে পারে, বুদ্ধ তাহা কোথায় পাইবেন? শিবের সমাধিতে যুগ যুগ অতীত হইয়া যায়, দেবতারা সেই সমাধিমূর্ত্তির অনতিদূরে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণ কি ইহার কাছে লাগে? শিব বিশ্বের বিষ দূর করিবার জন্য স্বয়ং বিষভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ। মার বুদ্ধকে ছলনা করিতে আসিয়া পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৈলাস-শিখরে কাম ভস্মীভূত। যাহা কিছু বুদ্ধের গরিমা তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া শিবে আরোপিত। কিন্তু শিবের আনন্দ বুদ্ধ কোথায় পাইবেন? শিবের আনন্দের পর-পার নাই, তাঁহার কণ্ঠের বিষাক্ত ধুস্তুর পুষ্প আনন্দ-নির্ম্মল শুভ্র হাস্যে সতত উদ্‌বুদ্ধ; তাঁহার কণ্ঠে হাড়মালা, অঙ্গে চিতার বিভূতি, দেহবেষ্টী ভীষণ উরগ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম, এ সমস্তের মধ্যে [illegible] কিছুই নাই। মস্তকোর্দ্ধের অর্দ্ধচন্দ্রের প্রসন্ন জ্যোতিতে, আনন্দময়ের [illegible] মৃদুহাস্যে তাহারা নূতন গৌরব লাভ করিয়া আনন্দসূচক হইয়াছে। [illegible] পরমব্যথী নীলকণ্ঠ শিব—এই মহাভিক্ষু, রত্নকাঞ্চনবিলাসত্যাগী মহাযোগী—[illegible] শোধক মহানির্ঘৃণ,—আভিজাত্য ও দেবগৌরব-বিসর্জ্জনকারী মহা অপাঙ্‌ক্তেয়—এই [illegible], বিষাণ-ডমরু-গণ্ড-বাদক, মহাভয়ের মধ্যে চির অভয়—মৃত্যুর মধ্যে অমর—এই শিব, [illegible] অধ্যাত্মরাজ্যের কর্ত্তা—ঠাকুরের ঠাকুর।

বুদ্ধ ভিক্ষু—শিব ভিক্ষু, বুদ্ধ উপদেষ্টা—কৈলাসশিখরে সমাসীন শিবও উপদেষ্টা। বুদ্ধ

মারজয়ী—শিব কামভস্মকারী, বুদ্ধ নির্ব্বাণালোক প্রাপ্ত যোগী—শিব নির্ব্বাণকল্প সমাধিমগ্ন, বুদ্ধ জগতের দুঃখে দুঃখী—শিব জগৎ নিস্তারের জন্য কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়াছেন। তরুণ বুদ্ধ—বনাম যুগযুগান্তের বৃদ্ধ শিব। পুরাণকারেরা শিবকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিলেন। আর তাঁহার সংহারমূর্ত্তি নাশ পাইল, তিনি কল্যাণের আনন্দস্বরূপ নটরাজ হইলেন—তাঁহার তাণ্ডব হইল আনন্দনর্ত্তন—প্রেমমঙ্গলের প্রকাশক অভিব্যক্তি।

বৌদ্ধ ও শৈবের আদর্শ-সাম্য।

বুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আর শিব পুরাণের কল্পনা। লোকক্ষেত্রে চিরদিনই অধ্যাত্ম জীবনের উপর বেশী জোর দিয়াছেন, বাহ্য জীবনের সত্যতাকে তাঁহারা ততটা গ্রাহ্য করেন নাই। শিবের পেছনে যে কোন বাস্তব সত্তা নাই, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এখনও হিমালয়ের কোন উপত্যকায় ডমরু বাজাইয়া সাপ গায়ে জড়াইয়া বৃষভাসনে তুষার-কুন্দ-কান্তি কোন কোন জাতি চলাফেরা করিয়া থাকে, তাহাদের কোন সুদূর আদি পুরুষ বিষাণ-বাদনে দিক্-প্রকম্পিত করিয়া আর্য্যদের মণ্ডলীর মধ্যে হয়ত কোন কালে একটা বিশিষ্ট আসন লইয়াছিলেন,—সুতরাং মূলে কিছু বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক সত্য ছিল,—তাহার উপর যুগ যুগ ধরিয়া পুরাণকারেরা রং ফলাইয়া এরূপ এক রজত-গিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংশ ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত নিখিল-ভয়-হরণ প্রসন্ন উদাসীন মহাযোগীর মূর্ত্তি আঁকিয়া ফেলিলেন যে, বুদ্ধ তাঁহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। বস্তুতঃ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধ শেষকালটায় জাতকের গল্পে নানাজন্মে নানারূপ জীবজন্তুর অংশে পরিকল্পিত হইয়া অবশেষে যে আকার গ্রহণ করিলেন, তাহাতে বুদ্ধদেবের বাস্তবতা ও শিবের কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে বেশী তারতম্য রহিল না; ললিতবিস্তরে বুদ্ধাবির্ভাব অবহিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতারা গর্ভবতী মায়াদেবীর চতুঃপার্শ্বে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ অযোনিসম্ভব, তিনি মাতৃকুক্ষি ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হন, এমন কি পালি অম্বট্ঠসুত্তে ও সামাঞ্ঞফলসুত্তে বুদ্ধের মুখে যে সকল কথা আরোপ করা হইয়াছে, হিউনসাঙ্গ তাঁহার অণিমা-লঘিমা শক্তির যে সকল গল্প লিখিয়া গিয়াছেন—লঙ্কাবতারসূত্রে বুদ্ধের লঙ্কায় গমনসম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক আখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা প্রায় সকল বৌদ্ধ বিশ্বাস করেন। এই সকল গল্পে আস্থাবান্ লোকদের সঙ্গে শিবোপাসকদের পার্থক্য কোথায়? জাতকগুলি ও পুরাণ-আখ্যানগুলিতে প্রভেদ কি? বুদ্ধ যে সকল নীতি উপদেশ দিয়াছেন, নানা পুরাণে নানা তন্ত্রে শিবোপদেশ তদপেক্ষা গুরুত্বে নূন কিসে? সুতরাং জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধ-সাহিত্য ও হিন্দুর তন্ত্র-পুরাণ প্রায় এক পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐতিহাসিক বুদ্ধের উপর ক্রমাগত রং ফেরান হইতে লাগিল এবং বৈদিক শিবও ঠিক একস্থানে একভাবে স্থির থাকিলেন না।

ভারতবাসীর চক্ষে বুদ্ধ ও শিব প্রায় এক শ্রেণীর দেবতা হইয়া পড়িলেন। হীনযানীরা সরিয়া পড়িলেন, কিন্তু মহাযানীরা ভারতবর্ষের ধর্ম স্বীকার করিয়া বুদ্ধকে তাঁহার স্বদেশে আরও কতকদিন টিকিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি আকাশের দিগ্বলয়ে মিশিয়া যায় এবং পূর্ব্বাকাশ সিন্দুরে রাঙাইয়া দিনদেবতা শক্ত

রশ্মির শর-নিকরে সমস্ত কুহেলিকা দূর করিয়া জগতে আবির্ভূত হন, বুদ্ধ সেই ভাবেই অস্ত গেলেন এবং শিব সেই ভাবেই বুদ্ধের সমস্ত শক্তি ও প্রভাব নিঃশেষে আহরণ করিয়া তাঁহাকে হঠাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র যেরূপ পরশুরামের ভাগবত তেজঃ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ যেরূপ শিশুপালের বৈষ্ণবীশক্তি লুপ্ত করিয়া সুদর্শন-চক্র-দ্বারা তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিলেন, শৈবধর্ম্ম সেই ভাবে বুদ্ধের সমস্ত শক্তি নিঃশেষে আয়ত্ত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষে একেবারে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিল।

পুরাণকারেরা বুদ্ধের সমস্ত বিভূতি শিবে প্রয়োগ করিয়া দেবাদিদেবের মূর্ত্তি উজ্জ্বল করিলেন, সুতরাং এই নবগঠিত শিবমূর্ত্তির নিকট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।

কিন্তু বুদ্ধ ভারতবর্ষকে যে দান দিয়াছিলেন, শিব কি শুধুই তাহা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন? বুদ্ধ দিয়াছিলেন—ভিক্ষুর ত্যাগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, কামনার বিলোপ এবং নির্ব্বাণ - জীবমঙ্গলের জন্য। আমরা দেখিতে পাইলাম, শিব এ সমস্ত গুণই আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি ম্লান করিয়া ফেলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈব ধর্ম্মের অভিনব দান

কিন্তু শিব এই সকল গুণ ছাড়া আরও তিনটি বিষয়ে বুদ্ধকে ডিঙ্গাইয়া গেলেন। তাঁহার নূতন তিন গুণের—প্রথমটি আনন্দ, দ্বিতীয়টি গার্হস্থ্যাশ্রম ও তৃতীয়টি শ্মশান।

তিনটি গুণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম আনন্দ-হীনের ধর্ম্ম—জগতের অত্যন্ত দুঃখাভিঘাতে অভিভূত মানবের পরিত্রাহি আর্ত্তনাদ; কামনার বিলোপে যে নির্ব্বাণ, তাহাতে প্রশান্তি আছে—কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই। এই আনন্দ-হীনতার জন্য উত্তর-কালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অপর নাম নাস্তিকতা হইয়াছিল।

সমাধি।

শৈব সমাধি আনন্দ-সাগরে ডুব দেওয়া, ইহাতে দুঃখের হাত হইতে পলায়নের ইচ্ছা নাই, পূর্ণিমা চন্দ্র যেরূপ সমুদ্রকে আকৃষ্ট ও স্ফীত করে, ব্রহ্মানন্দ সেইরূপ আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। ইহা আত্মহারার আনন্দ, ইহা সংসারকে জ্বালাযন্ত্রণার কারাগার মনে করিয়া সংসার-কারাগার ভাঙ্গিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে; ইহা আধ্যাত্মিক জগতের অনাগত বংশীরবের আহ্বান।

বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ দারাশ্রমকে হীন মনে করিয়াছেন। "সামঞ্ঞফলসুত্তে" বুদ্ধদেবের এ সম্বন্ধে অজাতশত্রুর প্রতি উপদেশ অতি সুস্পষ্ট, সন্ন্যাসীর স্থান গৃহাশ্রম হইতে উচ্চ। ঋষি গৃহী হইতে বড়,—গৃহী যত বড় অনাসক্তই হউন না কেন। বুদ্ধ তাঁহার সঙ্ঘে স্ত্রীলোকের

স্থান প্রথমতঃ রাখেন নাই ; শেষে বহু অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে অশীতিপরা বৃদ্ধা মহাপ্রজাবতীর জন্য দ্বার খুলিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। শৈবধর্ম্ম গৃহকে পুণ্যনিকেতন করিয়া দেখাইল—গৃহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। অন্নপূর্ণা গৃহিণী ও গৃহস্থ শিব আদর্শ দম্পতী। সে দাম্পত্য কত বড় তাহা পুরাণকারেরা নানাভাবে দেখাইয়াছেন। শিবের ন্যায় স্বামী পাইবার জন্য গৌরীকে বহু তপস্যা করিতে হইয়াছিল ; তপঃশীর্ণা, সুচির-সাধনাক্লান্তা, তন্বী গৌরী দাম্পত্যের আদর্শ শ্রীমূর্ত্তি। গৌরী স্বামিনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ দাম্পত্যের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন। শিব মৃত গৌরীদেহ যুগযুগ স্কন্ধে করিয়া মহাপ্রেমে নৃত্য করিয়াছিলেন। এদিকে কৈলাসে শিবদুর্গার সংসারে—আদর্শ পারিবারিক জীবন প্রতিবিম্বিত। ভিক্ষুকের অন্নশালায় অন্নপূর্ণা,—শিবের ষাঁড়, স্বীয় বুড়ো সিংহ, কার্ত্তিকের ময়ুর, গণদেবের ইন্দুর ও লক্ষ্মীর পেচক এবং ভৃত্য নন্দী-ভৃঙ্গী ও পুত্রকন্যাগণকে পরিবেশন করেন। সিদ্ধি ও ভাঙ্গ বাটিতে বাটিতে হিমরাজের কন্যার হাতে কড়া পড়িয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রসন্ন প্রেম-গর্ব্বিত ধর্ম্ম-পত্নীর ছবি ও মাতৃমূর্ত্তি নিরুপম আনন্দের আধার। এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে গৃহিণীমুখে সেই অন্নপূর্ণার দুঃখসহনক্ষমা অপূর্ব্ব সেবা ও ত্যাগের প্রভা খেলিয়া যাইতেছে। এদিকে শিবের শত প্রেম সত্ত্বেও তিনি ত্যাগী উদাসীন—যে মুহূর্ত্তে গৃহাশ্রম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তে আবার চিতাগ্নির বিরাগ তাঁহাকে সমভাবেই আকর্ষণ করিতেছে। একদিকে গৌরীর কোমল-বল্লরীসমা ভুজলতা তাঁহার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিয়াছে, অপরদিকে বিষধর সর্প তাঁহার অপর স্কন্ধে ফোঁস ফোঁস করিতেছে। এই অনাসক্তির মধ্যে আসক্তি, বিরাগের মধ্যে রাগ—ভাব-সমাধির পার্শ্বে অগাধ দাম্পত্য-প্রেম—এই ত্যাগের মহিমমণ্ডিত গৃহীর চিত্র—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শুষ্ক আনন্দহীন নীরসত্ব কঠোরতর করিয়া লোকচক্ষে উপস্থিত করিল এবং এই ধর্ম্মের প্রতি সকলকে বিতৃষ্ণ করিল। বুদ্ধদেব যাহা দেন নাই, পুরাণকারের নবসৃষ্ট শিব এখানে তাহা মুক্ত হস্তে পরিবেশন করিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে আস্তিকতা নাই। বুদ্ধদেবকে ছাপাইয়া ভক্তের পূজার ধূপ ধোঁয়া আর উপরে উঠিল না। সেই বুদ্ধদেবও বলিলেন, কেহ কিছু করিতে পারিবে না, তোমার নিজের উপকার নিজেকেই করিতে হইবে। কর্ম্মফল অনুল্লঙ্ঘ্য, অখণ্ডনীয় ও অমোঘ। পূজা কর কর্ম্মের—মন্দিরে ঘণ্টা বাজাইলে তোমার পাপতাপ ঘুচিবে না।

শিব-সমাধি আনন্দলোকের পূর্ণ ইঙ্গিত, তাহা শুধু কামনা-জয় নহে ; কামনা-জয়ের পরে কোন অনাস্বাদিত সুখের স্পষ্ট আভাস তাহাতে আছে। আত্মার মধ্যে যে পরমাত্মা তাহার স্বরূপদর্শন, “মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্” এই শিবকে আমরা পাইলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে শৈবধর্ম্ম বুদ্ধের এক একখানি করিয়া সমস্ত ভূষণ হরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের দত্ত ঐশ্বর্য্য হইতে আরও কিছু বেশী অধ্যাত্মসম্পদ্ এদেশকে দিয়াছিল—যাহাতে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পরিবর্ত্তে “হর হর” রবে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

এদিকে অতিশয় সূক্ষ্ম-চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম লোকের নিকট ক্রমশঃ

নাস্তিকের ধর্ম্মরূপে পরিচিত হইতে লাগিল। বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণীতে ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন মত যথাযথ রূপেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে (ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১০২) আমরা তাহা দেখাইয়াছি। শেষদিকে বৌদ্ধধর্ম্মে ভাবজগতে যে উষর মরুভূমির সৃষ্টি করিয়াছিল, পুরাণকারেরা তাহাতে রসের অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে সেই যুগে কেহ জোর করিয়া এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে নাই; স্বীয় আকর্ষণী বলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম নিবৃত্তি-মূলক। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবারণ ইহার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই কপিলবস্তুর রাজকুমার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অরণ্যচারী হইয়াছিলেন। লালসার মূল যতদিন থাকিবে, ততদিন মানুষের দুঃখ অপরিহার্য্য। কাম-ক্রোধাদি রিপুর শিকড় পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিয়া মানুষকে অনড়, অটল ও নিষ্কম্প একটি পাষাণ-প্রতিমার মত করিয়া গড়িতে হইবে। যাহা কিছু জীবনের উপভোগ্য তাহা সমস্ত কাড়িয়া লওয়া হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম কঠোর চিকিৎসকের মত ভবরোগীর ঘরে হানা দিয়া তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে নিবৃত্ত করিয়াছিল, কিন্তু এই ধর্ম্ম দিয়া গেল কি? নির্ব্বাণরূপ মহাশূন্য, যাহাতে মানুষের যথাসর্ব্বস্ব লুপ্ত হইয়া একটা শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। একটি মাত্র নৈতিক দান এই ধর্ম্মের অঙ্গীয় ছিল, তাহা দয়া, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি। একটি অপূর্ব্ব মত, একটি অপার্থিব কুণ্ডলের মত এই দয়াবৃত্তি সদ্ধর্ম্মের শ্রী উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পর সে দয়াও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং লৌকিক বিশ্বাসে বৌদ্ধধর্ম্ম যে নাস্তিক-বাদের অপর নাম হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

উন্নত নৈতিক জীবন, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই কি মানুষের সম্যক্ পরিতৃপ্তি দিতে পারে? প্রকৃতিতে চারিদিকেও 'নেতি-নেতি' রব। এত সুন্দর হইয়া গাছের ডগায় ফুলটি ফুটিল, কিন্তু দু'দিনের দেখা-শোনার পরই সম্বন্ধ চুকিয়া গেল, প্রকৃতি 'নেতি-নেতি' বলিয়া তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন; আকাশে উজ্জ্বল তারাটি ফুটিল, রাত্রি অবসানে প্রকৃতি আকাশ হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, অপোগণ্ড শিশুর মুখের স্বর্গের হাসি চিতায় ডালি দিলেন। প্রকৃতি কত বীর্য্য, কত প্রতিভা, কত ক্ষমতা, কত হেলেন, কত নারদ, কত অর্ফিয়াস, কত তিলোত্তমা, কত অর্জ্জুন ও আলেকজাণ্ডার মানব জগতে অপূর্ব্ব রং দিয়া আঁকিয়া 'নেতি-নেতি' বলিয়া তিষ্ঠিতে দিলেন না। মহাশূন্যের ক্রোড়ে এই 'নেতি-নেতি' রব চিরকাল ধ্বনিত হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল নীতি কি এই শূন্যবাদ—যাহা আছে তাহা অনিত্য—সুতরাং দুঃখই সত্য?

কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে আর একটি সামগ্রী আছে তাহাও তো উপেক্ষণীয় নহে। আনন্দ বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, এই আনন্দ নশ্বরকে অবিনশ্বর করিয়াছে, শূন্যকে অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত-দ্বারা নিরর্থক করিতেছে। নিত্য রাত্রে চোখ বুজিলেই জগৎ লয় হইয়া যায়—অন্ধকারের গর্ভে—মহা শূন্যে। কিন্তু আবার প্রত্যূষে জাগিলেই দেখি, কিছুই তো যায় নাই। যাহা গিয়াছে ভাবিয়াছিলাম, তাহা স্ফূর্ত্তির সঙ্গে দ্বিগুণ সাজসজ্জায় চক্ষুর কাছে নিজের সত্তা

প্রমাণ করিয়া ঝলমল করিতেছে। আনন্দ এই নিত্যচঞ্চল ধ্বংসশীল জগতের চিরস্থায়ী মেরুদণ্ড, চঞ্চলের সঙ্গে—অনিত্যের সঙ্গে নিত্যবস্তুর সেতুবন্ধন। বৌদ্ধধর্ম্মে এই আনন্দ নাই, কান্না ও হাহাকার আছে—হয়ত নির্ব্বাণ-বারিপ্রক্ষেপে তাহা থামান যায়; কিন্তু ক্ষুৎপিপাসার জন্য যেরূপ অন্নজলের দরকার—শুধু হরীতকী চিবাইয়া উহা নিবারণ করা যাইতে পারে—কিন্তু মানব-মন যে পরম-পরিতৃপ্তি চায়—চঞ্চল ছোট ছোট তৃপ্তি যে স্থায়ী মহাতৃপ্তিকে ইঙ্গিত করে, সেকথা বৌদ্ধধর্ম্মে বলে না। নির্ব্বাণ ও সমাধিতে এই প্রভেদ। যদি নির্ব্বাণ শূন্যবাদ হয়, তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিব-সমাধি আনন্দসাগরে ডুব দেওয়া।

শেষদিকের শৈবধর্ম্ম—বঙ্গীয় বৈষ্ণব-যুগের অগ্রদূত। গৌরীর সঙ্গে শিবের যে সকল প্রেমলীলা আমরা রাজাদের তাম্রফলকের স্তোত্রে বর্ণিত দেখিতে পাই এবং সেই যুগের শিব ও গৌরীর পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ প্রস্তর-নির্ম্মিত যুগলরূপ দেখিতে পাইতেছি, তাহা রাধাকৃষ্ণের লীলার আদি যুগের সূচনা করে। বুদ্ধদেব যেরূপ বেদের রুদ্রদেবকে সৌম্য, শান্ত সমাধির গড়ন দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে হরগৌরীর প্রেম সেইরূপ রাইকানুর বিচিত্র লীলার প্রথম অধ্যায় অবধারিত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব শিবকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিয়া স্বীয় সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া বিদায় লইলেন। শিবও তদ্রূপ কৃষ্ণকে স্বীয় প্রেমের বিভূতি প্রদান করিয়া এদেশ হইতে বিদায় লইলেন। শিবের গার্হস্থ্যধর্ম্ম, স্বপত্নীকে ধর্ম্ম-উপদেশ—ইত্যাদি বাহ্য উপাদানগুলি পরিহার করিয়া—তদীয় প্রেমের পরিপূর্ণভাব কৃষ্ণ উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রেমের বন্যায় এ দেশকে ভাসাইয়াছিলেন। এই বন্যার আদি সূচনা শৈবধর্ম্মে।

এই ভাবে বৈদিক রুদ্রদেবতা পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের গুণগুলি গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞানীর আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন;—শিব ক্রমশঃ জ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়া প্রেমের পথে অগ্রসর হইলেন—এবং যখন হরগৌরীর যুগলমূর্ত্তিতে এই প্রেম কতকটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখন রাধাকৃষ্ণ বঙ্গের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই প্রেমের পরিপূর্ণ পরিণতি প্রদর্শন করিলেন। দুঃখের বিষয় হরগৌরীর যে অপূর্ব্ব প্রস্তর নির্ম্মিত যুগলমূর্ত্তি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় পাওয়া যায়, প্রতিমা-বিদ্বেষীদের দ্বারা প্রস্তরশিল্প ধ্বংস হওয়ার দরুন বঙ্গদেশের সেই নিকষিত হেমতুল্য সম্যক্ পরিণত প্রেমের স্বর্গীয় প্রতিচ্ছবি প্রস্তরে অঙ্কিত বা গঠিত দেখিতে পাই না। শিল্পে সেই প্রেম-পরিণতি না পাইলেও আমরা অতুলনীয় বৈষ্ণব-পদে তাহা পাইয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সাম্রাজ্য

"সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্॥
যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্॥
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্॥
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥
—অন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্।
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ॥"

—রঘুবংশ।

অন্ধ্র ও শক নৃপতিগণ এবং ধর্ম্ম-প্রতিযোগিতা

অন্ধ্র নৃপতিরা বহুকাল আর্য্যাবর্ত্তে প্রবল ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইঁহারা গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী তেলিঙ্গনা প্রদেশের লোক ছিলেন এবং তেলেগু ভাষায় কথা বলিতেন। গৌতমপুত্র জ্ঞানশ্রী ইঁহাদের সর্ব্বপ্রধান রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকাল ১৬৬ খৃঃ—১৯৬ খৃঃ। ২২৫ খৃঃ অব্দের পর ইঁহাদের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনেক স্থানে "তেলেঙ্গা" সৈন্যের উল্লেখ আছে। মুতাক্ষরিণে দৃষ্ট হয় সৈন্যমাত্রই বঙ্গদেশে "তেলেঙ্গা" নামে অভিহিত হইত, তেলিঙ্গনা সৈন্যের এক কালে ব্যাপক-প্রভাবের ইহা প্রমাণ। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অন্ধ্র-প্রদেশের শৈবধর্ম্মের দ্বারা বাঙ্গলার বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, সুতরাং বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষায় এই তেলেগু জাতীদের একটা অবদান ও অন্তরঙ্গতা আছে—তাহা পরে আমরা দেখাইব।

অন্ধ্রপ্রাধান্য; ৭৩ খৃঃ পূঃ—২২০ খৃঃ।

সুঙ্গবংশের ক্ষমতা-বিলোপের এবং গুপ্ত-অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলের ইতিহাস কতকটা তমসাচ্ছন্ন। এই সময়টার মধ্যে পশ্চিমদিকে বক্তিয়ার গ্রীক শাসনকর্ত্তারা খুব শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন; মৌর্য্যবংশের শেষ দিক্‌টায় ইঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আরও ক্ষমতাশালী হইয়া পাঞ্জাব পর্য্যন্ত দখল করেন। গ্রীকবীর এ্যান্টিওকাসের হস্তে পাঞ্জাব ও কাবুলের অধিপতি সুভাগসেনা পরাজিত হইয়া বহু উপঢৌকন ও রাজস্ব প্রদান করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। বক্তিয়ার চতুর্থ রাজা ডেমিট্রিয়াস এত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তিনি "ভারতবর্ষের অধিপতি" নামেও পরিচিত ছিলেন। ক্রমে চীনদেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে 'য়ুই-চি' নামক এক বৃহৎ সম্প্রদায় দক্ষিণদিকে অবতরণ করিয়া বক্তিয়া দখল করেন। তাঁহাদের রাজা কাডফিসেস্ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়া অগ্রসর হন। দ্বিতীয় কাডফিসেস্ এত প্রবল হন যে তিনি চীনদেশ অধিকার করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি চীন সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিয়া পাঠাইয়া শেষে বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

শকগণের অভ্যুদয়

দ্বিতীয় কাডফিসেসের পর শকরাজ কণিষ্ক প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করেন (৭৮ খৃঃ)। কণিষ্কের পর তৎপুত্র হবিষ্ক,—তাঁহার পর বাসুদেব সম্পূর্ণ হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় শকবংশীয় উপাধি পরিত্যাগ করেন।

কণিষ্ক, হবিষ্ক প্রভৃতি

কণিষ্ক
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

হবিষ্ক
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

শারীরিক শক্তিবলে যাহারা বাহির হইতে এদেশ দখল করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার সনাতনী-শক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া এ দেশের ধর্ম্ম ও আচার

গ্রহণ করিলেন। হিন্দুর এই বিজয়কথা স্পষ্টাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত আছে। এই রাজাদের কোন কোনটির মুদ্রায় বৃষভ ও ত্রিশূল লাঞ্ছন শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীকরাজ মিনাণ্ডার পূর্ব্বাঞ্চলটা অধিকার করিতে যাইয়া পুষ্যমিত্রের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ্যান্টিয়াল্কিডাসের দূত গ্রীক তক্ষশীলাবাসী হেলিওডোরাস্ বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় কাডফিসেস্ শৈবধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মুদ্রার একদিকে তাঁহার মূর্ত্তি অপরদিকে বৃষভারূঢ় মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত আছে। (অক্সফোর্ড ইতিহাস—ভিনসেণ্ট স্মিথ, ১২৮ পৃঃ।) পার্থিয় রাজা গণ্ডফারনেসের মুদ্রায়ও শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় কাডফিসেস এবং কণিষ্ক উভয়ের মুদ্রায় শিবের চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ এই দুই মূর্ত্তিই পাওয়া যাইতেছে। কণিষ্কের কোন কোন মুদ্রার একপার্শ্বে বুদ্ধমূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়।

কিন্তু কণিষ্ক শিবভক্ত হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মেরই গোঁড়া ছিলেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বৌদ্ধধর্ম্ম—বিশেষ মাধ্যমিক মহাযান কোন কালেই শিবকে বাদ দেয় নাই। কণিষ্কের পৌত্র বাসুদেব নিজের শক উপাধি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের ভারতীয় ধর্ম্ম ও উপাধিগ্রহণ।

এইভাবে দৃষ্ট হইবে বহু বিদেশী গ্রীক, পার্থিয়, য়ুইচি, কুশাণ ও শক ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের দেশ-বিদেশে বহুল প্রচারের দরুন ইহা ভারতীয় স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে নাই। এদিকে "হীনযানীরা" বুদ্ধের মতগুলি বিশেষভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকাতে তাঁহাদের মতের বিস্তৃতি-লাভপক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। অশোকের পর কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়া তাহা আরও উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি পুনরায় বৌদ্ধসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কৃত হইয়া ইহা যে আকার ধারণ করিল, তাহাতে ইহা অনেক পরিমাণে হিন্দুমত গ্রহণ করিল। এই নবগঠিত উদারপন্থী বৌদ্ধধর্ম্মের নাম হইল মহাযান। এখন চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ সকলেই মহাযান-পন্থী। যাহাকে হীনযান নামক নিন্দিত উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। কিন্তু এই দুই নাম সম্প্রতি পরিকল্পিত হইয়াছে এবং একদেশদর্শীরা হীনত্ব ও মহত্বের যে সূচনা করিয়া নাম-সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা সর্ব্বসম্মত নহে।

বৌদ্ধধর্ম্মের নবসংস্কার হইলেও উত্তরোত্তর ইহার শক্তি ভারতবর্ষে কমিয়া আসিতে লাগিল। রামায়ণের আকর্ষণ ভারতবাসীর পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত অপেক্ষা রামায়ণ কাব্য ভারতবাসীর মন বেশী আকর্ষণ করিল। মহাভারত কৃষ্ণকে কেন্দ্রবর্ত্তী করিয়া নব ব্রাহ্মণ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিল। এই মহাগ্রন্থের বিরাট্ আদর্শ, আখ্যান-গৌরব, ব্রাহ্মণ্যের বৈজয়ন্তী নূতন ভাবে উত্তোলন করিল। বহুদিন যাগযজ্ঞের ধূমধাম ও যূপকাষ্ঠে পশুহননজনিত উল্লাস—অশ্বমেধাদি যজ্ঞের দিগ্বিজয়ী উৎসাহ এদেশে নিরস্ত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র এই যজ্ঞাগ্নি নূতন করিয়া প্রজ্বলিত করিলেন। বৌদ্ধ-

দিগের ত্যাগ অপেক্ষা ক্ষাত্রবীর্য্য পুনরায় অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বৌদ্ধ সাম্যপ্রচারে ব্রাহ্মণগণ বর্ণগুরু বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, এমন কি ধর্ম্মগুরুর আসনও তাঁহাদের টলিয়া পড়িয়াছিল। অশোকের সময়েই কিংবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে শূদ্রাধিকারে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছিল, তাঁহার অনুশাসনেই তিনি তাহা জানাইয়াছেন। "লোকগণ এখন ব্রাহ্মণ, প্রবীণ ও মাতৃপিতৃগণের প্রতি বীতস্পৃহ।" সঙ্ঘের গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে পারিবারিক বন্ধন এই শিক্ষায় নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্ঘকে উচ্চতর স্থান দেওয়াতে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব কমিয়া গেল। অশোক একদিকে সঙ্ঘের মাহাত্ম্য ও পদগৌরব ঘোষণা করিয়াছেন, অপরদিকে ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ উচ্চতর ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, অশোক তাঁহাদের কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের এই গৌরব স্বীকার করিয়াও তিনি তাঁহাদিগকে কোন বিশিষ্ট পদ দেন নাই। চরিত্রভূষিত লোকেরই তিনি আদর করিয়াছেন ও জাতি-নির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকেই রাজসভার উচ্চতম পদ প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়।

ব্রাহ্মণ কে? মহাভারতকার অনেকবার এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (১) নহুস যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, "যদি শূদ্রে সত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ লক্ষিত হয়, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" (২) যুধিষ্ঠির বংশগত-প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যৌন-প্রবৃত্তি, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতিবিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের এইরূপ শঙ্করত্ববশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে "যাঁহারা যাগশীল তাঁহারাই ব্রাহ্মণ"—এই আর্য্য প্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করেন। (বনপর্ব্ব—১৭৯ অঃ) (৩) কিন্তু অনুশাসনপর্ব্বে দেখা যায়, "ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই গুণনির্ব্বিচারে তিনি পূজা পাইবেন" এই বিধান আছে। সমগ্র মহাভারত পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে, এই গ্রন্থে ভারতীয় অতি পুরাকালের সমাজ-নীতির আভাস থাকিলেও ইহা সঙ্কলিত হওয়ার সময়ে ব্রাহ্মণকেই সর্ব্বপ্রধান স্থানে, এমন কি সর্ব্বদেবতার ঊর্দ্ধে স্থাপন করিবার চেষ্টা আছে। এই ব্রাহ্মণ্য-গৌরবের ধ্বজা ধারণ করিয়া আছেন স্বয়ং ভৃগুপদ-লাঞ্ছিত-বক্ষ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ঠিক মহাভারতের সময়ে ব্রাহ্মণ তখনও যে সমাজে পরবর্ত্তী যুগের মত প্রতিষ্ঠিত হন নাই, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, সভাপর্ব্বে রাজসূয়যজ্ঞের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপারটার উপর কোন জোরই দেওয়া হয় নাই। যতিদের ভোজনের প্রচুর ব্যবস্থা এবং বামন, অন্ধ, খঞ্জদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার্য্যদানের কথা আছে, সেখানে ব্রাহ্মণ-ভোজনের উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণ-ভোজনই সকল ধর্ম্ম ও সামাজিক কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ কে? তিন যুগে তিনরূপ ব্যাখ্যা।

ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে করিয়া যে হিন্দুধর্ম্ম নূতন ভাবে দাঁড়াইল তাহার অগ্রদূত শ্রীকৃষ্ণ।

কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চল মহাভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই; মগধে সুঙ্গবংশের সঙ্গে কৃষ্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য কতকটা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। এ দিকে হর্ষবর্দ্ধন কনোজে পুনরায় বৌদ্ধ ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মগধ ও গৌড়ে প্রাচীন শৈব ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। জরাসন্ধ, নরক, মুর, শিশুপাল প্রভৃতির রাজ্যে কৃষ্ণ বহুকাল নিগৃহীত রহিলেন।

আমরা দেখাইয়াছি, বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়া শৈব প্রতিভা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে আকারে দেশে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গরুড়ে আসীন বিষ্ণু, তাঁহার একদিকে লক্ষ্মী, অপর দিকে সরস্বতী, পূজিত হইতেন। সত্যভামা, রুক্মিণী, প্রভৃতি সপত্নীক দৈবকীনন্দন,—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কেন্দ্রবর্ত্তী নবব্রাহ্মণ্যের পুরোহিত-কল্প রাজচক্রবর্ত্তী কৃষ্ণ এই পূজার উদ্দিষ্ট ছিলেন না, ব্রাহ্মণই পরমপূজ্য ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের নব জাগরণে এক দিকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অপরদিকে শৈব ধর্ম্ম উভয়েই নবশ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পার্শ্বে শৈব ধর্ম্ম বহুকাল একত্র প্রচলিত ছিল। গৌড়ের প্রাচীন সমস্ত তীর্থ ই শৈব।)

পূর্ব্বভারতে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুপ্তগণের অভ্যুদয়

কুষাণ ও সুঙ্গ বংশের পর চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস কুহেলিকাময় ও দুর্নিরীক্ষ্য। গুপ্তরাজত্বের কিছু পূর্ব্বে (মরুবাসী) পুষ্করণাদেশাধিপ চন্দ্রবর্ম্মার কথা বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া-পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়। ইনি যদি মেহেরৌলি স্তম্ভলিপির চন্দ্র হইতে অভিন্ন না হন, তাহা হইলে চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গে এক মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সুদূর পশ্চিম হইতে তিনি বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। *

চন্দ্রবর্ম্মা, চতুর্থ শতাব্দী।

* শ্রীযুক্ত কে. পি. জয়সোয়াল বিহার ও উড়িষ্যা-রিসার্চ্চ সোসাইটির মার্চ্চ-জুন সংখ্যক পত্রিকায় (১৯৩৩) প্রমাণ করিয়াছেন যে ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা কুষাণ ও অন্ধ্রবংশের অবসান ও গুপ্তযুগের আরম্ভ—এই সময়টাকে ভারতীয় ইতিহাসের "অন্ধকার-যুগ" আখ্যা দিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে। জয়সোয়াল সাহেব বলেন, গুপ্তদিগের অচির পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তে বাকাতক ও ভারশিব এই দুই প্রবল বংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা যে শুধু আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান রাজত্ব-শক্তি ছিলেন, তাহা নহে;—গুপ্তদিগের পূর্ব্বে ইঁহারাই ভারতবর্ষের

এই অন্ধকারযুগে ক্ষীণ আলোকরশ্মির মত কোন এক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত নামক এক রাজা সুবিখ্যাত লিচ্ছবি বংশের সহিত বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া সমস্ত গৌড়রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। চন্দ্রগুপ্তের পিতার নাম ঘটোৎকচ এবং পিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত। ইহারা সম্ভবতঃ সামান্য সামন্তরাজরূপে মগধাধিপের অধীনে থাকিয়া ক্রমে বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময়ে লিচ্ছবিদের কথা পাওয়া যায়, তারপরে [illegible] বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যের বিশেষ কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু গুপ্তযুগে, মুদ্রা [illegible] লিচ্ছবিদের নাম [illegible] যাইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয় গুপ্তযুগের প্রারম্ভে লিচ্ছবিরা [illegible] অধিকার করিয়াছিলেন।

লিচ্ছবি ও গুপ্তবংশ।

শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্তের সম্বন্ধে [illegible] শিলালিপিতে তাঁহাদের উপাধি 'মহারাজ' দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য মগধের কোন অল্পপরিমাণ ভূভাগে সীমাবদ্ধ থাকারই সম্ভাবনা। ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তই গুপ্তবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ সময় হইতেই গুপ্তাব্দ আরব্ধ হইয়াছিল। বৈশালীর লিচ্ছবিবংশ এই সময়ে খুব পরাক্রান্ত

শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত।
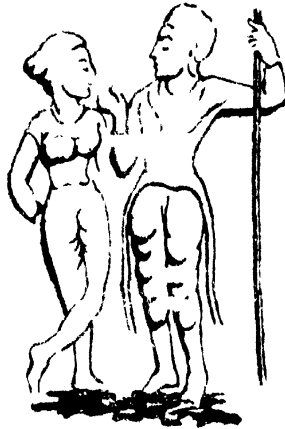
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও রাজ্ঞী কুমার দেবী
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)
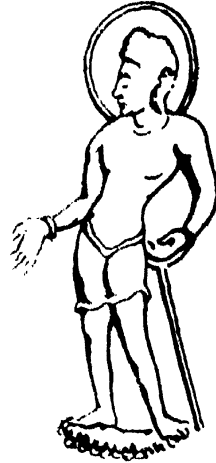
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

হইয়া উঠিয়াছিল, ৭০০ বৎসরের পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সময়েও লিচ্ছবিদের কথা পাওয়া যায়। সেই বংশের কুমারদেবীকে বিবাহ পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ তাঁহাদের সাহায্যে মগধ দখল

অদ্বিতীয় সম্রাট্ রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাকাটক বংশাবতংস প্রথম প্রবর সেন ব্রাহ্মণ-কুল-সম্ভূত ছিলেন এবং তিনি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বহুদূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ ও চারিটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রবর সেনের পৌত্র রুদ্র সেনের (প্রথম রুদ্র সেন) যুদ্ধ হইতে সমুদ্রগুপ্ত

করিয়া তাঁহার অধিকার প্রয়াগ ও অযোধ্যাপর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত "মহারাজ" উপাধিতে পরিচিত, কিন্তু প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শিলালিপিতে "মহারাজাধিরাজ" "পরমভট্টারক" প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীর উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন। মুদ্রায় পত্নীকুলের উল্লেখ বড় দেখা যায় না, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় লিচ্ছবিবংশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং তদীয় বংশের অপরাপর সকল রাজার শিলালিপিতেই তাঁহার পত্নী কুমারদেবী ও লিচ্ছবিবংশের কথা উল্লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, এই লিচ্ছবিবংশের সঙ্গে আত্মীয়তাই ইহাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার পক্ষে প্রধান সহায় হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের অধিকার খুব বিস্তৃত ছিল না, এজন্য শিলালেখে সমুদ্রগুপ্তের বিজয়কাহিনী কীর্ত্তনোপলক্ষে "তিনি নির্ব্বান্ধব, একমাত্র স্বীয় ভুজবলে অসংখ্য এবং প্রবল শত্রুপক্ষসমূহ পরাজয় করিয়াছিলেন," এরূপ ভাবের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'মহারাজাধিরাজ' 'পরম-ভট্টারক' চন্দ্রগুপ্ত।

গুপ্তবংশের অদ্বিতীয় প্রতিভা—সাহসী সংগ্রামসাহসে বিজয়ী, অমিতপরাক্রম, খড়্গ ও বীণাপুস্তকশোভিত-হস্ত, কবিশ্রেষ্ঠ, দাতাশিরোমণি, ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রণাম-বিজয়মালা, অশ্বমেধ যজ্ঞে সুপ্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তি, মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপক ছিল। কঠোর যুদ্ধবিগ্রহের পর তাঁহার বিশাল রাজ্যের প্রতি শান্তি দেবীর কৃপামধুর হাস্য বিতরিত হইয়াছিল। সেই হাস্যচ্ছটায় তাঁহার শাসিত প্রদেশগুলি শিল্পকলা ও কবিত্বমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শান্তিপূর্ণ বিজয়রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া প্রজা-হিতকর বহু কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। শিলালিপিতে তাঁহাকে পরমভাগবত 'রাজর্ষি' এবং আশ্রিতবৎসল প্রজারঞ্জক বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্ত সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় প্রখর ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন জনপ্রিয়, নয়নানন্দবর্দ্ধন চন্দ্রলেখার মত, শিলালেখের বিশেষণে একের প্রখর তেজ ও অপরের মধুর চরিত্রেরই যেন আভাস দিতেছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল "বিক্রমাদিত্য"। উজ্জয়িনীর কোন বিক্রমাদিত্য কোনকালে ছিলেন কিনা জানা নাই। গুপ্তরাজগণ মালবদেশ বিজয় করিয়া উজ্জয়িনীতে অন্য এক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে যে শত শত উপগল্প প্রচলিত আছে, অন্ততঃ তাহার উপকরণের অনেকাংশ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি হইতে সংগৃহীত।

তৎপুত্র রাজর্ষি দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।

অনেকে মনে করেন কালিদাস এই বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন। এ সম্বন্ধে খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন করিবে কে? কালিদাস যদি কোন রাজসভার

[illegible] অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন—সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভের শিলা-লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। [illegible] রাজ-পরিবারের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে ভারশিব (মহারাজ [illegible]নাগ) উভয় বংশের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত [illegible]। এই ভারশিব [illegible] [illegible] দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জয়সোয়াল সাহেব [illegible] করেন, সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের [illegible] এখনও কাশীর "দশাশ্বমেধ" ঘাট নামে পরিচিত।

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে মগধরাজের সঙ্গেই তাঁহার ঐ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। লৌকিক সংস্কার, তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল। মগধের রাজা হইলেও চন্দ্রগুপ্তের অন্যতম রাজধানী উজ্জয়িনীতে ছিল। লৌকিক সংস্কার, কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন। কালিদাস যে গুপ্তযুগের কবি, তাহা তাঁহার ভাষাও রচনাভঙ্গী আলোচনা করিলে অস্বীকার করা যায় না। ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে যদিও নায়িকা উত্তর-কোশলাধিপতি অজকেই বরমাল্য দান করিয়াছেন, তথাপি মগধের প্রাধান্য সেই রাজমণ্ডলীর মধ্যে স্বীকৃত হইয়াছিল। মগধপতিই রাজন্যবর্গের পুরোভাগে ছিলেন। কালিদাসের "আসমুদ্রক্ষিতীশানাং" প্রভৃতি পদ পড়িয়া কেহ কেহ মনে করেন কবি রূপকপ্রয়োগে গুপ্ত বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি সমুদ্রগুপ্তের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্ম উপলক্ষে কবি 'কুমারসম্ভব' রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল যুক্তি বৈজ্ঞানিক হিসাবে দোষশূন্য না হইলেও একটা অনুমানকে সুদৃঢ় করিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, চন্দ্রগুপ্তের (দ্বিতীয়) আদেশক্রমে কালিদাস রাজকন্যা প্রভাবতীর বিবাহ উপলক্ষে 'সেতুবন্ধ' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের টীকাকার রামদাস এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, বাকাতক মহারাজ প্রবরসেনের বংশে জাত রুদ্রসেনের সঙ্গে প্রভাবতীর বিবাহ হয় এবং এই বংশের গৌরব 'সেতুবন্ধ' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কিনা?

কালিদাসের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য হ্রাস পাইলেও বৌদ্ধ ভাবগুলির ছাপ জাতীয় জীবনে তখনও খুব স্পষ্ট ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান গুণ ত্যাগ। কবি রবীন্দ্র অনাথপিণ্ডদের মুখে বলিতেছেন "সর্ব্ব ধর্ম্ম হ'তে ত্যাগ ধর্ম্ম সার",—যেন—"নিজেকে নাশিয়া দেয় জলধার।" এই গুণ বৌদ্ধ যুগের আদর্শ গুণ ছিল। বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বৎসর পরে সর্ব্বত্যাগী কল্পতরু হইতেন, তখন ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধের রাজ্যত্যাগের মহিমার অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিতেন। উত্তরকালে হিউনসাঙ্ হর্ষবর্দ্ধনকে এই ভিক্ষুর ধর্ম্ম পালন করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। কালিদাস মহারাজ দিলীপকে দিয়া এই অনুষ্ঠান করাইতেছেন—বলা বাহুল্য বাল্মীকির রামায়ণে, অথবা অন্য কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যে বা [illegible], দিলীপের সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা নাই। বত্রিশ-সিংহাসনে বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে [illegible] উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই ত্যাগমূলক।* তাঁহার প্রথম [illegible]

কালিদাসকৃত বত্রিশ সিংহাসনে ত্যাগ ও দানের মাহাত্ম্য।

* [illegible]-পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশ-সিংহাসনে উজ্জয়িনী ও বিক্রমাদিত্যের [illegible] [illegible] কাহিনীর [illegible]; এই সকল গল্প বৌদ্ধ জাতকের ন্যায়, অথচ [illegible] [illegible] না থাকিলেও কতকগুলি প্রাচীন কাহিনী [illegible]

অসীম ত্যাগমূলক দান-শক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে দিতেছেন, যে কেহ উপযাচক হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে তিনি সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহা পূরণ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। দ্বিতীয় পুত্তলিকা রাজার সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বলিলেন, যাহাতে বিক্রমাদিত্য কোন হোম সম্পাদন করিতে যাইয়া নিজেকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্তলিকা রাজার অমূল্য চারিটি ফল,—যদ্দ্বারা চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়—কোন এক ব্রাহ্মণকে অকাতরে দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থ পুত্তলিকা বলিতেছেন, রাজা একবার কোন ব্রাহ্মণের নিকট কিছু উপকার পাইয়াছিলেন, কি করিয়া তাঁহার প্রত্যুপকার করিবেন তাহাই ইঁহার সতত চিন্তার বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণ ছলনা করিয়া জানাইল যে, সে যুবরাজকে হত্যা করিয়া তাঁহার অঙ্গের আভরণ চুরি করিয়াছে। মন্ত্রীরা সেই ব্রাহ্মণকে তখনই বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। রাজা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আরও নানা উপহার দান করিলেন। পঞ্চম পুত্তলিকার উপাখ্যান এই যে, রাজা এক বণিকের প্রার্থনায় তাঁহার ভাণ্ডার হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দশটি মাণিক্য তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। ৩২টি উপাখ্যানের প্রত্যেকটিতে এইরূপ দান ও ত্যাগের কথা আছে এই বিষয়ে বৌদ্ধ জাতকগুলির সঙ্গে বত্রিশ-সিংহাসনের উদ্দিষ্ট আদর্শের খুব ঘনিষ্ঠ ঐক্য আছে। নাগার্জ্জুন নাটকেও এইরূপ আত্মদানের কাহিনী আছে—উহা খাস বৌদ্ধ গ্রন্থ।

সিংহ শিকারী চন্দ্রগুপ্ত (২য়), বিক্রমাদিত্য
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কালিদাসের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, এইখানে জাতক গ্রন্থগুলির সঙ্গে বত্রিশ-সিংহাসনের

ব্রাহ্মণকে দানের পুণ্য।

একটু প্রভেদ আছে। বুদ্ধদেবের জন্মকথায় যে দান ও ত্যাগের মহিমা দৃষ্ট হয় তাহার কোন গণ্ডী নাই। সেই ত্যাগ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় সমস্ত জীবজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বত্রিশ-সিংহাসনের কাহিনীগুলিতে যদিও অপরাপর লোকের জন্য ত্যাগ-স্বীকারের কথা আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে অসীম পুণ্যসঞ্চয় হয়, মাঝে মাঝে কবি তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে ত্রুটি করেন নাই। ১১শ পুত্তলিকার কাহিনীটিতে আতুর ব্রাহ্মণের জন্য ত্যাগ-স্বীকারের অশেষ পুণ্য বর্ণিত আছে।

বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে এই সমস্ত উপাখ্যানের মধ্যে শৌর্য্য, বীর্য্য, বীরত্ব প্রভৃতি কথা একরূপ নাই বলিলেই হয়। উহার সকলগুলি ত্যাগ ও দানের মহিমায় উজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিবার আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গদেশে কালিদাসের বর্ণিত গুণ ও কাব্যের

আদর্শ এক সময়ে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা পরবর্তী এক যুগে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে।

শিকারোদ্যত চন্দ্রগুপ্ত (২য়), বিক্রমাদিত্য
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)
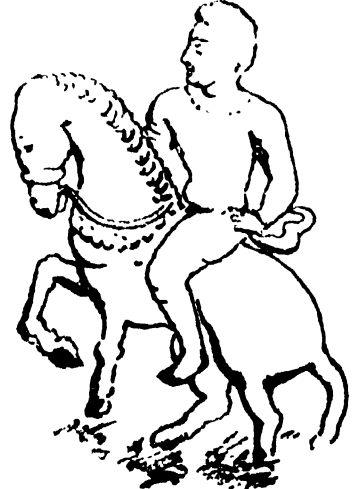
অশ্বারোহী চন্দ্রগুপ্ত (২য়), বিক্রমাদিত্য
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কালিদাসের বর্ণনা যাহাই থাকুক না কেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য্য, বীর্য্য ও ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। ফা-হায়েনের বিবরণে জানা যায়, তাঁহার শাসনে রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিতেছিল ও শত্রুগণ মাথা তুলিতে সাহস করে নাই। তাঁহার মুদ্রায় তিনি সিংহের সহিত লড়াই করিতেছেন, এইরূপ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়।

বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের পরাক্রম।

বঙ্গদেশে গুপ্তরাজত্বসম্বন্ধে কোন প্রবাদ বা সংস্কার নাই, তবে যদি কালিদাসের বিক্রমাদিত্য সত্যই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হন, তবে শুধু বত্রিশ-সিংহাসনের কাহিনী নহে—বেতাল-পঞ্চবিংশতি-কথিত উপাখ্যানমালায় তাঁহার কৃতিত্ব এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভসম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প আমরা বঙ্গীয় পল্লীসমূহে শুনিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এক সময়ে এই দেশ গুপ্তসম্রাটদের বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও এবং মগধ বঙ্গদেশের এত নিকটে হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তদের স্মৃতি এদেশ হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল, এমন কি সমুদ্রগুপ্তের নামও আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

এদেশে গুপ্তবংশের স্মৃতি বিলুপ্ত।

আলবেরুণী লিখিয়াছেন, সাধারণ লোকের বিশ্বাস, গুপ্তরাজগণ যেমনই প্রবল ও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তেমনই দুষ্ট ছিলেন। একজনের রাজা হইতে হইলে কতকটা কঠোরতা অবলম্বন না করিলে চলে না। বহু রাজার সঙ্গে [illegible] পতাকা উড়াইতে হয়। বহু স্বাধীন বীরবিক্রম রাজাকে [illegible]

[illegible]

করিয়া তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইতে হয়। রাজচক্রবর্ত্তীদের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে।

হত। গুপ্তরাজগণের রণহস্তী ও রণ-অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিরাম পাইত না, তাঁহাদের সৈন্যগণের বর্ম্ম কচিৎ বক্ষোমুক্ত হইত। "প্রবল ও দুষ্ট" (powerful and wicked) উপাধি নিরীহ লোকেরা তাঁহাদিগকে যদি দিয়া থাকে তবে ইহাই তাহার কারণ। রুদ্রদেব, মতিল্য, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গঙ্গাপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দিন্, বলবর্ম্মা প্রভৃতি বহু আর্য্যাবর্ত্তবাসী রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন (violently extirpated). তাম্রশাসনে আমরা তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

সমুদ্রগুপ্ত কোশল দেশের মহেন্দ্ররাজ, মহাকান্তারাধিপ ব্যাঘ্ররাজ, কেরলাধিপ মন্তরাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্ররাজ, পার্ব্বত্য কোওরার স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লাধিপ দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অবমুক্ত দেশের নীলরাজ, বেঙ্গীদেশাধিপ হস্তিবর্ম্মা, পালক্ক দেশের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের

বন্দী। কুবের, কুস্থালপুরার ধনঞ্জয় এবং দক্ষিণাপথের অপর অপর রাজগণকে মহাসমরে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন, তৎপর বশ্যতাস্বীকারের পর নিজগুণে মুক্তি দিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত ইহা ছাড়া সামতট, দবাক (ঢাকা), কামরূপ, নেপাল, কার্ত্তিপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত (আর্য্যাবর্ত্তের সীমান্ত) প্রদেশের নৃপতিগণের বশ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। মালবীয়গণ, অর্জ্জুনায়েয়গণ, যুদ্ধেয়গণ, মদ্রকগণ, আভীর, প্রচার্জ্জুনা, সনকানিকা, কাকা, খরপারিকা

পরাভূত। ও অপরাপর শ্রেণীর লোকের এবং তাহা ছাড়া দৈবপুত্রা, সাহা, সাহানসা, শক, মুরণ্ডা এবং সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীরা তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে তাঁহাকে বাৎসরিক রাজস্ব দান করিতেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য কুসুমপুরের দরবারে উপস্থিত হইতেন। অপরেরা তাঁহাকে তাঁহাদের ধন ও ঐশ্বর্য্য সমস্ত প্রদানপূর্ব্বক বিচিত্র গরুড়ধ্বজও তত্তদ্দেশীয় সুন্দর রমণী প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। অন্যান্য উপাধির সহিত তাঁহাকে শিলালিপিতে বারংবার 'কৃতান্তের পরশু' এবং 'অন্তক' বলা হইয়াছে। ইরানের শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে "তিনি পৃথিবীর যাবতীয় রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার শাসনাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহার শত্রুরাজগণ নিদ্রাবশে স্বপ্নের অবকাশে তাঁহাকে স্মরণ করিলে কম্পিত কলেবর হইতেন। তিনি সর্ব্বরাজোচ্ছেদকারী ছিলেন।" ইহার মধ্যে কতকটা বেশীমাত্রায় রংফলান হইলেও তাঁহার দুর্দ্দান্ত প্রতাপে দেশময় যে ভয়ের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহার আভাস পাওয় যায় এবং আলবেরুনীর কথার কতকটা প্রতিপোষকতা দৃষ্ট হয়। এতগুলি রাজন্যকে যিনি দিবারাত্র যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যসংখ্যা প্রথম দিকে যে খুব বেশী ছিল, এমন নহে; কারণ তিনি একাকী নিজ ভুজবলমাত্র আশ্রয় করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন,—শিলালিপিতে এ কথার বারংবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার বহুভুজব

তাঁহার একমাত্র বান্ধব ছিল (whose only ally was the strength of his arms). তাঁহার অঙ্গ শত যুদ্ধের শত কুঠার, শূল, শেল, বাণ ও পরশুর চিহ্ন বহন করিত। শিলালিপির কবি লিখিয়াছিলেন—"এই চিহ্নগুলিই তাঁহার পুরুষদেহের শোভা-সৌন্দর্য্য ছিল"। তিনি এক জনের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া অপরকে প্রদান করিয়া নিত্য নব রাজবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার রাগ থাকিত না। "ভক্তি অবনতি মাত্র গ্রাহ্য মৃদু হৃদয়স্য।" সুতরাং তিনি ভারতের প্রাচীন আভিজাত্য ধ্বংস এবং নব আভিজাত্যের পত্তন করিয়াছিলেন। এই ভাবে দেশময় শত্রুর সৃষ্টি করিয়া তিনি সমস্ত শত্রুজয় করিয়া অরিন্দম হইয়াছিলেন।

গুপ্তযুগের পূর্ব্বে এই বিশাল ভারতবর্ষ যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল তাহা পূর্ব্বের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ দৈব লীলার মহৎ ক্ষেত্র। কোন বড় রাজবংশ একযুগে খণ্ড ভারতকে অখণ্ড শ্রী প্রদান করেন এবং সেই বংশের প্রতাপবিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই অখণ্ড রাজশ্রী শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ ভাঙ্গাগড়া এদেশে বহুবার হইয়াছে। কত বড় শক্তি থাকিলে একজন বীর এই অসাধ্যসাধন করিতে পারেন তাহা অনুমেয়। তৈমুরলঙ্গ, আলেকজেণ্ডার প্রভৃতি বীরেরা দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আশ্চর্য্য বীর-প্রতিভা ধূমকেতুর মত উদিত হইয়া হঠাৎ জগৎকে চমক লাগাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোন মহাদেশের শক্তিপুঞ্জ জয় করিয়া তাঁহাদিগকে চিরকালের জন্য বশ্যতার নিগড়ে আবদ্ধ করা কঠিনতর কাজ। সমুদ্রগুপ্ত এই কঠিনতর কাজ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের আয়তন।

সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন—তাঁহার রাজত্ব পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও কামরূপ, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পাঞ্জাব ও মালব এমন কি পেশোয়ার এবং দক্ষিণে সিংহল প্রভৃতি দ্বীপমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি ও পূর্ব্বদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বকালে উগ্র শাসনের চাপ দিয়া বিজিত রাজ্যগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবার রীতি ছিল না, "ভক্তি-অবনতি পাইলেই দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ তাহা গ্রাহ্য করিতেন এবং বিজিত রাজা তাঁহার আশ্রয় লাভ করিতেন।" শিলালিপিতে যে সকল প্রদেশের নাম পাওয়া যাইতেছে—ইহাদের সকলেই তাঁহার একচ্ছত্র রাজ-গৌরব স্বীকার করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা তিনি তাঁহার অখণ্ড প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দেওয়ার জন্য যে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার একদিকে অশ্বমেধের ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। আমরা মনে করিতে পারি এই যজ্ঞে সিংহলের মেঘবাহন, শক নৃপতিরা (দৈবপুত্রাঃ) এবং পেশোয়ারের [illegible] সাহানসা (কুষাণরাজগণ) করদানার্থ কুসুমপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, সিংহলের রাজা মেঘবাহন সমুদ্রগুপ্তকে বহু উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং শিলালিপিতে যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে তাহা [illegible]

নাই। পাটলিপুত্রের রাজগণ যুগ যুগ ধরিয়া এই মহাদেশে রাজচক্রবর্ত্তীর পদে আসীন ছিলেন। জরাসন্ধের সময় হইতে গিরিব্রজের নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী সর্ব্বদেশের সেরা দেশ ছিল। অল্প সময়ের জন্য এই দেশের প্রভা পরিম্লান হইলেও কোন নব রাজবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুপ্রাচীন রাজগৌরব ফিরিয়া আসিত।

সমুদ্রগুপ্ত শুধু বিজয়ী সম্রাট্‌রূপে আমাদিগের শ্রদ্ধার দাবী করেন নাই, তাঁহার মুক্ত-হস্ত দান, পণ্ডিতগণের সাহায্য, কবিত্ব ও সঙ্গীতশাস্ত্রে কৃতিত্বের বহু উল্লেখ শিলালিপিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দানশক্তি পৃথু এবং বাণের অপেক্ষাও বেশী ছিল। শিলালিপির কবি লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার মনস্বী প্রতিভায় সুরগুরু কাশ্যপকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রে অধিকার নারদ, তম্বুরু এবং অপরাপর কলাবিৎকে ছাপাইয়া গিয়াছিল, তিনি বিদ্বদ্গণের অবলম্বনস্বরূপ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া "কবিরাজ" রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত শত যুদ্ধ-নায়ক সম্রাট্ ছিলেন। বহু নরপতি তাঁহার খড়্গাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন, অপর অনেক নৃপতির গর্ব্ব তিনি নষ্ট করিয়াছিলেন এবং বহু নব রাজবংশ তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সকল নৃপতির ছিন্ন, গর্ব্বিত ও কৃতজ্ঞ শির নিত্য তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইত। এখন তাঁহারা কোথায়? সেই ক্ষমতাশালী লিচ্ছবিবংশ কোথায়—যাঁহারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিগঠনের প্রথম ইষ্টক যোগান দিয়াছিলেন? সেই অতুলবীর্য্য নাগসেন ও অচ্যুতই বা কোথায়—যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সমুদ্রগুপ্তের সহিত লড়িয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন, তথাপি গুপ্ত সম্রাটের নিকট "ভক্তি অবনতি" দেখান নাই? সমুদ্রগুপ্তের পুরুষকারের গৌরব সাময়িক জগৎ স্বীকার করিয়াছিল, এখন আমাদের কাছে তাহার মূল্য কি? কিন্তু তিনি যে বীণাবাদনে অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনি যে সুরের মোহিনীতে মুগ্ধ হইতেন, তাঁহার সেই বীণাবাদনশীল মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে বড় মধুর লাগিয়াছে, তাহা তাঁহার মুদ্রায় অঙ্কিত হইয়া আছে। অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ও খড়্গহস্ত সমুদ্রগুপ্ত হইতে বীণা-হস্ত সমুদ্রগুপ্তই আমাদের প্রাণ বেশী স্পর্শ করে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজত্বের প্রথম দুই বৎসর তিনি বহু যুদ্ধ করিয়া এই মহাদেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন।

বীণাবাদক সমুদ্রগুপ্ত।

বীণাবাদক—সমুদ্রগুপ্ত
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

তাঁহার পতাকা গরুড়চিহ্নলাঞ্ছন হইলেও তিনি বৌদ্ধদিগের উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন; সুবিখ্যাত বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধু তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ছিলেন। গুপ্তবংশ হিন্দুধর্ম্মের

পুনরুত্থানের নেতা হইলেও তাঁহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধবিদ্বেষের কোন পরিচয় নাই। তাঁহাদের বংশধরদের অনেকের অমাত্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ মন্দিরে আলোর ব্যবস্থা ও ভিক্ষুদের আতিথ্যের সংস্থান করিয়া যে সকল শিলালেখ উৎকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে গুপ্তরাজগণের কীর্ত্তি ও যশ ঘোষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শুঙ্গবংশের পতনের পর আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধদিগের প্রতি প্রখর ঘৃণার ভাব হ্রাস পাইয়াছিল।
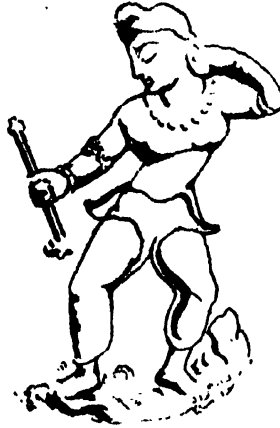
কুমারগুপ্ত (১ম)
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কুমারগুপ্ত (২য়)
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কিন্তু কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্তের সময়ে গুপ্ত রাজত্বে নানারূপ বিপদ্ দেখা দিয়াছিল। পশ্চিম হইতে ইরানবাসী পুষ্যমিত্রগণ ও মধ্য এশিয়া হইতে হুনেরা তাঁহার বিশাল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। মহাবীর স্কন্দগুপ্ত এইসকল বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুরা প্রথমতঃ তাঁহার রাজ্য কতকটা দখল করিয়া লইয়াছিল। পৈতৃক রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে কত অনিদ্ররাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল—তাহার ইয়ত্তা নাই। শিলালেখে বর্ণিত আছে, তিনি পৈতৃক রাজ্য হারাইয়া একদা সমস্তরাত্রি শুধু মৃত্তিকাকে পালঙ্ক করিয়া তদুপরি শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অসীম শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহস-বলে স্বীয় রাজ্য পুনরায়

স্কন্দগুপ্তের বিপদ্।
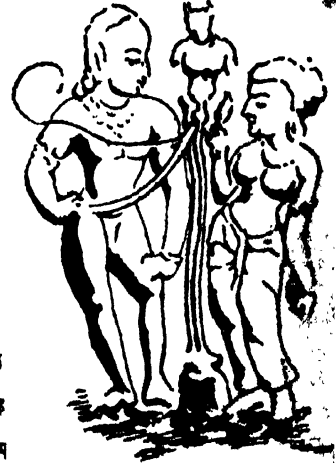
স্কন্দগুপ্ত ও তাঁহার রাজ্ঞী, মধ্যে গরুড়ধ্বজ
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

অধিকার করিয়া যেদিন তিনি ইরানদেশীয় নৃপতির মস্তক তাঁহার পাদপীঠে পরিণত করিয়াছিলেন সেইদিন শত্রুজয়ী সম্রাট্ তাঁহার মাতার ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সেই বিজয়বার্ত্তা তাঁহাকে স্বয়ং জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শিলালেখে কথিত আছে, "কৃষ্ণ যেরূপ কংসকে বধ করিয়া মাতা দৈবকীর নিকট সেই বার্ত্তা বহন করিয়াছিলেন, স্কন্দগুপ্ত সেইভাবে জননীকে বিজয়-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে মাতার আনন্দাশ্রু তাঁহার মস্তক আর্দ্র করিয়াছিল।"

স্কন্দগুপ্ত শত্রুদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে দয়া প্রদর্শন করিতেন, এজন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি জয়গর্ব্বে অহঙ্কৃত হন নাই। সর্ব্বদা ক্ষমাশীল মধুর চরিত্রগুণে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের পর আরও কয়েকজন, গুপ্ত রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু স্কন্দগুপ্তই অখণ্ডভারতের শেষ রাজ-চক্রবর্ত্তী। তাঁহার পরে এই বংশের পতনের ইতিহাস। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, "আরঙ্গেবকে যেরূপ মোগলবংশের শেষ রাজা বলা যাইতে পারে, স্কন্দগুপ্তও সেইরূপ গুপ্তবংশের শেষ রাজা।" তৎপরে কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত গুপ্তরাজবংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু লৌকিক সৌজন্যে তাঁহারা 'মহারাজাধিরাজ' ও 'পরমভট্টারক' উপাধি শেষ পর্য্যন্ত বহন করিয়াছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের সুদৃঢ় বাহু অপসারিত হইলে হুনেরা পুনরায় প্রবল পরাক্রমে গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার ধ্বংস সাধন করিলেন। হুনরাজ তোরমান্ এই আক্রমণের নেতা হইলেও তৎপুত্র মিহিরগুলই পরিশেষে এই ধ্বংসকার্য্যে শেষ আহুতি প্রদান করেন। ইহার পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত গুপ্তবংশধরগণ রাজবিভূতি অঙ্গে ধারণ করিয়া স্তাবকগণ হইতে মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীর উপাধিধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের তেজ সম্পূর্ণ অস্তমিত।

হুনদিগের আক্রমণ।

আমরা নিম্নে গুপ্ত সম্রাট্দের একটা তালিকা দিতেছি :—

গুপ্তরাজবংশের তালিকা

১। শ্রীগুপ্ত।

২। ঘটোৎকচগুপ্ত।

৩। চন্দ্রগুপ্ত (১ম)—রাণী কুমার দেবী। ইঁহার অভিষেক কাল হইতে গুপ্তাব্দ প্রচলিত হয় (৩১৯—২০ খৃঃ)।

৪। সমুদ্রগুপ্ত—রাণী দত্তা দেবী; মৃত্যু ৩৭৬ খৃঃ।

৫। চন্দ্রগুপ্ত (২য়), উপাধি—বিক্রমাদিত্য—রাণী ধ্রুব বা ধ্রুবস্বামিনী দেবী। ইঁহার রাজ্যাঙ্ক চিহ্নিত যে সকল উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তারিখ যথাক্রমে ৪০১ খৃঃ (৮২ গুপ্ত), ৪০৭ খৃঃ (৮৮ গুপ্ত), ৪১২ খৃঃ (৯৩ গুপ্ত)। মেহাকসান ৪১২ খৃঃ—৪১৫ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে; প্রধান কর্ম্মচারী পৃথিবী সেন।

৬। কুমারগুপ্ত (১ম)—রাণী অনন্ত দেবী; উপাধি—মহেন্দ্রাদিত্য, প্রাপ্ত রাজ্যাঙ্ক চিহ্নিত লিপি, ৪১৫ খৃঃ (৯৬ গুপ্ত), ৪১৭ (৯৮ গুপ্ত), ৪২৮ খৃঃ, ৪৩২ খৃঃ।

৭। পুরগুপ্ত—রাণী শ্রীবৎস দেবী—উ—প্রকাশাদিত্য। (প্রথম কুমারগুপ্তের দুই পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্কন্দগুপ্ত ও কনিষ্ঠ পুরগুপ্ত।)

৮। স্কন্দগুপ্ত—৪৫৫ খৃঃ (১৩৬ গুপ্ত), ৪৫৬ খৃঃ, উ—বিক্রমাদিত্য (১৩৭ গুপ্ত), ৪৫৭ খৃঃ (১৩৮ গুপ্ত)

৯। নরসিংহগুপ্ত—রাণী মহালক্ষ্মী দেবী। উ—বালাদিত্য।

১০। কুমারগুপ্ত (দ্বিতীয়)—৪৭০ খৃঃ।

১১। তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

১২। চন্দ্রগুপ্ত (৩য়); উ—দ্বাদশাদিত্য।

১৩। বিষ্ণুগুপ্ত, উ—চন্দ্রাদিত্য

১৪। জয়গুপ্ত, উ—প্রকাণ্ডযশা।

এই তালিকার শেষের দিকে আর একজন প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত বংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি গুপ্তবংশীয় হইলেও ইঁহার অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইনি বুধগুপ্ত। বিবিধ তাম্রলিপি ও শিলালিপি হইতে জানা যায়, ইনি ৪৭৬ খৃঃ অব্দে (১৫৭ গুপ্ত) মালবদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ৪৮৫ খৃঃ অব্দে (১৬৫ গুপ্ত) ইঁহার রাজ্য গৌড়দেশ হইতে মালব ও মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মালবদেশে তাঁহার অধিকার ৪৮৫ খৃঃ হইতে ৪৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বুধগুপ্তের পর আর একজন গুপ্ত রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে, ইনি ভানুগুপ্ত। ইঁহার অধিকার ৫০৯ খৃঃ হইতে ৫৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত পৌণ্ডবর্দ্ধন হইতে মালব দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ের অব্যবহিত পরেই মালব রাজ যশোধর্ম্মদেব বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিলেন।

এই তালিকাটি রাখালবাবুর ইতিহাস হইতে গৃহীত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরবর্ত্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ

ফ্লিট সাহেব অনুমান করেন লিচ্ছবিরাজগণ গুপ্তসাম্রাজ্য-স্থাপনের পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন। শ্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচগুপ্ত, এমন কি প্রথম চন্দ্রগুপ্তও তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত লিচ্ছবি-সম্রাট্‌গণের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। যে অব্দ "গুপ্তাব্দ" নামে পরিচিত, তাহা মূলতঃ লিচ্ছবি-সংবৎ, অধীন গুপ্তগণ সেই অব্দ গ্রহণ করেন এবং পরে উহাই গুপ্তাব্দ নামে চলিয়া যায়। লিচ্ছবি-রাজকুমারীর পাণি-

লিচ্ছবিগণের উত্তরাধিকারী।

গ্রহণের পর চন্দ্রগুপ্তের ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরিয়া যায়, এদিকে যেমনি গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে লাগিল—লিচ্ছবিগণও তদবধি নেপাল-উপত্যকায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। গুপ্তরাজগণের সঙ্গে সেই কৃতজ্ঞতা ও বৈবাহিক আত্মীয়তা-সূত্র বিদ্যমান থাকায় এত বড় একচ্ছত্র সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত নেপাল তাঁহার অধিকারভুক্ত করেন নাই।

৪৮০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হওয়ার পর মালবদেশ গুপ্তসাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বাধীন হয়; পরপর ক্রমাগত শত্রুর আক্রমণে গুপ্তরাজগণ বিধ্বস্ত হইয়া পড়েন। শেষদিকে তাঁহাদের এক শাখা কতক সময়ের জন্য গৌড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই ক্ষীয়মাণ রাজগণের তালিকায় আমরা পুরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত, জয়গুপ্ত (উপাধি প্রকাণ্ডযশাঃ) প্রভৃতি অনেক নৃপতির নাম করিতে পারি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে এই বংশের রাজগণের অনেকেরই "আদিত্য" উপাধি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। কুমারগুপ্তের উপাধি ছিল "মহেন্দ্রাদিত্য;" নরসিংহগুপ্ত "বালাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত "দ্বাদশাদিত্য" নামে পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়া স্কন্দগুপ্ত বোধ হয় শত্রু বিজয় করিয়া পিতামহের অনুকরণে "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'আদিত্য' উপাধি।

দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কুমারগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরেরা এক সময়ে পাটলিপুত্রের রাজা হইয়াছিলেন। এই শাখার কুমারগুপ্ত (তৃতীয়) ঈশানবর্ম্মা নামক কোন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গৌড়ের অধিকার হইতে বিচ্যুত হন।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতের ইতিহাসের অন্ধকার-যুগ বলা যাইতে পারে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর তাঁহাদের প্রদত্ত উপাধির সম্মান রক্ষা করিয়া অমাত্যগণ কোন কোন প্রদেশে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আপনাদিগকে "মণ্ডলাধিকরণ" বা "কুমারামাত্যাধি-করণ" ইত্যাদি নামে পরিচিত করিতেন। ঈশা খাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা "দেওয়ান" উপাধিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি রাজা হইয়াও দেওয়ান উপাধি ত্যাগ করেন নাই। শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের রাজারা স্বাধীন নবাব ছিলেন, অথচ তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের "দেওয়ান" উপাধি চিরকাল বজায় রাখিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়ার, হায়দ্রাবাদের নিজাম—এই সকল উপাধি পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটের দান। উপাধিধারীর বংশধরেরা স্বাধীন হইয়াও তাহা ছাড়েন নাই। গুপ্তরাজগণের প্রদত্ত উপাধি তাঁহাদের অমাত্যগণের বংশধরেরা সেইরূপ অনেকদিন বজায় রাখিয়াছিলেন। গুপ্তদের নানা শাখা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিপতি হইয়া কথঞ্চিৎ বংশগৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন।

গুপ্তদিগের প্রদত্ত উপাধি।

এই নানা শাখায় বিভক্ত গুপ্তরাজগণের বংশধরগণের কে কাহার সন্তান তাহা অনেক সময়ে নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক এই সকল বংশধরের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে শশাঙ্ক গুপ্তরাজগণের বংশধর। ইনি প্রথমতঃ (কর্ণসুবর্ণের) রাঙ্গামাটীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন ইহার প্রচারিত মুদ্রায় ইনি "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমহাসামন্ত "শশাঙ্কদেবস্য" এই নামে নিজ পরিচয় দিতেন কালে মগধ, গৌড়, রাঢ় ও সমস্ত বঙ্গদেশ ইহার অধিকৃত হয়। ইহার উপাধি ছিল, "নরেন্দ্রাদিত্য"। সম্ভবতঃ ইহার পিতা বা পিতৃব্যের নাম মহাসেনগুপ্ত। শেষোক্ত ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগুপ্তের বংশধর বলিয়া মনে হয়। মালবরাজ দেবগুপ্তও গুপ্তবংশ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং দেবগুপ্তের শত্রু কান্তকুব্জাধিপতির বিরুদ্ধে শশাঙ্ক (নরেন্দ্রাদিত্য) স্বীয় জ্ঞাতির সাহায্যের জন্য কান্তকুব্জাভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কগুপ্ত।

"গৌড়-ভুজঙ্গ" শশাঙ্কগুপ্ত
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

এই সময়ে স্থানীশ্বরে রাজ্যবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন, জ্ঞাতির শত্রুতা মাথায় করিয়া শশাঙ্ক এইভাবে তাঁহার সহিতও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। কালক্রমে এই বিবাদ শেষ হইয়া যায়, শশাঙ্ক তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দেবগুপ্ত পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ যুদ্ধের অবসান হইলেও শশাঙ্কের মনে রাজ্যবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের শেষশিখা নির্ব্বাপিত হয় নাই। রাজ্যবর্দ্ধন অতি সাধুচরিত্র ছিলেন। দেশময় তাঁহার গুণ ও কীর্ত্তির কথা প্রচারিত ছিল। কথিত আছে শশাঙ্ক তাঁহার অমাত্যবর্গকে প্রায়ই বলিতেন, "স্বীয় রাজ্যের প্রান্তদেশে কোন সাধুচরিত্র রাজা বিদ্যমান থাকা অকল্যাণকর," এ কথার অর্থ ইহাই মনে হয় যে, কোন কারণে যদি প্রজারা রাজার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তাহারা স্বভাবতঃই সেই সাধু রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিদ্রোহী হইতে পারে। দেবগুপ্তের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া হউক, বা পূর্ব্বোক্ত বিদ্বেষবশতঃই হউক, শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক হত্যা করিবার অভিলাষ মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যবর্দ্ধনকে গৌড়দেশে [illegible] [illegible] করিয়া পাঠাইলেন এবং অতিশয় আপ্যায়ন ও স্নেহমধুর ব্যবহারে তাঁহার মনের সন্দেহ [illegible] [illegible] করিয়া (৬০৬ খৃঃ অঃ) স্বীয় রাজধানীতে [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। এই ঘটনা হর্ষচরিত এবং হিউয়েনসাঙের বিবরণ [illegible]

রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা—৬০৬ খৃঃ অঃ।

আছে, বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ শশাঙ্কের সমস্ত দোষ যথাসাধ্য স্খালন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে তাঁহার সিংহনাদ নামক এক সেনাপতি এই নিষ্ঠুর সংবাদ দেওয়ার সময়ে শশাঙ্ককে "গৌড়ভুজঙ্গ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই কৃতঘ্ন ব্যবহারের সংবাদ শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন—"যে পর্য্যন্ত এই গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে আমি হত্যা না করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আহার-বিষয়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার করিব না।" কথিত আছে শশাঙ্ক শৃঙ্খলাবদ্ধ কান্যকুব্জের রাজ্ঞী রাজ্যশ্রীর বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

শশাঙ্ক গোঁড়া শৈব এবং বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। হিউনসাঙ্গ লিখিয়াছেন—তিনি বোধিতরুর মূল উচ্ছেদ করিয়া পাটলীপুত্র ও কুশীনগরে বহু বৌদ্ধকীর্ত্তি ধ্বংস করেন।

শশাঙ্ককৃত বৌদ্ধদলন ও অনুতাপ।

পাটলীপুত্রে তিনি বুদ্ধ-চরণ-চিহ্ন-লাঞ্ছিত প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা না পারিয়া উহা গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কুশীনগর হইতে তিনি বৌদ্ধ শ্রমণ-দিগকে দূর করিয়া দিয়া গয়ার বোধিবৃক্ষের উচ্ছেদ এবং আশ্রমসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং বোধিবৃক্ষের নিকটবর্ত্তী আশ্রমের বুদ্ধমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া তৎস্থানে শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিতে আদেশ দেন, কিন্তু ঐ কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে সাহসী না হইয়া একটা প্রাচীর তুলিয়া উহা চক্ষুর আড়াল করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত হইয়াছে যে শশাঙ্ক এইসকল তীর্থস্থান ধ্বংস করিয়া পরিণামে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন; তাঁহার শরীরময় ঘা হইয়াছিল এবং মাংস পচিয়া গিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করার পর কিছুকালের জন্য শশাঙ্ক কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। ৬০৬ খৃঃ অব্দে শুধু কামরূপ ছাড়া প্রায় সমস্ত উত্তর-পূর্ব্ব ভারত তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন জ্যেষ্ঠভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য নির্গোঁড় করিবার মানসে গৌড়ে অভিযান করেন। কামরূপের ভাস্করবর্ম্মা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই অভিযানের সহায়তা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ কতকটা সহায়তা পাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। শশাঙ্কের যে সকল সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কতকগুলি খাঁটি এবং কতকগুলিতে অন্য ধাতুর বেশী পরিমাণে খাদ আছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে যাইয়া গৌড়ের রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, তজ্জন্য শশাঙ্ক এরূপ অপকৃষ্ট মুদ্রা চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরূপ ব্যয়বাহুল্যে নিঃস্বতাপন্ন অবস্থার পূরণ করিবার জন্য খাদযুক্ত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের রীতি কয়েক রাজ্যে ঘটিয়াছিল। [illegible] মুদ্রায়ও এইরূপ খাদ দৃষ্ট হয়, তাহাও একই কারণে ঘটিয়াছিল।

নানাবিধ অশান্তি ও রোগের প্রকোপ সহ্য করিয়া শশাঙ্ক দ্বাদশবৎসরব্যাপী যুদ্ধের

শেষভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।* সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বরের পরাজয় এবং মৃত্যুঘটিত ক্রোধবশতঃ পুলকেশী হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া তাঁহাকে শেষে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন ব্রাহ্মণগণের চক্রান্তে তাঁহার জনৈক অমাত্যকর্ত্তৃক নিহত হন।

এই অন্ধকার-যুগে মাঝে মাঝে গৌড়ের যে কাহিনী পাওয়া যায় তন্মধ্যে শশাঙ্কের কীর্ত্তি স্মরণীয়। তিনি হঠাৎ কোন গ্রহ-উপগ্রহের মত উদিত হইয়া কয়েক বৎসরের জন্ম তাঁহার চমকপ্রদ বীরত্ব, রাষ্ট্রীয় কূটনীতি ও প্রতিভার আলো দেখাইয়া গৌড়াকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস ও পালরাজত্বের অভ্যুদয়ের মধ্যে গৌড়সম্বন্ধে আরও দুএকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রণিধানযোগ্য।

ছোট ছোট গুপ্তরাজা।

শশাঙ্কের পূর্ব্বে ৫৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গুপ্তবংশের ভানুগুপ্ত গৌড়দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে কতক সময়ের জন্ম মালবরাজ যশোবর্ম্মা এই দেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। গৌড়দেশের ভাগ্যলক্ষ্মীর এইভাবে পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যয় ঘটিতেছিল।

যশোবর্ম্মা।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর গুপ্তবংশোদ্ভূত মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক আদিত্যসেন ৬৭১ খৃঃ অব্দে মগধে পুনরায় স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ গৌড়দেশপর্য্যন্ত তিনি স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। আদিত্যসেনের রাজ্ঞীর নাম ছিল "কোণাদেবী"। পৌণ্ড্রদেশ কতকদিনের জন্ম শৈলবংশীয় কোন রাজার অধীন ছিল।

আদিত্যসেন।

এই সময়ে বঙ্গের আর একটি পরাক্রান্ত রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। হিউনসাঙ্গ এবং ইৎসিং উভয়েই লিখিয়াছেন—তাঁহাদের অবস্থিতিকালে সমতটে খড়্গবংশীয় নৃপতিগণ দৃঢ় ভাবে শাসনযন্ত্র চালাইতেছিলেন। খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ এবং তৎপুত্র দেবখড়্গ এই কয়েকটি নাম আমরা পাইতেছি। সার্ব্বভৌম

খড়্গবংশ।

* সম্প্রতি "বোধিসত্ত্ব পিটকাবতংশক" (অন্য নাম "মঞ্জুশ্রী মূলকল্প") নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত কে. পি. জয়সোয়াল সম্পাদন করিতেছেন। এই পুস্তকে রাজাদের নাম ইঙ্গিতে দেওয়া আছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ইহাতে যে 'হকারাস্ত' নাম দেওয়া আছে, তাহাতে হর্ষবর্দ্ধন বুঝা যাইবে। 'রকারান্ত' রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে এবং 'সোমাখ্য' শশাঙ্ককে বুঝাইতেছে। এই অনুমান ঠিক হইলে শশাঙ্ক সম্বন্ধে পুস্তকখানি হইতে জানা যায়:—তিনি দুষ্টকর্ম্মা ছিলেন এবং কাশী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অব্যবহিত পরে, উদয়র নগরের জয়নাগ নামক এক রাজা অল্প সময়ের জন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন।

'হকারান্ত' রাজা অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধন—

"পরাজয়ামাস সোমাখ্যং দুষ্টকর্ম্মানুচারিণম্।
ততো নিষিদ্ধঃ সোমাখ্যো স্বদেশেনাবতিষ্ঠিতঃ॥
নিবর্ত্তয়ামাস হকারাখ্যঃ ম্লেচ্ছ রাজ্যোমপূজিতঃ।
দুষ্টকর্ম্মা হকারাখ্যো নৃপঃ শ্রেয়সা সর্ব্ব ধর্ম্মিনঃ॥
স্বদেশেনৈব প্রয়াতঃ স্বদেশপতিনাপি স॥"

[illegible] মূলকল্প [illegible] মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে কাহারও মতে [illegible] রচিত হয়।

রাজাদের সম্বন্ধে যেরূপ স্তোকবাণী লিখিত হয়, তাম্রলিপির কবি ইহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ স্তোকবাণী বলিয়াছেন, যথা "নিখিলক্ষিতিপতিজয়ী"—" অশেষ-ক্ষিতিপাল-মৌলিমালা-মণি-খচিত-পাদপীঠ" ইত্যাদি। সমতট প্রদেশ সম্ভবতঃ পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন খাদ, উত্তর গারো ও অন্যান্য পাহাড়, পূর্ব্বে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট, দক্ষিণে সমুদ্র—এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। বস্তুতঃ এখন পূর্ব্ববঙ্গ বলিতে যে দেশটি বুঝায় তাহার প্রায় সমস্তটাই এই সমতটের অন্তর্গত ছিল। খড়্গবংশীয় রাজারা বিদ্যাচর্চ্চা ভালবাসিতেন এবং বিদ্বান্‌দিগকে সমাদর করিতেন; ইহারা প্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারের উৎসাহবর্দ্ধক ও সাহায্যকারী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় নানা প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই রাজাদের রাজধানী ছিল কর্ম্মান্তনগর (আধুনিক কামতা বা বড়কামতা, কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে)। শ্রীযুত দীক্ষিত সাহেব এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নহেন। খড়্গোদ্যমের পৌত্র দেবখড়্গ শ্রীহর্ষের সমসাময়িক। এই কর্ম্মান্ত বা কামতানগরে যে স্থানে বিহার ছিল—তাহা এখনও 'বিহারমণ্ডল' নামে পরিচিত, উহা বড়কামতা গ্রামের কিছু উত্তরে। ভট্টশালী মহাশয় বলেন, খড়্গবংশীয় রাজাদের রাজ্য ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর এমন কি ঢাকা জেলার কোন কোন অংশ জুড়িয়া ছিল, ইহাই প্রাচীন সমতট। এই রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, দেবখড়্গের পুত্র রাজভট্ট, একজন গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন। হিউনসাঙের সময়ে কর্ম্মান্ত নগরের পরিধি ৫ মাইল ব্যাপক ছিল। রাজধানীর অভ্যন্তরে ত্রিশটী সঙ্ঘারাম ও শতাধিক দেবমন্দির ছিল। হিউনসাঙের সময়ে এই নগরে ২০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন, কিন্তু ৫০ বৎসর পরে ইৎসিংএর সময়ে (৬৭৩ খৃঃ—৬৮৮ খৃঃ) এই সংখ্যা বাড়িয়া ৪০০০ এ পরিণত হইয়াছিল।

রাজভট্ট সমস্ত বৌদ্ধমঠ ও মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতেন। এই নগরে বহু জৈন (নির্গ্রন্থ) বাস করিতেন, এবং ইহাতে একটি অশোকস্তম্ভ ছিল বলিয়া হিউনসাঙ লিখিয়াছেন। ভট্টশালী মহাশয় তথায় একটি স্তম্ভ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা যেরূপ পাওয়া যায়, তাহাতে উহা চীন পর্য্যটককথিত সেই প্রাচীন অশোকস্তম্ভ বলিয়াই মনে হয়।

যে কারণেই হউক এই খড়্গবংশীয় রাজাদের সঙ্গে আরাকানের রাজাদের সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজভট্টের পরে কোন সময়ে কর্ম্মান্ত রাজ্য লড়হদেবের অধীন হইয়াছিল। লড়হচন্দ্র বা লড়হচন্দ্র নাম সম্ভবতঃ আরাকানরাজ চুলটেংচন্দ্রেরই বাঙ্গলা রূপান্তর। তাম্রশাসনে শ্রীমৎলড়হচন্দ্রবিজয়রাজ্যের অষ্টাদশ বৎসরে শ্রীকুম্ভদেবসুত ভাস্করদেবের উল্লেখ আছে। ইহার উপাধি 'কর্ম্মান্তপাল' দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয় তখন আর কর্ম্মান্তের রাজারা রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন না—তাঁহারা "শাসনকর্ত্তা" হইয়া গিয়াছিলেন। লড়হচন্দ্র (চুলটেংচন্দ্র) ৯৫১ খৃষ্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আরাকানরাজদের সঙ্গে কর্ম্মান্তরাজগণের, জয়ী ও জিত, কিংবা বৈবাহিক

আত্মীয়তা-সূত্রে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়। আরাকানরাজদের মুদ্রালাঞ্ছন শায়িত বৃষ, খড়্গবংশেরও তাহাই। বড়কামতার চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ 'পাটিকারা' নামে পরিচিত। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস 'মহারাজোয়াং' গ্রন্থে এই 'পাটিকারা'র কথা উল্লিখিত আছে। ময়নামতীর গানে দৃষ্ট হয় যে, মাণিকচন্দ্র রাজা এই পাটিকরার রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর পাটিকারার কোন রাজকুমার পেগুর রাজা কিংসিথ্যার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহজাত পুত্র অলংশিশু পাটিকারার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কথিত আছে অলংশিশু পিতৃভূমি দেখিবার জন্য প্রায়ই পাটিকরায় আসিতেন। অলংশিশু ১০৮৫ খৃঃ—১১৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন (নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধ, প্রতিভা ২য় সংখ্যা, ১২৫ পৃঃ)।

এই বড়কামতা গ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলি জুড়িয়া প্রাচীন বহু কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ভট্টশালী মহাশয় তাহার একটি কৌতূহলোদ্রেককারী করুণ বর্ণনা দিয়াছেন। তথাকার অষ্টাদশ-হস্তবিশিষ্ট নটেশ্বরের মন্দির, ত্রিশটি সঙ্ঘারামের ভিক্ষুদের বিপুল কোলাহল, নির্গ্রন্থদিগের কঠোর যতিধর্ম্মপালন—পুরাকালের বাঙ্গলার সেই স্বাধীন রাজ্যের প্রতাপ ও সমৃদ্ধি এখন একটি স্বপ্নে পরিণত। কবির সেই উক্তি মনে পড়ে,—"এই যদি শেষ, সব হয় শেষ, জীবন স্বপন প্রভাতে ও। ভ্রমমন করিয়ে, দুঃখ শত সহিয়ে, ভ্রমিছে লোকে কি আশে ও।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজতরঙ্গিণী-কথিত দুইটি আখ্যান

গৌড়ের এই অন্ধকার-যুগে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক রশ্মি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইল। এখানে আমরা কলহণকৃত রাজতরঙ্গিণীর (কাশ্মীরের ইতিহাস) দুই একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। এই সকল বিবরণের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি, কিন্তু বর্ণিত ঘটনাগুলি যে কতকাংশে সত্য, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

আবুল ফজল লিখিয়াছেন, পালদিগের অব্যবহিত পূর্ব্বে জয়ন্ত নামক এক রাজা গৌড়াধিপতি ছিলেন,—অধ্যাপক ল্যাসন মনে করেন ইনিই রাজতরঙ্গিণীর "গৌড়েশ্বর জয়ন্ত", [illegible] অবতারণা করিয়া আমরা রাজতরঙ্গিণীর কাহিনীটি দিয়ে দিতেছি।

তখন কাশ্মীরাধিপতি ছিলেন জয়াপীড়, ইনি মহারাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র। তরুণ জয়াপীড় মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, তিনি একাকী কোন শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবেন, তৎপূর্ব্বে তিনি কোন ভোগবিলাসে প্রমত্ত হইবেন না। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি একক ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। সেই সুদূর কাশ্মীরের লবঙ্গ ও আঙ্গুরলতা-পরিশীলন-মধুর আবহাওয়ার সীমা ছাড়িয়া একেবারে খর্জ্জুর-তাল-তমাল নিষেবিত, গঙ্গানীর সম্পৃক্ত-সমীরচুম্বিত বঙ্গদেশের নাতিশীতোষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেন। প্রথমতঃ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইয়া তৎপরে তিনি গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। গৌড়ের রাজা তখন জয়ন্ত। গৌড়ে এক বিশাল চারুশিল্পখচিত কার্ত্তিকেয়ের মন্দির ছিল। সেখানে প্রতি নিশীথে অপূর্ব্ব সুন্দরী নর্ত্তকীরা অঙ্গের নানারূপ লীলায়িত ভঙ্গী দেখাইয়া নৃত্যদ্বারা দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিত। নর্ত্তকীর শ্রেষ্ঠ ছিলেন কমলা। সরসীর কুমুদদলের মধ্যে যেরূপ চন্দ্ররশ্মি—সেই কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরে সঙ্গীতের আসরে কমলার গীতি ও নর্ত্তন ছিল তেমনই। এদিকে ছদ্মবেশী হইলেও কাশ্মীরের তরুণ রাজার রূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কাশ্মীর ধরাতলে নন্দনবন, সেখানকার স্ত্রীপুরুষ স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। জয়াপীড় ছিলেন কাশ্মীরবাসীদের মধ্যেও পরম সুন্দর, সুতরাং নবাগত যুবকের প্রতি সকলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু বিশেষ করিয়া রূপের জালে পড়িলেন কমলা। শুধু কুমারের সুশ্রী রূপ নহে, তাঁহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া কমলা বুঝিলেন, ইনি কোন দেশের রাজা হইবেন। কতকগুলি লক্ষণের একটি এই যে সেকালে রাজাদের সঙ্গে সর্ব্বদা তাম্বুলধারিণী থাকিত, মণিখচিত সুবর্ণপাত্র-হস্তে তাহারা রাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিত। রাজা ইচ্ছানুসারে পৃষ্ঠের দিকে হাত বাড়াইয়া তাম্বুল গ্রহণ করিতেন। রাজনটী লক্ষ্য করিল, তরুণ যুবক অভ্যাসবশতঃ পুনঃ পুনঃ স্বীয় পৃষ্ঠের দিকে হস্ত প্রসারিত করিতেছেন। মেঘ ফুরাইয়া গেলেও ময়ূর যেরূপ অভ্যাসবশতঃ কেকারব করে, রাজ্য হইতে প্রবাসে একাকী আসিয়াও জয়াপীড় সেইরূপ এই হাত বাড়াইবার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। নটী বুঝিলেন, ইনি রাজা না হইয়া যান না।

জয়াপীড়ের সঙ্কল্প ও গৌড়ে আগমন।

জয়াপীড় ও কমলা।

রমণীরা নানারূপ ছলাকলায় পারদর্শিনী, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীর পক্ষে জয়াপীড়কে কৌশলে ভুলাইয়া স্বগৃহে লইয়া আসা বিশেষ শক্ত কাজ হয় নাই। কিন্তু যখন নর্ত্তকী নানা অনুনয় বিনয় করিয়া তরুণ নৃপতিকে প্রেম নিবেদন করিলেন, তখন তিনি সঙ্কল্পের বিষয় তাঁহাকে বলিয়া নিরস্ত করিলেন।

এই সময়ে একটা বড় রকমের সিংহ গৌড়ের এক জঙ্গলে ঢুকিয়া বড়ই উৎপাত করিতেছিল। রাজা সেই সিংহের মস্তকের জন্য উচ্চ পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কোন শিকারী সিংহকে বধ করিতে সমর্থ হইল না। এই কথা শুনিয়া বহু লোকের নিষেধ মান্য না করিয়া একাকী খড়্গাহস্তে জয়াপীড় সিংহ খুঁজিতে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি সিংহের

সিংহবধ।

দর্শন পাইলেন এবং খড়্গের এক আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু মুমূর্ষু সিংহ জয়াপীড়ের দক্ষিণ বাহু কামড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

গৌড়েশ্বরের আদেশে সেই সিংহের মস্তক তাঁহার নিকট আনীত হইল, কিন্তু শিকারীর দর্শন নাই। সঙ্কল্প পূর্ণ হওয়ার আনন্দে তিনি রাজধানীর এক প্রান্তে একাকী বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। তরুণ শিকারীর বাহু কামড়াইবার সময়ে তাঁহার মণিময় বলয় সিংহের দংষ্ট্রাবদ্ধ হইয়াছিল। সেই বলয় খোলা হইলে রাজা দেখিলেন, তাহাতে "জয়াপীড়" নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ছদ্মবেশী যুবক ললিতাদিত্যের পৌত্র, তরুণ বয়সে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, একথা কোথাও অবিদিত ছিল না। গৌড়েশ্বর জয়ন্ত শিকারীকে আনিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত করিলেন। জয়াপীড়কে রাজসকাশে উপস্থিত করা হইল। তিনি সাদরে তাঁহার গুণবতী ও রূপবতী কন্যা কল্যাণীদেবীকে জয়াপীড়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়া তাঁহাকে নানা উপঢৌকন প্রদান করেন। কল্হণ লিখিয়াছেন, জয়ন্তের পাঁচটি প্রবল শত্রুকে পরাজয় করিয়া জয়াপীড় তাঁহার শ্বশুরের রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

মণিবলয়ে "জয়াপীড়" নাম ক্ষোদিত।

কল্যাণীদেবীর সহিত বিবাহ।

জয়ন্তকে কায়স্থ ও প্রখ্যাতনামা আদিশূরের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিবার জন্য যে কয়েকখানি জাল কুলজী সম্প্রতি প্রণীত হইয়াছে তাহার অসারতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষভাবে তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে (১৫২-১৬১ পৃঃ ১৩০০) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (জয়াপীড়ের বিবরণ রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গৌড়েশ্বর জয়ন্তের গুণবতী কন্যা কল্যাণীদেবীকে যে কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় বিবাহ করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু বাকী গল্পটা যেন রূপকথার রাজকুমারের কাহিনীর মত শোনায়। তাহার কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা এবং অতিরঞ্জন তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

কল্হণের দ্বিতীয় উপাখ্যানটি জয়াপীড়ের পিতামহ ললিতাদিত্য (মুক্তাপীড়) সম্বন্ধীয়। তাহাতে বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের অনেক পরিচয় আছে।

ললিতাদিত্যের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের বহুদিন কলহ চলিতেছিল। তিনি সন্ধি করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহাকে কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। গৌড়েশ্বর স্বভাবতই শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন। কিন্তু ললিতাদিত্য তাঁহার গৃহদেবতা 'পরিহাস-কেশব'কে স্পর্শ করিয়া তাঁহার সম্মানিত অতিথিকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তাঁহার কোনও বিপদ ঘটে তবে তজ্জন্য 'পরিহাস-কেশব' দায়ী হইবেন। গৃহদেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া এরূপ প্রতিশ্রুতির পর গৌড়েশ্বর অবশ্য নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু কাশ্মীর-রাজ [illegible] পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ত্রিগামী নামক স্থানে গুপ্তহন্তারক নিযুক্ত করিয়া রাজ-অতিথিকে নিহত করেন।

কাশ্মীরের ললিতাদিত্য ও গৌড়েশ্বর।

এই সংবাদ পাইয়া রাজার দেহরক্ষীর একটি ক্ষুদ্র দল গৌড়দেশ হইতে প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীরাভিমুখে রওনা হইল। কল্‌হণ লিখিয়াছেন (৪র্থ অধ্যায়);—

দেহরক্ষী ক্ষুদ্রদলের অভিযান।

"গৌড়রাজ্যের পরিচারকেরা তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তির অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বীয় প্রাণ স্বীয় প্রভুর জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছিল। (৩২৪ শ্লোক)

"তাঁহারা কাশ্মীরের তীর্থ সারদা দেবীর মন্দির দেখিবার ছলনা করিয়া এক জোট করিয়া পরিহাস-কেশবের মন্দিরে প্রবেশ করিল, এই পরিহাস-কেশবই তো তাঁহাদের প্রভুর জীবনের জন্য জামিন হইয়াছিলেন। (৩২৫ শ্লোক)

"পুরোহিতেরা দেখিলেন, গৌড়ীয় সৈন্যগণ পরিহাস-কেশবের মন্দিরে ঢুকিতেছে; রাজা তখন কাশ্মীরে ছিলেন না, তাঁহারা মন্দিরের সদর দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। (৩২৬ শ্লোক)

"গৌড়ীয়গণ সেখানে মহামারী উপস্থিত করিয়া পরিহাস-কেশব ভ্রমে 'রামস্বামী' নামক বিষ্ণুর অপর এক রজতময় বিগ্রহ আক্রমণ করিল। তাঁহারা সেই মূর্ত্তি পীঠ হইতে উৎপাটিত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। (৩২৭ শ্লোক)

'পরিহাস-কেশব' ভ্রমে 'রামস্বামী'বিগ্রহের ধ্বংস।

"এদিকে শ্রীনগরের সৈন্যগণ আসিয়া যখন সেই মুষ্টিমেয় গৌড়ীয়গণকে বধ করিতেছিল, তখনও তাহারা স্বীয় মৃত্যু অগ্রাহ্য করিয়া সেই দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাঁহার রেণু চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতেছিল। (৩২৮ শ্লোক)

"গৌড়ীয়গণের কৃষ্ণদেহ রক্ত-রঞ্জিত হইয়া যখন ভূমিতে পড়িতেছিল তখন তাহারা পর্ব্বতগাত্রে স্খলিত রক্তিম গৈরিকাবৃত প্রস্তরখণ্ডের মত দেখাইতেছিল। (৩২৯ শ্লোক)

"তাহাদের রক্তধারা যেন তাহাদের অসাধারণ প্রভুভক্তিকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইল এবং ধরিত্রীকে অসামান্য সম্পৎশালী করিল। (৩৩০ শ্লোক)

"তড়িৎপাত বজ্রদ্বারা নিবারিত হয়, অতি মূল্যবান্ মরকত মণি (Emerald) দ্বারা বহুবিধ দোষ নষ্ট হয়। প্রত্যেক মণির কোন না কোন আশ্চর্য্য ব্যবহারিক মূল্য আছে, কিন্তু এই বীরগণের বীরত্বের তুলনায় অপর সমস্ত মণি নিষ্প্রভ। (৩৩১ শ্লোক)

"তাহারা তাহাদের প্রভুর জন্য কত দূরদেশ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিল। সেই মৃত প্রভুর জন্য তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া কি অসাধ্য-সাধনই না করিয়াছিল। (৩৩২ শ্লোক)

"সেই দিন গৌড়ীয়গণ যাহা করিয়াছিল, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাও বুঝি করিতে পারিতেন না। (৩৩৩ শ্লোক)

"রামস্বামীর বিগ্রহ এই গৌড়ীয় সন্তানগণ ভগ্ন করাতে রাজার অতি সাধের বিখ্যাত 'পরিহাস-কেশব' বিগ্রহ রক্ষা পাইয়াছিল। (৩৩৪ শ্লোক)

"এখন পর্য্যন্ত রামস্বামীর মন্দির বিগ্রহশূন্য থাকিয়া গৌড়ীয়গণের জগদ্ব্যাপী বীরত্ব-যশের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।" (৩৩৫ শ্লোক)।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৌর্য্য ও গুপ্ত-রাজত্বে শিল্পসাহিত্য

“ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ”—কালিদাস।

যুগে যুগে বৃহত্তর বাঙ্গালার গৌরব।

আমরা যুধিষ্ঠিরের যুগ, মৌর্য্যযুগ এবং গুপ্তদের যুগ—ভারতের এই তিন প্রধান যুগের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি—এই তিন যুগই গৌড়দেশের উজ্জ্বল কীর্ত্তিচিহ্নিত। রঘুবংশে দিলীপের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে বাঙ্গালীরা তাঁহাকে তাঁহাদের রণতরীর সাহায্যে বাধা দিয়াছিল, এবং সে যুদ্ধ এত ভীষণ হইয়াছিল যে বিজয়ী রঘু জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া স্বীয় গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশ অবশ্য ইতিহাস নহে, কিন্তু গুপ্ত-যুগে যে বঙ্গবীরগণ যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এই সংস্কার কালিদাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠিরের যুগে ভগদত্ত, জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, মুর, নরক, সমুদ্রসেন—ইঁহারা কৃষ্ণদ্বেষী এবং কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইঁহাদের রাজ্যের সীমা যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইঁহারা সকলেই বৃহত্তর বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বে বঙ্গের এক দুর্দ্দান্ত রাজকুমার সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন। সেই বিজয়কাহিনী সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, সেই ঘটনার বহু শতাব্দী পরেও অজন্তার চিত্রকরের তুলি সিংহলবিজয় তাঁহার সমস্ত প্রতিভা দিয়া আঁকিয়াছিল। অজন্তার অতুলনীয় চিত্রগুলির শীর্ষস্থানে বিজয়ের অভিযান। গুপ্তযুগের শেষাঙ্কে ‘গৌড়-ভুজঙ্গ’ শশাঙ্ক প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়াছিলেন।

মৌর্য্যযুগ হইতে বঙ্গের অতি নিকটবর্ত্তী মগধই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। যাঁহারা মগধ-জয়ী, তাঁহারাই ভারতজয়ী। আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উল্লেখ এখানে করিব না। যিনি যখন মগধ জয় করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছেন, তিনিই একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সমগ্র ভারতের উপর রাজদণ্ডের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষের আয়তন অতি বৃহৎ ছিল—একদিকে পারস্য, অপর-দিকে [illegible], উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সিংহল। এই বিরাট্ [illegible] সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা [illegible] মগধের শাসন মানিয়া চলিত। জরাসন্ধ হইতে [illegible] পর্য্যন্ত মগধের [illegible] রাজচক্রবর্ত্তিগণের পুরোভাগে বিরাজ করিতেছিলেন। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর [illegible] পুরোভাগে মগধেশ্বরের স্থান দিয়া লিখিয়াছেন, [illegible]

সহস্র, সহস্র নরপতি থাকিলেও বসুমতী কেবল এই মহীপতি দ্বারাই রাজবতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, যেহেতু রজনী নক্ষত্র ও গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইলেও কেবল চন্দ্রমা দ্বারাই দীপ্তিমতী হইয়া থাকে। ("কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে, রাজবতীমাহুরনেন ভূমিম্। নক্ষত্রতারা-গ্রহ-সঙ্কুলাপি, জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈবরাত্রিঃ"॥) কিন্তু এইবার মগধের ভাগ্যলক্ষ্মী আর একটু পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া বহু প্রাচীন গৌড়রাজধানীর প্রতি প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিলেন। গৌড়দেশ মগধ-সিংহাসনের শ্রী হরণ করিয়া লইল। কিন্তু আমরা সেই অধ্যায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গুপ্তযুগের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

যাঁহারা বলিতেন, ভারতীয় শিল্প বিদেশ হইতে এদেশে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য নিত্য নূতন বিস্ময়ের সামগ্রী সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়া অধুনা তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি অসার প্রতিপন্ন করিতেছে। কোন কোন লেখক "যোগীমারা" গিরিগুহা এবং বিজয়গড়ের প্রাচীন চিত্রাঙ্কন দেখিয়া তাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (Indian Antiquary, Vol. xxxiv, Sept., 1905)। কেহ কেহ রায়গড়ের অন্তঃপাতী সিঙ্গানপুর-গিরিগুহার চিত্রিত শৈলমালাকেও ঐ পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন (বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর বিবরণী, ১৯১৫, দ্রষ্টব্য)।

আদিম মানবের চিত্রালেখ্য, মধ্যভারতে সিঙ্গানপুরের গুহা-চিত্র।

শেষোক্ত চিত্রগুলি বি. এন. আর রেলওয়ের মিঃ এণ্ডারসন সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এই চিত্রগুলির সঙ্গে অধুনাতন কালের আবিষ্কৃত ফরাসী, স্পেন ও ইটালী দেশের প্রাচীন শৈলচিত্রগুলির খুব সাদৃশ্য আছে এবং এ সমস্তই এক যুগের বলিয়া মনে হয়। সিঙ্গানপুর বি. এন. রেলওয়ের নাহারপলী ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল দূরে। এই স্থানের পাহাড়ের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমর নাথ দত্ত, এল. এল. বি. মহাশয় ইংরেজীতে 'Pre-Historic Relics of Singanpur' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে সেই চিত্রগুলির কতকটির ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি অতিকায় বানরাকৃতি মনুষ্যের ছবিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার হাত-পায়ের গড়ন, সুবিস্তৃত বক্ষ, দীর্ঘবাহু,—খাট অথচ স্থূল স্কন্ধ এবং ঈষৎ কুব্জ দেহ যে যুগের মনুষ্যের আভাস দেয় তাহাকে, পণ্ডিতদের কেহ কেহ প্রস্তর-যুগ বলিয়া মনে করেন। মিঃ পারসি ব্রাউন তাঁহার Indian Painting নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"The rock paintings at Singanpur may be of very remote antiquity."* (সিঙ্গানপুরের এই গিরিচিত্রগুলি

* "These drawings depict human beings and animals and are accompanied by what appear to be hieroglyphics. Although many of these drawings are not unintelligible, enough of them have been identified to show that this primitive artist had a natural gift for artistic expression as proved by the facile manners in which he interpreted his ideas by means of these effective haematite brush forms.

—Indian Painting, p. 16.
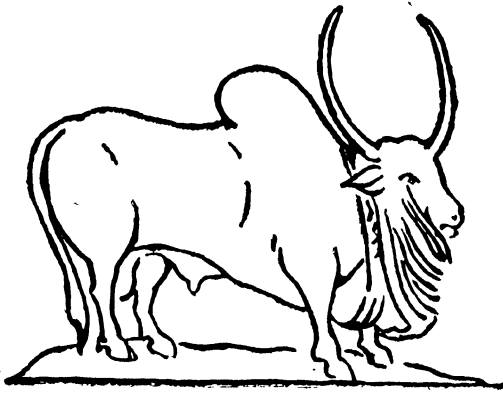
* মহেঞ্জোদারোর বৃষ, ৬।৭ হাজার বৎসর পূর্ব্বের, (২৪০-৪৬ পৃঃ)।
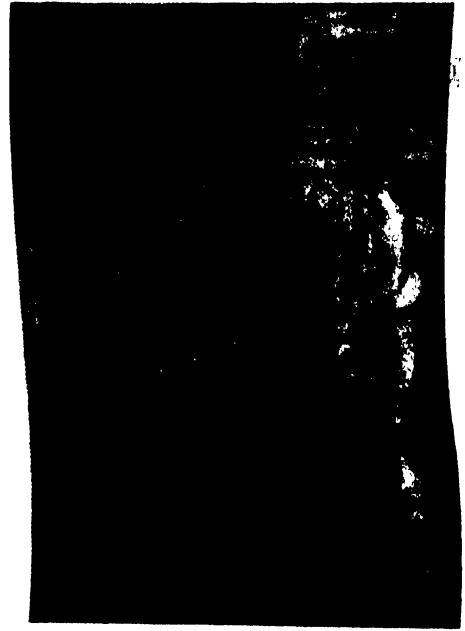
* পাহাড়পুরের একটি পুরুষের ছবি (পাহাড়পুর-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ৪১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

* পাহাড়পুরে তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে রাধাকৃষ্ণ ও গোপদের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই চিত্র 'যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন।'

মহেঞ্জোদারোর ক্ষুদ্র মানুষের মূর্ত্তি। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বীরভূম জেলার একটি কাঠের মূর্ত্তি আমরা এইরূপ দেখিয়াছি, এবং পরবর্ত্তী মূর্ত্তিটির সঙ্গে ইহার অতীব সাদৃশ্য আছে।

* কলিকাতা মিউ-জিয়ামের একতলার পূর্ব্বদিকের বারান্দায় নবম-দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটি ধূসরবর্ণ প্রস্তরস্তম্ভের শিরভাগের মূর্ত্তি হইতে গৃহীত।

মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে (৯৮৪ খৃঃ) লিখিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পুথির প্রথম পত্রে অঙ্কিত ছবি, মূল চিত্র রঞ্জিত।

নরপতি কবিচন্দ্রের ব্রহ্মযামল পুথির (১৭৬৯ খৃঃ) রঞ্জিত ছবি হইতে এই ছবিগুলি গৃহীত।

ব্রহ্মযামল, (১৭৬৯ খৃঃ)

ব্রহ্মযামল, (১৭৬৯ খৃঃ)

সিংহ—পটুয়ার আঁকা, ২৪শ পরগণা, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ।

সংকীর্তন—পটুয়ার কর্তৃক শুধু সাদায় আঁকা, (ফরিদপুর) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ।

সুদূর প্রাচীন যুগের বলিয়া মনে হয়)। এই চিত্রগুলির মধ্যে মৎস্যনারী (mermaid) এবং নানাবিধ পশুর প্রতিমূর্ত্তি আছে। তখনও হয়ত মনুষ্যেরা জীবজন্তুকে পোষ মানাইতে শিখে নাই। শিকার দ্বারাই সম্ভবতঃ তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই শিকারের ছবিগুলি দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত ইহাদিগকে 'শিকার-যুগের' মনুষ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন।

এই ছবিগুলি পাহাড়ের সিন্দুর ও গৈরিক প্রস্তরের গুড়া-দ্বারা অঙ্কিত। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন চিত্রাবলীর সঙ্গে ইহাদের নিকট-সাদৃশ্য লইয়া অমরবাবু খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন—এই ছবিগুলির সঙ্গে য়ুরোপের নানাস্থানে প্রাপ্ত এবং জাভা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন গিরিগুহায় অঙ্কিত মূর্ত্তি তুলনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ ইহাদিগকে বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া অনুমান করেন।

সিঙ্গানপুরের ছবিগুলি বিশ হাজার বা পনের হাজার বৎসর পূর্ব্বের কিনা পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন। এই সকল তারিখ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা আমার পুস্তকের বিষয়ভূত নহে; তথাপি নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে এগুলি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ছবি ও প্রতিমূর্ত্তির যুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। এই যুগের নিকট ঋগ্বেদের যুগকেও মানবজাতির শিশুকাল বলা যাইতে পারে। এইখানে সিঙ্গানপুরের কয়েকখানি ছবির প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

সম্প্রতি সম্বলপুর জেলায় বিক্রমখোলায় কতকগুলি চিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাও পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ। বিক্রমখোলার অনতিদূরে উষাকুটি নামক স্থানে ঐরূপ কতকগুলি জ্যামেতিক চিত্র ও প্রাণীর ছবি দুর্গম পাহাড়-গাত্রে পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমখোলা বি. এন. আর. পথে বেলপাহাড় ষ্টেসন হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। লিপিগুলি ৩১ × ৬ ফিট স্থান ব্যাপিয়া আছে। অক্ষরসংখ্যা প্রায় ৩৫০। উষাকুটির অক্ষর বা চিত্রসংখ্যা ২০।২৫টি হইবে। মহেঞ্জোদারোর চিত্রাক্ষরের সঙ্গে এই সকল অক্ষরের সাদৃশ্য আছে এবং ইহাদের কোন কোন অক্ষর ব্রাহ্মী লিপির ন্যায়। কিন্তু এখনও ইহাদের পাঠোদ্ধার হয় নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, ইহাদের সময় আনুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বের, মহেঞ্জোদারো ও অশোক-লিপির মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে এই অক্ষরগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

এই সিঙ্গানপুরের চিত্রগুলি কুড়ি হাজার বৎসর পূর্ব্বের অনুমান করিয়া লইলে ভারতীয় চিত্র-ইতিহাসের সময়-নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমরা নিম্নলিখিত ভাবে একটা ধারাবাহিকত্ব দেখাইতে পারি।

(১) সিঙ্গানপুরের চিত্র ২০,০০০ বৎসর পূর্ব্বের।
(২) মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার চিত্র—৬,০০০।৭,০০০ বৎসর পূর্ব্বের।
(৩) বিক্রমখোলার চিত্রাক্ষর—৪,০০০ বৎসর পূর্ব্বের।
(৪) মহাভারতাদি পুরাণ-বর্ণিত চিত্র—৩,৫০০ বৎসর পূর্ব্বের।
(৫) মৌর্য্যচিত্র—২,৫০০ বৎসর পূর্ব্বের।

এই সকল চিত্রে এমন কতকগুলি বিষয় দৃষ্ট হয় যাহাতে অকাট্যরূপে প্রমাণ হয় যে বঙ্গদেশের চিত্রবিদ্যা কোন কোন স্থলে ইহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। এতৎ-সংলগ্ন চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন। বাঙ্গালা পল্লীতে লক্ষ্মী-পূজায় ঠিক এইরূপ ছবি আঁকিয়া মেয়েরা পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতীয় চিত্র তাহার ধারাবাহিকত্ব হারায় নাই। কিন্তু এই সকল চিত্র বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল কাহারা? সে সকল চিত্রকরের বংশ কি লোপ পাইয়াছে?

আমরা মনে করি—আর্য্যগণ কোন চিত্র-সংস্কার লইয়া এতদ্দেশে আসেন নাই, ভারতীয় আদিম অধিবাসীদিগের নিকটেই এই সংস্কার তাঁহারা পাইয়াছিলেন। ব্যাবিলন, ঈজিপ্ট, ক্রীট্ এবং সুমেরিয়ান শিল্পের সঙ্গে এই ভারতীয় আদিযুগের শিল্পের নানারূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার যে লেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহিত ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির কতকটা মিল দেখা যায়, কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন; এবং অমরবাবুর পুস্তকের সিঙ্গানপুরের ৩নং চিত্রকে কেহ কেহ ঈজিপ্টের মত "চিত্রাক্ষর" বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও বিক্রমখোলার চিত্র ব্রাহ্মী লিপির আদিপুরুষ হওয়া অসম্ভব নহে।

আর্য্যগণ সঙ্গীতকে যেরূপ উচ্চস্থান দিয়াছেন, চিত্রকলাকে সেরূপ দেন নাই। সামগানে ঋষিরা প্রমত্ত হইতেন। নারদ, তম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীতের গুরুগণ আর্য্যগণপূজিত। দেবী ভারতীর হস্ত বীণা-রঞ্জিত।

আর্য্যসমাজে শিল্পীর স্থান।

চিত্র এবং স্থপতিশিল্পের দেবতা বিশ্বকর্ম্মাকে আর্য্যগণ যদিও তাঁহাদের দেবপঙ্‌ক্তিতে কতকটা স্থান দিয়াছেন, তথাপি কোন উচ্চবর্ণের লোকেরা ঐ দেবতার পূজা করেন না। স্বর্গবাসী দেবতারা কোন শিল্পকার্য্য করাইতে হইলেই বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন, তিনি তাঁহাদের কর্ম্মচারীর মত। "বিশ্বকর্ম্মা" ঠাকুর প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর শিল্পীদেরই দেবতা এবং তাহারাই এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা মনে হয় অনার্য্য জাতিদের নিকট হইতেই আর্য্যগণ এই শিল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লঙ্কার প্রধান শিল্পী 'বিদ্যুদ্‌জিহ্ব' রাক্ষসজাতীয় ছিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয় যজ্ঞের সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ময়দানব। এই ময়দানব প্রাচীন ব্যাবিলনের ময় (Maya) জাতীয় কিনা তাহা বিবেচ্য। মৌর্য্যযুগের শিল্পী "তুষাস্ক", যিনি সুদর্শন হ্রদের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তিনিও সম্ভবতঃ অনার্য্য-বংশোদ্ভূত, তাঁহার নাম আর্য্যজাতীয় বলিয়া মনে হয় না। ঐতিহাসিক-যুগে চণ্ডালজাতীয় সূর্য্য স্থপতি কাশ্মীরে যে সকল অদ্ভুত স্থাপত্যের দ্বারা বিতস্তা নদীর গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লণ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন; এখনও এ দেশে স্থাপত্য ও চিত্রের কারুকার্য্য সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই করিয়া থাকে। যাহারা তাম্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই শিল্পীরাও হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়—ভোগট, তাতট প্রভৃতি পাল রাজাদের নিযুক্ত শিল্পী নিশ্চয়ই উচ্চকুলজাত ছিল না। এমন কি

আদিম শিল্পীরা কোথায় গেল?

মোগলদের সময়েও আইন-আকবরিতে আবুল ফজেল যে কয়েকজন হিন্দু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই নিম্নশ্রেণীর; বিখ্যাত দস্বন্ত এবং কেশু কাহারজাতীয়। য়ুরোপে চিত্রকরেরা যে সম্মান ও অর্থ প্রাপ্ত হন, ভারতীয় শিল্পকারগণ অনেক বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য করিয়াও তদপেক্ষা অতি অকিঞ্চিৎকর প্রতিষ্ঠা ও অর্থ পাইয়া থাকে। ভুবনবিজয়ী "মসলীন" যাহারা প্রস্তুত করিত, তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাই বা কি ছিল? অর্থ সম্পদই বা কি ছিল?

হাতীর দাঁতের উপর যে সকল চিত্রকর মোগল বাদসাহদের স্বল্পাসতন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রতিকৃতি অঙ্কন করে, তাহারা এবং জয়পুরের অপূর্ব্ব প্রস্তর-শিল্পীরা অতিসামান্য উপার্জ্জনে তুষ্ট।

ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলে লিখিয়াছেন—ব্যাস বিশ্বকর্ম্মাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূজকগণ অর্থাভাবে না খাইয়া মরিবে।

এই সকল প্রমাণবলে আমার মনে হয়—ভারতীয় শিল্প অনার্য্যদের দান। অথচ বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন (৩য় শতাব্দী)—কলাবিদ্যার মধ্যে চিত্রবিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আদিম শিল্পিগণ কোথায় গেলেন? তাঁহারা কি জাতীয় ছিলেন?—এই জটিল প্রশ্নের সহজে সমাধান হয় না। ভারতবর্ষে যাঁহারা একবার আসিয়াছেন, কি হুন, কি শক, কি পাঠান, কি মোগল, কি কালাজ্বর, কি ম্যালেরিয়া কাহাকেও ত এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে দেখি নাই। য়ুরোপবাসীরা যেখানে যান তাঁহারা তদ্দেশবাসী অর্দ্ধসভ্যদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া ছাড়েন, যথা—আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ান। কিন্তু সকল শ্রেণীর লোকই, কি জেতা বা কি জিত, ভারতের ক্রোড়ে ভিন্ন ভিন্ন যুগে আশ্রয় পাইয়াছেন। আমার মনে হয়—ভারতের আদিম শিল্পিগণ আর্য্যসমাজের নিম্নস্তরে স্থান লাভ করিয়াছিল এবং এখনও তাহাদের বংশধরগণ 'কারিগর' শ্রেণী নাম ধরিয়া নিম্নজাতিদের অন্তর্গত হইয়া আছে। দীর্ঘকাল আর্য্যসমাজের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে তাহারা তাহাদের চেহারার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, তথাপি আমার মনে হয় অশোক-রেলিংএ যে বহুসংখ্যক চ্যাপ্টা নাক, এদেশবাসী হইতে কতকটা ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত ও মুখবিশিষ্ট লোক দৃষ্ট হয়, উহাই সেই আদিম শিল্পীদের মূর্ত্তি। শিল্পীরা মনুষ্যমূর্ত্তি আঁকিতে যাইয়া সহজেই তাহাদের নিজেদের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়াছে। এতৎসংলগ্ন চিত্র দেখুন।

অশোক-রেলিংএর মূর্ত্তি।

মৌর্য্য রাজগণের কীর্ত্তি দেখিয়া গ্রীস রাজদূত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পারস্য রাজধানীর ঐশ্বর্য্যকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মৌর্য্য-যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের উপর গ্রীক প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। গান্ধারের দিকে যেখানে গ্রীক ক্ষত্রপেরা (Satraps) আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিলেন, সেখানে অবশ্য গ্রীক-প্রভাবের অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহার পশ্চিমে যদি গ্রীক-প্রভাব কিছু থাকিলেও থাকুক—[illegible] চালাইয়াছে। ভারতীয় শিল্প কখনই গ্রীক-শিল্পের দ্বারা অভিভূত হয় নাই। [illegible] অশোক তাহার সাম্রাজ্যের দূর প্রান্তের প্রজা হইতেও রাজস্ব আদায় করিয়া

রাজভাণ্ডারে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, ভারতীয় শিল্প সেইভাবে বিদেশী শিল্প হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। তাহাতে ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, ভঙ্গী, শ্রী কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতীয় শিল্প অধ্যাত্মবাদী হইয়াও জড়জগৎকে তুচ্ছ করে নাই; উহাতে অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্যের সঙ্গে জড়জগতের শোভা মিশিয়া গিয়াছে, গ্রীক-শিল্প বাহিরের অবয়বের প্রতি বদ্ধ-লক্ষ্য। নরনারীর অবয়বে সম্পূর্ণতা দান করাই তাহাদের তুলির চরম সার্থকতা, কিন্তু ভারতীয় শিল্প ভূতলে দাঁড়াইয়া স্বর্গ ছুঁইতে চাহিতেছে। তাহাদের শিল্পপ্রতিভা বিদ্যুতের মত পৃথিবীতল হইতে ক্ষরিত হয় নাই, তাহা অধ্যাত্মরাজ্যের দান। গ্রীক-প্রভাবান্বিত বুদ্ধ এবং মগধের রীতি নির্ম্মিত বুদ্ধ—এতদুভয়ের পার্থক্য দেখাইবার জন্য আমরা কয়েকখানি ছবি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দিলাম।

গ্রীকশিল্পের প্রভাব।

এ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য। ভারতীয় বুদ্ধ ধ্যানের মূর্ত্তি। বৌদ্ধগণ এখন জগতের দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। চীন, জাপান, সিংহল, রেঙ্গুন, জাভা, কাম্বোডিয়া, শ্যাম, বালি প্রভৃতি সকল স্থানেই বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মগধশিল্পীর কয়েকখানি বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্যানী বুদ্ধের আদর্শ প্রতিকৃতি। তাঁহাদের নির্ম্মাণপ্রণালী ও বৈশিষ্ট্য অন্যদেশের অনায়ত্ত। কিন্তু এখানে আমি তাঁহাদের শিল্পশ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গ তুলিব না। যাঁহারা তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া প্রাচ্যভাবে ভাবিত হইয়া এই দেশে মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাঁহাদের কাজের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। রেঙ্গুনের বুদ্ধের ক্ষুদ্র চক্ষু ও স্ফীত গণ্ড, চিনে বুদ্ধের মোঙ্গলিয়ান মুখভাব, চ্যাপ্টা ওষ্ঠাধর, স্থূল হনু ও ভ্রূযুগ্মের ঊর্দ্ধগ তির্য্যগ্‌গতি, নানাদেশের অশিক্ষিত বর্ব্বর শিল্পিকৃত বুদ্ধের বিকৃত মূর্ত্তি—কুদর্শন, শোভাসৌষ্ঠব-বিরহিত প্রস্তরাকৃতি—কলিকাতার মিউজিয়ামের বিশাল বৌদ্ধ গ্যালারিতে এইরূপ শত শত বিচিত্র রকমের বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। খেজুরাহ, জাভা ও সিংহলের মগধ-শিল্পানুগ কয়েকখানি বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি অতীব সুন্দর, মাগধী পর্য্যায়ের চূড়ান্ত শোভা-সৌন্দর্য্য তাহাতে আছে।

ভারতীয় বুদ্ধ-মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, এই যে বিরাট্ বুদ্ধ মূর্ত্তির ব্যূহ আমরা চিত্রশালায় দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকটিতে সেই বৈশিষ্ট্যের ছাপটি আছে। সুন্দর অসুন্দর, সুশ্রী বিশ্রী, মগধ—রেঙ্গুন—আরাকান, প্রভৃতি সমস্ত প্রাচ্য জগতের বুদ্ধমূর্ত্তিই ভাব-প্রধান। ইহাদের সকলের উপরই অন্নবিস্তর একটা ধ্যানের ছাপ আছে, প্রত্যেক বুদ্ধকে দেখিয়াই যেন প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়। প্রত্যেকের দেহ যেন চিন্ময় এবং শরীরের প্রতীক হইয়াও অশরীরী। ইহাদের মুখে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আনন্দ—নিরানন্দ, প্রভৃতি সাংসারিক ভাবের লবলেশ নাই। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষের স্থির নিস্পন্দ ভাব, প্রশান্ত ওষ্ঠপুট, তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস-বিজ্ঞপ্তির সম্পূর্ণ অভাব;—এক কথায় 'নির্ব্বাণ' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বুদ্ধবিগ্রহের প্রত্যেকটিতে তাহা আছে। এমন কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে স্নায়ুর নিস্পন্দতা এবং একটা অপার্থিব নিশ্চেষ্টতা—মুখে সম্পূর্ণ বিকারচাঞ্চল্য বিরহিত, যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সেই নির্ব্বাণ-তত্ত্ব বুঝাইতেছে।

ভূমিস্পর্শমুদ্রা, বজ্রাসন প্রভৃতি সমস্তই যেন সেই নির্ব্বাণের ইঙ্গিত করিতেছে। যেরূপ কোন অক্ষম চিত্রকর ঘোড়া আঁকিতে যাইয়া ব্যর্থ হইলেও যেমন তেমন করিয়া তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়টি বুঝাইয়া দিতে পারে, বুদ্ধবিগ্রহনির্ম্মাতাও সেইরূপ হাজার অক্ষমতাসত্ত্বেও সে যে নির্ব্বাণতত্ত্বটি বুঝাইতে চায়, তাহা তাহার সম্পাদিত কার্য্য দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না।

এইবার গান্ধার-প্রভাবান্বিত বুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাহাতে মানুষের প্রতিকৃতি বিশেষভাবে স্ফুট, বাহ্য অবয়বের প্রতি লক্ষ্য অধিকতর, মানুষের লক্ষণ তাহাতে বেশী। শিল্পী যে মানুষ আঁকিতেছে, অপরূপ কিছু আঁকিতে বসিয়া যায় নাই, তাহা তাহার বাটালী বা তুলির প্রত্যেক রেখাপাতে ধরা পড়িতেছে। গ্রীক প্রভাবান্বিত কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তিতে নির্ব্বাণের গৌরব রক্ষা করিয়াও বাহিরে গ্রীক ধারার অঙ্গসৌষ্ঠব বজায় রাখিয়াছে।

বাহিরের সমালোচক ইহসংসারের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় হয়ত এই গ্রীক-আদর্শকেই বেশী প্রশংসা করিবেন, কারণ উহা ঠিক মানুষেরই প্রতিকৃতি, কিন্তু মাগধশিল্পী ঠিক এই মানুষিক তত্ত্বটি বুঝাইতে চান নাই। তিনি নরলোককে উপেক্ষা করিয়া বাসনার অতীত কোন রাজ্য খুঁজিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একান্ত অক্ষম প্রাচ্যশিল্পীর যে সফলতা হইয়াছে, অতি দক্ষ গ্রীক-শিল্পীর তাহা হয় নাই। পক্ষান্তরে অত্যুৎকৃষ্ট প্রাচ্যশিল্পীর কাজে বাহ্য সম্পূর্ণতার যে অভাব পরিলক্ষিত হইবে, নিকৃষ্ট গ্রীক-শিল্পীর কাজে হয়ত তাহা নাই। একটি সংসারের সামগ্রী, অপরটি ধ্যান-লোকের, এখন দুইটি চিত্র লক্ষ্য করুন। মগধের বুদ্ধ ধীর, স্থির, নির্ব্বিকার, প্রশান্ত—নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়। তাঁহার ওষ্ঠাধরে, অবনমিত অক্ষিপুটে, এমন কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা নিবিড় শান্তির ছায়া—নির্ব্বাণতত্ত্বের জীবন্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ। অপরদিকে গ্রীক-প্রভাবান্বিত বুদ্ধের করাঙ্গুলিতে কোন কোন চিত্রে ধ্যানের উপযোগী মুদ্রালক্ষণ বিরাজমান, কিন্তু তাহা একান্তই বাহ্য। তাঁহার সমস্ত শরীরে জীবনের স্পন্দন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হইতেছে,—তাঁহার মুখের ভাবে কোন কথা বুঝাইবার চেষ্টা ও বাক্‌চাতুরী যেন সাংসারিক ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে।

এই যে মগধাশ্রিত শিল্প, এখনও তাহা এ দেশ হইতে তিরোহিত হয় নাই। বাঙ্গলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও যেরূপ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় এই দেশই একসময়ে মগধের শিল্পশালা ছিল। হয়ত মগধের শিল্পকার্য্যের জন্য বঙ্গদেশই শিল্পী সরবরাহ করিয়াছে। শুধু ঢাকার মসলিন নহে, সোনারূপার কাজ, কিম্বা প্রস্তরশিল্প, কাষ্ঠফলকে, ইষ্টকে, কার্পাসে সর্ব্বত্র বাঙ্গলাদেশ হইতে যে অজস্র চারুশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় পূর্ব্বভারতের মধ্যে বঙ্গদেশই সর্ব্বপ্রধান শিল্প-কেন্দ্র ছিল। এখনও বঙ্গদেশের কুম্ভকারগণ যে সকল দেবদেবী নির্ম্মাণ করে, তাঁহাদের মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গীতে সেই প্রাচীন ধারা সহজেই ধরা পড়িবে। মগধ যে দীপ জ্বালাইয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—এখনও সেই দীপ ক্ষীয়মাণ হইয়া এদেশের পল্লীতে পল্লীতে জ্বলিতেছে।

বাঙ্গলাদেশে মগধের শিল্প-শালা।

ভারতীয় শিল্পকলাদি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এত উল্লেখ ও ইঙ্গিত আছে যে তাহা অগ্রাহ্য করা বাতুলতা। এই শিল্পসম্বন্ধে বেদে যে আভাস আছে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও রামায়ণ, মহাভারতাদি পুরাণ হইতেও নানা কাব্য ও নাটিকার সুস্পষ্ট-ভাবে বহু উল্লেখ আছে। কালিদাসের বহু পূর্ব্বে ভাস-কবি তাঁহার প্রতিমা নাটকে ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়াই মৃতের চিত্রশালায় দশরথের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই গৃহে ইক্ষাকুবংশের মৃত রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি ছিল—সেই মৃত রাজগণের পঙ্‌ক্তিতে নবনির্ম্মিত দশরথের মূর্ত্তি দেখিয়া ভরত ঘটনাটি বুঝিলেন এবং শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রামায়ণে রাবণের আদেশে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষস রামের কর্ত্তিত মস্তক ও ধনু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; "নয়নে মুখবর্ণঞ্চ ভর্ত্তুস্তৎসদৃশং মুখম্। কেশান্ কেশান্তদেশঞ্চ তঞ্চ চূড়ামণিং শুভম্। এতৈঃ সর্ব্বৈরভিজ্ঞানৈরভিজ্ঞায় সুদুঃখিতা।" (লঙ্কা, ৩২শ অঃ।) বৈদেহী সেই মায়ামুণ্ডের মুখবর্ণ, চক্ষু, কেশ, মাথার চূড়ামণি এবং সমস্ত লক্ষণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া শোকসন্তপ্তা হইলেন। বিদ্যুজ্জিহ্ব এরূপ পারদর্শিতার সহিত তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, সীতার ন্যায় রামগতপ্রাণা স্ত্রীও তদ্দ্বারা প্রতারিত হইয়া শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে যেরূপ শিল্পসম্ভারের বর্ণনা আছে এবং রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন চিত্রশালার উল্লেখ (সুন্দর, ৩৬ শ্লোক) দৃষ্ট হয়, তাহাতে, প্রাচীন কালে এদেশের মানুষের মূর্ত্তি কেহ গঠন বা চিত্রণ করিতে পারিত না—এরূপ মত যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলি নিতান্ত একটা আবর্জ্জনার স্তূপ মনে করেন, আমরাও কি তাহাই করিব? মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের ময়দানবকৃত যে রাজসভার বর্ণনা আছে তাহা কা হায়েন কথিত চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার সঙ্গে তুলিত হইয়া শ্রেষ্ঠতর আসন পাইবার যোগ্য, কিন্তু কোন গ্রীক দূত তাহা দেখেন নাই—সুতরাং তাহা অবজ্ঞেয়। ইংরাজীতে যাহাকে ইতিহাস বলে, আমাদের কাব্যপুরাণাদি তাহা না হইতে পারে,—কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা আছে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিল্প প্রভৃতির যে যথাযথ চিত্র দেওয়া আছে তাহা মনগড়া কথা নহে। কবি বা লেখকেরা যাহা দেখিতেন, তাহাই বর্ণনা করিতেন। ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় স্ফটিক-পরিশোভিত একটা স্থানকে জলাশয় মনে করিয়া দুর্য্যোধন জলভ্রমে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া উপহসিত হইয়াছিলেন ("স কদাচিৎ সভামধ্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ। স্ফটিকং স্থলমাসাদ্য জলমিত্যভিশঙ্কয়া। স্ববস্ত্রোৎকর্ষণং রাজা কৃতবান্ বুদ্ধিমোহিতঃ।") একটা জায়গায় একটা স্ফটিকের স্তম্ভ বা ভিত্তি ছিল, তাহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে মনে হইত যেন দুইটি কাচের দরজা খোলা আছে, দুর্য্যোধন ঢুকিতে যাইয়া কঠিন স্ফটিকের ধাক্কা খাইয়া মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলেন। ("দ্বারন্তু পিহিতাকারং স্ফাটিকং প্রেক্ষ্য ভূমিপঃ। প্রবিশন্নাহতো মূর্দ্ধ্নি ব্যাঘূর্ণিত ইব স্থিতঃ॥") আবার একটা স্থানে দুইটি স্ফটিকময় বিশাল কবাট মুক্ত ছিল, কিন্তু ঊর্দ্ধস্থিত মণিজ্যোতিতে এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন দুইটি দরজাই বন্ধ, তখন দুই হাত বাড়াইয়া দুর্য্যোধন তাহা খুলিবার

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রমাণ।

অভিপ্রায়ে তাহাতে বেগে ধাক্কা দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। ("তাদৃশকাপরং দ্বারং স্ফটিকোরুকপাটকম্। বিঘট্টয়ন্ করাভ্যাস্ত নিষ্ক্রমাগ্রে পপাত হ।") অন্ত একজায়গায় একটি মুক্ত দ্বার ছিল, তাহাও পূর্ব্ব দ্বারের ন্যায় আবদ্ধ মনে করিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। ("দ্বারন্ত বিতত্তাকারং সমাপেদে পুনশ্চ সঃ। তদ্ বৃত্তকেতি মন্বানো দ্বারস্থানাদুপারমৎ"—সভা, ৩৫ অঃ, ১০-১২ শ্লোক।) অভিমানী দুর্য্যোধন অহঙ্কারবশতঃ দ্বারদর্শক কাহারও সাহায্য না লইয়া এইরূপ নানা ভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন।

ভারতীয় স্থপতিরা যে প্রাচীনকালে নানারূপ মণি, স্ফটিক ও কাচসংযোগে গৃহনির্ম্মাণের বিচিত্র কৌশল দেখাইতেন, এই সকল পাঠ করিয়া এতৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। রাজসূয়যজ্ঞের উপলক্ষে কাম্বোজের রাজা যুধিষ্ঠিরকে ষোলখানি পট্টবস্ত্র ভেট দিয়াছিলেন, মহাভারতে লিখিত আছে তাহা কদলীপত্রের ন্যায় মসৃণ—তাহাদের কোন কোনটি কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি শ্যামবর্ণ এবং কোনটি অরুণবর্ণ। কৃষ্ণ নানামণিরত্নখচিত শিক্যের ('শিকায়') মধ্যস্থিত সুবর্ণময় জলপাত্র যুধিষ্ঠিরকে এই উপলক্ষে উপহার দিয়াছিলেন। এই সকল দ্রব্যের কারুকার্য্য এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ছিল যে দুর্য্যোধন শকুনীকে বলিয়াছিলেন, "মাতুল, এই দ্রব্যগুলি দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্যদর্শনে আমার যেন জ্বর হইয়াছিল। ("দৃষ্ট্বা চ মম তৎ সর্ব্বং জ্বররূপমিবা-ভবৎ॥")

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভাকে গ্রীকদূত সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। পারস্তের রাজসভা তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সভা তাহাকে পরাজিত করিয়াছে, এসকল মানুষের হাতের কাজ নহে; কোন দৈব শিল্পি কৃত। গ্রীকদূতের এইরূপ উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই; ব্যাস, বাল্মীকির কথা অগ্রাহ্য, কিন্তু ফা হায়েন, মেগাস্থিনিস্ ও ইৎসিং যত অদ্ভুত কথাই তাঁহারা বলুন না কেন, তাঁহাদের কথা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যে ভারতীয় স্থাপত্য ও কলাশিল্প খুব উচ্চ দরের ছিল এবং গ্রীক ও পারস্তের শিল্পীদিগকে ছাপাইয়া গিয়াছিল—একথা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তথাপি গ্রীকদিগের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি চিরবিশ্বাসীরা এক কথায় সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন না।

ভারতবর্ষে দেবদেবী, বহু হস্ত, বহু মুখ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সহকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিয়া ভাসাভাসা সমালোচনা করেন, তাঁহারা হয়ত মনে করিতে পারেন, এই শিল্প বিশৃঙ্খল,—ইহার কোন সূত্র বা নিয়ম নাই, শিল্পী তাঁহার খেয়ালে কার্য্য করিয়া যান। কিন্তু শুক্রনীতি ও শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তকে কলাশিল্পের নির্মাণের যে সকল সূক্ষ্ম ও কঠোর নিয়ম আছে, তাহাতে শিল্পীর যথেচ্ছাচারের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। এমন কি মনুষ্যমূর্ত্তি ও গজমুণ্ডের সংযোগে যে গণেশ দেবতা নির্ম্মিত হইয়া থাকেন, তাঁহার সম্বন্ধেও অনেক খুঁটিনাটির আইন আছে। যথা—গণেশের মস্তক হাতীর, মনুষ্য-মূর্ত্তি, কর্ণ লম্বা,—

গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে শিল্পীদের নিয়ম, শুক্রনীতি।

লম্বোদর, ক্ষুদ্র কিন্তু মাংসল স্কন্ধ, মাংসল পদদ্বয়, দীর্ঘ শুঁড়, বামদন্ত দেখাইতে হইবে না, শুঁড় বামদিকে হেলান থাকিবে। মূর্ত্তির শিরা, অস্থিসংযোগ দেখাইতে হইবে না। ইহার পরিমা এইরূপ—শুঁড় = ৪½ তাল ; মস্তক = ১০ আঙ্গুল, শুঁড়ের শেষদিকে পুষ্কর থাকিবে। কর্ণ = (দৈর্ঘ্যে) ১০ আঙ্গুল এবং (বিস্তৃতিতে) ৮ আঙ্গুল। দুই কাণের অবকাশ স্থানের মাপ = ১ তাল এবং এক আঙ্গুল। চক্ষুর উপর দিয়া মস্তকের পরিধি = ৩২ আঙ্গুল। চক্ষুর নিম্নভাগে শুঁড়ের উৎপত্তিস্থান হইতে মস্তকের পরিধি ২৬ আঙ্গুল। পুষ্কর এবং শুঁড়ের শেষদিকে পরিধি = ১০ আঙ্গুল। কর্ণের দৈর্ঘ্য = ৩ আঙ্গুল, উহার পরিধি ৩০ আঙ্গুল। উদরের পরিধি = ৪ তাল। উদরের দৈর্ঘ্য = ৬ অথবা ৮ আঙ্গুল। দাঁত = দৈর্ঘ্যে ৬ আঙ্গুল ; উৎপত্তি স্থানে পরিধি ঐরূপ। নিম্নাধর = ৬ আঙ্গুল, পুষ্করের মধ্যে পদ্ম থাকিবে। উরুর উৎপত্তিস্থলে পরিধি = ৩৬ আঙ্গুল। উরুর শেষদিকের পরিধি = ২৩ আঙ্গুল। হাতের উৎপত্তিস্থানে পরিধি শেষদিকটার পরিধি অপেক্ষা এক কিংবা দুই আঙ্গুল বড়। চক্ষু এবং কর্ণে অবকাশ স্থান = ৪ আঙ্গুল। চক্ষুর দুই প্রান্তের ব্যবধান, দুই চক্ষের তারার ব্যবধান এবং চক্ষুর্দ্বয়ে উৎপত্তিস্থানের ব্যবধান = (ক্রমান্বয়ে) ১০, ৭ এবং ৬ আঙ্গুল।

এই ভাবে বহুমুখ, বহুহস্ত, বহুপাদ দেবতাদিগের সমস্ত দেহের খুঁটিনাটির পরিমাণ দেওয়া আছে।

পরিমাণসূচক যে সকল শব্দ (পারিভাষিক) ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ:— একটি মুষ্টির ¼ অংশ = এক আঙ্গুল, (মুষ্টি = হাতবদ্ধ করিলে যে 'মুঠ' হয় তাহাই)। তালে দৈর্ঘ্য ১২ আঙ্গুল। ৫ তালে = এক বাল, ৬ তালে = এক কুমার।

মূর্ত্তিগুলির যেরূপ পরিমাণ হইবে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

(সাধারণতঃ)		(অসাধারণ)	
বামন	= ৭ তাল	নরনারায়ণ	= ১০ তাল
মানুষ	= ৮ তাল	চণ্ডী	= ১২ তাল
দেবতা	= ৯ তাল		
রাক্ষস	= ১০ তাল	ভৈরব, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র	= ১৬ তাল
স্ত্রী	= ৭ তাল		
কুমার	= ৬ তাল		
বাল	= ৫ তাল		

৭ তাল-পরিমিত মূর্ত্তির মাপ :—

(১) মুখ = ১২ আঙ্গুল, (২) গ্রীবা = ৩, (৩) হৃদয় = ৯, (৪) উদর = [illegible] (৬) সক্থি = ১৮, (৭) জানু = ৩, (৮) জঙ্ঘা = ১৮, (৯) পাদাধঃ = ৩।

৮ তাল-পরিমিত মূর্ত্তির মাপ :—

(১) মুখ = ১২ আঙ্গুল, (২) গ্রীবা = ৪, (৩) হৃদয় = ১০, (৪) [illegible] (৫) বস্তি = ১০, (৬) সক্থি = ২১, (৭) জানু = ৪, (৮) জঙ্ঘা [illegible] [illegible] = ৪।

১০ তালের মাপ ;—

(১) মুখ=১৩ আঙুল, (২) গ্রীবা=৫, (৩) হৃদয়=১৩, (৪) উদর=১১, (৫) সক্থি=১৩, (৬) জঙ্ঘা=২৬, (৭) জানু=৫, (৮) গুল্ফ=৫, (৯) মণি=১।

"শিশুদের (বাল) দৈর্ঘ্যের বিচিত্রতা ঘটে ; কণ্ঠের নিম্ন হইতে সমস্ত শরীর যেভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহাদের মুখ সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না। কণ্ঠের নিম্ন হইতে সমস্ত শরীরের যে দৈর্ঘ্য, তাহা মুখের ৪½ গুণ। কণ্ঠের নিম্ন হইতে শিশ্ন পর্য্যন্ত মাপ মুখের দ্বিগুণ ; উরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত=মুখের দ্বিগুণ। হস্ত মুখের আড়াই গুণ।"

"শিশুরা পাঁচ বৎসরের পর হইতে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায়। মেয়েদের ষোড়শবর্ষে সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হয়।" (শুক্রনীতি—৪র্থ অঃ, ৪র্থ পঃ, ১৬৯-৪১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের যে সকল স্থানে মাপের বিভিন্নতা আছে, তাহা অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আলঙ্কারিকদের ক্ষীণ কটি, বিপুল নিতম্ব, পদ্মাক্ষ প্রভৃতির অতিরঞ্জিত রূপবর্ণনার সঙ্গে শুক্রনীতির পরিমাণের ঐক্য অল্প। শুক্রাচার্য্য স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াছেন।

এই সকল শিল্পসম্বন্ধীয় নিয়ম পড়িলে দৃষ্ট হইবে যে এদেশের শিল্পাচার্য্যগণ অতি সূক্ষ্মভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ স্থির করিয়া দিয়াছেন। মূর্ত্তি স্বাভাবিকই হউক বা উদ্ভট রকমেরই হউক—প্রত্যেকটি সূক্ষ্মবিষয়ের হিসাব আছে, শিল্পীকে কোনরূপে ব্যভিচারী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। আমরা সামান্য কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করিলাম মাত্র।

কিন্তু শুক্রনীতির কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য—তাহা ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক এবং সেই কয়েকটি সূত্রের উপরই এদেশের শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। যদিও আচার্য্যগণ শিল্পীর হাত পা আইনকানুন দ্বারা একরূপ বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেই কয়েকটি সূত্র পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, এই সকল আঁটা আঁটি বাঁধন সত্ত্বেও তাঁহারা শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করেন নাই। শিল্পীকে তাঁহারা কখনই ক্রীতদাসে পরিণত করেন নাই। যেখানে ভারতের প্রকৃত মহিমা—তাহার অর্জ্জনকারীকে তাঁহারা তপস্যা করিতে বলিয়াছেন ; পরের নির্দ্দেশে কতকদূর যাওয়া যায়—কিন্তু গৌরবের শীর্ষস্থানে উঠিতে হইলে সাধককে একা যাইতে হইবে,—সমস্ত বন্ধনের অতীত রাজ্যে একা একা প্রাণের দেবতার সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। শুক্রাচার্য্য লিখিয়াছেন, "সকল মূর্ত্তির চরম উদ্দেশ্য ধ্যানযোগের সহায়তা করা ; সুতরাং শিল্পীকে ধ্যাননিরত হইতে হইবে।" মূর্ত্তির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে শিল্পীকে ধ্যানধারণা করিতেই হইবে—ইহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। এমন কি সাক্ষাৎভাবে রূপদর্শন ও তাহা পরীক্ষা করিয়া [illegible] শিল্পী কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। (নকল বিদ্যায় কুলাইবে না।) শুক্রনীতি—[illegible] পরিচ্ছেদ, ১৪৭-১৫১ শ্লোক।

ভারতীয় শিল্পের স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্য।

শুক্রনীতি স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মনুষ্যের মূর্ত্তি গড়িতে হইবে না। দেবমূর্ত্তিই গড়িতে হইবে। মনুষ্যমূর্ত্তি যদি সুশ্রী এবং সুগঠিত হয়—তাহাকে ছাড়িয়া বিশ্রী ও কুরূপ দেবমূর্ত্তিগঠনও শ্রেয় (৪র্থ অঃ, ৪র্থ পঃ, ১৫৪-১৫৭ শ্লোক)।

এই শ্লোক কয়টিতেও ভারতীয় শিল্পের চরম কথা বলা হইয়াছে। এরূপ কথা অন্য কোন দেশে কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। ইহা ভারতীয় নিজস্ব কথা।

যদি শিল্পী মনুষ্যের মূর্ত্তি গড়িতে লাগিয়া যান, তবে কোটীপতিদেরই মূর্ত্তি লইয়া ব্যস্ত হইবেন। অর্থের প্রলোভনে সুরূপ, কুরূপ ধনী ব্যক্তিদের খেয়াল পূর্ণ করিতেই তাঁহার জীবন চলিয়া যাইবে, তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার প্রাণের দেবতাকে অঙ্কন বা গঠন করিতে বসিয়া যান, সে মূর্ত্তি, গণেশ, কার্ত্তিক, চণ্ডী বা বিষ্ণু যে দেবতারই হউন না কেন—তাঁহার ধ্যানে তিনি ডুবিয়া পড়িবেন। আরাধ্যদেবতার অনুপ্রাণনায় তাঁহার সমস্ত কলাশিল্প-শক্তি উদ্বোধিত হইবে, তিনি ধ্যানালোকে পৌছিয়া তাঁহাব কার্য্যের চরম সফলতা লাভ করিবেন।

মনুষ্যমূর্ত্তি গড়িতে হইবে না, দেবমূর্ত্তি গড়িতে হইবে।

স্থাপত্যসম্বন্ধে শুক্রাচার্য্যের নিয়মগুলি এমনই পরিপূর্ণ এবং খুঁটিনাটি-তত্ত্বপূর্ণ। বঙ্গদেশে প্রাচীন প্রাসাদাদি খুব বেশী নাই। তদ্বর্ণিত মেরু, মন্দর, ঋক্ষমালি, দ্যুমণি, চন্দ্রশেখর, মাল্যবান্, পারিযাত্র, রত্নসার, ধাতুমাল, পদ্মকোষ, পুষ্পহাস, শীকর, স্বাস্তিক, মহাপদ্ম, পদ্মকূট, বিজয় প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর মন্দিরের গঠনপ্রণালী, ডোম (dome) বা স্তম্ভের সংখ্যা, উচ্চতা, কত তল প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ কথা নীতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার খড়ো ঘরের রীতি বহু প্রাচীন এবং দেশজ। এসম্বন্ধে স্থানান্তরে লেখা হইবে। আমরা অবগত আছি বাঙ্গলার মন্দির ও গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রাচীন একখানি পুঁথি মেদিনীপুর জারগ্রামে ছিল। যিনি আমাকে এই পুস্তকের সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি এখনও উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ডাকের বচনের "পূর্ব্বে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে ঘেরে, দক্ষিণে ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে"—পূবে হাঁস অর্থ পূর্ব্ব-দিকে জলাশয়। পল্লীর কুটীরস্থাপত্যের এই নিয়ম পল্লীবাসী সকলেরই মুখে মুখে শোনা যায়।

বাঙ্গলার চিত্রশিল্প বহু প্রাচীন। হরিবংশের চিত্রলেখা বাঙ্গলার আদি যুগের চিত্রকরী। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের বাণ রাজার কন্যা উষা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, কামদেবের পুত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া—প্রেমে পতিত হন। এই স্বপ্ন-দৃষ্ট তরুণ সুদর্শন রাজকুমার কে তাহা তিনি কিছুতেই জানিতে না পারিয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন। তাঁহার সখী চিত্রলেখা তখন ভারতীয় তৎকাল-প্রসিদ্ধ যাবতীয় তরুণ রাজকুমারের চিত্র অঙ্কন করিয়া কুমারী উষার নিকটে উপস্থিত করেন, তন্মধ্য হইতে উষা সহজেই অনিরুদ্ধকে চিনিয়া লইয়াছিলেন। হরিবংশের পূর্ব্বে মনুষ্যমূর্ত্তির অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কনের কথা বোধ হয় আর কেহ বলেন নাই। চিত্রলেখার সময়ে এবং তাহার পূর্ব্ব

বাঙ্গলায় বরকন্যার চিত্র।

২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত নায়িকা-চিত্র

ব্রহ্মযামল (১৭৬৯ খৃঃ)

পোটোদের ছবি, ১০৩৭ সনে অঙ্কিত (বাঁকুড়া জেলা) চিত্র হইতে।

পোটোদের ছবি, ১০৪৭ সনে অঙ্কিত (বাঁকুড়া জেলা) চিত্র হইতে।

হইতে যে এদেশে চিত্রবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল—এই বিবরণ হইতে তাহা অনুমিত হয়।*

এইরূপ বরকনের চিত্র আঁকিয়া দেশে-বিদেশে ঘটকরমণীরা দেখাইয়া বিবাহ স্থির করিতেন। এতৎসম্বন্ধে বাঙ্গলায় বহুদিনের কিংবদন্তী আছে। প্রাচীন পল্লী-গীতিকায় দৃষ্ট হয় বহু পল্লী-সুন্দরীর চিত্র লইয়া ঘটকীরা দেশবিদেশে আনাগোনা করিত। কথিত আছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমও এই চিত্রদর্শন হইতেই প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় এই কথা পাওয়া যায়। পূর্ব্বরাগের প্রথমাংশের নামই "চিত্রদর্শন"।

"কি চিত্র বিচিত্র মরি দেখাইল চিত্রকরী, প্রাণ মম নিল যে হরি।"
"বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট, মোরা বলেছিলাম সে বড় লম্পট॥"—

প্রভৃতি বহুবিধ গান বৈষ্ণব কবিগণ রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যুগেও ঐরূপ চিত্রাঙ্কনের দ্বারা পাত্রপাত্রীর মন আকর্ষণ করার রীতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জঙ্গল-বাড়ীর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান-কুমারী সখিনার চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া কুমার-ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন—"ফিরোজ খাঁ" নামক পল্লী-গীতিতে তাহা দৃষ্ট হয়। "মুকুট রায়" নামক রাজপুত্রের কথা উক্ত নামে অভিহিত পল্লীগীতিকায় দৃষ্ট হয়; রাজা তাঁহার জন্য পাত্রী খুঁজিতে নানাদিক্ হইতে রাজকন্যাদের চিত্রপট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মুকুট রায় সেই ছবির কোনটিই পছন্দ করেন নাই।

চণ্ডীদাসের—

"হাম সে অবলা, সরলা অখলা—ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি॥"—

প্রভৃতি পদ সকলেই অবগত আছেন।

রাজা ও রাজতুল্য ব্যক্তিদের ছবি যে একসময়ে সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালিদাসের শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্তের ছবি অঙ্কন করিবার যে কথা আছে তাহাতে দেখা যায়, এ বিষয়ে তাঁহার পটুতা কত বেশী ছিল। চিত্রোপযোগী ঘটনানির্দ্দেশ, দূরত্বের পরিষ্কার ধারণা এ সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরচরিতে রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ ও পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির চিত্রিত দৃশ্যপট লক্ষ্মণ সীতাকে দেখাইতেছিলেন—সেই অঙ্কটি ভবভূতির পাঠকদের সুপরিচিত। গুপ্ত সম্রাট্‌গণ এমন কি কণিষ্ক প্রভৃতি শক রাজাদের মূর্ত্তি তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত পাওয়া যাইতেছে। মহেঞ্জোদায়োর মূর্ত্তিগুলির আবিষ্কারের পর উগ্রপন্থী গ্রীকভক্তগণ এখন আর বলিবেন না যে হিন্দুরা গ্রীস হইতে মূর্ত্তি আঁকিবার

* It is a notable fact that the first Indian painter mentioned by name was a woman. Chitralekha was the heroine of an incident in the *Dwaraka Lila*, a work of the Epic age and probably dating from many centuries before the Christian era.

—P. Brown's Indian Paintings, p. 11.

খা গঠন করিবার কৌশলটি শিখিয়াছিলেন। যদিও ভারতীয় শিল্প বিদেশাগত, কোন কোন পণ্ডিত এই মত প্রতিপন্ন করিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সকল মতের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান কালে পুঞ্জীভূত আবিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে—যাহাতে সেগুলি আর মাথা তুলিতে পারিবে না। আমরা এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া যাইব।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর যে বর্ণনা গ্রীক দূত দিয়াছেন তাহাতে তাহাদের সৌধরচনা ও সাধারণতঃ সমস্ত স্থাপত্যের উৎকর্ষের আলোচনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে অতটা উৎকর্ষ হঠাৎ একদিনে হইতে পারে না। ইহাদের পূর্ব্বে বহু সাধনা হইয়া গেলে তৎপরে ঐরূপ সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু সেই সাধনা, সেই আদি প্রচেষ্টার কোন চিহ্ন ভারতবর্ষে নাই, সুতরাং এই উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের জন্য ভারতবাসী হেলেনার শিল্পের নিকট ঋণী। কিন্তু স্মিথ সাহেব বলেন উত্তর-ভারতে উপর্য্যুপরি মুস্লিম আক্রমণে ভারতীয় আদি যুগের শিল্পের নমুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহাতে ভারতীয় রীতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ এই দেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের উপর এমন স্পষ্ট যে উহা বিদেশাগত বলিয়া মনে হয় না। আদিযুগের শিল্পের কোনই নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই বলিয়া ভারতীয় শিল্পী গ্রীক-মহাজনের খাতক প্রতিপন্ন করিতে যাঁহারা চেষ্টিত হইয়াছিলেন,—মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা তাঁহাদের যুক্তির ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেঞ্জোদারো, চীন-পর্য্যটকগণের মত

সম্প্রতি মহেঞ্জোদারোর (শব্দটির অর্থ, মৃতের স্তূপ) ৭২০ বিঘা জমির নিম্নে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে গ্রীকেরা হিন্দুদিগকে চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিখাইয়াছেন, এই পরিকল্পনা এখন উড়িয়া যাইবে। এই সকল নিদর্শন বহু যুগ ব্যাপক, স্তরে স্তরে ভিন্ন ভিন্ন যুগের চিহ্ন উহাতে আছে। খৃষ্ট জন্মিবার ৫।৬০০০ বৎসর পূর্ব্বের যে সকল বাড়ী ঘর ও মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বা যাইতেছে—তাহা শুধু সময় হিসাবে পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, উহা ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের আদিরূপ দেখাইতেছে। এইগুলি ভারতীয় শিল্পের জনক, এক পরিবার ভুক্ত। ইহাতে যে সকল অক্ষর দৃষ্ট হয় তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়, ইহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের ময়দানব কৃত গোটা সভাটা আর শুধু কবি কল্পনা বলিয়া মনে হইবে না,—ইজিপ্ট ও ব্যাবিলনের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী বলা চলিবে না। কিন্তু আর্য্যগণ যদিও এই শিল্পের অনেক উন্নতি করিয়াছেন, আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা

৫০০০ খৃঃ-পূর্ব্বের ভারতীয় শিল্প।

করিয়াছি—এই শিল্প আর্য্যদের নহে—ইহা ভারতীয় আদিম অধিবাসীদের। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার শিল্প অপেক্ষাও সিঙ্গানপুরের শিল্প বহু প্রাচীন, তাহা আদিম মানবের শিল্পে হাতে খড়ি। মহেঞ্জোদারো সিন্ধু দেশের লারকণা প্রদেশে অবস্থিত এবং হরপ্পা পাঞ্জাবের মনগোমরি জেলার অন্তঃপাতী।

খেজুরাহ, ভুবনেশ্বর, মগধ এবং বঙ্গদেশের নানাস্থানে রমণীদের যে নানারূপ লীলায়িত ভঙ্গী আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহার আদি খুঁজিতে আমাদের আর হেলেনায় যাইতে হইবে না। স্যার জন মার্সেল তিনখানি মস্ত বড় পুস্তকে মহেঞ্জোদারোর প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গলা দেশের আলিপনা ও কাঁথার পদ্মের সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর পদ্মগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই স্থানের একটি লোকের আকৃতি পর পৃষ্ঠায় দিতেছি, আমরা বীরভূমির কাষ্ঠে ক্ষোদিত প্রাচীন একটি মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহা অনেকটা এই রকমের।

মার্সেল লিখিয়াছেন, গ্রীকদিগের পূর্ব্বেই মহেঞ্জোদারোর শিল্পীরা জীবজন্তু অঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। এখানে ঐ দেশে প্রাপ্ত বৃষের মূর্ত্তির একটি নমুনা দিতেছি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই অনার্য্যলোকেরা ৭,০০০ বৎসর পূর্ব্বে শিবপূজা করিত এবং শুধু লিঙ্গ নহে, ধ্যানস্থ শিব মূর্ত্তিও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া যাইতেছে। শিব কোথা হইতে আসিলেন, কেহ তাহা জানে না। দক্ষ তাঁহাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি দেবগণের গণ্ডীর বাহিরে ছিলেন, অনার্য্য নন্দী-ভৃঙ্গী তাঁহার সহচর ছিল, এই ভাবের পৌরাণিক বর্ণনা আমরা জানিতাম, তাঁহার আদি খুঁজিতে হয়ত আমাদিগকে অনার্য্য নিষেবিত কোন পার্ব্বত্য দেশে যাইতে হইবে। এবার তাঁহার গোড়াকার খবরটা কতকটা পাওয়া গেল।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, মৌর্য্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে বাঙ্গালীর কতকটা হাত ছিল। মগধ বাঙ্গলার প্রতিবেশী। গুপ্তদের সময়কার যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি আছে—সেগুলি খাস মগধ শিল্পশালার। তাঁহাদের উন্নত নাসিকা, কবাট বক্ষ এবং ধ্যানস্থ, সুগঠিত শ্রীবিশিষ্ট আর্য্যমূর্ত্তি ভাস্কর্য্য-মহিমার চরম আদর্শ। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই মাগধ বুদ্ধের অনুপম মুখশ্রী বাঙ্গালীরা এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের দেবমূর্ত্তি হইতে ক্রমশঃ সেই দেব-মানব, নরনারায়ণের সন্ধি-সূচক আধ্যাত্মভাব অধুনা তিরোহিত হইতেছে; কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বেও আমাদের দেশের কুম্ভকার ও সূত্রধরগণ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া গুপ্তযুগের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মুখ অনুকরণ করিত। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। ফরিদপুরের নালিয়া গ্রামের কুমরের হাতের কৃষ্ণমূর্ত্তির মুখ ও বোধিসত্ত্বের মুখ তুলনা যোগ্য।

এই ভাবের আধ্যাত্মিকত্বের চূড়ান্ত গরিমা দেখাইতেছে, কাশীর [illegible] সংগ্রহে একখানি বুদ্ধমূর্ত্তি, উহা আদি গুপ্তযুগের, উহাকে পাণ্ডারা "জটাশঙ্কর" নামে অভিহিত করে। এই জটাশঙ্করের মত সুগঠিত, বৃষস্কন্ধ, সিংহকটি, [illegible] বুদ্ধ-মহিমা

বিশিষ্ট ধ্যানগৌরবের অত্যুজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি আমার চক্ষে আর পড়ে নাই। ইহা গুপ্তযুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহায়েন গুপ্তযুগের আর্য্যাবর্ত্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। বিনয় পিটকের বিশুদ্ধ পাঠ সংগ্রহের জন্য তিনি ৩৯৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ৪১৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নানাস্থান পর্য্যটন করেন। তিনি তিন বৎসর পাটলীপুত্রে ও দুই বৎসর তমলুকে ছিলেন। তাঁহার আর্য্যাবর্ত্ত-ভ্রমণ (৪০১—৪১০ খৃঃ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই সম্পাদিত হইয়াছিল। ফাহায়েন মগধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমাদের মহাভারতের গিরিব্রজপুরের কথা স্মরণ হয়। প্রজারা নিশ্চিন্ত ও সুখী, অপরাধের দণ্ড প্রায়ই জরিমানার দ্বারা হইত। শুধু যেখানে কোন লোক দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহী হইয়া থাকিত কিংবা দস্যুতাকে তাহার নিত্যনৈমিত্তিক বৃত্তিতে পরিণত করিত, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হইত, কিন্তু এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা অতি অল্পই হইত। নগরে বড় বড় মনুষ্য ও পশু চিকিৎসালয় ছিল। তখনও অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইত, ফাহায়েন উহা দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়াছেন, "এগুলি কোন স্বর্গীয় স্থপতির কাজ—এরূপ নির্ম্মাণশক্তি মানুষের হইতে পারে না।" বিচিত্র শোভা-মণ্ডিত হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ দেখিয়া চীন পর্য্যটক বিস্মিত হইয়াছিলেন। স্মিথসাহেব, লিখিয়াছেন, "সে সময়ের কোন বড় হর্ম্ম্য বা এমারত এখন নাই, এই স্থান বহু পূর্ব্ব হইতে মুসলমানেরা অধিকার করিয়া ক্রমাগত হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন। (অক্সফোর্ড প্রকাশিত হিন্দুভারত, ১৬০ পৃঃ, ১৯২১।) ফাহায়েন লিখিয়াছেন সমস্ত দেশে কেহ মদ্য মাংস পিয়াজ বা রশুন খায় না, তাহারা কোন জীবিত প্রাণী হত্যা করে না।" অশোক জীবহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন, অথচ দেশের অবস্থা বিবেচনায় জীবহত্যার জন্য দরজা খুলিয়া না রাখিয়া পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার অসামান্য জীবপ্রীতির ফল বৌদ্ধাধিকার-বিলোপের পর ফলিয়াছিল। ফাহায়েন সাধারণতঃ যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্ববধ করিয়াছিলেন।

ফাহায়েন।

অশোকের সেই বিশাল রাজপ্রাসাদ যেখানে বিদেশী পর্য্যটকের বিস্ময় জন্মাইয়া আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, উহা বর্ত্তমান সহরের দক্ষিণে কুমরাহার গ্রামে অবস্থিত ছিল। এখনও তাহা কেহ খুঁজিয়া দেখে নাই।

ফাহায়েনের বর্ণিত গুপ্তরাজ্যের সুশাসন আদর্শ স্থানীয়। উহা স্পষ্ট দেখাইতেছে মৌর্য্য-যুগের কৌটিল্য-প্রবর্ত্তিত গুপ্তচর-প্রথার দৌরাত্ম্য তখন আর ছিল না। তথাপি আলবিরুনী লিখিয়াছেন—গুপ্তগণ খুব ক্ষমতাপন্ন ও দুষ্ট ছিলেন। জনমত কখনই একরূপ হয় না।

এই গুপ্তযুগে কালিদাসের অতুলনীয় শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য বিরচিত হয়। ঋতুসংহার, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার তরুণ বয়সের রচনা। মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক কিছু পূর্ব্বের রচনা। ৪৭৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন।

বরাহমিহির (৫০৫ খৃঃ—৫৩৭) ও ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খৃঃ) প্রভৃতি এই গুপ্তযুগে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং গুপ্তযুগকে সংস্কৃত সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদির সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। গুপ্ত সম্রাটেরা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হইলেও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না। স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধুর বন্ধুত্বাভিমানী ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

সাহিত্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অজন্তাগুহা

গুপ্তযুগে মগধের সঙ্গে ভারতের বাহিরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের শুভযুগ। ৩৫৭ হইতে ৩৭১ খৃঃ অব্দের মধ্যে বাণিজ্যাদি বিষয় লইয়া অন্ততঃ দশ বার চীন রাজদূতেরা ভারতবর্ষে গমনাগমন করিয়াছিলেন। ফাহায়েন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু চীন পরিব্রাজক তীর্থ দর্শন ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চ্চার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসী বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত চীনে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮৩ খৃঃ অব্দে কুমারজীবের চীনগমন এ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানের বৌদ্ধগণের প্রথম প্রচেষ্টা। ৪৩১ খৃঃ অব্দে কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্ম্মা জাবা দ্বীপে যাইয়া তদ্দেশবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপূর্ব্বে তথায় হিন্দু পরিব্রাজকগণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। অজন্তা চিত্রে আমরা দেখিতে পাই পারস্য রাজদূত সম্রাট্ পুলকেশীর নিকট দূত পাঠাইতেছেন। রোমের রাজার নিকট ৩৩৬, ৩৬১, ৫৬১ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ তিনবার মগধের রাজদরবার হইতে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে।

বিদেশের সহিত সম্বন্ধ।

ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, হিন্দু মুদ্রায় দিনারের উল্লেখ দৃষ্টে এই কথা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই দিনার শব্দ হিন্দুরা রোমানগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শব্দটি ল্যাটিন "দিনাবিদন" শব্দের রূপান্তর। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে দিনার শব্দের উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের বলিবার উপায় নাই যে রোমানেরা বা গ্রীকগণ হিন্দুদের কোন ঋণ বহন করে, সেই দাগ তাঁহারা সংগোপন করিতে চেষ্টা করেন। অবশ্য য়ুরোপীয়েরা হেলেনার প্রভাব আমাদের দেবমন্দিরের নৈবেদ্যের মধ্যেও আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি তাঁহাদের "থেরোপুটিক" শব্দ মিথ্যারূপে আমাদের থেরাপুত্ত শব্দ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু একথা তাহারা মানিবেন কেন? দিনার শব্দ আমরা মহাভারতে পাইতেছি, ইহার উত্তরে হয়ত তাঁহারা বলিবেন, মহাভারতে ঐ শব্দ

নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই "প্রক্ষিপ্ত" শব্দ-দ্বারা যত কিছু অযৌক্তিক, অসত্য ও অলীক তাহা শোধন করিয়া লওয়া যায়, প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান ব্যাপারে এই শব্দটি পঞ্চগব্য স্থানীয়।

এই যুগে গ্রীকগণ হইতে যে হিন্দুরা জ্যোতির্বিদ্যার কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিষয়—"সামুদ্রিকী", সমুদ্র পাড়ি দিয়া এই বিদ্যা আসিয়াছে এই জন্য ইহা সামুদ্রিকী। লৌকিক প্রবাদে যাহা শোনা যায় তাহাতেও ফলিত জ্যোতিষ যে এদেশের নয় তাহার প্রমাণ আছে। বরাহমিহির অনেকগুলি গ্রীক শব্দ তাঁহার গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং আর্য্যভটও গ্রীক প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। 'পনফর,' 'আপোক্লিম,' 'দ্রেক্কাণ,' 'মুন্থা,' 'ইস্থিহা' প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতিষের কয়েকটি শব্দ যাবনিক। কিন্তু তাঁহারাও হিন্দুদের নিকট গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অনেক কথা লইয়াছেন, তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। আর্য্যভটের ছাত্রগণের মধ্যে ম্লেচ্ছ ছাত্র কতকটি ছিলেন, তাঁহার 'দশগীতিকা পরিশিষ্ট' নামক জ্যামিতির গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন :—"সংপ্রত্যারম্ভে ম্লেচ্ছাস্তেবাসিনামববোধায় গোলমেবাণুসৃবতি।" বীজগণিতের অনেক কথা গ্রীকেরা আর্যভটের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেকালে হিন্দু পণ্ডিতেরা কত উদার ছিলেন, তাহা গর্গাচার্য্যের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় :—

গ্রীকদিগের নিকট ঋণ।

গ্রীকদিগের উপরে প্রভাব।

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্ব্বেদবিদ্দ্বিজঃ॥"

রেখা গণিত শাস্ত্র হিন্দুদিগেরই উদ্ভাবিত। যজ্ঞকুণ্ডের আকার লইয়াই এই বিদ্যার প্রথম অনুশীলন হয়। হয়ত কোন রাজার খেয়াল হইল যে যজ্ঞকুণ্ডের আয়তন ঠিক থাকিবে কিন্তু উহা বৃত্তাকার বা অষ্টকোণ হইবে, সুতরাং যজ্ঞকর্ত্তা ঋষিকে চতুষ্কোণ কুণ্ডের সমান করিয়া বৃত্তাকার, অষ্টকোণ বা অন্য কোন প্রকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবার সমস্যা পূরণ করিতে হইল, এইভাবে বৃত্ত=চতুষ্কোণ, বা চতুষ্কোণ=অষ্টকোণ, জ্যামিতির এই সকল সূত্র লইয়া ভাবিত হইতে হইয়াছিল। রেখা গণিতের জন্মকথা এই প্রকারের। যে সকল দেশের যজ্ঞের বালাই নাই সে সকল দেশে এই সব সমস্যার উদয় হয় নাই। আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। সাতটি ঋষির নামে সাতটি গ্রহ আছে। ঋষি শব্দ হিন্দুস্থানীরা "ঋখি" এইভাবে উচ্চারণ করে (ষ=খ)। এখন আরব গ্রন্থকারেরা হিন্দু জ্যোতিষ অনুবাদ করার সময় "ঋখি" শব্দ লইয়া ভাবিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা অভিধান খুলিয়া দেখিলেন ঋক্ষ শব্দের অর্থ ভল্লুক। সুতরাং তাহাদের তর্জ্জমায় সপ্তর্ষি সপ্তভল্লুকে পরিণত হইল। এই সপ্ত ভল্লুক হইতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ Seven bears আমদানী করিলেন। আমাদের বক্তব্য এই, ভারতবর্ষ তখন নিজ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া প্রবাহ-হীন হইয়া পড়ে নাই, তখন তাহার গতিশীলতা অবাধ ছিল; সমস্ত জগতের

সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ছিল এবং হিন্দুরা জীবন্ত মহামানবের ন্যায় চারিদিক্ হইতে যাহা কিছু ভাল তাহা আত্মসাৎ করিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরের উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু নিজকে পরানুকরণে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহাদের অপূর্ব্ব নাটকগুলি সর্ব্বদা অভিনীত হইত। কিন্তু অনেক সময় প্রশস্ত প্রাঙ্গনে পট-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক দৃশ্যাবলী দেখাইবার অবকাশে যে খানিকটা সময়ের জন্য দর্শকদিগকে অবসর দেওয়া হইত, সেই সময়ে কোন অংশ-বিশেষ অভিনীত হওয়ার পর আড়াল দেওয়ার উপযোগী ভাল কোন উপায় ছিল না, হয়ত বা সেই অবকাশে গুপ্ত প্রকোষ্ঠে যাইয়া অভিনেতারা বেশাদি বদলাইতেন। উক্ত রূপ কোন কারণ বশতঃ গ্রীকদিগের নিকট তাহারা "যবনিকা" পাইয়া থাকিবেন। কথাটির মধ্যেই ঋণ স্বীকার আছে। প্রাচীন নাটকের আধুনিক সংস্করণ যাত্রায়ও "যবনিকার" কোন স্থান নাই, সুতরাং ইহা দেশজ নয় বলিয়াই অনুমিত হয়।

এই গুপ্ত যুগে নানাদিকেই ভারতের অপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কলাশিল্পের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; আর্য্যাবর্ত্ত ছিল সকল দেশের সেরা, এখানে কতই না চরম চারুশিল্পের নিদর্শন ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। তবে দক্ষিণের দুর্গম গিরিগুহায় অজন্তার যে চিত্রগুলি বিদ্যমান, কোন ভাগ্যে তাহার বিলোপ হয় নাই। এই গুহা চিত্রগুলির মধ্যে ১৬ নং এবং ১৭ নং চিত্র অতুলনীয়,—বিজয়ের সিংহল অভিযান—চিত্রগুলির মধ্যমণি। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি পঞ্চম শতাব্দীর। ভারতীয় চিত্রকলার এইগুলি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। খুব সম্ভব ইহা হইতে যদি শ্রেষ্ঠ কিছু কল্পনা করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই আর্য্যাবর্ত্তে ধ্বংস পাইয়াছে এবং নালন্দা বিহারের শিল্প তাহাদের অন্যতম ছিল। বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তি, নরনারী অঙ্গের নানারূপ লাস্য ও মনমোহন ভঙ্গিমা, ফুললতার বিচিত্র সৌষ্ঠব এ সমস্ত অজন্তা চিত্রগুলির উপর এক স্বপ্নকুহক বিস্তার করিতেছে। চিত্রকরদের সংযম অসাধারণ ছিল, তাহারা এক একটি রেখায় যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, বহু রেখার জটিলতা উপস্থিত করিয়াও এখনকার চিত্রকর সেই সাধনার পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিবেন না। গৃহস্থ রমণী বাহির হইয়াছেন বুদ্ধকে ভিক্ষা দিতে—তাঁহারা ভিক্ষা দিতে ভুলিয়া গেলেন, সেই মানসসরোবরের শ্রেষ্ঠ কমলের মত প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রমণী ও বালক নিশ্চল ভাবে চাহিয়া রহিলেন, কি জন্য আসিয়াছেন ভুলিয়া গিয়াছেন, শিশুর হাত হইতে ভিক্ষার দ্রব্য পড়িয়া গিয়াছে। মা ও ছেলের দৃষ্টির ইঙ্গিতে পটে অধ্যাত্ম রাজ্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন চিত্রসমালোচক বলিয়া থাকেন রেখা-দ্বারা দূরত্বের ভাব বুঝান অতি অল্প দিনের আবিষ্কার। অজন্তায় চিত্রে পালঙ্কে সমাসীন রাজার পার্শ্ববর্ত্তী পরিচারকদের এরূপ ভাবে আঁকা হইয়াছে, যাহাতে চিত্রকর যে রেখা সম্পাতে দূরত্বের ভাব বিশেষভাবে বুঝাইতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। *

অজন্তার চিত্র-সম্পদ্।

* কোন কোন চিত্র-সমালোচক বলেন, অজন্তা এবং নালন্দা প্রভৃতি বিহারের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি পূর্ত্ত ও স্থাপত্য-বিভাগের অন্তর্গত; তাহা প্রাচীন ভারতের চিত্রাদর্শের অনুযায়ী নহে। প্রাচীনকালে অনেক গৃহেই প্রাচীর ও মূর্ত্তি সাজাইবার রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে এই রীতি বিদ্যমান আছে।

প্রত্যেক রেখা অঙ্কনে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে, কোথায় দ্বিধা বা ক্ষীণশক্তির প্রমাণ নাই। রংএর খেলার লাবণ্যে চক্ষু মুগ্ধ হইয়া যায়, অথচ কোন স্থানে অতিরাগ বা বাহুল্য নাই।

ঝান্সী জেলায় দেওঘরে পাথরের উপর গুপ্তযুগের যে শিল্প পরিচয় আছে, তাহাই বোধ হয় প্রস্তর কারুকার্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ধাতবমূর্ত্তি এই সময়ে খুব উৎকৃষ্ট হইত। দিল্লীতে সমুদ্রগুপ্তের ঢালা লৌহের যে স্তম্ভ আছে তাহা এযুগের শিল্পকারদের বিস্ময়। তামার উপর ঢালাই করা কাজ ঐ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। নালন্দাতে ৮০ ফিট উচ্চ বুদ্ধের এক তাম্রমূর্ত্তি ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত ৭½ ফিট উচ্চ একটি অতি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি গুপ্তযুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহা এখন বারমিংহাম্ চিত্রশালায় রক্ষিত। গুপ্তযুগের একটি প্রস্তরস্তম্ভের প্রতিলিপি ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার প্রাচীন হিন্দুযুগের

বেহারে মেয়েরা এখনও গৃহের দেয়ালে নানারূপ চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন ; বৌদ্ধ-বিহারে ভিক্ষুদের হাতের কাজ এই শ্রেণীর। যদিও অজন্তার চিত্রাঙ্কন চমৎকার রূপ উৎরাইয়া গিয়াছে, তথাপি প্রাচীন চিত্রের রীতি হিসাবে ঐ সকল চিত্র আদর্শ চিত্র নহে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর কঠোর সংযম ও ঋষিজনোচিত সরলতা ঐ সকল চিত্রকে নমস্ত করিয়াছে, কিন্তু চিত্র বলিতে প্রাচীনেরা যাহা বুঝিতেন তাহার অনেকটাই নায়ক ও নায়িকা লইয়া। তাহাদের লীলায়িত মাধুরী, প্রেমোৎসব, লাস্ত ও সৌন্দর্য্য বৌদ্ধ-ভিক্ষুর হস্তে আশা করা যায় না। বৌদ্ধ-ভিক্ষু অনাসক্ত ভোগবিরত কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী। নরনারীর প্রেমলীলাই জগতে চিত্রকরকে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা দিয়া থাকে, ভিক্ষু সেই প্রেরণা কোথায় পাইবেন ? নরনারীর মিলনের মধ্যে যে রূপের সন্ধান মেলে, চিরকৌমার্য্যে দীক্ষিত ভিক্ষু তাহা জানেন না। সুতরাং তাঁহার চিত্র-সম্পদের অভাবনীয় চমৎকারিত্ব-সত্ত্বেও তাহাতে যৌন প্রেমের ব্যঞ্জনা নাই

বাৎস্যায়ন বলেন—"প্রকৃত-চিত্রবিৎ তিনি, যিনি বাতান্দোলিত তরঙ্গের লীলা-চাঞ্চল্য, প্রজ্বলিত অগ্নির সহস উত্থিত দীপ্তি ও বিজয়ী সৈন্যের বৈজয়ন্তীর বিক্রত আবর্ত্তন হইতে গতিশীলতা শিখিয়াছেন" ("তরঙ্গাগ্নিশিখাধূম বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকম্। বায়ুগত্যা লিখেদ্ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ।") "তিনি শরীরের নানাস্থানের মাংসপেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নতোন্নত ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহা আভাসে বুঝাইবেন কিন্তু অস্থি ও শিরা দেখাইবেন না, কার একটু দূরে শিরা ও অস্থি দৃশ্য হয় না এবং চিত্র একটু দূর হইতেই দেখিতে হয়। শরীরাবয়বের তরঙ্গায়িত ভাবে দ্বারা তিনি আভাসে সেই সকল বুঝাইবেন।" মানুষের চোখ আঁকিবার কোন সাধারণ নিয়ম নাই ; একই চ অবস্থাভেদে নানাভাব পরিগ্রহ করে ; যোগ সাধনের সময়ে চক্ষু দুটি ধনুর মত হয়, পুরুষ ও নারীর লালসাজনি দৃষ্টির সময়ে চক্ষু মৎস্যোদরের মত দেখায়, নির্ব্বিকার পুরুষের চক্ষু নীলোৎপল-পত্রের ন্যায় হয়, রোরুদ্যমান চ ঈষৎ রক্তিমা বিবর্ণ পদ্মপত্রের মত এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির চক্ষু শশকের চক্ষুর মত দেখায়। এইরূপে ভিন্ন ভি অবস্থাভেদে চক্ষু নানা ভাব গ্রহণ করে। রূপগোস্বামীর "দান কেলি-কৌমুদী"র প্রস্তাবনায় 'কিল-কিঁ ভাবে'র নিদর্শন স্বরূপ চক্ষুর এই রূপান্তর অতি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত আছে।

নরনারীর পূর্ব্বরাগে উভয়ের চক্ষু উভয়ের মধ্যে নিত্য যে অত্যাশ্চর্য্য রূপ আবিষ্কার করে তাহা বৌদ্ধ-বিহা চিত্রে বিরল। ভূষণহীনা হইলেও প্রেমিক প্রেমিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অপার্থিব ভূষণ আবিষ্কার করেন ("অঙ্গ ভূষিতাঙ্গেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা। যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্ রূপমিতি কথ্যতে।")। নিরাভরণ-দেহে যিনি আভর জ্যোতি দিতে পারেন সেই চিত্রকরের তুলি সার্থক। যে রেখা-পাতে অরূপ দেহে রূপের খেলা খেলিতে থা তাহা চিত্রকরের কার্য্যের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। মাতা তাঁহার ছেলের মধ্যে অন্যের অদৃষ্ট রূপ আবিষ্কার কর চিত্রকরকে বাৎসল্য অঙ্কন করিতে হইলে সেই রূপ-রেখা-পাত আয়ত্ত করিতে হইবে। এক কথায় প্রেমের অঞ্জন পরিলে যে রূপচ্ছটা আবিষ্কৃত হয়, চিত্রকর তাঁহার চিত্রে সেই রেখাপাত করিবেন।

ইতিহাসে দিয়াছেন—তাহাতে ফুললতা ও মনুষ্যমূর্ত্তির নানা বিচিত্র ভঙ্গী কল্পিত হইয়াছে। এই গুপ্তযুগের যাহা কিছু সাহিত্য বিজ্ঞান ও চিত্র সম্পদ্ তাহা বাঙ্গলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। আমরা আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন সভ্যতার যতটা উত্তরাধিকারী, অন্য কোন প্রদেশবাসী ততটা হয় নাই। মৌর্য্য ও গুপ্তযুগের সভ্যতা ও উচ্চচিন্তার ধারা সমস্তই বাঙ্গলায় কি পরিমাণে আসিয়াছে তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইব। যাহা কিছু মগধে ছিল তাহা গৌড়ে আসিয়াছে, গৌড়ের ধ্বংসের পর তাহা বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—যেমন করিয়া কোন বিজয়স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহা হইতে রত্ন ও মুক্তা নিকটবর্ত্তী স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। গুপ্তদের সময় হইতেই মগধ গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" নামক প্রাচীন পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই গুপ্তরাজাদের মগধ সর্ব্বদা "গৌড় মাগধ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। গৌড়তন্ত্রের একটি অঙ্গ ছিল মগধ। পরবর্ত্তী গুপ্ত রাজারা বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গৌড়রাষ্ট্র স্বাধীন ভাবে পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন।

মৃত ও নিদ্রিত মনুষ্য দেখিতে একরূপ; কিন্তু চিত্রবিৎ এই দুয়ের প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া নিদ্রিতকে নিদ্রিত এবং মৃতকে মৃত বলিয়া বুঝাইবেন। একটি শবের পার্শ্বে নিদ্রিতের যেন শ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত বুঝাইয়া বিভিন্নতা বুঝাইবেন ("সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতম্। নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ।")। নিদ্রিতের চিত্র "সশ্বাস ইব" প্রতীয়মান হইবে। নায়ক-নায়িকার চিত্রকেই অনেকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। এই রূপাদর্শযুক্ত চিত্র আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। বহুপরে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে খেজুরাহ ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে-সকল নায়ক-নায়িকার চিত্র দৃষ্ট হয় তাহা আদিযুগের রূপরেখাঙ্কিত বিলুপ্ত চিত্ররীতির কথা মনে জাগাইয়া দেয়। এই রীতি দ্বাদশ শতাব্দীতে ভিক্ষুধর্ম্মের ঘোর প্রতিবাদ স্বরূপ যৌন মিলনকে মন্দির-গাত্রে বীভৎস করিয়া দেখাইয়াছিল। তখন বাৎস্যায়ন যুগের (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) সেই রূপ-রেখা একান্ত স্থূল ও দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। বাৎস্যায়ন চিত্রশিল্পকে কলাশিল্পগুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন ("যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগানাং যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ। যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশস্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ।")।

যখন ভিক্ষুধর্ম্ম এদেশ হইতে দূরীভূত হইল এবং হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ কতক পরিমাণে পুনরায় গ্রহণ করা হইল, তখন প্রণয়ী যুগলের চিত্রপট আর তেমন রূপ ও লাবণ্য-রেখা-সংযুক্ত হইতে পারিল না। কতকগুলি উমা-মহেশ্বরের মূর্ত্তিতে সে চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু যদিও বৈষ্ণব রূপাভিসারের পদে এই ভাবটি সম্যক্ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল, বিদেশীদের আক্রমণে এদেশের ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা বিনষ্ট হওয়াতে সেই নায়ক নায়িকার প্রেমলীলা আর কলাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইতে পারিল না (১৩৩৯ বাং চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে গুরুদাস রায় মহাশয়ের ভারতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। চিত্রকলা সম্বন্ধে বাৎস্যায়নের নিম্নলিখিত শ্লোক স্মরণীয়:—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ।"

['আচার্য্যগণ রেখার প্রশংসা করেন, রমণীগণ অলঙ্কারের পক্ষপাতিনী, ইতর ব্যক্তিরা বর্ণের চাকচক্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়।' বাৎস্যায়নের মতে চিত্রবিদ্যার ছয়টি অংশ—রূপভেদ, প্রমাণ (গঠন ও আকৃতির পরিমাণ শুদ্ধি), ভাব, লাবণ্য, যোজনা, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ।]

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালসাম্রাজ্য, মৎস্যন্যায়

"যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"

—চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য।

বৃহত্তর বাঙ্গলা ছাড়িয়া এবার আমরা খাস বাঙ্গলা মুলুকে আসিয়া পড়িব। পাল ও সেন-যুগ খাস বাঙ্গলার। মৌর্য্য ও গুপ্তযুগের যাহা কিছু নিজস্ব তাহা শেষের দুইযুগে বাঙ্গলার নিজস্ব হইল।

অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে আর্য্যাবর্ত্ত কোন প্রধান সম্রাট্ বা একচ্ছত্র মহীপতির রাজদণ্ডের আয়ত্ত হয় নাই। আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর বিপুল মোগল সাম্রাজ্যের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত তখন শতধা বিভক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের অবস্থা কবি সন্ধ্যাকর তখন মৎস্যন্যায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বড় মৎস্য যেরূপ ছোট মৎস্যকে ধরিয়া খায়, বঙ্গদেশে সেইরূপ ছোট ছোট জমিদারগণ ছোট ছোট রাজা

লামা তারানাথের বর্ণনা।

গ্রাসে যাইয়া পড়িতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র অরাজকতা, নিপীড়ি প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে কোন বলবান্ ভুজ প্রসারিত হয় না তাহারা চক্ষে "কাঞ্চনবৃক্ষ" দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িল। [সংস্কৃত কবিদের কাঞ্চনবৃ বঙ্গের প্রাদেশিক নাম "সরষেফুল"] বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথ এই সময়ের সম্ব লিখিয়াছেন, "উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্যদেশের আর পাঁচটি প্রদেশের বিভিন্ন অংশে প্রত্যে ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক বৈশ্য পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে আপন আপন প্রাধা স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না।"

তারানাথ আরও লিখিয়াছেন "গৌড়দেশে এক নৃপতি ছিলেন, তাঁহার বিধবা পত্নী পরব নির্ব্বাচিত রাজাকে গোপনে নিধন করিতেন। এইভাবে তিনি বহু রাজার প্রাণ সংহা করিয়াছিলেন।" কথাটা উপগল্পের মত শোনায়। তবে ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, বিধবা রাণীর অধীক মন্ত্রিবর্গের ষড়যন্ত্র ছিল। তাঁহারা কোন স্থায়ী রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া

স্বীয় স্বীয় প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যিনিই সিংহাসনের দাবী করিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা বাধা দিতেন না। কিন্তু গোপনে রাণী তাঁহাকে রাত্রিকালে বধ করিতেন। সুতরাং রাজা হওয়া একটা বিভীষিকায় দাঁড়াইয়াছিল। যাঁহারা রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন, উপর্য্যুপরি তাঁহাদের কয়েকজন এইভাবে নিহত হওয়ার পর অনেকদিন রাজা হইবার জন্য কেহ আর অগ্রসর হন নাই। এই সময় "গোপ" নামক এক জননায়ক কতকদিনের জন্য রাজা হইয়াছিলেন, আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে—ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রাজলক্ষ্মীর রাজকুলত্যাগ।

রাজলক্ষ্মী কাহার ভুজ অবলম্বন করিবেন? রাজকুলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবার তিনি বিশিষ্ট এবং যোগ্য ভুজাশ্রয় করিতে উদ্যত হইলেন; সম্মিলিত প্রজারা অরাজকতা নিবারণের উপায় উদ্ভব করিলেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য প্রজারা তাঁহারই ললাটে রাজচিহ্নলাঞ্ছন লিখিয়া দিল এবং কণ্ঠে বিজয়মাল্য দোলাইয়া দিল। এই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি গোপাল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোপাল ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ

দয়িতবিষ্ণু।

গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণুকে "অবনীপাল কুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বংশধরের বীজপুরুষ" বলা হইয়াছে। পাল-বংশীয় নৃপতিগণের তিনি বীজপুরুষ ছিলেন, তিনি "সর্ব্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ" ছিলেন। বেদ, বেদান্ত, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যায় যিনি কৃতী হইতেন, তাঁহাকেই "সর্ব্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ" বলা হইত। দয়িতবিষ্ণু সুধী সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের আদি নিবাস ছিল—উত্তরবঙ্গ, বরেন্দ্রভূমি।

বপ্যট।

এই পণ্ডিত-বরের পুত্র "বপ্যট" ছিলেন যোদ্ধা। সেই ঘোর অরাজকতাপূর্ণ চৌরদস্যু-অধ্যুষিত বঙ্গদেশে তখন পণ্ডিতের পুত্রকেও শাস্ত্র ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিতে হইয়াছিল। তাম্রলেখের ভাষায় বপ্যট অরাতিনিধনকারী ও কর্ম্মকুশল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—"তাঁহার বিপুল কীর্ত্তিকলাপ সসাগরা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিল।" ইহাদ্বারা অনুমিত হয় 'বপ্যট' পৈত্রিক শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যবসায় ছাড়িয়া

বীরত্ব দ্বারা কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নানাস্থানে "জয়স্তম্ভ" ও "দুর্গ" প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ধরাতলে সেই কীর্ত্তি ও বীরত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন।" সুতরাং বপ্যট হইতেই এই বংশ বিত্তশালী ও প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

গোপাল বপ্যটের পুত্র। অনুমান ৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। লামা তারানাথের মতে গোপাল ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহা হইলে তাঁহার রাজত্ব ৭৮৫ খৃঃ অব্দে শেষ হয়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। রাখালদাসবাবুর মতে গোপাল ৭৫০-৭৭০ অব্দের কোন সময়ে রাজা হইয়া ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। রাজা হইবার পূর্ব্বেই শাসনভার অনেকটা তাঁহার হাতে ছিল, এইজন্য তারানাথ তাঁহার ৪৫ বৎসর রাজত্বের কথা বলিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের ঘোর অরাজকতার সময় বহু দস্যু ও অত্যাচারীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, প্রজাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, এবং যেখানে প্রবলের অত্যাচার ও দুর্ব্বলের দলন হইত, সেই স্থানেই অভয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া দাঁড়াইতেন। গৌড়মণ্ডলে তাঁহার সমকক্ষ বীর আর কেহ ছিল না; নতুবা যিনি একজন সামান্য ভূস্বামীর পুত্র, এবং এক পণ্ডিতের পৌত্র ছিলেন, সেই মধ্যবিত্তকুলজাত (চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি বংশের কেহ নহেন) একজনকে গৌড়বাসী সকলে মিলিয়া রাজপদে বরণ করিবেন কেন? তাম্রলিপিতে লিখিত হইয়াছে, "প্রকৃতিপুঞ্জ ইঁহাকে রাজলক্ষ্মীর প্রসারিত কর গ্রহণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইনি এরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন যে, দিঙ্মণ্ডল-প্রসারিত পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নাই তাঁহার যশের স্থায়ী ধবলতার সঙ্গে তুলিত হইতে পারিত।" উত্তরকালে যখন ইঁহার বংশ গৌড়ে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন স্তাবক পণ্ডিতেরা এই বংশের সঙ্গে সূর্য্যবংশের একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

গোপাল ৭৪০-৭৮৫ খৃঃ।

বৈদ্যদেবের সম-সাময়িক সন্ধ্যাকরনন্দী যখন রামপালকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিতে যাইয়া এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন বৈদ্যদেব যেটুকু বাকী ছিল তাহাই বা পূরণ না করিবেন কেন? তাঁহার প্রশস্তিতে রামচন্দ্রের ন্যায় পালরাজকেও সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জনশ্রুতি এই যে ধর্ম্মপাল সমুদ্রকুলজাত। একথা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য-গুলিতে পাওয়া যায় এবং সন্ধ্যাকর নন্দীও ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাখালদাস-বাবু বলেন যে যখন এই দুই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন যুগের প্রমাণ মিলিয়া যাইতেছে, তখন ধর্ম্মপাল সমুদ্রকুলজাত একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই;— ইহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। পালগণের আদিপুরুষ যে বঙ্গোপসাগর বা ভারত-মহাসাগরের ঔরসজাত পুত্র, তাহা তাম্রপট, শৈল-লেখ কিংবা যে কোন "বিশ্বাসযোগ্য" স্থানে লিখিত থাকিলেও উন্মত্ত ভিন্ন কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না। হয়ত এই অজ্ঞাতকুলশীল পালবংশ প্রাচীন কোন যুগে সমুদ্র পাড়ি দিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই জনশ্রুতিটি সেই ইতিহাসের একটা লোকগত বিকৃত প্রতিধ্বনি। রাখালদাসবাবু সমুদ্রের

পালগণের আদি সম্বন্ধে উপকথা।

ঔরসে পালবংশের আদিপুরুষ জন্মিয়াছেন, এই মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণাটি উপহাসাস্পদ করিয়া ফেলিয়াছেন। (বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ ১৩৩০, ১৬৭-১৬৮ পৃঃ।)

বাঙ্গলা দেশকে অত্যাচার হইতে বিমুক্ত করিতে গোপালকে যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে হইয়াছিল, তিব্বতবাসী তারানাথ তাহা লিখিয়াছেন। "After seven years Gopal who had been elected king managed to free himself and obtained the kingdom" (Cuningham's Survey Report, Vol. XV, p. 148)। নারায়ণদেবের তাম্রশাসনেও গোপাল কর্ত্তৃক কাষাচারগণের দৌরাত্ম্য নিবারণের কথা উল্লিখিত আছে। মনে হয় গৌড়দেশে শাসন-শৃঙ্খলা আনয়ন করাই গোপালের প্রধান প্রচেষ্টার বিষয় হইয়াছিল, তিনি গৌড়দেশে সম্যক্ অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন; দীর্ঘকাল নানা যুদ্ধ বিগ্রহে পারদর্শিতা দেখাইয়া তিনি রাজরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গৌড়রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার পর তাঁহার আর বেশী কিছু করিবার ছিল না। কথিত আছে, তিনি রাজা হইবার পূর্ব্বেও ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রজাদের অনুরাগ ও মৈত্রী লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে তিনি জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে জ্ঞান প্রচারিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টিত ছিলেন। পূর্ব্বের উল্লিখিত তাম্রলিপিতে উল্লিখিত আছে তিনি অচিরে রাজ্য মধ্যে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—"শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং।"

দেবপালের তাম্রলিপিতে গোপালকে বিনয়ীদের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় বলা হইয়াছে। সমুদ্রান্ত গৌড়দেশ জয়ের পর "আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই" ইহা মনে করিয়া তিনি তাঁহার মদমত্ত হাতীগুলিকে রথ-যূপ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। উক্ত লিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি রণ-হস্তীগুলিকে পুনরায় বনে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; তাহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ চক্ষে বনে যাইয়া তাহাদের স্বগণদের সঙ্গে পুনরায় মিলিতে পারিয়াছিল। দেবপালের তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি, গোপালদেব সমাজ সংস্কার করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইহারা স্বধর্ম্ম বিচ্যুত হইয়াছিলেন। গৌড়মণ্ডলের রাজারা যুগে যুগে যে সমাজ-সংস্কার করিয়াছেন, গোপালই তাহারই অন্যতম আদি পথ-প্রদর্শক।

এই সকল বর্ণনা দ্বারা মনে হয় যে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা "গোপাল" যদিও মহাবীর এবং যুদ্ধনীতি-বিশারদ ছিলেন, তাঁহার সেই অসাধারণ বীরবিক্রম তিনি সংযত করিতে পারিতেন। তিনি দুরাকাঙ্ক্ষী দুর্দ্দান্ত বীর ছিলেন না, তাঁহার জয়েচ্ছা অবাধ ছিল না। যেখানে দরকার, সেইখানেই তাঁহার অসি কোষমুক্ত হইত এবং প্রয়োজন-শেষে তিনি তাহা কোষবদ্ধ করিতে জানিতেন। তিনি বিনয়ীদিগের আদর্শ ছিলেন এবং জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিতেন। এই সকল গুণ পিতামহ দয়িতবিষ্ণুর পৌত্রের যোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম-মণ্ডিত চরিত্র মাহাত্ম্যেই তিনি প্রজারঞ্জন এবং প্রজাদের নির্ব্বাচনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ মমতার অধীন থাকিতে চায়,

কিন্তু তাহারা মধ্যাহ্ন ভাস্করের তেজকে ভয় করে। গোপালের চরিত্রে এই বিনয়-মাধুরী ছিল বলিয়াই তিনি সর্ব্বজন প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি রণ-হস্তীগুলিকে পর্য্যন্ত যুদ্ধান্তে তাহাদের অরণ্য-জীবনের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বজীবে তাঁহার দয়া ছিল,—এই সামান্ত কথায় তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে যে জীবে দয়ার নীতি শিক্ষা দেয়, এই ব্যাপারে আমরা তাহারই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

বপ্যট বা দয়িতবিষ্ণুর পত্নীদের উল্লেখ নাই। গোপালের মহিষী যদিও ইন্দ্রের শচী, অগ্নির স্বাহা, শিবের সর্ব্বাণী, কুবেরের ভদ্রা ও বিষ্ণুর লক্ষ্মীর সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন, তথাপি তিনি কোন্ বংশের মেয়ে তাহার উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী প্রায় সকল পাল রাজারই মাতৃকুল কোন না কোন রাজবংশ-জাত,—তাম্র-শাসনে তাহা সগৌরবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু গোপাল-পত্নী দেদ্দদেবী বহুগুণে গুণবতী হইয়াও বোধ হয় মধ্যবিত্ত লোকের মেয়ে ছিলেন, এ জন্য তাঁহার বংশকথা অনুল্লিখিত রহিয়াছে। গোপাল স্বয়ং মধ্যবিত্ত গৃহস্থকুল হইতে প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বেই সমান ঘরে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বিজয়ী বীর ছিলেন কিন্তু দিগ্বিজয়ীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি পররাজ্য বিজয় করিয়া একচ্ছত্র মহীপাল হওয়ার বাসনা করিতেন না। গৌড়মণ্ডলের শান্তি আনয়ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সেই শান্তির আবির্ভাবের পর তিনি তাঁহার অসি কোষ মুক্ত করেন নাই। এমন কি তাঁহার শত যুদ্ধের সহচর রণ-হস্তীগুলিকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। গোপাল ৭৪০ খৃঃ অব্দে ওদন্তপুরের বিহার স্থাপন করেন।

দেদ্দদেবী।

৺অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এখনও বরেন্দ্র ভূমির এক নগণ্য পল্লীতে শ্রীশ্রীগোপালদেবের সমাধি বিদ্যমান আছে। এক জীর্ণ কুটীরে দরিদ্র কৃষক কামিনীরা সেই সমাধির স্মৃতিতে সন্ধ্যাকালে তৈলের ক্ষুদ্র আলো দেখায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে, বাঙ্গালীরা তাঁহাদের দেশের প্রধান গৌরব বিস্মৃতির জলে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের দরিদ্রেরা সেই রাজাকে ভুলে নাই,—যিনি মহাবিপদের দিনে বাঙ্গালী জাতিকে মৎস্যন্যায়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মপাল

গোপাল ছিলেন পূর্ণচন্দ্র—গৌড়মণ্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন—তাঁহার উদয়াস্ত মহিমান্বিত, উজ্জ্বল অথচ শান্ত। কিন্তু তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল ছিলেন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড—তেজ, বিক্রম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি গৌড়মণ্ডলে একচ্ছত্র রাজত্ব লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার সিংহাসন ছিল বজ্রতুল্য দৃঢ়—তাঁহার বিজয়লক্ষ্মী ছিলেন বজ্রাসনে স্থিত, অবিচলিত।

ধর্ম্মপাল ৭৮৫ খৃঃ-৮২০ খৃঃ অব্দ। ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে ৭৪০-৮১০ খৃঃ।

তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন গৌড়ের চতুর্দ্দিক্ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের ন্যায়—কে কাহার রাজ্য কাড়িয়া লইবে, তাহারই চেষ্টা চলিতেছিল। দশদিক্ দুর্দ্দান্ত শত্রু-সৈন্য-পরিব্যাপ্ত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর অমাত্যগণ স্বাধীন হইয়া সকলেই একচ্ছত্র সিংহাসনের দাবী করিতেছিলেন।

ধর্ম্মপালের সামন্ত রাজগণ।

নর্ম্মদার উত্তরকূলে মালবরাজ, (ভোজদেশাধিপ), উজ্জয়িনীরাজ (অবন্তীর রাজা), মধ্যভারত ও পাঞ্জাববাসী কুরু ও যদুকুল, ভারতের পশ্চিম সীমানায় যবন গ্রীকগণের শেষবংশধরেরা, কান্দাহার (গান্ধার) ও ভারতের উত্তরপূর্ব্ববাসী কীর ও মৎস্যরাজা (বর্ত্তমান কাঙ্গরা বা জ্বালামুখী) এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ (মদ্র) প্রভৃতি প্রদেশের নৃপতিবৃন্দকে ধর্ম্মপালের নিকট মাথা নোয়াইতে হইয়াছিল। তাম্রশাসনের অতিরঞ্জিত ভাষায়—"এই সকল নৃপতিরা 'সাধু' 'সাধু' উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।" তিনি কান্যকুব্জের ইন্দ্ররাজকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকে এই রাজ্য প্রদান করেন। চক্রায়ুধের অভিষেক কালে ধর্ম্মপালের সমস্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত ছিলেন এবং বৃদ্ধ পাঞ্চালগণ চক্রায়ুধের মস্তকে স্বর্ণকলস হইতে অভিষেকের জলধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন।

চক্রায়ুধ।

ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয় অভিযানের কথা তাম্রলেখের কবি অতিশয় আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। দণ্ডাচার্য্য গৌড়ীয় রীতি নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের যে রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, এই সকল প্রশস্তি হইতে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। উমাপতিধর-কৃত বিজয় সেনের প্রশস্তি সেইরূপ রচনার আর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয় কাহিনী অলঙ্কারের বাহুল্যে জনকীর্ত্তন হইয়া আছে—তাঁহার অসংখ্য সৈন্যের পদভরে পর্ব্বতশিখর নোয়াইয়া পড়িয়াছিল; তাঁর বৃহৎ চমূর অগ্রগামী "নাসীর" নামক সৈন্যদের বিক্রান্ত গতিতে মান্ধাতার অভিমান খর্ব্ব করিয়া এবং ইন্দ্রদেব বীর চমূ ভয়ে নিমিলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রণ-হস্তীগুলির নাম ছিল "[illegible]"; সংস্কৃত অভিধানে এ শব্দের অর্থ দেওয়া আছে "হস্তীর বিরাট ব্যূহ"।

ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয়।

ধর্ম্মপালের এই রণ-হস্তীর বিরাট্ ব্যূহ যখন কোন বৃহৎ নদী পার হইত, তখন মনে হইত সেই নদীর সিকতাভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ হস্তীগুলি নদীর প্রসারিত তটভূমির মত মনে হইত এবং তাহাদের ঘন সন্নিবেশে চতুর্দ্দিক্ শ্যামায়মান হইয়া লোকের মনে অকাল বর্ষাগমের বিভ্রম জন্মাইত। তাঁহার অসংখ্য রণতরী সেতুবন্ধস্থিত সমুদ্র-নিমজ্জিত পর্ব্বতমালার সমুদ্রস্থ-শেখর বলিয়া মনে হইত এবং ধর্ম্মপাল যখন ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন মনে হইত চতুঃসাগর বেষ্টিত ভূমণ্ডলে বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রাজধানীতে উত্তর দেশের রাজারা, তাঁহার সখ্যকামনা করিয়া আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক অসংখ্য অশ্ব পাঠাইতেন। তাহাদের খুরোত্থিত ধূলিতে রাজধানী ধূসরিত হইয়া থাকিত।

এই সকল বর্ণনায় আমরা প্রবল প্রতাপান্বিত একচ্ছত্র সম্রাটের একটি উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাই। ধর্ম্মপাল গুপ্তরাজাদের সাম্রাজ্যের অনেকটা যে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার গুণগাথা সর্ব্বত্র গীত হইত, আমরা তৎসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। গোপালের সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) তুলনা চলে, উভয়েরই সংযত বীরত্ব, শান্তিপ্রিয়তা ও ত্যাগ প্রায় একরূপ। কিন্তু ধর্ম্মপাল ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের ন্যায়, তাঁহার ক্রোধ ছিল বাড়বাগ্নির মত; একবার জ্বলিয়া উঠিলে তাহা সহজে নিবিতে চাহিত না। ইঁহার দরবারে যে সকল প্রধান ব্যক্তি ও রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, খালিমপুরের তাম্রশাসনে তাঁহাদের একটা তালিকা দেখা যায়—সে সকল উপাধির অনেকগুলি আমাদের কাছে এখন দুর্ব্বোধ্য হইয়া গিয়াছে—যথা রাজ-রাজনক (অধীন রাজা ?), রাজপুত্র, রাজামত্য, সেনাপতি, বিষয়পতি,. ভোগপতি, ষষ্ঠাধিকৃত, দণ্ডশক্তি, দণ্ডপাশিক, চৌরোদ্ধারণিক, দৌঃসাধসাধনিক, দূতখোলগমাগমিক, অভিত্বরমাণ, হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেষাধ্যক্ষ, নাকাধ্যক্ষ,* তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক, চাট, ভাট—প্রভৃতি, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহামহত্তর, দশগ্রামিক, করণ, ক্ষেত্রকর, বলাধ্যক্ষ, বলাক ইত্যাদি।

রাজপুরুষদের উপাধি।

এই দরবার যে প্রবল একচ্ছত্র সম্রাটের, তাহা এই তালিকা হইতেই বুঝা যায়। আমাদের বাঙ্গলাদেশ কৃষিপ্রধান; গরু, ছাগ, বৃষ প্রভৃতি জন্তু কৃষির সহায়। গোধন রাজাদের একটা প্রধান সম্পত্তি ছিল। সেই ঋগ্বেদের সময় হইতে গরু চুরি করা রাজাদের একটা নিত্য কার্য্য ছিল। স্বয়ং ইন্দ্র পণিদের গরু হরণ করিতেন। বিরাট রাজার গো-গৃহ লইয়া মস্ত বড় যুদ্ধ বাধিয়াছিল, সুতরাং গবধ্যক্ষ-ছাগাধ্যক্ষের পদ বহু প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। তাম্রশাসনটি ভূমিদান সম্পর্কীয়, সুতরাং ইহাতে রাজ্যের ভূমিসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদেরই মাত্র উল্লেখ করা

* 'নাকাধ্যক্ষ' অর্থ আকাশ-বিভাগের অধ্যক্ষ। এই পদটির অর্থ কি তাহা বোঝা যায় না। কালিদাসের রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নৃপতিরা সকলেই স্বচ্ছন্দে আকাশপথে বিচরণ করিতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে (প্রথম অধ্যায়)। অবশ্য অপরাপর কাব্যসমূহেও আকাশগামী রথের উল্লেখ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। শিল্প শাস্ত্রেও আকাশগামী রথের বর্ণনা আছে। আকাশে যাতায়াতের সত্যই কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা এ সমস্তই [illegible]।

হইয়াছে। রাজাদের বিপুল নৌ-বাহিনীর এবং বাণিজ্যতরণীর অধ্যক্ষ বা রাজকর্ম্মচারীদের উল্লেখ এখানে নাই। ভারতবর্ষে যুগে যুগে গ্রীক, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি যে সকল জাতি বিজয়ী হইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের ভাষার কতকগুলি পদের উপাধি দরবারে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল, এই জন্য এই সকল উপাধির ভাষা কতকটা জটিল ও দুর্ব্বোধ।

খালিমপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে মহারাজ ধর্ম্মপালের ত্রিভুবনপাল নামক এক পুত্র ছিলেন। তিনিই জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন এবং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহার অকালে পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় কনিষ্ঠ দেবপাল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। ত্রিভুবনপাল নাম যখন রাজকীয় দলিলপত্রে ব্যবহৃত দেখা যায়, তখন ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া একই ব্যক্তির দেবপাল নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মপাল ৬১ বৎসর রাজত্ব করেন। রাখালদাস-বাবুর মতে তাঁহার রাজত্বকাল ৩৫ বৎসর।

ধর্ম্মপাল তাঁহার অনুগত বিপুলবাহিনীকে নানা তীর্থ দর্শন করাইয়া তাহাদের পরলোকের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ের সহায় হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিকে কেদার-তীর্থে তর্পণাদি করিবার সুযোগ দিয়া প্রয়াগে এবং তৎপর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোকর্ণ তীর্থে ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। কথিত আছে রাবণ রাজা এই গোকর্ণ তীর্থে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

দানশীলতা।

তাম্রশাসনের কবি লিখিয়াছেন, মহারাজ পৃথু, মহারাজ রামচন্দ্র এবং পুণ্যশ্লোক নল রাজা এখন স্বর্গগত, তাঁহারা আর দর্শনীয় নহেন। কিন্তু ইহাদের সমস্ত গুণ লইয়া মহারাজ ধর্ম্মপাল দেব বিদ্যমান। তাঁহাকে দেখিলেই সেই সকল মহাপুরুষদের দেখিবার ফল হইত।

ধর্ম্মপালের রাজত্ব যে সর্ব্বদাই বিজয়ের ইতিহাস তাহা নহে। এতাদৃশ পরাক্রান্ত নৃপতিকেও দুই একস্থলে অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি গুর্জ্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। এই শত্রুকর্ত্তৃক বারংবার বিপর্য্যস্ত হইয়া ধর্ম্মপাল তাঁহার আশ্রিত কনোজাধিপতি চক্রায়ুধকে লইয়া রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট বিনীত ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

জয়পরাজয় বীরদিগের জীবনে উভয়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মপাল যে উত্তর ভারতের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে যে তাঁহার প্রতাপ স্বীকৃত হইত, তাহার প্রমাণ আছে।

তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্ম্মপালের রাজ্য বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তরে দিল্লী এবং জলন্ধর (পঞ্জাব) পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ধর্ম্মপাল প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটরাজবংশীয় জেজ্জের পৌত্র এবং কর্করাজের পুত্র পরবলের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পরবলের অপর নাম গোবিন্দ। প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা বিহার ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক তদীয় রাজত্বের প্রথম ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবপাল

ধর্ম্মপালের জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রিভুবনপাল সম্ভবতঃ অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে কনিষ্ঠ দেবপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। দেবপালের মাতা রণ্ণাদেবী "মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তি" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ অনেক মঠমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন, দেবপালের সেনাপতি লবসেন বা লাউসেন কলিঙ্গ ও আসাম জয় করেন। কাহারও কাহারও মতে লাউসেন ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পুত্র এবং উক্ত রাজার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি শুধু কলিঙ্গ ও আসাম নহে, "অজেয় ঢেকুরের" অধিপতি ইছাই ঘোষকে বধ করিয়া উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ঈশ্বর ঘোষের" যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, সেই ঈশ্বর ঘোষ এবং ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত ইছাই ঘোষ অভিন্ন—এই মতও কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন।

দেবপাল—৮২০-৫৮ খৃঃ (ভিন্সেণ্ট স্মিথ, ৮০০-৪৮ খৃঃ)।

তাম্রলিপিতে লিখিত হইয়াছে, দেবপালের মুখে সর্ব্বদা হাসির শ্রী বিরাজ করিত; ইঁহার চিত্ত নির্ম্মল ছিল, তাহাতে কুটিলতার লেশ ছিল না এবং ইনি সংযত-বাক্, সংযত-ব্যবহার ও মধুর চরিত্র-দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য ইঁহার দেহ পবিত্র ছিল এবং পিতামহের ন্যায় ইনি শান্তিকামী ছিলেন। পিতামহ যেরূপ যুদ্ধান্তে বন্য হস্তীগুলিকে অরণ্যজীবনে ছাড়িয়া দিতেন, ইনিও সেইরূপ দিগ্‌বিজয়ান্তে হস্তীগুলিকে তাহাদের নিবাসভূমি বিন্ধ্যপর্ব্বতে মুক্তি দিতেন। দেবপাল রণশ্রান্ত অশ্বগুলিকে তাহাদের জন্মভূমি কাম্বোজের অরণ্যে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; সেখানে তাহারা তাহাদের আরণ্যসহচর অশ্বগণের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিত।

বীর অথচ শান্তিপ্রিয়।

তাম্রশাসনের অতিরঞ্জিত ভাষায় স্তাবক কবি লিখিয়াছেন, সত্যযুগে বলি, ত্রেতাযুগে ভার্গব, দ্বাপরে কর্ণ এবং কলিতে বিক্রমাদিত্য দাতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন; কিন্তু তারপর লোকে দানের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছিল, দেবপাল সেই দানশীলতা গুণ পুনরায় মর্ত্ত্যে প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

তাম্রলিপির কবিরা অনেক অতিশয়োক্তি করিয়াছেন, কোন কোন স্থানে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, কিন্তু বেশী স্থানেই সত্যগোপন করিয়াছেন। নিজের আশ্রয়দাতা নৃপতির দোষগুলি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদের পরাজয়-কথা প্রায়ই উল্লেখ করেন নাই। তথাপি এই তাম্রলেখমালা ভাল করিয়া পাঠ করিলে এক এক নৃপতির চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ভাবগুলি বুঝিতে পারা যায়; সে সম্বন্ধে কবিগণ যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ধর্ম্মপাল ছিলেন পরাক্রমশালী যোদ্ধা, কিন্তু দেবপালের বীরত্ব অপেক্ষা সাধুতাই চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল,

উপরের লেখাগুলি পাঠ করিলে তাহাই বোঝা যাইবে। পরবর্ত্তী তাম্রশাসনগুলি পড়িলে আমরা দেবপাল-সম্বন্ধে আরও কতকগুলি তত্ত্ব জানিতে পারি। ধর্ম্মপাল এত বড় বোঝা হইয়া যে সকল কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, দেবপাল তাহা সমাপ্ত করেন, তিনি দ্রাবিড়েশ্বর ও পিতৃশত্রু গুর্জ্জরনাথকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। দেবপালের মাতা রাষ্ট্রকূটাধিপতি অমোঘবর্ষের ভগিনী ছিলেন। দেবপাল মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কাম্বোজগণ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গৌড়দেশ আক্রমণের জন্ত চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু দেবপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তিনি গুর্জ্জরের রামভদ্রদেবকে জয় করিয়া সেই দেশের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং উৎকলের রাজাকে রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনে দেবপালকর্ত্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অধিকার এবং হূণবিজয়ের কথাও উল্লিখিত আছে।

এই সকল বৃত্তান্তের দ্বারা মনে হয় ধর্ম্মপাল যদিও তাঁহার বিশাল রাজ্য একরূপ নিষ্কণ্টক করিয়াই স্বর্গীয় হইয়াছিলেন, তথাপি চারিদিকে বিজয়োন্মুখ স্বাধীন নৃপতিরা গৌড়মণ্ডলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। দেবপালকে ধীর, স্থির ও সৌম্য প্রকৃতির লোক বুঝিয়া ইহারা মাথা জাগাইয়াছিলেন—কিন্তু পুণ্যশীলা রাজ্ঞী রণ্ণাদেবীর আশীর্ব্বাদে তাঁহার প্রিয়পুত্র দেবপাল সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধগুলি তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা অদ্বিতীয় বীর জয়পাল কর্ত্তৃকই বেশীর ভাগ নির্ব্বাহিত হইত। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (দেবপালের) অনুজ্ঞাক্রমে বলবান্ জয়পাল দিগ্বিজয়ার্থ চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়াই উৎকলের রাজা অবসন্ন হইয়া পড়িয়া স্বীয় রাজধানী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা (সম্ভবতঃ ভগদত্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল বীরবাহু) জয়পালের বশীভূত হইয়া অধীনত্বস্বীকাররূপ মাল্য মস্তকে পরিয়া চিরকাল শান্তিতে অবস্থান করিয়াছিলেন।" "জয়পাল ইন্দ্রের কনিষ্ঠ উপেন্দ্রের ন্যায় অগ্রজ দেবপাল দেবকে ধরিত্রীর শাসনসুখের অধিকারী করিয়াছিলেন।" সুতরাং দেখা যাইতেছে অর্জ্জুনতুল্য সহোদরের বীরত্বেই দেবপাল তাঁহার রাজ্যের শত্রুদলন করিয়া রাজশ্রীকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন। দেবপালের এই সৌভাগ্যের ফল আরও দুইজনের সাহায্যে অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইঁহারা তাঁহার মন্ত্রিদ্বয়; প্রথমতঃ দর্ভপাণি। তাম্রলেখে বর্ণিত হইয়াছে—"ইঁহার নীতিকৌশলে দেবপাল বিন্ধ্য হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ, করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" দর্ভপাণির পৌত্র কেদার মিশ্রও দেবপালের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাম্রশাসন ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই মন্ত্রিবরের বুদ্ধির বলের উপাসনা করিয়া গৌড়েশ্বর (দেবপাল দেব) উৎকল কুল উৎকলিত করিয়া হূণগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া এবং দ্রাবিড়-গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন।"

দর্ভপাণি।

[illegible], স্থির, বীর, ধর্ম্মানুরাগী দেবপাল দৈবানুগ্রহে অর্জ্জুনতুল্য ভ্রাতা [illegible] এবং

বৃহস্পতিতুল্য মন্ত্রী দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্রকে লাভ করিয়া সর্ব্বত্র বিজয়যুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যটির পরিসর বড় কম ছিল না। অনুশাসনে লিখিত আছে—"একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ; একদিকে লক্ষ্মীর নিকেতন ক্ষীরসমুদ্র, অপরদিকে বরুণালয়—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল দেবপাল নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছেন।" দেবপাল সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র নৃপতি না হইলেও তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় রাজন্যগণের পুরোভাগে ছিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে একজন শ্রেষ্ঠ নৃপাল ছিলেন, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

ইঁহার রাজত্বকালে যবদ্বীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেব পাটলিপুত্রে দূত পাঠাইয়া ইঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন মহারাজ দেবপাল যবদ্বীপাধিপতির নামে রাজগিরের অন্তঃপাতী নন্দীবনাক ও মণিবায়কগ্রাম, নাটিকাগ্রাম, হস্তিগ্রাম এবং গয়া জেলার পালামর-গ্রাম—এই পাঁচখানি গ্রাম নালন্দা বিহারে দান করেন। এই গ্রামগুলির উপস্বত্ব দ্বারা (১) নালন্দা বিহারের বুদ্ধসেবা, (২) ভিক্ষুসঙ্ঘের বলি, চরু, চীবর, পিণ্ড, শয়ন, আসন, ঔষধ, সত্র, (৩) ধর্ম্মগ্রন্থ-লিখন, (৪) বিহার ভগ্ন হইলে তাহার সংস্কার—এই চতুর্ব্বিধ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছিল। যবদ্বীপের বালপুত্রদেব শ্রীবীরনামক রাজার বংশসম্ভূত। বলা বাহুল্য এই পঞ্চগ্রাম বালপুত্রদেব সেই সেই গ্রামের মালিকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া দান করিয়াছিলেন। দেবপালের রাজত্বের আটত্রিশ বৎসরের কার্ত্তিক মাসের একবিংশ দিনে, অনুমান ৮৫৮ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে এই দানপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

বিগ্রহপাল ধর্ম্মপালের পৌত্র এবং দেবপালের ভারতবিশ্রুতকীর্ত্তি শক্তিমান্ কনিষ্ঠ সহোদর জয়পালের পুত্র। কাহারও কাহারও মতে বিগ্রহপাল ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের পৌত্র।

বিগ্রহপাল হৈহৈ রাজবংশভূষণস্বরূপা লজ্জা নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইঁহার অন্য নাম ছিল সুরপাল। ইঁহার সময়ে গুর্জ্জরাধিপতি ভোজরাজ অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারা বিগ্রহপাল পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, প্রণত সমস্ত সামন্ত নৃপতির মুকুটমণি তাঁহার পাদপীঠ উজ্জ্বল করিয়াছিল এবং তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে

বিগ্রহপাল ৮৫৮-৮৬০ খৃঃ।

প্রাপ্ত সিংহাসন নিজের যোগ্যতা দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাম্রলিপির "ন্যায়ার্জ্জিত" শব্দের অর্থ সকলেই "উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত" করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার সিংহাসনের দাবীর প্রতিদ্বন্দ্বী অপর কেহ ছিলেন, ন্যায়ার্জ্জিত কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটাই আছে। গুর্জ্জরপতির আক্রমণে শুধু তিনি নহেন, তাঁহার পুত্র নারায়ণপালও কতকটা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিগ্রহপাল ৮৫৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি অল্পকাল পরেই পুত্র নারায়ণপালের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনের সপ্তদশ শ্লোকে এই বানপ্রস্থ অবলম্বনের আভাস আছে।

নারায়ণপাল—৮৬০-৯১৫ খৃঃ।

নারায়ণদেব—বিগ্রহপাল ও লজ্জাদেবীর পুত্র। তিনি সম্ভবতঃ ৮৬০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব খুব নিরাপদে নির্ব্বাহিত হয় নাই; রাজত্বের প্রথম দিকটায় গৌড়ের পরম শত্রু গুর্জ্জররাজ ভোজদেব মগধ আক্রমণ করেন। ভোজদেবের এই অভিযান দৃঢ়সঙ্কল্পিত এবং সুহৃদ্ ও সামন্ত-নৃপতিগণের সমবেত চেষ্টায় সফল হইয়াছিল। নারায়ণপালের পিতা বিগ্রহপাল এই সমবেত শত্রুগণকর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন; ভোজরাজের প্রধান সহায়স্বরূপ যোধপুরের (প্রাচীন মাণ্ডব্যপুর) রাজা কক্ক ও কলচুরি বংশের রাজা গুণাম্ভোধিদেব সামন্ত নৃপতিস্বরূপ এই অভিযানে মিলিত হইয়াছিলেন এবং

অধিকার সংকোচ।

মুঙ্গেরে নারায়ণপালের সঙ্গে গুর্জ্জরাধিপ ও তাঁহার সামন্ত নৃপতিগণের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহাতে নারায়ণদেব পরাজিত হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষপরে গুর্জ্জরের দৌরাত্ম্যে পালসাম্রাজ্য ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মুঙ্গের, ত্রিহুত ও মগধ, গুর্জ্জর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গেল এবং পালরাজা গৌড়বঙ্গের আবেষ্টনীর মধ্যে পরিম্লান মহিমায় রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন।

কিন্তু নারায়ণপাল দেব উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অধিকার হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইলেও ইহার দীর্ঘ রাজত্ব মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। ইহার সময়ে উচ্চশিক্ষা, শিল্পকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে দেশের খুব উন্নতি হইয়াছিল। আমরা এই অধ্যায়ের শেষে পালরাজত্বকালে দেশের অবস্থার কতকটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। শান্তিপ্রিয়, দানবীর, প্রিয়ভাষী, আদর্শচরিত্র, নারায়ণপাল উচ্চশিক্ষা ও চারুশিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা সুখে বাস করিত, কবি তাঁহার শুভ্র যশোরাশি শিবের হাসির সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন।

নারায়ণপালের একমাত্র পুত্র রাজ্যপাল। আনুমানিক ৯১৫ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তাম্রলেখে এই রাজার কৃত কুলাচল-সদৃশ উচ্চ দেবালয় এবং অগাধ-সমুদ্রতুল্য বিশাল দীর্ঘিকার উল্লেখ আছে। [illegible] ভূমিতে বহু উচ্চ দেবালয়ের ভগ্নস্তূপ এবং অধুনা-[illegible] দীর্ঘিকা নানাস্থানে

দৃষ্ট হয়। ইহার কোন্‌টি কোন্ রাজার কীর্ত্তি, তাহা এখনও ভাল করিয়া জানা যায় নাই।

রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ৯১০-৭৮ খৃঃ।

পালরাজগণের সময়ে সাধারণতঃ দেশে শান্তি ছিল এবং তাঁহারা সকলেই শিক্ষা, শিল্প ও সাধারণের হিতকর নানা অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটপতি জগত্তুঙ্গদেবের (কাহারও কাহারও মতে তুঙ্গ ধর্ম্মাবলোকের) কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পুত্র দ্বিতীয় গোপালদেব।

উত্তর ভারতে তখন কান্যকুব্জ এবং রাষ্ট্রকূট এই দুই পরাক্রান্ত রাজার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। কান্যকুব্জের অধিকার মগধ ও ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কনোজাধিপতি মহীপালকে যখন বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিলেন, তখন গৌড়াধিপ দ্বিতীয় গোপালদেব এই সুবিধায় মগধ পুনরায় দখল করিলেন। কিন্তু গোপালদেবের অদৃষ্টে অব্যাহত শান্তি ছিল না। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে বুন্দেলখণ্ডের রাজা চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মা গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মধ্যভারত ছত্রপুরে এই চন্দেল্লবংশীয় রাজাদেরও যে সকল কীর্ত্তি বিদ্যমান—তাহা এখনও অটুট অবস্থায় আছে; এই কীর্ত্তিগুলি অতীব বিস্ময়কর। প্রকৃতির স্বপ্নকুহক-জড়িত এরূপ অপূর্ব্ব স্থাপত্যমহিমা ভারতের আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পাহাড়ের ঊর্দ্ধস্থিত রাজগড় আরব্য উপন্যাসের দৈত্যপুরী বা অতিমানুষগণের রাজধানী বলিয়া ভ্রম হয়। খজুরাহো গ্রামে আবিষ্কৃত যশোবর্ম্মার তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় ৯৫৪ খৃঃ অব্দে উক্ত রাজা গৌড়, কাশ্মীর, কোশল, মিথিলা, মালব, চেদী, কুরু ও গুর্জ্জর-রাজগণকে পরাভূত করিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত স্বাধিকারে আনিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় গোপালদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। গোপালদেবের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। তাঁহার সময়ে গৌড়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রে বিদেশীয়গণের বড়ই উৎপাত চলিতেছিল। তাম্রশাসনের কবি বিগ্রহপালের প্রশংসা করিতে যাইয়া তাঁহার কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারেন নাই। যে সময়ে সমস্ত দেশ অসির ঝনৎকারে মুখরিত, তখন হয়ত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল কোন নিরাপদ্ পল্লী খুঁজিয়া তথায় তুলিহস্তে চিত্রপট আঁকিতেছিলেন, তাঁহার অভ্রতুল্য বিশালকায় হস্তিগণ রণমদে মাতিয়া কোন দুর্লঙ্ঘ্য নদীর প্রসারিত সিকতাভূমির কাছ দৃষ্ট হয় নাই—তাহারা হিমালয়ের হিমশীতল কোন উপত্যকায় চন্দনবনে যথেচ্ছ বিহার করিতেছিল।

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে)

এই সময়ে যশোবর্ম্মার পুত্র ধঙ্গদেব কনোজ হইতে বিপুল বাহিনী লইয়া গৌড়েশ্বরের পত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য কি তাম্রশাসনকার মহীপালের মাতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্ঞীর নাম বা বংশসম্বন্ধে একটি কথাও লিখেন নাই? অপরদিকে কাম্বোজিয়ারা আসিয়া অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়াছিল। এই জন্যই কি মনঃক্ষোভে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল চিত্র করিবার [illegible]

লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া সংসার-জ্বালা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন? যশোবর্ম্মার পুত্র ধঙ্গদেবের দিগ্বিজয়-প্রবৃত্তিটা যেমন খুবই প্রবল ছিল, তেমনই তাঁহার পরাজিত রাজাদের অন্দরমহলের প্রতি একটা লিপ্সাও বলবতী ছিল। তাম্রশাসনের কবি তাঁহার এই রোগটারও বেশ প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়া তদীয় অবরোধিকার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন:—"সমরজয়ী রাজা ধঙ্গের কারাগারে বন্দিনী রমণীরা সজলনেত্রে এই ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন—"আপনি কে? অন্ধ্রদেশের রাজ্ঞী; আপনি কে? রাঢ়রাজপত্নী; আপনি কে? অঙ্গরাজ-পত্নী।" এই ঘটনা ১০০২ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরবর্ত্তী পালরাজগণ

কাম্বোজিয়াগণ ছিলেন বিদেশী; কুলজীগ্রন্থে নলুপঞ্চানন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন—"এই অস্পৃশ্যজাতি নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে চায়। এই এক বিষম রোগ যে জাতি রাজা হইবে, সেই নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করে।" নলুপঞ্চানন জানিতেন না যে আবুপর্ব্বতে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবার জন্য যে সময়ে যজ্ঞ হইয়াছিল তদবধি ব্রাহ্মণেতর সর্ব্বজাতির মধ্যে এই প্রচেষ্টা চলিতেছিল।

কাম্বোজিয়ারা কে? ফরাসী পণ্ডিত ফুঁসের মতে তিব্বত দেশের নামান্তর কম্বোজ দেশ—নেপালে এই প্রবাদ প্রচলিত। রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন "কাম্বোজরাজ গৌড়পতি" তিব্বত বা অন্য কোন পাহাড়িয়া দেশ হইতে আসিয়া বরেন্দ্র জয় করিয়া "গৌড়পতি" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ৯৬৬ খৃঃ অব্দে ইঁহাদের এক বংশধর কর্ত্তৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণগড়ে ইঁহাদের কীর্ত্তিচিহ্ন পাওয়া যায়। কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিরা এই কম্বোজরাজগণের স্বশ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যে "অনধিকারী" জাতি কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন—ইঁহারা সেই জাতি।

মহীপাল—৯৭৮-১০৩০ খৃঃ (ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে)।

মহীপালের রাজত্বকালে উত্তর-পূর্ব্ব ভারত নানা নৃপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধবিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। কনোজাধিপতি রাজ্যপাল চন্দেল্লরাজগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি মামুদ গজনীর সহায়তা-প্রার্থনার জন্য [illegible] হইয়াছিলেন। মহীপালের পরে নয়পালের সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ঘোর [illegible] হইয়াছিল। [illegible] কলচুরিরাজ কর্ণ অপূর্ব্ব বীরত্ববলে সমস্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। [illegible] "কর্ণদেবের বিক্রমদর্শনে পাণ্ড্যরাজ চণ্ডতা [illegible] করিয়াছিলেন,

কেরলরাজের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল, কুরুরাজ সৎপথে আসিয়াছিলেন, বঙ্গরাজ ও কলিঙ্গরাজ ভয়কম্পিতকলেবরে লুকাইয়া ছিলেন, কীররাজ পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন, হূণরাজের হর্ষ অন্তর্হিত হইয়াছিল।" এই ভারতবিজয়ী বীর চন্দ্রেরবংশের রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মাকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানগণ এই সময়ে অমিতবিক্রমে বন্যার ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তের উপর আসিয়া পড়িলেন। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরাজাদের অনেকে একত্র হইয়া মুসলমানের অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু কম্বোজরাজগণের হস্ত হইতে বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করিয়া মহীপাল স্বদেশে নানা লোকহিতকর ব্যাপারে আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যে প্রচণ্ডশক্তি হিন্দুসাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা বাধা দিবার জন্য মহীপাল কোন চেষ্টাই করেন নাই। বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত মহীপাল দীঘি এখনও সেই নিশ্চিন্ত জনপ্রিয় রাজার প্রধান কীর্ত্তিস্বরূপ বিদ্যমান আছে। এত বড় দীঘি আর বাঙ্গলায় নাই। এই দীঘি রঙ্গপুরের অতি সন্নিহিত। তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় চরিত্রের নানাগুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে পল্লীগাথা এখনও উত্তরবঙ্গে গীত হইয়া থাকে। "ধান ভানতে মহীপালের গীত" এই প্রবাদবাক্য বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচলিত। ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা কি ছিল তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

"যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।"

মহীপালের মৃত্যুর ৪।৫ শত বৎসরেও যে গীত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পূর্ণোদ্যমে গীত হইত এবং এখন কিঞ্চিন্ন্যূন সহস্রবৎসর পরেও যাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, সেই গানের বিষয়ীভূত রাজচরিত্র যে কতটা জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি ক্ষুদ্র মহীপালের গানে আমরা জানিতে পারিয়াছি, লীলা নাম্নী এক ধনাঢ্য বণিক্‌কন্যাকে মহীপাল ভালবাসিতেন। তাহাকে পাওয়ার জন্য তিনি কত হিমপূর্ণ রাজ্য খুঁজিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে উষ্ণ প্রদেশে গমনাগমন করিয়াছেন। একদিন তিনি শুনিলেন, তাঁহার নবনির্ম্মিত দীঘিতে স্নান করিবার জন্য সেই সুন্দরী কন্যা আপনা হইতে আসিয়া জলে সাঁতার কাটিতেছে। মহীপাল নিজে জলে নামিয়া লীলার জটিল ও দীর্ঘ শৈবালের মত ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত চুলের মুঠা ধরিয়া টানিয়া আনিলেন এবং তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। ইতঃপূর্ব্বেই মহীপালের সংস্রবে লীলার একটা কলঙ্ককথা প্রচলিত ছিল, এই জন্য লীলার পিতামাতা তাহাকে মহীপালদীঘিতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। লীলা সে কথা না মানিয়া দীঘির জলে নামিয়াছিল, ইহা যারা মনে হয় রাজশিকারী যে পাখিটাকে শিকার করিয়াছিলেন, সে পাখী ধরা দিতেই তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। এই সকল গল্পকথার ঐতিহাসিক মূল্য কি তাহা জানি না। [illegible] পল্লীগাথা অনেক সময়েই সত্যের একটু ইঙ্গিতকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর [illegible]

মহীপাল ও লীলা।

নির্ম্মাণ করে। এই প্রাচীন গাথাটীতে যে সত্যের সেরূপ একটু ইঙ্গিত না আছে তাহাই বা কে বলিবে?

মহীপাল দেব সম্ভবতঃ ১০৩০ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন তিনি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারানাথের মতে মহীপাল ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। সুলতান মহম্মদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, যখন স্থানীশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোপাদ্রি, কলঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি নগর ও দুর্গ একের পর একটি করিয়া বিজয়ী বিদেশীর করতলগত হইতেছিল, তখন মহীপাল নিশ্চিন্তমনে বারাণসী নগরীকে নানা কীর্ত্তিতে সজ্জিত করিতেছিলেন।

মহীপালের পুত্র নরপালের সময়েই বঙ্গদেশের নানাস্থানে শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; উত্তর-ভারতে যে ঝড় বহিতেছিল, গৌড়ে তাহার গতি উপলব্ধ হয় নাই। নরপাল নিরুদ্বেগে সিংহাসনে বসিতে পারেন নাই। যে কর্ণদেব অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত কবলিত করিয়া চেদীরাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমবার চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার হস্তে পরাজিত হন। চন্দেল্লরাজের ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপালের শৌর্য্য ও বীরত্বগুণে এই জয় সংসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু কর্ণদেবের দ্বিতীয় বারের পরাজয় ঘটিয়াছিল মগধে।

নরপাল—১০৩০-১০৪৫ খৃঃ।

নরপাল তাহাকে পরাভূত করেন। কর্ণদেব গয়ায় তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। সেইখানে মগধাধিপতি নরপালের সঙ্গে তাঁহার যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে কর্ণ মগধ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় জয়ের আশা না দেখিয়া স্বীয় যুযুৎসাবৃত্তি কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস করিয়া কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করেন। নরপালের সৈন্যদল বিজয়ী হইয়া কর্ণদেবের সৈন্যসামন্তদিগকে অবাধে হত্যা করিতেছিল। এই সময়ে বঙ্গের মুকুটমণি শ্রীমান্ অতীশ দীপঙ্কর গয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় কর্ণদেব ও নরপালের মধ্যে উভয় পক্ষের একটি সম্মানজনক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। শত্রুতা এইভাবে সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হইলে নরপালের পুত্র কুমারপালের সঙ্গে চেদীরাজ যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

কর্ণদেবের পরাজয়।

৺ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "নরপাল দেবের রাজত্বকালে বৈদ্য-জাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল, বৈদ্যগ্রন্থকর্ত্তা চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ নরপাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। জনার্দ্দন মন্দিরের প্রশস্তি রাজবৈদ্য সহদেব কর্ত্তৃক এবং গদাধর মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্য বজ্রপাণি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই ক্ষোদিত লিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম-সত্ত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যা ও রচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।"

বৈদ্যজাতির উন্নতি।

১০৪৫ খৃঃ অব্দে নরপালদেবের পুত্র বিগ্রহপাল (তৃতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার শ্বশুর ভারতবর্ষের তৎকালীন নৃপতিগণের প্রধান—চেদীরাজ কর্ণদেব, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিগ্রহপাল বহু রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। পাটনা

জেলায় কোমরাজগ্রামে বীরদেব-নির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এই সকল মুদ্রার অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বিগ্রহপালের সময়ে বর্ম্মবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা বাঙ্গলাদেশের অনেকটা আত্মসাৎ করেন। এই রাজগণের মধ্যে বিগ্রহপালের সমসাময়িক বজ্রবর্ম্মা ও জাতবর্ম্মা। জাতবর্ম্মা বিগ্রহপালের শ্যালীপতি, তিনি কর্ণদেবের দ্বিতীয় কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। জাতবর্ম্মা হরিকেল (চন্দ্রদ্বীপ) অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ও পরে দিব্য নামক কৈবর্ত্ত সেনাপতিকে পরাভূত করিয়া অঙ্গদেশ (পাটনা) অধিকার করেন।

বিগ্রহপাল তৃতীয় ১০৪৫ খৃঃ—দ্বিতীয় মহীপাল ও সুরপাল।

কিন্তু বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষদিকে আর এক দুর্দ্ধর্ষ শত্রু ক্ষীয়মাণ পালশক্তির বিক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ বঙ্গদেশে রাজ্যস্থাপন করেন। ইঁহারা কৈবর্ত্তকুলসম্ভূত। সেনাপতি দিব্যের নাম এই মাত্র করা হইল—ইনি অঙ্গ ছাড়িয়া বরেন্দ্রে উপস্থিত হন এবং তথাকার অধিবাসিগণকে পালরাজাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। দিব্য অনেক স্থলে দিবেবাক্ নামে পরিচিত। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষের দিকে কৈবর্ত্তগণ উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া দিবেবাকের শাসন স্বীকার করিয়া লয়।

কৈবর্ত্তপতি দিবেবাক্।

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজ্যের অধিকার লইয়া তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে কলহ ঘনাইয়া আসে। দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছিলেন। বিগ্রহপালের তৃতীয় পুত্র রামপাল কৃতী ও জনপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং যদি তিনি রাজ্যের প্রতি লোভ করেন এই আশঙ্কায় মহীপাল শুধু রামপালকে নহে, অপর ভ্রাতা সুরপালকেও শৃঙ্খলিত করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। এমন কি তিনি রামপালকে বধ করিবারও প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহী কৈবর্ত্তদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া নিহত হন। ইহার পরে কতক সময়ের জন্য সুরপাল রাজা হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন সুরপালকে হত্যা করিয়া রামপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইহা একটি অনুমান মাত্র। সুরপালের রাজত্ব বেশীদিন স্থায়ী ছিল না, এবং তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না—সুতরাং তিনি হয়ত রামপালকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, এই "হয়ত" দ্বারা পুণ্যশ্লোক রাজা রামপালের ঘাড়ে এত বড় একটা অভিযোগ চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নহে।

যাহা হউক রামপাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পাল-সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বিদ্রোহী কৈবর্ত্তেরা উত্তরবঙ্গের সমস্তটা দখল করিয়া লইয়াছিল। দিব্বোকের পরে তদীয় ভ্রাতা রুদোক গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। রামপালের সময়ে রুদোকের পুত্র ভীম কৈবর্ত্তদের অধিনায়ক হইয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন; রামপাল তখন পদ্মা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন।

রামপাল।

কিন্তু কিরূপে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন, ইহাই ছিল রামপালের দিবসের চিন্তা ও

রাত্রের স্বপ্ন। রামপালের মাতুল "বিন্ধ্য-মাণিক্য" নামক দুর্জ্জয় হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ় মথন তাঁহার সহায় হইলেন। রামপাল জনপ্রিয় ছিলেন,—পূর্ব্বগগনের সমুজ্জ্বল সূর্য্য, পালবংশাবতংস রাজ্যহারা রামপালের জন্য সমস্ত গৌড়মণ্ডল মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ করিতেছিল।

পিতৃরাজ্যোদ্ধারব্রত।

এই দেশে এখনও কৈবর্ত্তের সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর, তাঁহারাই সম্ভবতঃ একসময়ে দেশের মুখপাত্র ছিলেন। বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গে সমুদ্র ও বড় নদীতে ইঁহারা দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। ইঁহাদের শরীরে অমানুষী বল ছিল,—কিন্তু "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"। রামপাল সংগঠনের শক্তি ও রাষ্ট্রনীতির উজ্জ্বল প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সামান্য একটি ভূস্বামীর অবস্থায় পরিণত একটি মেটে প্রদীপের সলতের মত গৌরবান্বিত পালবংশের এই দুঃস্থ হতভাগ্য বংশধর কিরূপে কৈবর্ত্তগণের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন,—শতধা-বিভক্ত এই গৌড়মণ্ডলীকে কিরূপে ঐক্যের সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন, তাহা সন্ধ্যাকর নন্দী বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন, প্রথমতঃ ভীম কৈবর্ত্তের পরাক্রম ও তাঁহার নিজ শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া রামপাল নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে সমস্ত সামন্ত নৃপতিদের গৃহে গৃহে যাইয়া দেখা করিতে লাগিলেন; পার্ব্বত্য দেশের দলপতিদিগের সাহায্য পাইবার জন্যও চেষ্টিত হইলেন এবং দিবারাত্র স্বীয় তরুণপুত্র রাজ্যপাল ও অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যেন ঘনঘটাচ্ছন্ন নিরাশা ভেদ করিয়া একটু একটু করিয়া আলোর সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, দেশের লোকের হৃদয়ের অনুরাগ তাঁহার প্রতি স্থির রহিয়াছে।

যখন দেশবাসিগণের ভালবাসা সম্বন্ধে তিনি দ্বিধাশূন্য হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ ও বাহুতে বল আসিল। তিনি অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রাণপণে লাগিয়া গেলেন। তখনও পালরাজগণের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয় নাই। সেই পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত অর্থ তিনি জলের মত বিলাইয়া দিতে লাগিলেন।

কৈবর্ত্তবিদ্রোহের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রথম সেনাপতি হইলেন রামপালের মাতুলপুত্র রাষ্ট্রকূটবংশীয় শিবরাজদেব। তিনি প্রচণ্ডবেগে ভীমাধিকৃত দেশগুলি আক্রমণ করিলেন—এই আক্রমণের ফলে দেশ জুড়িয়া আতঙ্ক হইবার কথা ছিল,—কিন্তু রাজার অনুজ্ঞাক্রমে শিবরাজদেব যথাসম্ভব সংযম ও সাধুতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অভিযান চালাইতে লাগিলেন। তিনি হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকের বিপুলবাহিনী লইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বত্র দেবত্র ও ব্রহ্মত্র জমি এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। বরেন্দ্রভূমি শিবরাজের বিক্রম ও সংযম এই উভয় গুণেই তাঁহার বশীভূত হইয়া গেল। ভীমের নিযুক্ত সেনাপতিগণ ক্রমশঃ হটিয়া যাইতে লাগিল। যেখানে প্রজামণ্ডলী অনুকূল, সেখানে অভিযান অনেক পরিমাণে নিরাপদ। অল্পসময়ের মধ্যেই শিবরাজ রাজদরবারে সংবাদ দিলেন—"বরেন্দ্রভূমি অধিকৃত হইয়াছে।"

কিন্তু সহসা এই বিরাট্ অভিযানের বেগ সামলাইতে না পারিয়া কৈবর্ত্তরাজ একটু

বিব্রত হইয়া পড়িলেও পুনরায় তাঁহার বিপুল বলসঞ্চয় করা কষ্টসাধ্য হইল না। এবার উভয় পক্ষের জীবনমরণ পণ। কৈবর্ত্তনেতা তাঁহার অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ হইতে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। হিমাদ্রিতুল্য এই বিরাট্ ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলে তবে জয়ের আশা,—যে বরেন্দ্র-দেশ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের পুণ্য জন্মভূমি ও তাঁহাদের শত শত কীর্ত্তিদীপ্তিতে সমুজ্জল, যাহা স্বপ্নলব্ধধনের ন্যায় রামপাল শিবরাজের কল্যাণে কিছুকালের জন্য পাইলেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা দেখিতে দেখিতে শত্রুকর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়া গিয়াছিল—তবেই তাহা সত্য সত্য অধিকার করিতে পারিবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন। এই সমস্যার কণ্টকাকীর্ণ মুহূর্ত্তে তিনি সমস্ত সামন্ত-নৃপতি লইয়া এক গৌড়চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—সেই চক্রে নিম্নলিখিত দলপতিগণ যোগদান করিয়াছিলেন:—

১। মগধ ও পীঠাধিপতি ভীমযশা। ইনি কান্যকুব্জাধিপতি দেবরক্ষিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইনি রামপালের বিরুদ্ধে ছিলেন, একসময়ে মথনদেব (রামপালের মাতুল) ভীমযশাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার মিত্রতা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন এবং স্বীয় কন্যা শঙ্করদেবীকে ইহার সঙ্গে বিবাহ দিয়া সেই সখ্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। কৈবর্ত্ত-বিরুদ্ধে অভিযানার্থ একত্র সামন্তমণ্ডলীর মধ্যে ইনিই সম্ভবতঃ প্রধান ছিলেন, যেহেতু ইহারই নাম সন্ধ্যাকর নন্দী সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে "বন্দ্য" উপাধি দিয়াছেন। (পীঠ—বর্ত্তমান গয়া-জেলার প্রাচীন নাম)।

২। কোটাটবীপতি বীরগুণ। কোটাটবী উড়িষ্যার বিশাল অরণ্যানীবেষ্টিত গড়জাত প্রদেশ। আইন আকবরীতে এই দেশকে কটক সরকারের অন্তর্গত "কোট দেশ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দী বীরগুণকে "নানারত্ন-কুট্টিম-কোটাটবী-কণ্ঠী-দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্ত্তী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ। ইনি উড়িষ্যার রাজা কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তি বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। রামচরিতে কর্ণকেশরীকে পরাজয় করার জন্য যে বহুপল্লবিত দীর্ঘসমাসযুক্ত উপাধিদ্বারা ইহার প্রশংসা করা হইয়াছে সেই স্তবযুক্ত বিশেষণটী দেড় ছত্র পরিমিত দীর্ঘ।

৪। বালবলভীর অধীশ্বর বিক্রমরাজ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বালবলভী বর্ত্তমান বাগড়ীর প্রাচীন নাম। সন্ধ্যাকর নন্দী এই দেশের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে এই দেশ নদীবহুল ছিল বলিয়া মনে হয়।

৫। শূরবংশীয় অপার মান্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর। রামচরিতে ইহাকে "অপার-মান্দার-মধুসূদন-সমস্তাটবিক-সামন্তচূড়ামণি" উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

সামন্তচক্র।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে অপার-মান্দার দুর্গেশনন্দিনীর "গড়মান্দারণ"।

৬। কুজবটীর অধীশ্বর শূরপাল। ইনি পালবংশের কোন বংশধর হইবেন। কুজবটীর এখনও স্থাননির্ণয় হয় নাই।

৭। তৈলকম্পের অধিপতি রুদ্রশিখর। এই স্থানটির বর্ত্তমান নাম 'তেলকুপি', উহা মানভূম জেলায় অবস্থিত।

৮। উচ্ছালের অধিপতি ময়গাল সিংহ।

৯। ঢেকরীয় রাজা প্রতাপসিংহ। ঢেকরী উত্তর-রাঢ়ে অবস্থিত। ইহাই ইছাই-ঘোষের "অজেয় ঢেকুরী", এখানে এখনও ইছাই-ঘোষের শ্যামরূপার মন্দির অতি জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান।

১০। কয়ঙ্গ-মণ্ডলের নরসিংহার্জ্জুন।

১১। শঙ্কটগ্রামের চণ্ডার্জ্জুন।

১২। নিদ্রাবলের বিজয়রাজ। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে এই বিজয়রাজই বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন। নামের সাদৃশ্যজনিত অনুমান ভিন্ন এই মতের সমর্থক অন্য কোন প্রমাণ নাই।

১৩। কৌশাম্বীর ঘোরপবর্দ্ধন। কুশম্বী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। এখানে নসরত্ সাহের একটি মসজিদ আছে। ঘোরপবর্দ্ধন সম্ভবতঃ লিপি-প্রমাদ; নামটি গোবর্দ্ধন। কেহ কেহ মনে করেন ইনি ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত গোবর্দ্ধন।

১৪। পদুবন্বার সোম।

গৌড়াভিযানার্থ এই চতুর্দ্দশ নৃপতিমণ্ডল-নির্ম্মিত চক্র বাঙ্গলার ইতিহাসে জাতীয় ঐক্যের একটি বিরল নিদর্শন। কৈবর্ত্তপতি ভীম এই দেশেরই লোক, তাঁহার বিরুদ্ধে এত বড় একটা চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যাঁহারা,—তাঁহাদের বংশধরেরা লক্ষ্মণসেনের বিপদের সময়ে, জাতীয় মহাবিপদের দিনে কোথায় ছিলেন? এই চতুর্দ্দশ মহারথ একত্র হইয়া সমস্ত গৌড়মণ্ডল যেন এক ব্যক্তি এইরূপ ভাবে ভীমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। এরূপ ঐক্য গৌড়দেশে বড় দেখা যায় নাই। এই অপূর্ব্ব ঐক্যের একটি কারণ আমার মনে হইতেছে, কৈবর্ত্ত-রাজা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত জাতির উপর শাসনদণ্ড চালাইবেন—ইহা জাত্যাভিমানের দুর্গস্বরূপ গৌড়দেশে দুঃসহ ও অসহ্য হইয়াছিল। এই সামন্ত-চক্র বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় অধিকাংশ স্থান লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতেই নব ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের হাওয়া পূর্ব্ব-ভারতে পৌঁছিয়া কৈবর্ত্তাধিকারটা জাতীয় সম্মানজ্ঞানকে অভিঘাত করিয়াছিল। পালেরা যে জাতীয়ই হউন, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া লোকের শ্রদ্ধা ও স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, পালেরা বৌদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেন।

যাহা হউক, তথাপি রামপাল যে এত বড় একটা কাণ্ড করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সামন্ত-চক্র লইয়া রামপালদেব প্রবল নৌবাহিনীর সহিত অগ্রসর হইয়া নৌ-সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণপশ্চিমে কোন স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈবর্ত্তরাজ "মরি কিংবা মারি" সঙ্কল্প করিয়া রণক্ষেত্রে 'মরিয়া' হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় কৈবর্ত্তরাজ ভীম—রামপালের সেনাপতি বিত্তপালের হস্তে বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার এই বিপদের সংবাদ শুনিয়াও কৈবর্ত্তসেনা একেবারে আশা ত্যাগ করে নাই। তাঁহারা

আবার একত্র হইয়া হরি নামক সেনা-নায়কের নেতৃত্বে রামপালের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এবার চাষা কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) জাতির গৌরব পশ্চিমে বিলয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় স্বল্পস্থায়ী হইয়াছিল। হরিও রামপালের পুত্র রাজ্যপালের হস্তে বন্দী হইলেন। কৈবর্ত্তপতি ভীম তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতির সহিত একই শাণিত রণকুঠার-দ্বারা নিহত হইলেন। কৈবর্ত্তেরা তিন পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকার গৌড়মণ্ডলের বহুদূরব্যাপক হইয়াছিল। ভাগ্যদোষে তাঁহাদের রাজত্ব "কৈবর্ত্তবিদ্রোহ" নামের কলঙ্ক ললাটে ধারণ করিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহীপালের নিষ্ঠুরতা ও উগ্রশাসনেই যে এই বিদ্রোহিদলের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ভীমরাজকে নিহত করিয়া রামপাল তাঁহার রাজধানী ডমর-নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী কৈবর্ত্তরাজত্বের প্রতি এতটা বিদ্বিষ্ট ছিলেন যে তাঁহাদের রাজধানীকে তিনি 'উপপুর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদি ভীম জয়ী হইতেন, তবে রামপালের কার্য্যটাই "বিদ্রোহ" নামে অভিহিত হইত; জয়ের গৌরব ও পরাজয়ের কলঙ্ক রাষ্ট্র-ইতিহাসে চিরপরিচিত। কৈবর্ত্তগণের ক্ষোভের কারণ নাই। কৈবর্ত্তরাজ ভীমের খুল্ল-পিতামহ দিব্বোক দ্বিতীয় মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া বিজয়োল্লাসে যে স্তম্ভ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও রাজসাহী জেলায় এক দীঘির উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে যে বিশাল মৃৎপ্রাকারের অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়, এবং যাহা "ভীমের জাঙ্গাল" নামে প্রসিদ্ধ তাহা ভীম-কৈবর্ত্ত রামপালের সামন্ত-চক্রের গতিরোধ করিতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রামপালের চরিত্র।

রামপাল দয়ালু ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। ভীমকে বন্দী করিয়া তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে পদোচিত মর্য্যাদা ও আতিথ্য দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু যুদ্ধান্তে কৈবর্ত্তসেনা পরাজয় স্বীকার করিয়াও সেনাপতি হরির নেতৃত্বে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ করাতে তিনি ভীম ও তদীয় সেনাপতির বধাজ্ঞা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সামন্ত রাজারা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ইহাদের জীবিত থাকা তাঁহার সাম্রাজ্য-রক্ষার পক্ষে নিরাপদ্ নহে।

কৈবর্ত্তযুদ্ধে ভীমরাজা কলিঙ্গ অধিপতির সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই রাজার নাম কর্ণ,—"উৎকলেশ-কর্ণকেশরী"। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কেশরীবংশের রাজা ছিলেন। রামপালের সামন্ত-চক্রের অন্যতম প্রধান বীর দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহ উৎকলে অভিযান করিয়া এই রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভীমের গুণাবলী।

শত্রুপক্ষের কবি সন্ধ্যাকর, যিনি কৈবর্ত্তদিগের প্রতি অতি-বিদ্বিষ্ট ছিলেন এবং ভীমকে রাবণের সঙ্গে উপমা দিয়া তাঁহার রাজধানীকে উপপুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তিনিও ভীমের চরিত্রের কতকগুলি গুণের উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। ভীম স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিতের [illegible] জানিতেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন এবং মুক্তহস্তে দান [illegible]

গুণ বুঝাইতে তিনি নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি ব্যবহার করিয়াছেন—"ভীম লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের আবাস" তাঁহাকে পাইয়া "বিশ্ব অতিশয় সম্পৎ লাভ করিয়াছিলেন। সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। এই কৈবর্ত্ত রাজারা শুধু শারীরিক বলে দেশ অধিকার করেন নাই, ইহারা লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন।

ভীমকে জয় করিয়া রামপাল তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের বাসভূমি বরেন্দ্ররাজ্যের অধিকার ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ক্রমে সমস্ত গৌড়মণ্ডল তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল এবং পালবংশের ভাগ্যলক্ষ্মী পুনরায় এই বংশের প্রতি কতকটা সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন।

রামপালের দিগ্বিজয়।

রামপাল সমস্ত মিথিলাদেশ ও বর্ত্তমান বেহার জেলার উত্তরাংশ চম্পারন এবং দ্বারবঙ্গ জেলাদ্বয় অধিকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কামরূপও জয় করিয়াছিলেন। যেহেতু আমরা দেখিতে পাই তাঁহার পুত্র কুমারপাল কামরূপের সিংহাসনে তাঁহার এক অমাত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শেক-শুভোদয়া পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে; এই গল্পটি আমাদের কাছে একেবারে অলীক বলিয়া মনে হয় না, তবে "হলায়ুধ-কৃত" শেক শুভোদয়ায় অনেক গল্প ও উপগল্প আছে, এজন্য খুব জোর করিয়া এই গল্পটির সত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু এইরূপ একটি গল্প সৃষ্টি করিবার কোন কারণ নাই। রামপাল যে নিজে পারিবারিক শোকে নদীর জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। মাতুল মথনদেবের মৃত্যুতে তিনি এতটা শোক পাইয়াছিলেন যে, তজ্জন্যই তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন—সন্ধ্যাকর নন্দী এইরূপ কথা লিখিয়াছেন।

শেক-শুভোদয়ায় লিখিত আছে যে রামপালের পুত্র কোন বণিক্-বধূকে ধর্ষণ করেন। সেই রমণী রাজ-দরবারে অভিযোগ করে। রামপাল স্বীয় তরুণ বয়স্ক পুত্রকে শূলে দেওয়ার দণ্ড প্রদান করেন। এই ঘটনাটি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় আরও একটু বিস্তারিত করিয়া তৎসম্বন্ধে রাজসাহী অঞ্চলে প্রচলিত জনপ্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

যক্ষপালের মৃত্যুদণ্ড।

তিনি লিখিয়াছেন, রামপালদেবের যে পুত্র এইরূপ দুর্ব্যবহার করেন, তাঁহার নাম যক্ষপাল। ধর্ষিতা-রমণী আলুলায়িত-কুন্তলে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া রামপালের সম্মুখে সমস্ত ঘটনা বলিয়া তাঁহার কলঙ্কিত জীবনের আর কোন মূল্য নাই—এইরূপ জানাইয়া বিষ পান করিয়া সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনায় রামপাল ভুলিয়া গেলেন যে তিনি যক্ষপালের পিতা, ভুলিয়া গেলেন যে কুমারের বিবাহিতা স্ত্রী ও স্নেহাতুরা জননীর পক্ষে রাজকুমারের প্রতি উচিত দণ্ড দিলে তাহা অসহ্য হইবে। তিনি তাঁহাকে শূলে দেওয়ার দণ্ড দান করিলেন। তাঁহার মাতা সাশ্রুনেত্রে পুত্রের জীবনভিক্ষা করিলেন, কিন্তু ন্যায়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা কিছুতেই তাঁহার কর্ত্তব্যবিচ্যুত হইলেন না। কুমার যক্ষপালকে শূলে দেওয়া হইল এবং সেই শোকে রাজমহিষী ও রাজবধূ আত্মহত্যা করিলেন। রামপাল স্বয়ং এই শোক সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও নদীগর্ভে তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। শেক-শুভোদয়া-কার লিখিয়াছেন, রামপালের এই কার্য্যের ন্যায়নিষ্ঠার

সমস্ত প্রজা এরূপ কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান্ হইয়াছিল, যে অদ্যাবধি রাজ্যের লোকেরা পুণ্যশ্লোক নৃপতির এই বিস্ময়কর ত্যাগের কথা গান করিয়া থাকে। ("অদ্যাপি তেষাং যশো গীয়তে লোকৈঃ, রামপালো রাজা একমেব পুত্রং অপরাধিনমনপরাধিনং বা শূলেন যোজয়ামাস"—শেক-শুভোদয়া। তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারানাথও লিখিয়াছেন যে, রামপালের যক্ষপাল নামে এক পুত্র ছিল। এই গল্পের বিশ্লেষণ করিতে গেলে হয়ত অনেক ঐতিহাসিক খুঁত বাহির হইতে পারে, কিন্তু মোট ঘটনাটি অসত্য বলিয়া মনে হয় না। এত বড় একটা ঘটনা লইয়া যে পল্লীগীতি রচনা হইয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না।

রামপাল গৌড়রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রমাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। রমাবতী আবুলফজলের আইন আকবরীতে রমৌতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই 'রমৌতি' বা "রমতি" নগরের নাম প্রাচীন বাঙ্গলা ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রমাবতী-নগরী গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে অবস্থিত ছিল। রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের তাম্রশাসনেও রমাবতী নগরী রাজধানীস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। রামপাল এই নগরে "জগদ্দল মহাবিহারের" প্রতিষ্ঠা করেন।

রমৌতি।

রামপালের মৃত্যুর পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপালের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং দ্বিতীয় পুত্র কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে ইঁহার যে সকল গুণের উল্লেখ আছে তাহা পড়িলে মনে হয় কোন দুর্দ্ধর্ষ মহাকাব্য পাঠ করিতেছি। ইনি সমুদ্রের সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে উপমিত হইয়াছেন, কি কি বিষয়ে উপমিত হইয়াছেন,—তাহার তালিকা দিলে এই পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা পূর্ণ হইবে। প্রশস্তিকার এইভাবে উপমার ব্যূহ সাজাইয়া শেষ ছত্রে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না, হইল না,"—একটি বিষয়ের অভাবে সমুদ্রের সহিত কুমারপালের তুলনা চলে না—সুতরাং তাঁহাকে সমুদ্রের সহিত উপমা দেওয়া উচিত নহে। সমুদ্র রামের সেতুর দ্বারা লঙ্ঘিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কুমারপালকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, অর্থাৎ তিনি কোন শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হন নাই। একথা ঠিক কিনা তাহা বিচার্য্য। রামপালের পর পালরাজগণের ঘর পড়ন্ত, তখন কি তিনি নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভ করিয়া খুব শান্তিতে ছিলেন? এই সকল তাম্রপটের পাণ্ডিত্য আমাদিগকে "গৌড়ীয়-রীতি" কি পদার্থ তাহা বারংবার স্মরণ করাইয়া দেয়।

পরবর্ত্তী পালরাজগণ; তাম্রপটে কুমারপালের প্রশংসা।

একথা ঠিক যে যখন কামরূপের রাজা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কুমারপাল তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও অমাত্য বৈদ্যদেবকে বিদ্রোহ-নিবারণের জন্য প্রেরণ করেন। বৈদ্যদেব আসন্ত বিক্রমে কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং কুমারপাল এই সংবাদে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বৈদ্যদেবকে কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের সময়েও কুমারপাল সেনানায়ক হইয়া বীর অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

বৈদ্যদেবকৃত আসাম-জয়।

কুমারপালের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মদনপাল রামপালের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, ইনি রাজ্ঞী মদনদেবীর গর্ভজাত। মদনপালের বাড়ীর নাম ছিল "চিত্রমতিকা"। ইনি ব্যাসদেবের সমগ্র মহাভারতের পাঠ শুনিয়াছিলেন এবং পাঠক বটেশ্বর স্বামী শর্ম্মাকে একটি গ্রাম পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। মদনপাল রাজা হইবার আটবৎসর পরে এই দান সম্পাদিত হইয়াছিল। মদনপাল সম্ভবতঃ এই সময়েই সেনবংশের আদিরাজগণের কাহারও দ্বারা মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তিনি কাণ্যকুব্জের রাজার সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় গোপাল, নামে মাত্র রাজা হইয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই পালবংশের রাজত্বের উপর শেষ যবনিকাপাত হয়। যে বংশ প্রায় পাঁচ শত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের রাজত্বকালে বাঙ্গলা দেশ শৌর্য্য, বীর্য্য, শিল্প-কলা, স্থাপত্য, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই অমরকীর্ত্তি ও সম্পদ্-ভূষিত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই বংশের শেষ দীপ নিবিয়া গেল। তৃতীয় গোপালের পর পালবংশের বংশধর আর দুই এক জনের নাম জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন—"এই বংশের গোবিন্দপাল নামক এক রাজা ১১৭৫ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। পালেরা বঙ্গের গৌরব অশেষরূপে বাড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন কানোজাধিপতিকে পরাভূত করিয়া স্বীয় সামন্তকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, অপর এক জন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজবংশ উচ্ছেদ করিয়া স্বীয় আশ্রিত বন্ধুকে তথাকার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইঙ্গিতে এই ভাবে নূতন রাজবংশ সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তাঁহাদের প্রতাপ যে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র স্বীকৃত ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইঁহারাই বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর (উদ্দণ্ডপুর) এবং জগদ্দল বিহারের স্থাপয়িতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মদনপাল।

তৃতীয় গোপাল ও ইন্দ্রদ্যুম্নপাল।

মুসলমানবিজয়ের সময়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন পাল নামক এই বংশের এক রাজা মগধের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। মুঙ্গের জেলায় ইন্দ্রদ্যুম্নের কতকগুলি ভগ্ন দুর্গের অবশেষ এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে। লামা তারানাথ পাল রাজগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাম্রশাসন ও শিলালিপিলিখিত রাজগণের মিল নাই। কিন্তু তারানাথ এবং বৃন্দাবন দাস যে সকল পালরাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন তাম্র বা স্তম্ভলিপি না পাওয়া গেলেও তাঁহাদের অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। হয়ত কোন রাজা তাম্রশাসন প্রচার করেন নাই। বহুসংখ্যক শিলালিপি যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অনেকই লুপ্ত হইয়াছে, অল্পমাত্র আছে। এই বিশাল পালবংশের শাখাপ্রশাখায় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নৃপতি ছিলেন; একথা সত্য যে জনপ্রবাদের প্রমাণ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা সরাসরি অগ্রাহ্য করা যায় না। তারানাথের তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

তারানাথের তালিকা।

১। গোপাল—৬৬০—৭০৫ খৃঃ
২। দেবপাল—৭০৫—৭৫৩ খৃঃ
৩। বসুপাল—৭৫৩—৭৬৫ খৃঃ
৪। ধর্ম্মপাল—৭৬৫—৮২৯ খৃঃ
৫। মধুরক্ষিত—৮২৯—৮৩৭ খৃঃ
৬। বাণপাল—৮৩৭—৮৪৭ খৃঃ
৭। মহীপাল—৮৪৭—৮৯৯ খৃঃ
৮। মহাপাল—৮৯৯—৯৪০ খৃঃ
৯। সামুপাল—৯৪০—৯৫২ খৃঃ
১০। শ্রেষ্ঠপাল—৯৫২—৯৫৫ খৃঃ
১১। শবক—৯৫৫—৯৮৩ খৃঃ
১২। ভারাপাল—৯৮৩—১০১৫ খৃঃ
১৩। জয়পাল—১০১৫—১০৫০ খৃঃ
১৪। তাম্রপাল—১০৫০—১০৬৩ খৃঃ
১৫। হস্তিপাল—১০৬৩—১০৭৮ খৃঃ
১৬। শান্তিপাল—১০৭৮—১০৯২ খৃঃ
১৭। রামপাল—১০৯২—১১৩৮ খৃঃ
১৮। যক্ষপাল—১১৩৮—১১৩৯ খৃঃ

কোন কোন স্থানে রাজগণের একাধিক নাম ছিল। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে একরূপ নামে চিনিত, কিন্তু তাম্রশাসন ও রাজকীয় দলিলে তাঁহাদের নাম অন্যবিধ হইত। আবার কোথাও রাজার নানা পুত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজ্য শাসন করিতেন, তাম্রশাসনে শুধু এক শাখার বংশাবলী উল্লিখিত হইত, অন্যান্য ধারার কোন উল্লেখ দেখা যাইত না। এই সকল নানা কারণে বংশাবলীর এই রূপ অনৈক্য ঘটিয়া থাকিবে। পালবংশের মূলশাখার বহু উপশাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীও পূর্ব্বাগত সংস্কার ও লোক-সৌজন্যবশতঃ রাজা নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেও তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকিবে। ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাসোক্ত ভোগীপাল ও যোগীপাল সম্বন্ধে পল্লীগীত প্রচলিত ছিল, লেখক মহীপালের সঙ্গে ইঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তারিখসম্বন্ধে তারানাথের ভুলগুলি স্পষ্ট। ইহা ছাড়া ঢাকা জেলার ভাওয়ালের জঙ্গলে যে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ "শিশুপালের বাড়ী" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং জনসাধারণ যাহাকে মহাভারতোক্ত চেদিরাজের প্রাসাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে, তিনিও খুব সম্ভব পালবংশের কেহ হইবেন। অনেক স্থলেই সামান্য সামান্য ভূখণ্ডের অধিপতি রাজপুত্রেরাও রাজতালিকায় হয়ত স্থান পাইয়াছেন। কথিত আছে, পালবংশে ৫২জন রাজা ছিলেন।

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালরাজত্বের নানাকথা, বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ

"এ পয়ঃ-পারে, কত কত জাতীয় ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য, রচি ঘর কত পরিপাটী ও॥
কত শত দুর্জ্জয় দুর্গম দুর্গে, বেড়িল তব তটদেশ ও।
নগরে প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে চির-যুগ-সম্ভোগ আশে ও॥
উপহসি সর্ব্বে মানব-গর্ব্বে, কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঞ্জে রাখিল করি বিকলাকৃতি ও॥
ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে, গৃহবর শেষ শরীরে ও।
দেখিছি যে সব উজ্জ্বল লেখা, সে গত-যৌবন-রেখা ও॥"

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

পাল রাজাদের অধিকারকালে বঙ্গদেশ যে সকল প্রাদেশিক ও বিদেশী ক্ষুদ্র ও বড় রাজাদের সংস্রবে আসিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিব।

১। বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ণচন্দ্র আধুনিক রোটাস্-নগরের রাজা ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা সুবর্ণচন্দ্র বিক্রমপুর অঞ্চলের রাজা হন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থলের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র তৎপরে সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ মাণিকচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ।

শ্রীচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিলে ইনি পৈত্রিক অধিকারসূত্রে বিক্রমপুরের কতকাংশের মালিক হইয়া গৌড়ের এক বিস্তৃত জমিদারী মিরাশ স্বরূপ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি মিহিরকুলের (ত্রিপুরা) রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা ময়নামতীর পাণিগ্রহণ করিয়া ত্রিপুরদেশের এক বিস্তৃত অংশের অধিকারী হন। তাঁহার রাজধানী ছিল পটিকায়,—আধুনিক পাটিকারাতে। এখনও তথায় মাণিকচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৪ ইঞ্চি পরিমিত একখানি উমামহেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, উহা এখন আমার নিকট আছে। মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী পরমসুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। কথিত আছে রাজা প্রৌঢ় বয়সে অপর কয়েকজন রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে একজন সুন্দরী ও তরুণী ছিলেন। সেই নব বিবাহিতা ষোড়শীর রূপে মুগ্ধ হইয়া

তিনি ময়নামতীকে তাড়াইয়া দেন, যেহেতু পাটরাণীর সঙ্গে এই নূতন স্ত্রীর সর্ব্বদা ঝগড়া হইত। ময়নামতী অতি অল্প বয়সে ভারতবিখ্যাতকীর্ত্তি মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিষ্যা হন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ১৯ বৎসর বয়সে রাজকুমারের রিষ্ট ছিল এবং যদি দ্বাদশ বর্ষ তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দেশত্যাগী হন, তবেই এই রিষ্ট কাটিয়া যাইতে পারে—দৈবজ্ঞগণ গণিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। রাজার মৃত্যুর পর রাজ্ঞীই ছিলেন দেশের শাসনকর্ত্রী, কিন্তু যখন কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখনই রাজ্ঞীর আদেশে তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিতে হয়, এই উপলক্ষে একদল লোক ময়নামতীর বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা প্রচার করেন। তিনি এবং হাড়িসিদ্ধা উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে সমস্ত রাজ্য উপভোগ করিবার ইচ্ছায় নাকি রাণী তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক একমাত্র পুত্রকে দ্বাদশবৎসরের জন্য বনে পাঠাইয়াছিলেন। গোপীচন্দ্রের স্ত্রী অদুনা তারস্বরে রাণীর এই অপবাদ ঘোষণা করিয়া শাশুড়ীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—পল্লীগীতিকায় এই সকল কথা দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল।

এখন ঐতিহাসিকগণের অনেকে এই গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে রাজেন্দ্রচোলের শিলা-লিপির বঙ্গাধিপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অল্পবয়সে সন্ন্যাসগ্রহণে দেশময় যে শোকের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা লইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বোম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত দেশগুলিই পল্লীগীতি রচনা করিয়াছিল। ত্রিপুর জেলা ও উড়িষ্যায় এখনও "বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র" গানের ছড়া প্রাচীন লোকদের মুখে শোনা যায়। গোপীচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র নামের রূপান্তর, দুর্লভ মল্লিক কৃত পল্লীগাথায় তাহা উল্লিখিত আছে। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অনেকটা জুড়িয়া রাজ্যশাসন করিতেন, ত্রিপুরমণ্ডলের পার্ব্বত্যপ্রদেশের এক বিস্তৃত অংশ তিনি তাঁহার মাতামহ হইতে প্রাপ্ত হন। গৌড়ের কতকাংশ তিনি মিরাশ লইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিতান্ত নগণ্য রাজা ছিলেন না। গোরক্ষনাথের শিষ্য হওয়ার দরুন তাঁহার এই ত্যাগ পিতৃসত্যপালনকারী রামের নির্ব্বাসনের মতই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, যেহেতু গোরক্ষশিষ্য নাথ-সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই পল্লীগাথা সর্ব্বত্র গান করিয়া বেড়াইতেন। সেদিন পর্য্যন্তও বোম্বাই সহরে "বঙ্গাধিপ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" অভ্রভ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত, এবং রাজা রবিবর্ম্মা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের একটি চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন; ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঘরে ঘরে বঙ্গাধিপের এই ত্যাগের মূর্ত্তি আদৃত হইয়াছে।

গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ-চন্দ্রের সন্ন্যাস।

গোবিন্দচন্দ্র সাভারের হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা-পদুনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিদায়কালে অদুনার বিলাপ করুণরসের নির্ঝরস্বরূপ। তদপেক্ষাও করুণরসাত্মক দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ অন্তে স্বামি-স্ত্রীর মিলনের দৃশ্য। দ্বাদশ বৎসর পর গোবিন্দচন্দ্র ফিরে ফিরিয়াছেন; ১৯ বৎসরে সন্ন্যাস অবলম্বন, ৩১ বৎসরে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন। তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি ধূলিধূসর, শিরোময় দীর্ঘ জটাজূট, অনশনে [illegible]

তিনি প্রিয়দর্শন ও অপরূপশ্রীসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার সেই রূপ—সেই সৌন্দর্য্য আর নাই। তিনি রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে প্রহরীরা বাধা দিল, কিন্তু সন্ন্যাসীর উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইল না। রাজ্ঞী অদুনা রাজহস্তিদ্বারা উঁহাকে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন,—রাজহস্তী স্বীয় প্রভুকে চিনিতে পারিয়া হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া পড়িল, তাহার দুইচক্ষু হইতে অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রাজ্ঞী ভীমদর্শন রাজকীয় শিকারী কুকুর লেলিয়া দিলেন, ঘোর চীৎকার ও আস্ফালন করিয়া কুকুর যাইয়া সন্ন্যাসীর মুখ দেখা মাত্র তাঁহার পদলেহন করিতে লাগিল। তখন অশ্রুসিক্ত মুখে রাজ্ঞী বলিলেন, "বনের পশুরাও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" এই সকল কাব্যকথা পল্লীকথাকে সরস করিয়াছে, ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি জানি না।

এগুলি হয়ত সত্যই কাব্য-কথা; কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণ ঐতিহাসিক সত্য, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

রাজেন্দ্রচোলের সঙ্গে ইহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, পল্লীগাথায় তাহার ইঙ্গিত আছে। রঙ্গপুর অঞ্চল হইতে নীলকামরি সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে গীতিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—উড়িষ্যার দক্ষিণ দিক্ হইতে এক রাজা বঙ্গে আসিয়া ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া তাঁহার কন্যা গোবিন্দচন্দ্রকে সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করেন। এই দক্ষিণ-উড়িষ্যা হইতে আগত রাজাই সম্ভবতঃ রাজেন্দ্রচোল। তিরুমলয় শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে—গোবিন্দচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হাতীর পীঠে চড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলেন, এই রাজা যে পরাস্ত হইয়াছিলেন কিংবা আদৌ কোন যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। যাহা হউক অতি অল্প দূর অগ্রসর হওয়ার পরেই রাজেন্দ্রচোলকে সন্ধি করিতে হইয়াছিল। সুতরাং দুই দিক্ হইতেই এই ঘটনাটি দুইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজাদের স্তাবক কবিদের কথার কতকটা বাদ দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। রাখালদাসবাবু লিখিয়াছেন, "শ্রীচন্দ্রের বংশধরগণ পরে পালরাজগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন পরবর্ত্তী রাজা রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক।" রাখালদাসবাবু তাম্রশাসন ও শিলালিপির কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিতেন, তদ্বিরুদ্ধে যদি সুদীর্ঘকালের কোন জন-প্রবাদ বা গাথা থাকে, তাহার উল্লেখ করাটাও ঐতিহাসিক অঙ্গহানি বলিয়া মনে করিতেন। ইহাও এক প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। চোলরাজ রাজেন্দ্রের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে লিখিত আছে—"তিনি কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাদুকা এবং বলয়বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার অদ্ভুত বলসম্পন্ন হস্তিসমূহ এবং রত্নোপম রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গলাদেশে যেখানে ঝড়বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই সেখানে গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন।"

রাজেন্দ্রচোল—১০২৫ খৃঃ।

ত্রিপুরার ইতিহাসে আমরা কোন কোন স্থানে দুই পক্ষের স্তাবক-কবিকৃত ঘটনার দুইরূপ বিবরণ পাইয়াছি। শ্রীকরণ নন্দী-কৃত ছুটি খাঁর বিজয়-কাহিনী ও রাজমালার ধন্য মাণিক্যের রাজত্বের বিবরণ দ্রষ্টব্য। রাজেন্দ্রচোলের অপর নাম ছিল "পরকেশরী বর্ম্মা" এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত শিলালিপি তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ অব্দে (১০২৫ খৃঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ময়নামতীর গানে ও গোরক্ষবিজয়ে যে সকল প্রসিদ্ধ নাথ-যোগীদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের অনেকেই ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে ১৩২৮ বাং সনের পৌষমাসের 'ইতিহাস ও আলোচনা' পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ. মহাশয় যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন :—

(১) শালবান্ রাজার পুত্র "গাভুর সিদ্ধাই" ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়বাসী ছিলেন। কুমিল্লা হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে 'সালবানপুর' গ্রাম ও তথায় "শালবানের দীঘি" এখনও বিদ্যমান। ঐ গ্রামে শালবানের প্রাচীর-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই বাসভবন শালবান্ ও হাড়িপা সিদ্ধার বাড়ী বলিয়া জনশ্রুতি আছে। যে চৌরঙ্গী এখন জগদ্বিখ্যাত, তাহা যাঁহার নাম বহন করিতেছে, সেই নাথ-যোগী চৌরঙ্গীও এই শালবান্‌পুরে বাস করিতেন, তাহা একখানি প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। "ব্রহ্ম-যোগী" নামক পুঁথিতে ৮৪ সিদ্ধার অন্যতম প্রধান সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথ যে শালবান্ নগরে যাতায়াত করিতেন, তাহা লিখিত আছে, "জেন মতে চৌরঙ্গী গেল শালবান নগরে।" গাভুর সিদ্ধা যে শালবানের পুত্র তাহা গোরক্ষবিজয়েই পাওয়া যায়, "তথাপিহ হই আমি সালবানের বেটা" (২১ পৃষ্ঠা)।

ত্রিপুরা নাথ-যোগীদের অন্যতম প্রধানকেন্দ্র।

(২) ময়নামতীর সম্বন্ধে ত্রিপুরার পর্ব্বতে নানা প্রবাদ আছে—একটি পাহাড়ের নামই "ময়নামতীর পাহাড়"। ময়নামতীর শৃঙ্গে একটি সুড়ঙ্গ আছে, জনশ্রুতি ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধা অদৃশ্য হইয়া যান, ঐ সুড়ঙ্গের পার্শ্বে ত্রিপুরেশ্বরের একটি সুরম্য "বাঙ্গালা" আছে। সম্প্রতি সুড়ঙ্গটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩) মীননাথ যে "কদলীর দেশে" ("উত্তরে মিনাই") উত্তর দিকে গিয়াছিলেন, মীনচেতনে ও গোরক্ষবিজয়ে সেই স্থান সম্বন্ধে 'সিদ্ধাই' শব্দটি দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার উত্তরে শ্রীহট্টের নিকট 'সিদ্ধাই' গ্রাম এখনও আছে এবং তথায় যোগিগুরুর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে; গোরক্ষবিজয়ে এই প্রসঙ্গে যে 'মেথলী কাঁথার' উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা মণিপুরীরা এখনও প্রস্তুত করিয়া থাকে।

আমি মাণিকচন্দ্র রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উমা-মহেশ্বরের প্রস্তরমূর্ত্তির কথা লিখিয়াছি। এই মূর্ত্তি শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় আমাকে দিয়াছেন, আমার মনে হয় বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র যে উমা-মহেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, তাহার আদি-ইতিহাস নাথযোগীদের সঙ্গে জড়িত।

শীতলবাবুর সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষের একটী প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নাথ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল—ত্রিপুরা জেলা ও শ্রীহট্টের উপান্ত দেশ।

চন্দ্র রাজাদের যে বংশলতা পাওয়া যাইতেছে, তাহা এইরূপ :—

চন্দ্ররাজগণ।

পূর্ণচন্দ্র—ইনি বহু জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং অনেক দেববিগ্রহের পাদপীঠে ইহার নাম উৎকীর্ণ ছিল।
|
সুবর্ণচন্দ্র—সম্ভবতঃ নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার ইঁহার দ্বারা স্থাপিত।
|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র—ইনি চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন এবং হরিকেলে (পূর্ব্ববঙ্গ) বিজয়ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন।
|
শ্রীচন্দ্র
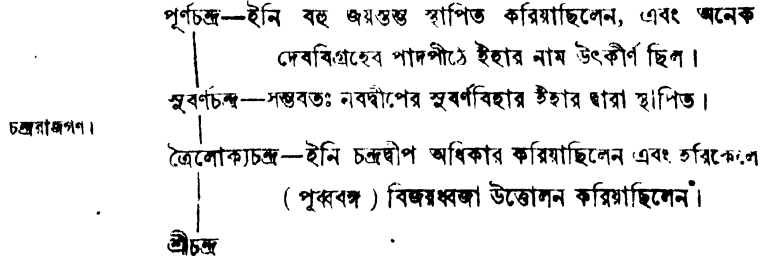
শ্রীচন্দ্রের দুইখানি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একখানি অসম্পূর্ণ। কেহ কেহ অনুমান করেন—বংশাবলী উৎকীর্ণ হওয়ার পর কোন দুর্ঘটনাবশতঃ হয়ত তাম্রশাসন তদবস্থায় রহিয়া গিয়াছে, বাকীটুকু পূর্ণ করিবার সুবিধা হয় নাই। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন, রাজভাণ্ডারে বংশাবলীর অংশ অনেক তাম্রপটেই উৎকীর্ণ হইয়া প্রস্তুত থাকিত, কাহাকেও দানপত্র দেওয়ার সময়ে বাকী অংশ উৎকীর্ণ হইত, এই তাম্রলেখটি ঐরূপ একখানি। তাম্রলিপির অক্ষর দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমের বলিয়া অনুমিত হয়।

ঢাকা জেলার সাভার হইতে যে শিলালিপির প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহার পাঠ 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা অপর এক রাজবংশের নাম ও বিবরণ পাইতেছি। ঢাকার আট মাইল উত্তরে সাভার গ্রামে একটা বড় জঙ্গলে ধলেশ্বরী নদীর তীরে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জঙ্গল হইতে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি এবং নানারূপ কারুকার্য্যসম্বলিত ইষ্টক ও প্রস্তরাদি পাওয়া গিয়াছে। সাভারের একটা মঠের নিম্নে যে শিলালিপি ক্ষোদিত ছিল তাহার মূল সংস্কৃত, ঢাকা রিভিউ, ১৯২০-২১ সনের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাহার প্রতিলিপি পাদটীকায় দেওয়া হইল। পরপৃষ্ঠায় অনুবাদটি মুদ্রিত হইল। *

নম সুগতায়

যে জাতো বীরবর মহি তাদিন্দু বংশৌষধেশাৎ
বীমন্তো বীরবরঃ মুকুটাৎ ভীমসেনাম্ন্ পেন্দ্রাৎ।
লোকত্যে বৈর্দশবল গেতম্নাধ্বিরাক্ষঃ সংগেহাং
আরাতিম্যাত্রিবন মশিতে ভাবনীনে প্রদেশে ॥ (১)।
যাবতী ব্রহ্মাযুত প্রবিষ্টং
[illegible] রাজং স চ ভাবনীনং।

"নম সুগতায়

(১) গ্রহরাজ চন্দ্রবংশজাত, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা ভীমসেন, যিনি অটুট ধৈর্য্য ও সংযমের প্রতীক ছিলেন, তাঁহার পুত্র ধীমন্ত সেন দশবল (বুদ্ধ) দেবের উপাসক ছিলেন, এজন্য ভ্রাতৃবর্গের সহিত ইঁহার মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও অরণ্যপূর্ণ ভাবলীন দেশে উপনীত হন।

"এই ধীমন্ত সেন তাঁহার অধীন যোদ্ধৃবর্গ ও সেনাপতিদের সাহায্যে গঙ্গার দক্ষিণ দিকে বংশবাটী (অধুনা বংশাই) ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভাবলীন প্রদেশে দুর্জ্জয় কিরাতদিগকে জয় করিয়া সেই দেশ অধিকার করেন।

মহেন্দ্রের শিলালেখ।

"ধীমন্ত সেনের পুত্র রণধীর সেন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বিজয়ী মহাবীর ছিলেন, তিনি হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়া সম্ভার নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

ধীমন্তসেনঃ সহসৈন্যযোধৈ-
রাক্রামতি স্ম প্রবলাৎ কিরাতাৎ॥ (২)।
ধীমন্তপুত্রো রণধীরসেনঃ
সংগ্রামজেতা ইব কার্ত্তিকেয়ঃ।
হিমালয়ব্যাপ্ত দেশান্‌বিজিত্য
সম্ভারপুর্য্যামবসৎ প্রবীরঃ॥ (৩)।
হরিশ্চন্দ্রো মহারাজঃ রণধীরস্য পুত্রকঃ
ধর্ম্মেশ ইব ধর্ম্মাত্মা ধনাঢ্যঃ কুবেরাধিকঃ। (৪)।
নৃপেন্দ্রবংশমার্ত্তণ্ড হরিশ্চন্দ্র ইবাভবৎ।
প্রশস্তিলোকান সর্ব্বান্ সঃ অথবা ইব রাঘবঃ। (৫)।
যমলাত্রাসিমী তীরে বৌদ্ধাকমঠমন্দিরে
বিজনে চ স রাজর্ষি ধর্ম্মার্থং স্মাবতিষ্ঠতে। (৬)
ভিমকুলে চেন্দ্রজিমঃ শশাঙ্কঃ
সমুজ্জ্বলঃ কিম্বিব পূর্ণচন্দ্রঃ।
রাজর্ষিণা কণ্টক-শাখিশৈলা
সুবাসিতা বৈ যমলাত্রি জেন॥ (৭)।

হরিশ্চন্দ্রস্য পুত্রেণ মহেন্দ্রেণ মীমাকাত্রিস্থিতো দত্তঃ স্বর্পর্ণং বৈ মহেশ্বরং
প্রণম্য স্বগতং যেব রচিতা শাসনী মন্না কবীন্দ্র শিবদেবেন ভিষগ্‌মাধবসূনুনা।

শকাব্দাঃ—(অস্পষ্ট) *

* মিঃ ট্রোপলটন ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় যে আমাকে এই প্রশস্তির যে প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেন আমি তাহাই প্রকাশ করিলাম। ইহাতে অনেক ভুল ও পাঠোদ্ধারের গোলমাল আছে।

"রণধীর সেনের পুত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের ন্যায়ই ধর্ম্মাত্মা ও কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন।

"তিনি ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া প্রজাদিগকে শাসন করিতেন এবং সূর্য্যবংশ-প্রদীপ হরিশ্চন্দ্রের মতই প্রতাপশালী ছিলেন।

"স্বভাবতঃ চন্দ্র কলঙ্ক বহন করে কিন্তু ইনি ভিষক্‌কুলের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র। এই রাজর্ষি যমুনার (যমলত্রাসিনী ?) তীরে নির্জ্জন বৌদ্ধমূর্ত্তিশোভিত মঠ-মন্দিরে বাস করিতেন।

"হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রাজর্ষি মহেন্দ্র,—যিনি এই কণ্টকাকীর্ণ পার্ব্বত্য জঙ্গল চন্দনতরু নিষেবিত করিয়াছিলেন,—তিনি এই মঠ মীনাঙ্কাদ্রিস্থিত শকে শিবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

"ভিষক্ মাধবের পুত্র কবীন্দ্র শিবদাস সুগতকে প্রণামপূর্ব্বক এই শ্লোকমালা রচনা করিলেন। শকাব্দা (অস্পষ্ট)।"

এখন "মীনাঙ্কাদ্রি"র অর্থ :—মীন=১২, অঙ্ক=৯, অদ্রি=৭,=১২৯৭ শক ("সপ্ত-কুলাচল")=১৩৭৫ খৃঃ অব্দ। সর্ব্বদাই যে অঙ্ক বাম দিক্ হইতে পড়িতে হইবে, এমন নয়। অঙ্কের সোজাসুজি পাঠ আমরা অনেক স্থানে পাইয়াছি, যথা ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে "সনে রুদ্র চৌতিশা" (রুদ্র ১১+৩৪=১১৩৪ বাং সন), খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গলে —"ভুবনশকে বায়ুমাসে শরের বাহন, খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন" (১৪ ভুবন ৪৯ বায়ু=১৪৪৯ শক, শরের বাহন মাস ধনু অর্থাৎ পৌষ মাস), জয়নারায়ণকৃত কাশীখণ্ডে "মিত্র শতচৌদ্দ শক"=১৪১৪ শক, গোপালভট্ট-প্রণীত বল্লাল-চরিতে "অব্দরাজজ মানে বসুভির্বাহণরষিকশাকেষু"=১০১৩ শক, আনন্দভট্টের বল্লাল-জীবনীতে "শাকে চতুর্দ্দশশতে মনুষ্যরদনযুতে" (মনুষ্যদন্ত=৩২)=১৪৩২ শক, ঐ পুস্তকের অন্যত্র "সহস্রেহষ্ট বিংশযুতে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাভাগং উৎপপাতঃ দিবং প্রতি"=১০২৮ শক। বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই যে মীন অর্থ সর্ব্বদা এক হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। জ্যোতিষিক গণনায় মীন অর্থ ১২। আমরা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "মীন অর্থ কখনই 'এক' বলিয়া ধরা হয় না, সর্ব্বদাই উহার অর্থ ১২।" যাঁহারা মীন অর্থ এক ধরিয়া এবং অঙ্কের বামা গতি স্বীকার করিয়া এই শ্লোকের অর্থ ৭৯১ অর্থাৎ ৮৬৯ খৃঃ অব্দ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,* তাঁহাদের এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে ঐ প্রশস্তি নবম শতাব্দীর হইলে উহার আবিষ্কারক বৃদ্ধ পণ্ডিত ৺অমৃতানন্দ গুপ্ত কখনই উহার পাঠ উদ্ধার করিতে পারিতেন না।

ইহা নিশ্চিত যে বৌদ্ধপ্রভাব তখনও দেশে যথেষ্ট ছিল। এদিকে বল্লাল সেন উদীয়মান ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন; ভীমসেনের পুত্রগণের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কলহ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। প্রশস্তিতে হরিশ্চন্দ্র ও মহেন্দ্র উভয়েই রাজর্ষিপদবাচ্য

* ষ্টেপল্টন সাহেব এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

হইয়াছেন। এমন অবস্থায় ইহাদের ৫ পুরুষ বিশ্বরূপ সেনের পুত্র ভীমসেনের সময় হইতে গণনা করিলে যে কোনরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে না, তাহা পরে লিখিব।

শোনা যায় সাভারের নিকটবর্ত্তী মাহিষ্য ও কৈবর্ত্তজাতীয় লোকেরা কেহ কেহ হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের কথা নাই, ইহা হইলেও হইতে পারে। যেহেতু সমাজ-বহির্ভূত উচ্চকুলসম্ভূত এই বংশ অবশেষে নিম্নতর জাতিদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

যাঁহারা বলেন, একটি প্রাচীন প্রস্তরলেখ বহুপূর্ব্বে কতকাংশে রূপান্তরিত করিয়া এই অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাঁহাদের কোন যুক্তিই বিচারসহ নহে। ভিষক্ শিবদাস দেবকে কেনই বা গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা হইবে? জাতিচ্যুত বৌদ্ধরাজাকে দাবী করিতে কোন উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুর সেকালে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। যাঁহাদের কাছে এই শিলালিপির প্রতিলিপি ছিল, তাঁহারা ইহা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। র‍্যাঙ্কিন ও ষ্টেপলটন্ সাহেব দৈবক্রমে ইহার সন্ধান পাইয়া বহুকালের চেষ্টার ফলে ইহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অমৃতানন্দ কবিরাজ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রতিলিপি লিখিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ লেখাও স্পষ্টতঃই তিনি সহজে পড়িতে পারেন নাই। এজন্য তিনি স্বয়ং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হইলেও শিলালিপিতে এরূপ অসাধু সংস্কৃত দেখা যায়। ভারতের নানাস্থানের শিলালিপিতে ভুল সংস্কৃতের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। হরিশ্চন্দ্র রাজর্ষি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তিনি শেষ বয়সে নদীতীরে বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরে বাস করিতেন। বিজয় সেনের সম্বন্ধেও ঐরূপ বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনের কথা তাম্রশাসনে পাওয়া যাইতেছে। পার্থক্য এই যে বিজয় সেন হোম-ধূম-পবিত্র গঙ্গার উপকূলে ঋষির আশ্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ রাজা, তাঁহার ধর্ম্মে যজ্ঞাগ্নির প্রীতি নাই—তিনি ভিক্ষুর আশ্রমে ও মঠে বিচরণ করিতেন।

হাইকোর্টের এ্যাড্ভোকেট এবং ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনের খুল্লতাত পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন, বি. এল., গীতাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি দুর্জ্জয়দাস কৃত বৈদ্যকুল-পঞ্জী প্রকাশ করিতেছেন; এই পঞ্জীর কথা ষোড়শ শতাব্দীতে ভরতমল্লিক তাঁহার চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা নামক দুই প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন উহার একখানি অতি জীর্ণ কাপি পাইয়াছিলেন, সেই কীটদষ্ট বহু প্রাচীন পুঁথিখানি বর্দ্ধমান কো-গ্রামের কোন একটি মল্লিক পরিবারের জনৈক বিধবার নিকট ছিল, উহা এখনও আছে কি না জানি না। বিধবা যক্ষীর ন্যায় সতর্ক ভাবে পুঁথিখানি রক্ষা করিতেন, কাহাকেও ছাড়িয়া দিতেন না। দুর্জ্জয় দাস বিশ্বরূপ সেনের পৌত্র কার্ত্তিক সেনের সমসাময়িক ছিলেন।

কার্ত্তিক সেনের পিতা ভীম সেন। দুর্জ্জয় দাসের অব্যবহিত পরেই মধ্যদেশবাসী শক্তি গোত্রীয় জয়সেন বিশ্বাস তাঁহার "সবৈদ্য-কুল-চন্দ্রিকা" রচনা করেন। দুর্জ্জয় দাস তাঁহার পূর্ববর্ত্তী বহু বৈদ্য-পঞ্জিকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের কোনটিই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ক্ষুদ্র ৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপক কুল-গ্রন্থখানি এবং জয়সেন বিশ্বাসের "সবৈদ্য-

কুল-চন্দ্রিকা” এই দুই পুস্তকই এখন বৈদ্য-গণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কুল-গ্রন্থ। শেষোক্ত পুস্তক ১২২৭ শকে (১৩০৫ খৃঃ) রচিত হয়। সদ্বৈদ্য-কুল-চন্দ্রিকা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, মহারাজ ভীম সেন ১১৫৮ হইতে ১১৯৬ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন (১২৩৬-১২৭৪ খৃঃ)। ইনি বল্লালের প্রপৌত্র। গ্রন্থকর্ত্তা জয়সেনের কন্যা কমলা দেবীকে ভীম সেনের পুত্র কার্ত্তিক সেন বিবাহ করেন। সুতরাং সেনরাজত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকিবার কথা।

আমরা স্থানান্তরে “সদ্বৈদ্য-কুল-চন্দ্রিকা” হইতে আর অনেক কথা উদ্ধৃত করিব। কুলশাস্ত্র নানা প্রতারকের হাতে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইয়াছে। দুর্জ্জয় দাস ও জয় সেন বিশ্বাস যে দুইখানি কুল-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, খুব প্রাচীন পুঁথি না পাওয়া পর্য্যন্ত,—উক্ত পুস্তক দ্বয়ের সকল অংশ আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। এই দুইখানি পুস্তকই গীতাচার্য্য মহাশয় শীঘ্র প্রকাশ করিবেন, তখন সুধীগণ ইহাদের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবেন; আমি তজ্জন্য প্রস্তুত হই নাই।

কুলজী অনুসারে, মহারাজ ভীম সেন ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে আমরা সাভারের শিলালিপিতে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র মহেন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণের তারিখ ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দ পাইলাম। মহেন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এদিকে ভীমসেনের জন্মতারিখ পাওয়া যায় নাই,—তাহা দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে হইতে পারে। ভীম হইতে মহেন্দ্র পঞ্চম পুরুষ, সুতরাং বল্লাল প্রপৌত্র ভীমসেন এবং সাভারের লিপি-কথিত ভীমসেন একব্যক্তি হইতে পারেন। বল্লালের তারিখ সম্বন্ধে অনেক মতান্তর আছে। গোপাল ভট্ট রচিত বল্লালচরিতে “রাজবল্লভ” বলিয়া যে ভীমসেন উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনিও এই ব্যক্তি কি না বলা যায় না। তাহাতে দ্বিধার কারণ এই উহা বিশ্বাস করিতে হইলে ভীমসেনের বয়ঃক্রম অপরিমিতরূপ বেশী হইয়া পড়ে।

এই সকল তারিখ সম্বন্ধে হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ অনেক সময়েই অবিশ্বাস্য। যখন তারিখটি গ্রন্থকার অঙ্কের অক্ষরে প্রদান করেন, তখন অনেক সময়েই নকলকারীর ভ্রমে তাহা অন্যরূপ হইয়া যায়। সাঙ্কেতিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও সেই সকল শব্দের প্রায়ই নানারূপ অর্থ করা হয়। সুতরাং এ বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া মোটামুটি আমরা জয়সেন বিশ্বাসোক্ত ভীমসেন এবং সাভারের লিপির ভীমসেন এক ব্যক্তি কি না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি।

ষ্টেপলটন সাহেব ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় সেন রাজগণের সঙ্গে সাভারের রাজ-পরিবারের সংস্রব অনুমান করিয়া প্রথমতঃ লিপিটি কতকটা দ্বিধার সহিত খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—তারপর সে মতের পরিবর্ত্তন করিলেন। শিলালিপির প্রামাণ্য তাঁহারা স্বীকার করিতে এখন কুণ্ঠিত। এতৎ সম্বন্ধে আমার সুদীর্ঘ পত্রের জবাব দিতে না পারিয়া সেই চিঠির মাত্র কিয়দংশ ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন, অপরাংশ কেন প্রকাশ করিলেন না, তাঁহারাই জানেন। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে ষ্টেপলটন সাহেব

নলিনীবাবুর দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহাদের দুই মত না ধরিয়া তাহা এক জনের মত বলিলেও অন্যায় হইবে না। ষ্টেপলটন সাহেব কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত আমাকে প্রথমে লিখিয়াছিলেন—"It has all the characteristics of a genuine inscription"—[এই শিলালিপি সর্ব্ব বিষয়ে খাঁটি বলিয়াই মনে হয়।] এই শিলালিপি সম্বন্ধে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ষ্টেপলটন সাহেবের মারফৎ আরও কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"When we were coming away from Savai last June (1920), Babu Harendra Nath Ghosh handed over to me the *khātā* full of litigation notes in which Sj. Ambikacharan Chaudhuri had taken down in pencil the *slokas* dictated by the late Amritananda Kaviraj. I found that the whole composition was the copy of an inscription on a Math dedicated by Mahendra, son of Harish. Harendra Babu had only utilised a part of the composition, the rest of which was also of unusual interest.

Mr. Rankin thereupon undertook to find the original of these *slokas* and through the aid of Mr. J. N. Roy, I.C.S., and Mr. A. C. Sen, I.C.S., at last succeeded in getting into touch with Babu Pratap Ch. Gupta, the grandson of Amritananda Kaviraj. Pratap Babu ransacked the papers of his grandfather and after much search succeeded in finding the required *slokas* written in violet ink in the Kaviraj's own hand on a piece of paper only 4″ × 8″ in size and handed it over to Mr. Rankin. On one side of the paper is seen a transcript in which many slips had occurred and on the reverse the transcript is copied correctly.

I shall give below an exact copy of the *slokas* and a translation; these *slokas* as already noted appear on a close reading to be the transcript of an inscription attached to an ancient Math, dedicated by Mahendra..... the inscription however is extremely interesting. It takes note of the fact that Harishchandra was a Buddhist. It gives the correct boundary of Bhowal or Bhabalina and furnishes us with the important information that it was reclaimed by Dhimanta from the occupation of the powerful Kirats. This supports the statement of the Yoginitantra that Pragjyotish at one time extented up to the confluence of the Laksya and the Brahmaputra. The Ganges is said to be flowing below Bhowal and thus this statement furnishes proof of the current tradition that the Ganges used to flow in olden times through the Dhaleswari channel or even further north along the course of the present Buriganga."

ইহার ভাবার্থ—"আমরা গত জুন (১৯২০) মাসে সাভার হইতে ফিরিবার পথে বাবু হরেন্দ্র-নাথ ঘোষ আমার হাতে একখানি খাতা দিলেন। এই খাতায় মোকদ্দমা সম্বন্ধে অনেক কথা [illegible] মধ্যে অম্বিকাচরণ চৌধুরীর হাতে পেন্সিলে লেখা এই শ্লোকগুলি

ছিল, স্বর্গীয় কবিরাজ অমৃতানন্দ তাহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং চৌধুরী মহাশয় তাহা টুকিয়া লইয়াছিলেন। আমি বুঝিলাম ইহা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র কর্তৃক নির্ম্মিত একটি মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন শিলালিপির নকল। হরেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে ইহার কতকাংশ মাত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম ইহার বাকী অংশও খুব দরকারী।

শ্রীযুক্ত র‍্যাঙ্কিন সাহেব কবিরাজের স্বহস্ত-লিখিত আদত লিপিটি উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর শ্রীযুক্ত জে. এন. রায় এবং এ. সি. সেন সিভিলিয়ান দ্বয়ের সাহায্যে স্বর্গীয় অমৃতানন্দ কবিরাজ মহাশয়ের পৌত্র প্রতাপচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হইয়া সন্ধান লইলেন। প্রতাপবাবু তাঁহার পিতামহের সমস্ত কাগজপত্রের বিশেষরূপে খোজ করিয়া শেষে সেই শ্লোকযুক্ত আদত কাগজটি পাইয়া র‍্যাঙ্কিন সাহেবকে প্রদান করেন। ছোট ৪″×৮″ ইঞ্চি কাগজে স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের নিজ হাতে বেগুনী কালীতে উহা লিখিত। কাগজখানির এক দিকে নকলটি অনেক ভ্রমপূর্ণ, কিন্তু অপর দিকে উহা নির্ভুল করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি নিম্নে সেই শ্লোকগুলি অনুবাদসহ প্রদান করিতেছি।

এই শিলালিপি অতীব প্রয়োজনীয় তত্ত্বপূর্ণ। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। ইহাতে ভাওয়াল অথবা ভাবলীনের একটা ঠিক সীমানা দেওয়া হইয়াছে। এই লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে ঐ স্থান কীরাতদের হাত হইতে ধীমন্ত সেন দখলে আনিয়াছিলেন। এই লিপি দৃঢ়ভাবে যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সীমা সমর্থন করিতেছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্য এক সময়ে লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের সংগমস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাতে দেখা যায় এক সময় গঙ্গা ভাওয়ালের প্রান্তভাগ দিয়া বহিয়া যাইত। লৌকিক সংস্কার, এক সময়ে ধলেশ্বরী এমন কি আরও উত্তরে বুড়িগঙ্গার খাদ দিয়া গঙ্গা বহতা ছিল; সুতরাং সেই সংস্কার এই লিপি সপ্রমাণ করিতেছে।”

যদি কুলজীটিকে বিশ্বাস্য বলিয়া ধরা যায়, তবে আমরা শিলালিপির মহারাজ ভীম সেন এবং জয় সেন বিশ্বাসোক্ত মহারাজ বল্লালের পুত্র ভীম সেনকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। বিশ্বাস মহাশয়ের ঐতিহাসিক নানা কথা সম্বন্ধে প্রচুর তর্ক ও আন্দোলন হইবে; কিন্তু তিনি সেন বংশের যে তালিকাটি দিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্য কিনা বিবেচ্য। আমরা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ইতিহাস দেওয়ার সময় সেই তালিকাটির কথা পুনরায় আলোচনা করিব। এই বহু ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ কুলজীখানিতে যে প্রক্ষেপকারীর হস্ত স্পর্শ করে নাই—তাহা বলিতে পারি না। এদেশে যাঁহারা জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা খুব পণ্ডিত হইলেও নিজের সামাজিক গৌরবের কথা একবারে ভুলিতে পারেন না। এমন কি নিতান্ত অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও মধ্যে মধ্যে এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া থাকেন।

হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা ও পদুনাকে গোপীচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া ময়নামতীর গানে উল্লেখ আছে। ইহা কতদূর ঠিক বলা যায় না।

আমরা এই শিলালিপির প্রতিলিপিখানি নিম্নলিখিত কারণে প্রামাণ্য মনে করি।

১। ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রের বৃদ্ধাবস্থা—তখন তিনি রাজর্ষি। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দ (মহারাজ ভীম সেনের মৃত্যুর সময়) হইতে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমরা চারিজন রাজার নাম পাইতেছি—ধীমন্ত, রণবীর, হরিশ্চন্দ্র ও মহেন্দ্র। এক শতাব্দীতে ৪ জন রাজার গণনা প্রচলিত নিয়মানুসারে সঙ্গত।

২। সাভারের লিপি ও জয় সেন বিশ্বাসের কুলুজী দুই বিভিন্ন এবং পরস্পরের অজ্ঞাত স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং উভয় স্থানেই ভীম সেন "মহারাজ" বলিয়া উল্লিখিত। কুলুজী হইতে আমরা জানিতে পারিলাম, ইনি বল্লাল পৌত্র মহারাজ বিশ্বরূপ সেনের পুত্র।

৩। জয় সেন বিশ্বাস কার্ত্তিক সেনকে স্বীয় কন্যা দান করিয়াছিলেন, সুতরাং তদুল্লিখিত বংশলতা নির্ভুল বলা যাইতে পারে—বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত নানা প্রমাণ দ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে। তবে প্রক্ষেপকারী কেহ কিছু করিয়াছেন কি না—বলিতে পারি না।

আদত লিপি হইতে অমৃতানন্দ কবিরাজ মহাশয় স্বহস্তে প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমৃতানন্দ কবিরাজ সে সময় পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবিরাজ ছিলেন, রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিগণ—যাঁহারা তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন—তাঁহাদের নৌকা অনেক সময় কবিরাজ মহাশয়ের ঘাটে বাঁধা থাকিত। ইনি সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার সততা ও বিবিধ সদ্‌গুণ জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। অমৃতানন্দের পুত্র যাদবানন্দ আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি পুরাতন "ভারতী" পত্রিকার এক জন নিয়মিত লেখক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পিতাপুত্র উভয়েই পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এবং যাদবানন্দ প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনায় পটু হইয়াও তাঁহারা এই দলিলটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রতিলিপি সম্বন্ধে ইঁহারা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। উহা হারাইয়া গিয়াছিল। র‍্যাঙ্কিন সাহেব চেষ্টা না করিলে উহা পাওয়া যাইত না।

মূল শ্লোকের কবিত্ব উচ্চদরের নহে, এবং কবিরাজ মহাশয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লিপির ভাল করিয়া পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে শ্লোকগুলি অনায়াসে নব শ্রীমণ্ডিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, সেই ভাবেই নকল করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাদের অনেক ক্রটি দৃষ্ট হয়।

ভট্টশালী মহাশয় সময়-সূচক পদটির বিকৃত অর্থ করিয়া উহা অষ্টম কি নবম শতাব্দীর বলিয়া লিখিয়াছেন। আমরা প্রমাণ করিয়াছি—লিপিটি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগের। প্রায় এই সময়ে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও কালবাচক সংস্কৃত পদ "বামাগতি" নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে এবং আরও বহুস্থলে যে সেই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ আমরা দিয়াছি। বিশেষ "বামাগতি" দ্বারা ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গেলে উহার কোন অর্থই হয় না। আর একটি কথা এই যে এই লিপি যদি অষ্টম কি নবম শতাব্দীর

হইত, তবে কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সেকেলে পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাহাতে দন্তস্ফুট করিয়া পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেন না, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধ প্রভাব যথেষ্ট ছিল। বঙ্গদেশে সপ্তদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধগণের একটা নবজাগরণ হইয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলায় রামানন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ঐ শতাব্দীতে আপনাকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈষ্ণব ও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে একটি অভিযান সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই পুস্তকের ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে হাজারিবাগ অঞ্চলে মানবংশীয় রাজাদের উল্লেখ পাই। ১। উদয়মান, ২। শ্রীধৌতমান, ৩। অজিতমান (রাজা উদয়মানের ভ্রাতা) পরে উদয়মানের বংশোদ্ভব, ৪। চন্দ্রমান ১১৩৭ খৃ অব্দে মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান নামক আর এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা সেনদিগের পূর্ব্বে মগধে স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

মানবংশ।

বঙ্গদেশের অপর এক রাজবংশের তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা বর্ম্মবংশীয়। এই বর্ম্মবংশের তাম্রলিপি একদিকে চন্দ্রবংশীয় ও অপরদিকে সেন রাজাদের তাম্রফলকের অক্ষরের মত দৃষ্ট হয়, বরঞ্চ উহা সেনদের তাম্রলিপির বেশী সন্নিহিত বর্ম্মবংশীয়েরা 'পরম ভট্টারক' 'মহারাজাধিরাজ' এবং 'পরমেশ্বর' প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীদের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, সুতবাং ইহারা প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রলিপিতে দৃষ্ট হয়, ইহারা কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরের আদিমবাসী। এই সিংহপুর খুব সম্ভব দক্ষিণরাঢ়স্থ বিজয়ের সিংহপুর। এই বংশের বজ্রবর্ম্মণ অঙ্গদেশে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ইঁহার পুত্র জাতবর্ম্মা কর্ণরাজ-কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন এবং কামরূপ অধিকার করিয়া কৈবর্ত্ত রাজা দিব্বোককে পরাস্ত করেন। জাতবর্ম্মার পুত্র শ্যামলবর্ম্মা। শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন ঢাকা নারায়ণগঞ্জের অন্তঃপাতী বেলাবা নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বর্ম্মবংশ।

শ্যামলবর্ম্মার কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী মহারাজ্ঞী মালব্যদেবীর গর্ভসম্ভূতা। এই সময়ে সিংহল-রাজ বিজয়বাহুর (১ম) এক রাজ্ঞীর নাম ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ইনি কলিঙ্গের (দক্ষিণ রাঢ়) সিংহপুরের রাজকন্যা। সুতরাং দেখা যাইতেছে ত্রৈলোক্যসুন্দরী নামটি এক সময়ে সিংহপুরের রাজপুরে প্রচলিত ছিল। কর্ণ, দিব্য (দিব্বোক) প্রভৃতি নামের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে এই রাজবংশ বিখ্যাত রামপালের প্রায় সমসাময়িক,—অর্থাৎ দশম-একাদশ শতাব্দীর।

বর্ম্মবংশ সম্ভবতঃ এককালে পাল নৃপতিদের সামন্ত রাজা ছিলেন। ইহারা যদুবংশীয় বলিয়া দাবী করেন এবং বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। আমাদের মনে হয়, ইহারা বিজয়ের বংশীয়, কিন্তু হিন্দু প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রবল হইয়া উঠিলে ইহারা আপনাদিগকে যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্ব্বদেশের রাজারা যে হিন্দুপুরাণের এবং রামায়ণ মহাভারতাদির

উল্লিখিত রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ পূর্ব্বভারতে বিদ্যমান। বিজয়ের বংশধরেরা বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে জ্ঞাতিত্বের কথা লোপ করিয়া মহাভারতের সর্ব্বপ্রধান নায়ক সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ইঁহারা গৌরবযুক্ত হইয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ এই রাজবংশে আরও দুইটী নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম জ্যোতিবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মা। সম্প্রতি শ্যামলবর্ম্মাকে বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইয়া কুলজীকারকেরা যে সকল জাল বংশতালিকা তৈয়ার করিয়াছেন এবং যাহাদের দ্বারা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মত প্রবীণ ব্যক্তিও প্রতারিত হইয়াছেন তাহার একটি কৌতুকাবহ বিবরণী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে পাল রাজত্বের শেষ সময়ে বিহার অঞ্চলের বর্ম্মবংশীয় রাজারা সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্র রাজাদের অধিকার বিলুপ্ত করিয়া রাঢ়, বঙ্গ ও বিহার অঞ্চলে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে শূরবংশ হয়ত বর্ম্ম বংশকে পরাভূত করিয়া সেনেদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই জটিল এবং যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ বিপদসঙ্কুল অরাজকতার যুগে সেনরাজগণ স্বীয় শক্তি সমস্ত বঙ্গ ও বিহারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তথাকার একচ্ছত্র রাজত্ব লাভপূর্ব্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন।

শকরাজ মিহিরগুলের সঙ্গে কোন সময়ে বঙ্গ দেশের হয়ত বা একটা সংস্রব হইয়াছিল। তাহা অবশ্য পাল রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। আমাদের ইহা একটি অনুমান মাত্র। অনুমানের হেতু এই যে ত্রিপুরার একটা বৃহৎপরগনার নাম মেহেরকুল। ঐ পরগনা ভারতবিশ্রুত মহাবীর মেহের-গুলের নামাঙ্কিত কি না, ইহা একটা জটিল সমস্যা।

মিহিরকুল।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ের অধিপতি কর্ণসেনের লাউসেন বা লবসেন নামক যে পুত্র ছিল, তাঁহার সাহায্যে গৌড়েশ্বর, কলিঙ্গ, বর্দ্ধমান, তারপাশা, কামরূপ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি মূলতঃ এই লবসেনের বীরত্ব গাথা লইয়া। ইনি ঢেকুরের ইছাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং হরিপালের কন্যা কাণেড়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভপূর্ব্বক উক্ত রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। বাঙ্গলা পঞ্জিকায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কলিকালের রাজচক্রবর্ত্তীদের মধ্যে লাউসেনের নাম উল্লিখিত হইত। লাউসেন বা লবসেন গৌড়েশ্বরের শ্যালীপুত্র ছিলেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে এই গৌড়েশ্বর পাল বংশীয় দেবপালদেব।

লাউসেন।

আমি কতকগুলি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু আমার মনে এখনও সে সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যার ভালরূপ সমাধান হয় নাই।

১। গোরক্ষনাথ ও গোবিন্দচন্দ্রের সময়।

২। ভর্তৃহরি ও গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্রের) সম্বন্ধ এবং তাঁহাদের কাল।

৩। এই গোবিন্দচন্দ্র এবং রাজেন্দ্র চোলের সময়ের গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি কি না?

৪। সাভারের হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা ও পদুনার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হইয়া থাকিলে উভয় রাজার কালের সঙ্গতি প্রমাণ করা যায় কি না?

৫। জাতিগত প্রশ্ন দ্বারা বিচলিত না হইয়া প্রশান্তভাবে বিচার করিলে সাভারের শিলালিপি খাঁটি বলিয়াই বোধ হয়, তবে বল্লালচরিতোক্ত অথবা "সদ্বৈদ্য-কুল-চন্দ্রিকা"র ভীমসেন এবং শিলালিপির ভীমসেন এক ব্যক্তি কি না তৎসম্বন্ধে আমার কতকটা সন্দেহ আছে।

এই সকল জটিল প্রশ্নের কেহ চূড়ান্ত উত্তর দিতে পারিবেন না। তবে কালে হয়ত দৃঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়া সমস্যার সমাধান-পথ সুগম করিয়া দিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এদেশে ইতিহাসের উপকরণ

ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই; ভারতের লোকেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না, ইত্যাদি কথা সকলের মুখেই শোনা যায়। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ-তন্ত্র পাঠ করিলে আমরা অতি পূর্ব্বকাল হইতে কতকগুলি রাজ বংশের ধারাবাহিক বংশাবলী জানিতে পারি। এই সকল বংশাবলী যে সমস্তই ভ্রমপূর্ণ তাহা বলা যায় না, ইদানীং তাম্রশাসন ও শিলালিপির প্রমাণে অবধারিত হইয়াছে যে এত পূর্ব্বকালের লেখার মাঝে মাঝে সত্যের অপলাপ হইয়া থাকিলেও সেগুলি মোটের উপর নির্ভরযোগ্য। পার্জিটার সাহেব পুরাণোক্ত বংশাবলীর আংশিক বিশ্বস্ততার পক্ষপাতী।

প্রত্যেক রাজাদেরই বংশাবলী ও পূর্ব্বপুরুষদের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য অভিজ্ঞ লোক থাকিত। বিবাহ-সভায় ও যজ্ঞস্থলে ইহারা উৎসবকারী রাজার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের গুণগ্রাম বর্ণনা করিতেন। কালিদাসকৃত রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। তাম্রশাসন ও প্রস্তরলেখ সহজে নষ্ট হয় না এবং এগুলি দানগ্রহীতাদের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষরূপ জড়িত, এজন্য এ সকল নানারূপ বিপ্লব সত্ত্বেও কতক কতক রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু কাগজ বা ভূর্জ্জপত্রাদিতে লেখা ইতিহাস কচিৎ রক্ষিত হইয়াছে। যদি একবংশই ক্রমাগতঃ রাজত্ব করিতেন, তবে সেই বংশের ইতিহাস রক্ষিত হইত। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে রাজনৈতিক বিপ্লব এত ঘন ঘন হইয়াছে যে এক বংশের কথা অপর বংশীয় লোকদের রক্ষা করিবার কোনই স্বার্থ থাকিত না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার হইলে সকলেই এদেশে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকে, কারণ ধর্ম্ম সকল সম্প্রদায়েরই সামগ্রী। কিন্তু নূতন বংশের রাজারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের (অনেক সময়েই যাঁহারা শত্রুপক্ষীয়) ইতিহাস রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন—এমন কি বিদ্বেষী হইতেন। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ

কখনই একত্র হইয়া একটা রাজনৈতিক ঐক্য অনুভব করেন নাই—সুতরাং তাঁহারা রাজত্ব-সম্বন্ধীয় ঘটনাগুলি প্রথম হইতে ধারাবাহিকভাবে রাখিতে যত্ন করেন নাই। বিশেষ গত সাত আট শত বৎসরের মধ্যে ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে গ্রন্থ লেখার প্রচেষ্টা বেশী হয় নাই। লোক বা জাতি-বিশেষের ইতিহাস লইয়া লোকেরা কখনই মাথা ঘামাইতে চায় নাই। দেবতাদের কীর্ত্তি পুরাণকারেরা লিখিয়াছেন এবং জনসাধারণ তাহাই পাঠ করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে। মানুষের কীর্ত্তি ক্ষণবিধ্বংসী, উহা লইয়া আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই—এই ছিল লোকদের বিশ্বাস। সুতরাং যে সকল প্রাচীন প্রাদেশিক ইতিহাস ছিল তাহা এই কয়েক শতাব্দীর অবহেলায় প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ইতিহাস কেন লুপ্ত হইল ?

তথাপি প্রাদেশিক এবং বিশেষ বিশেষ রাজত্বসম্বন্ধীয় ইতিহাস যে ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রামপাল সম্বন্ধে আমরা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পাইয়াছি। ধর্ম্মচর্চ্চায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত বঙ্গদেশ হইতে এই ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকারের বাড়ী ছিল পৌণ্ড্রদেশে, কিন্তু তাঁহার পুস্তকখানি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপালের ঘটনাগুলির প্রায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল, কারণ তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। পুস্তকখানি কাব্যের রূপ দিয়া লিখিত হইয়াছিল। রামপাল ও রঘুকুলচন্দ্র রাম এই উভয়ের সম্পর্কেই প্রতিটি শ্লোকের অর্থ করা যাইতে পারে। কবির উপাধি ছিল "কলিকাল-বাল্মীকি"। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত নেপাল হইতে ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত হয়; যে পুস্তকখানি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহা ৺হরপ্রসাদ শা[illegible] মহাশয় বাঙ্গলার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোক পর্য্যন্ত টীকা আছে। যে রূপক দ্বারা রামায়ণ ও রামপালচরিতকে একত্র জড়ান হইয়াছে, তাহাতে রামপালের ভাগ এত দুর্ব্বোধ্য যে যিনি সেই সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা না জানেন তাঁহার পক্ষে এরূপ টীকা লেখা অসম্ভব। এই জন্য অনেকে মনে করেন—সন্ধ্যাকর নন্দী স্বীয় গ্রন্থের টীকা স্বয়ংই লিখিয়াছেন। যে অংশের টীকা লিখিত হয় নাই, তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। রামচরিত খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রের রূপকের সম্বন্ধ থাকায় দরুনই পালবংশীয় রাজার কীর্ত্তি-সম্বলিত রামচরিতের জীবনরক্ষা হইয়াছে। নতুবা রামচরিত কে পড়িত? আমরা এই রামচরিত হইতেই জানিতে পারি যে, পাল ও সেন রাজাদের অনেকের সম্বন্ধেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। তিব্বতদেশীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ এরূপ কতকগুলি পুস্তকের নাম করিয়াছেন, যথা—

(১) ক্ষেমেন্দ্রভদ্র প্রণীত ইতিহাস। ক্ষেমেন্দ্র মগধবাসী ছিলেন এবং তিনি পুরাকাল হইতে রামপাল পর্য্যন্ত সমস্ত রাজার বিবরণ দিয়াছেন।

(২) ইন্দ্র দত্ত নামক এক কবির সেন-রাজাদের প্রথম চার জনের [illegible] [illegible] গ্রন্থের নাম "বুদ্ধপুরাণ।"

(৩) গুরুপরম্পরা ইতিহাস। গ্রন্থকার ব্রাহ্মণবংশজাত "ভট্টঘটী" পদবী। তারানাথ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সুবিখ্যাত ইতিহাসের উপকরণ তিনি এই পুস্তক হইতেই বেশী সংগ্রহ করিয়াছেন।

ত্রিপুররাজ্যের একখানি ইতিহাস আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক দুই পণ্ডিত উহা বাঙ্গালায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তৎপূর্ব্বে উহা ত্রিপুরভাষায় ছিল।

ত্রিপুরার 'রাজমালা'।

গ্রন্থকারদ্বয় যে সকল পুস্তকের সাহায্যে রাজমালা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'রাজমালিকা', 'যোগিনীমালিকা', 'বারণ্যকায়-নির্ণয়াদি' এবং 'লক্ষ্মণমালিকা' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত পুস্তকখানি খুব সম্ভব লক্ষ্মণ সেনের জীবন ও রাজত্বসম্বন্ধীয় পুস্তক।

আমার নিকট একখানি হস্তলিখিত কোচবিহারের ইতিহাস আছে। ইহা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের প্রধান মন্ত্রী কালীচন্দ্র লাহিড়ীর আদেশে মুন্সী জয়নাথ ঘোষ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকের পত্রসংখ্যা ৪৬৯। এ পর্য্যন্ত বহিখানি ছাপা হয় নাই; ইহাতে কোচবিহারের ১৫ জন ভূপতির রাজত্বের বিবরণ আছে। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের কতকাংশের পরে আর লিখিত হয় নাই। পুস্তক লিখিবার আদেশ দেওয়ার সময়ে মন্ত্রী কালীচন্দ্র লেখক জয়নাথ ঘোষকে প্রাচীন কতকগুলি ইতিহাসের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্বকালের রাজাদের এইরূপ রাজত্ববিবরণ লিখাইবার রীতি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল।

জয়নাথ মুন্সীর কুচবিহারের ইতিহাস।

আসামের 'অহম্' রাজাদের যে ইতিহাস আছে, তাহা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশ্বাসযোগ্য যে, আসামের ইতিহাস-লেখক গোইট্ সাহেব বলেন—অহম্জাতির ইতিহাস লিখিবার শক্তি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণে কাল্পনিক কাহিনী বা উপকথা নাই, উহা একান্তরূপে বাহুল্য-বর্জ্জিত ও খাঁটি তত্ত্বপূর্ণ। সুতরাং আমাদের দেশে ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট ছিল। অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও যাহা আছে তাহা নিতান্ত সামান্য নহে।

উপকরণগুলির নিম্নোক্ত ভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যাইতে পারে।—

প্রথমতঃ—মুদ্রা। বহুসংখ্যক মুদ্রা অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশের নানাস্থানে পাওয়া যায়। সেগুলি নানাস্থানে সংগৃহীত আছে এবং তৎসম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক উপকরণ।

দ্বিতীয়তঃ—রাজাদের ইতিহাস। তৎসম্বন্ধে এখনই আলোচনা করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ—শিলালিপি ও তাম্রশাসন।

চতুর্থতঃ—সাময়িক নানা গ্রন্থে রাজরাজড়াদের এবং বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনায় উল্লেখ এবং বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং অপরাপর বিদেশী লেখকগণকর্তৃক কোন কোন ঘটনায় বিবরণ। প্রাচীন মন্দিরাদি।

পঞ্চমতঃ—পল্লীগাথা।

এই শোষোক্ত উপকরণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

১। কোন কোন গুপ্তরাজার সম্বন্ধে পল্লীগাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস রঘুরাজার সম্বন্ধে বৃহৎ জনপদব্যাপী পল্লীগাথার উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাজাদের সম্বন্ধে পল্লীগাথা রচনার সংস্কার বহুকাল হইতে এদেশে বিদ্যমান ছিল। (রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ২০ শ্লোক।)

পল্লীগাথা।

২। ধর্ম্মপালের সম্বন্ধে তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার সম্বন্ধে প্রজারা গান বাঁধিয়া সর্ব্বত্র গাহিয়া বেড়াইত; সেই সকল গান পল্লীর রাখাল-বালকেরা গাহিয়া প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিত; দিবসের কর্ম্মাবসানে বণিকেরা তাহাদের বিপণীতে সেই গান গাহিতে ভালবাসিত, এমন কি অন্তঃপুরচারিণীগণ সেই সকল গান গাহিতেন এবং তাঁহাদের পোষা পাখীকে তাহা আবৃত্তি করিতে শিখাইতেন। (৮ম শতাব্দী—খালিমপুর তাম্রশাসন।) মহীপালের বাণগড় তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, মহারাজ রাজ্যপালের কীর্ত্তিকথা জনসাধারণ মুখে মুখে গাহিয়া বেড়াইত (১০ম শতাব্দী)। বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে (১৫৭৩ খৃঃ) লিখিয়াছেন যে যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপাল (১০ম শতাব্দী) সম্বন্ধে পল্লীগাথা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্র গীত হইত, এবং তাহাই বঙ্গবাসীর একটা প্রধান আনন্দোৎসবের বিষয় ছিল। সেক শুভোদয়া নামক পুস্তকে দৃষ্ট হয়—রামপাল (১১শ শতাব্দী) তাঁহার পুত্রকে কোন বণিক-সীমন্তিনীকে ধর্ষণের অপরাধে শূলে দিয়াছিলেন, তাঁহার এই অপূর্ব্ব ন্যায়পরতা-সম্বন্ধে পল্লীগাথা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র লক্ষ্মণসেনের সময়েও (১২শ শতাব্দী) গীত হইত। ত্রিপুরার মহারাজ ধন্যমাণিক্য (১৬শ শতাব্দী) সম্বন্ধে এইরূপ পল্লীগীতিকার উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া যায়। তাঁহার রাজ্ঞী কমলাদেবী ও পরবর্ত্তী রাজা অমরমাণিক্য সম্বন্ধেও এইরূপ গীতি প্রচলিত ছিল। রাজারা ত্রিহুৎ হইতে উৎকৃষ্ট গায়ক ও নর্ত্তক আনাইয়া সেই সকল গান কি ভাবে নাচিয়া গাহিতে হয়, তাহা ত্রিপুরবাসীদিগকে শিখাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁ ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকজন পরাক্রান্ত দেওয়ানের সম্বন্ধে পল্লীগাথা পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় প্রকাশিত হইয়াছে আমরা এরূপ অনেক উদাহরণের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের এই সকল মন্তব্য পাঠ করিলে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক রাজার সম্বন্ধেই নিরক্ষর প্রজা-মণ্ডলীরাও গাথা রচনা করিয়া গান করিত। যাহারা অত্যাচারী ও দুর্দ্দান্ত শাসনকর্ত্তা ছিল, তাহারা প্রজাদের রচিত পল্লীগীতির কশাঘাত খাইত। মাণিকচাঁদের গানে "লম্বা-লম্বা-দাড়ী" বাঙ্গাল মন্ত্রীর অত্যাচারের কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তিনি যে সকল অত্যাচার করিয়া-ছিলেন, তাহা কবির কৃপায় অনেকেই অবগত আছেন। কবি দয়া করিয়া তাঁহার কলঙ্কিত নামটি প্রকাশ করিয়া তাহা অমর করিয়া রাখেন নাই। কিন্তু কবিকঙ্কণ সেলিমাবাদ পরগনার শাসনকর্ত্তা মামুদ সরিফের শত কুকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে চিরকালের জন্য ঘৃণার পাত্র করিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষেমানন্দ উক্ত পরগনার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা বারা খাঁ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে কত ভালবাসিত তাহার আভাস

পাওয়া যায়। সমসের গাজি নামক এক দস্যুদলপতি প্রবল হইয়া কিছুকালের জন্য ত্রিপুর-রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। পল্লীকবি পীর মহাম্মদ তৎসম্বন্ধে একটি বিস্তারিত গীতি লিখিয়াছেন। উহা সমসাময়িক রচনা ও মূল্যবান্ ঐতিহাসিক উপকরণপূর্ণ। স্থানান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সেকালের কোন লেখাই বৈজ্ঞানিকের মানদণ্ডে নিখুঁত বলিয়া স্বীকৃত হইবে না তাম্রশাসন ও শিলালিপিতেও স্তাবকতার অতিরঞ্জন আছে; আমরা বলিতে চাই না যে, পল্লীগাথাগুলি নির্দ্দোষ এবং খাঁটি সত্য; উহাদের মধ্যে নানারূপ ত্রুটি, সত্যের অপলাপ, অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক জনশ্রুতি, অজ্ঞতার বাগাড়ম্বর এ সমস্তই আছে, কিন্তু তথাপি এই পল্লীগীতিগুলি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের নিতান্ত নগণ্য উপকরণ নহে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই নানাতত্ত্ববহুল, কবিত্বময়, জাতীয় গৌরবস্বরূপ পল্লীগীতির সন্ধানার্থ সরকার বাহাদুর ও বিশ্ববিদ্যালয় যে সামান্য কিছু টাকা দিতেন তাহা সম্প্রতি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই রত্নগুলি বৎসর বৎসর ধ্বংস পাইতেছে, শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যাইবে। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার তরঙ্গ উঠিয়াছে, কত দিক্ দিয়া কত ত্যাগের সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু দেশের ইতিহাসসম্বন্ধে তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা বিস্ময়কর! ঘরে আগুন লাগিলে এক বাল্‌তি জল আনিবার মতনও লোক কি দেশে নাই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যা ও বিদ্বানের গৌরব

মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোকের অনুশাসনে দেখা যায়, তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি দেশে শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছিল—দেশবাসীরা প্রকৃত জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ ত্যাগী পুরুষদিগকে সম্মান দেখাইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তরুণের দল যাহাতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা করেন, তজ্জন্য রাজা উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অন্যদিকে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্মের একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করিতে দেন নাই। ব্রাহ্মণ বলিতে তিনি শুধু ব্রাহ্মণবংশজাত ব্যক্তিদিগকে বুঝিতেন না, তিনি সর্ব্বজাতিনির্ব্বিশেষে 'সমাজসাম্য' প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য কুল ও শ্রেণী গণ্য না করিয়া, সর্ব্বজাতি হইতে নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক 'ধর্ম্মমহামাত্র'গণ নিযুক্ত করিতেন। সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে, কৌটিল্য লিখিয়াছিলেন—বিদ্বানের সঙ্গে রাজার তুলনাই হইতে পারে না। রাজা যে দেশে রাজত্ব করেন সেই দেশের ক্ষুদ্রগণ্ডীতে তাঁহার নাম ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু

বিদ্বানের পূজা পৃথিবীব্যাপী। কৌটিল্য বিদ্বানের প্রাপ্য সম্মানের কথা অনেকস্থলে বলিয়াছেন, কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় নীতিমালায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধার কথা নাই।

শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের প্রভাব।

এই বিদ্যার প্রতি যে শ্রদ্ধা জানাইয়া দেওয়া হইল, তাহার ফলে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের মধ্যে শ্রমণদের প্রতিপত্তি অসীম হইল। গুপ্তবংশের তাম্রশাসনে দেখা যায়, পণ্ডিত-মণ্ডলী-পরিবৃত হওয়াতে রাজা বিশেষরূপ গৌরবান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গুপ্ত রাজাদের কবিতা লেখা একটি বিশেষ গুণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত সিংহ শিকার করিয়া যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, বীণা বাজাইবার দক্ষতা দেখাইয়া তাহা হইতে কম যশ উপার্জ্জন করেন নাই। অশোকের সময়ে প্রাদেশিক অক্ষরে ও প্রাদেশিক ভাষায় অনুশাসন লিখিত হইয়াছে, গুপ্তদের সমস্ত অনুশাসনই দেবনাগর অক্ষর ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তখন পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের দিকে সর্ব্বসাধারণের লক্ষ্য হইয়াছে—কালিদাসের মত কবি জন্মিয়াছেন, বরাহমিহিরের মত জ্যোতির্ব্বিদের অভ্যুদয় হইয়াছে, দেশবিদেশের জ্ঞানীদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও ন্যায়দর্শনের মীমাংসা লইয়া আলোচনা চলিয়াছে। বড় বড় গ্রীক রাজা ও শকবংশীয় দিগ্বিজয়ী বীরেরা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ম্যানিণ্ডার, কণিষ্ক প্রভৃতি বিদেশীয়েরা এই দেশে বাস করিয়া এই দেশের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিদেশীয়েরা নাম বদলাইয়া হিন্দু বা বৌদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, কেহ বা গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন।

পালরাজগণের সময়ে এই দেশ জ্ঞান ও ধর্ম্মকাজে একেবারে জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। তখন বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর ও নালন্দার বিহারগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। খড়্গবংশের রাজপুত্র বঙ্গের শীলভদ্র নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। বিক্রমপুরের রাজকুমার দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পূর্ব্বাকাশের উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল আলোকিত করিয়া অর্দ্ধজগতের পূজা লাভ করিয়াছেন।

বিদ্যাযুগ।

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ বিশেষ করিয়া পালরাজগণের সময়ে যেরূপ সম্মান ও আদর পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের রাজ্যকাল আমরা 'বিদ্যাযুগ' নামে অভিহিত করিতে পারি। চরিত্রবান্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণমন্ত্রীকে রাজা খুবই সম্মান করিতেন। ব্যাস-বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কোন রাজার অধীন ছিলেন না, রাজারা যদি তাঁহাদের চরণধূলির প্রয়াসী হইতেন—তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না। এমন কি মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের নিকট যেরূপ গরুড় পক্ষীর মত করজোড়ে থাকিতেন, মুদ্রারাক্ষসে

কৌটিল্য, দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্রের প্রতিপত্তি।

সে দৃশ্য অতি পরিষ্কার ভাবে চিত্রিত হইয়াছে; তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার মত কিছু নাই। একমাত্র যাহার মন্ত্রণাবলে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া নিজের সিংহাসন ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় [illegible] করিতে পারিয়াছিলেন সে-হেন চাণক্যের অবজ্ঞাপ্রযুক্ত [illegible]

তিনি চরিতার্থ হইতেন। এ ব্যাপারেও আশ্চর্য্য হইবার বিষয় নাই—দরিদ্রের পক্ষে স্বপ্নে পাওয়া রাজ্যের মতনই তাঁহার সাম্রাজ্যলাভ আশাতীত সৌভাগ্যসূচনা করিয়াছিল। কিন্তু পালরাজগণ মন্ত্রীদিগকে যে সম্মান দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তৎকালে সর্ব্বসাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে, রাজা অপেক্ষা বিদ্বান্ই শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং নৃপতিরাও অকুণ্ঠিত চিত্তে এই প্রণতি ও শ্রদ্ধা পণ্ডিতদিগকে দিতেন। গরুড় স্তম্ভলিপিতে দেবপাল সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, সামন্ত নৃপতিগণের বিশালকায় হস্তিসমূহের পদধূলিতে সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া দেবপালকে লোকলোচনের দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখিত এবং পরাজিত ও মিত্র রাজাদের অসংখ্য সৈন্যগণের যাতায়াতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সহজ ছিল না, এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত একচ্ছত্র সম্রাট্ দেবপাল তদীয় মন্ত্রী দর্ভপাণির উপদেশ প্রাপ্তির জন্য অবসর খুঁজিয়া তদীয় গৃহদ্বারে প্রতীক্ষা করিতেন। মন্ত্রী দর্ভপাণি রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা সর্ব্বাগ্রে জ্যোৎস্নাধবল মহার্ঘ সিংহাসনে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়া শেষে যেন সঙ্কুচিত ভাবে তদীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। দর্ভপাণি মন্ত্রী হইলেও তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। কর্ম্মচারীকে এতটা সম্মান কোন্ রাজা দিয়াছেন? ধর্ম্মপাল রাজার মন্ত্রী গর্গ স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেন, "বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দশদিকের একটি মাত্র দিকের অধিপতি করাইয়াছিলেন, সেই একটি দিকেও অসুরগণ তাঁহাকে প্রায়ই পরাজিত করিতেন—বৃহস্পতি তাহা ঠেকাইতে পারিতেন না, কিন্তু আমি ধর্ম্মপাল রাজাকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।" এই ভাবের অহঙ্কারদীপ্ত কথা সেই মন্ত্রীর বংশধরেরা ধর্ম্মপাল ও তাঁহার বংশধরদের কর্ম্মচারী হইয়াও তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ করিতেন। সুরপালের মন্ত্রী কেদার মিশ্র গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। পালরাজাদের অনেকেই বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের যজ্ঞাদি মান্য না করারই কথা; কিন্তু গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে কেদার মিশ্র যখন স্বীয় গৃহে যজ্ঞ করিতেন, তখন সুরপাল স্বয়ং মন্ত্রীর উৎসবে তৎগৃহে উপস্থিত হইয়া অবনতমস্তকে যজ্ঞের বারি মস্তকে লইতেন।

বিক্রমশিলা-বিহারের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিক্রমশীল রাজার উপরই ছিল। নালন্দা বিহার পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিচালিত হইত, বিক্রমশিলা-বিহারের ভার শুধু রাজার উপর ন্যস্ত ছিল। রাজা স্বয়ং তথায় উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। কিন্তু চীনদেশের পর্য্যটক বিস্ময়ের সহিত লিখিয়াছেন যে, যখন রাজা স্বয়ং সেই বিহারে প্রবেশ করিতেন তখন কোন ছাত্র বা অধ্যাপক তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইতেন না, কিংবা অপর কোন ভাবে সম্মান দেখাইতেন না। বিক্রমশিলা বৌদ্ধবিহার ছিল, এখানেও বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থীর সম্মান এতটা বেশী ছিল! এই উপলক্ষে আমাদের সর্ব্বদাই মনে পড়িবার কথা:—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

এই বিদ্যার যুগে বিদ্বান্দিগের প্রতি লোকের যে কতটা অনুরাগ ছিল এবং রাজরাজড়ারা পর্য্যন্ত বিদ্বানের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন তাহার একটা প্রধান দৃষ্টান্ত এই যে, তিব্বতের

এক রাজা বিক্রমশিলা বিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্করকে তিব্বতে আনিবার জন্য কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া শেষে সেই চেষ্টায় নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। আমরা দীপঙ্করের প্রসঙ্গে সেই ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করিব।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে এই দেশবাসীরা সংস্কৃত যে রীতিতে রচনা করিতেন তাহা 'গৌড়ীয় রীতি' নামে প্রসিদ্ধি পাইয়াছিল। বৈদর্ভী রীতি ও গৌড়ীয় রীতির তুলনা করিয়া দণ্ড্যাচার্য্য বলিয়াছেন যে গৌড়ীয় রীতি কঠোর ও জটিল এবং বৈদর্ভী রীতি প্রাঞ্জল ও সরল। সেই গৌড়-রীতির উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"যথানন্ত্যর্জ্জুনাজ্জন্মসদৃক্ষাঙ্কো বলক্ষগুঃ।" তিনি বৈদর্ভী রীতির উদাহরণস্বরূপ আর একটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা—"মালতীমালা লোলালিকলিলা যথা।"

গৌড়ীয় রীতি, তাহার ক্রম-বর্দ্ধনশীল জটিলতা।

নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর পাশাপাশি এই তিনটা বিশ্ববিশ্রুত বিহার বিদ্যমান থাকায় ফলে তৎকালের জগতের ঐস্থানটা বিদ্যার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। চীন, জাপান, তিব্বত ও এশিয়ার অপরাপর প্রদেশ হইতে ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষার জন্য এই কেন্দ্রে অবিচ্ছিন্ন ধারায় ছুটিয়া আসিত। এতগুলি পণ্ডিতের সমাগমে এবং নানাবিধ জটিল বিষয়ের আলোচনার দরুন পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষাটা কতকটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সহজ ভাষায় কথা কহিবেন কেন? তাঁহারা কোন কালেই তাহা করেন নাই। এখনও পণ্ডিত-কবিরা ভাষার মারপ্যাচ মারিয়া কথাগুলি দুর্ব্বোধ করিয়া বাহাদুরী লইয়া থাকেন। স্বভাবের মিষ্টকণ্ঠ সঙ্গীত বিদ্যার গুরুগণের সভায় বিকায় না, তাঁহাদের কালোয়াতি সাধারণের রসবোধের পক্ষে একটু কঠিন হয়। গৌড়ীয় সংস্কৃত যদি এই সময়ে একটু জটিল হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ এই। দণ্ডাচার্য্যের অভিযোগ যে মিথ্যা নহে, তাহা তাম্রশাসনের ও শিলা-লিপির ভাষা আলোচনা করিলেই বুঝা যায়।

"চন্দ্রস্তোস্তবভূর্মহীপ্রসরণং সত্ত্বপ্রধানাশয়ঃ পাত্রশ্রীমহিতঃ স্ফুরদ্রসময়ঃ সোয়ং গভীরঃ পরঃ। রত্নানাং নিলয়ঃ প্রিয়ঃ কুলগ্রহং বাস্তব্যিত-শ্রীপতিঃ স্তাদেবং সদৃশোঽম্বুধের্য্যদি জলধারোঽথবা লক্ষিতঃ।"—এই অংশটি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ১৮ সংখ্যক শ্লোক। ইহা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। ইহার একদিক্ সমুদ্রার্থক, অপরদিক্ বৈদ্যদেবের অর্থজ্ঞাপক। এই তাম্রশাসনের একস্থলে রামপালকে রামচন্দ্রের সঙ্গে এবং ভীম কৈবর্ত্তকে রাবণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর দ্ব্যর্থ কাব্যের কথা তাম্রশাসনের লেখক অবগত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ ছন্দের জটিলতা, অর্থের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য, এবং বিচিত্র আলঙ্কারিক গুণসমন্বিত কবিতা দ্বারা লেখার চেষ্টায় পাল রাজত্বের সময় সংস্কৃত ভাষা প্রাঞ্জলতা হারাইয়া কতকটা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছিল। দণ্ডাচার্য্য বহুপূর্ব্বে গৌড়ীয় রীতির এই কালোয়াতির কথাই লিখিয়াছিলেন। পালরাজগণের [illegible] [illegible] সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাষা লইয়া নানারূপ শব্দবিত ভঙ্গীতে খেলা করিবার [illegible]

যায়। একস্থানে বৈদ্যদেবের সৈন্য সহকারে অভিযান ও যুদ্ধ একটা যজ্ঞের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। তদীয় রণযাত্রায় অশ্ব-খুরোত্থিত ধূলিপটল বালুকাপূর্ণ যজ্ঞভূমির মত দেখাইত; সেই আকাশব্যাপ্ত ধূলিপটলে সূর্য্যদেবের অশ্বগণের গতিরোধ হইত; দেবরাজ ইন্দ্র দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া সেই অবিচ্ছিন্ন ধূলিরাশি হইতে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করিতেন; এদিকে আবার দুইটি হস্তই চক্ষু রক্ষায় ব্যাপৃত থাকায় ইন্দ্র আর কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না, তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্যগুলি অসম্পাদিত থাকিয়া যাইত। দেবচক্ষু মুদিত হয় না, তাহা অপলক। সুতরাং দেবরাজ দেবতাগণের কর্ম্মফলের নিন্দা করিতে থাকিতেন, কেন তাঁহারা চক্ষু বুজিতে পারেন না? ইহা তাঁহাদের কর্ম্মফল, যদি চক্ষু বুজিতে পারিতেন তবে দুইটি হস্তকে এরূপভাবে নিযুক্ত রাখিতে হইত না। ইহার পরের শ্লোকে উপমা আরও অনেকদূর গড়াইয়াছে। শত্রুসেনার শরীর এই যজ্ঞের ইন্ধন, রিপুশির হোমাগ্নির শ্রীফল, শত্রু নরপালগণের নিধন এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। (কমৌলিলিপি ১৫ ও ১৬ শ্লোক।) এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রামায়ণাদির যে প্রাঞ্জলতা ছিল, পুরাণ ও মহাভারতেও তাহা কতক পরিমাণে বজায় ছিল। মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকও কতক পরিমাণে প্রাঞ্জল ছিল। কালিদাসের সময় হইতে অলঙ্কারের দিকে কবিদের ঝোঁক পড়ে। কালিদাসের উপমা ও ভাষা চমৎকার—কিন্তু মাঝে মাঝে উপমাগুলি একটু কষ্টকল্পিত ও ভাষা একটু জটিল। ভবভূতির সময় পাণ্ডিত্যের প্রভাব সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচণ্ড বেগে আসিয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতগণ ভাষাকে গুরুগম্ভীর, কখনও বা বীণা নিঃস্বনের ন্যায় মধুর করিয়া ভাষার উপর অসামান্য অধিকার দেখাইয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও কালিদাসের ভাষায় যতটা প্রাঞ্জলতা ছিল, ভবভূতির ভাষায় তাহা পাওয়া যায় না। তবে ভবভূতি নিজের ভাবপ্রবণতায় আবিষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছলিত স্নেহ ভাগীরথীর ন্যায় শতধারায় ছুটিয়া পাণ্ডিত্যের ঐরাবতকে যেন স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার পরে সংস্কৃতের পুনরুত্থানে পণ্ডিতগণ আসর জমকালো করিয়া বসিয়াছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা তাঁহাদের উদ্দিষ্ট নহে, ভাষার বাহাদুরি দেখানই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল। মগধের রাজসভায় বঙ্গের পণ্ডিতগণ বৈদর্ভী রীতিকে কতকটা অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। শ্রীহর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি রচনায় পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত ও অলঙ্কার-নিপুণতার একশেষ দেখানো হইয়াছে। কাদম্বরী ও শ্রীহর্ষচরিতে সংস্কৃত গদ্যলেখার এরূপ পূর্ণতমপুষ্টি দৃষ্ট হয়, যাহাতে লেখকগণ শব্দ দ্বারা যে কিরূপ অসাধারণ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু সেই সকল শব্দ একত্র করিয়া যে শব্দব্যূহ বা সন্ধিব দুর্গ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা ভেদ করা সকলের সাধ্য নহে। এদিকে নালন্দা প্রভৃতি বিহারে যে বৌদ্ধ ন্যায়দর্শনের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহার ছাঁচ বদলাইয়া হিন্দু দার্শনিক ও নৈয়ায়িকগণ যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষাত্মক কূট তর্কের মঠ গড়িয়াছিলেন—তাহা জগতের বিস্ময় অথবা মূর্ত্ত চিন্তাশীলতার স্বরূপ ধারণ করিয়া পরাধীন বাঙ্গলার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে।

বৈদ্যদেবের প্রশস্তিক উপমা।

ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বাঙ্গালীরা সংস্কৃত ভাষাকে পাণ্ডিত্যের জটিল প্রকোষ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে প্রমোদ-ভবনে ফিরাইয়া আনিলেন। উমাপতি ধরের প্রশস্তি ভাষার সন্ধিস্থলের রূপ প্রকটিত করিতেছে। কতকগুলি জটিল ও কূট-সন্ধির বন্ধনীর মধ্যে থাকিয়াও ভাষা অনেকটা জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি ফিরাইয়া পাইয়াছে; অলঙ্কারের গুরুভার লঘু হইয়াছে। কিন্তু জয়দেবের কাছে সেই জটিলতাও ভাল লাগে নাই। কি সমাজ, কি রাষ্ট্রনীতি, কি সাহিত্য—কোন স্থানেই বাঙ্গালীর প্রতিভা দীর্ঘকাল দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে চায় নাই। যাহা জীবন্ত, গতিশীল ও প্রাণস্পর্শী তাহার দিকেই বাঙ্গালীর ঝোঁক। রাখাল-বালক যেরূপ সারাদিন রাজা সাজিয়া মৃৎস্তূপকে সিংহাসনে পরিণত করিয়া অভিনয় করে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ঊর্দ্ধশ্বাসে মাতার অঞ্চলতল খোঁজে, বাঙ্গালীর প্রতিভাও সেইরূপ দর্শন, বিজ্ঞান, অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া দিনভোর নাড়াচাড়া করিয়া শেষে গৃহের আঙ্গিনায় আসে—স্বগণের সহিত কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াইতে। জয়দেব সেইরূপ সংস্কৃত আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া কথিত প্রাকৃতের অনুরাগী হইয়াছিলেন,

জয়দেবের আবির্ভাবে ভাষার প্রাঞ্জলতা।

তাঁহার রচনায়ও সন্ধি-সমাসের বাহুল্য আছে কিন্তু তন্মধ্যে ভারি গহনা একখানিও নাই। যাহা কিছু আছে তাহার ব্যবহার কষ্টকর বা দুঃসহ হয় নাই, অপিচ তিনি সংস্কৃতের লৌহদ্বার খুলিয়া দিয়া তাহাতে পাড়াগাঁয়ের চলিত কথার বহর চালাইয়াছেন, তাঁহার "চল সখি কুঞ্জং" "অলিকুল-সঙ্কুল কুসুম-সমূহ" "বন্ধুজন-জনিত-বিলাপে" "কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে" "ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে" প্রভৃতি পদ সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সন্ধি সূচক—তিনি সংস্কৃতে গীতিকাব্য লিখিয়াছেন কিন্তু মনে হয় এই উপলক্ষে বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের দ্বারে অপাঙ্‌ক্তেয় না হইয়া থাকে,—এই জন্য তাঁহার একটা চেষ্টা রচনার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তিনি বহু বাগাড়ম্বর ভাল বাসিতেন না, তজ্জন্যই উমাপতি ধরকে নিন্দা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার কোমল প্রাণের ভাষায় একমাত্র কোমল কান্ত পদাবলী রচনা করিতে তিনিই দক্ষ—এই শ্লাঘা করিয়াছেন। কপিলবস্তুর রাজকুমার ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া ভিখারী সাজিয়া ছিলেন, হর্ষবর্দ্ধনাদি কত রাজা সেইভাবে কল্পতরু সাজিয়া সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া নিঃস্ব হইতেন। বাঙ্গলাদেশেও এইরূপ বাহ্য সম্পদ্ ছাড়িবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাহুল্য ছাড়িয়া স্বভাবে ফিরিয়া আসার শক্তি বাঙ্গালীর যতটা আছে জগতে আর কোন জাতির তাহা আছে কিনা জানি না। জয়দেব সংস্কৃতের জটিল বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া ভাষাকে গতিশীল করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার গীত-গোবিন্দ এখনও বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে কলনিঃস্বনে বহিয়া চলিতেছে।

এই বিস্তার যুগের যে প্রবল পাণ্ডিত্য তাহা এখনও বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ের বামুন পণ্ডিতদের কথিত ভাষার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। মৌর্য্য, গুপ্ত এবং পালদিগের রাজত্বের কোন শিক্ষা বা কথাই বাঙ্গালায় ব্যর্থ হয় নাই। আমরা দেখাইব, এই সকল যুগের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আমরাই হইয়াছি, আর্য্যাবর্ত্তের আর কোন জাতিই সেই যুগের

বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে বিস্তারযুগের প্রভাব।

গুণরাশির ততটা দাবী করিতে পারেন না, যতটা আমরা পারি—যেহেতু মগধবাসীরা ধীরে ধীরে পাটলীপুত্রের আওতা ছাড়িয়া ক্রমে পূর্ব্বদিকে হটিয়া গৌড়ে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

"Indian Pandits in the Land of Snow" নামক পুস্তকে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,— "The close resemblance which the modern Bengali bears to the **Magadhi,** and the comparison of the customs of the ancient Magadhi people with those of the modern Bengalis show that the latter have descended from the former............It may be inferred that we are the descendants of the very people who constituted the central empire of Magadha though we have thus far, in the course of two thousand years and a half, moved to Bengal, replacing the original Bengalis who moved further East and South to Burmah and Siam" (p. 21).

["বাঙ্গালা ভাষা ও মাগধীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ,—প্রাচীন মগধবাসীদের রীতি নীতির সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালীদের রীতিনীতির ঐক্য প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি—মাগধীদের বংশধর।............ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরাই আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মগধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহারা এই দীর্ঘ কালের মধ্যে বঙ্গ দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে, ব্রহ্মদেশে ও শ্যামে বিতাড়িত করিয়া এই দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন।"]

পণ্ডিতী বাঙ্গালা।

অর্দ্ধমাগধী এমন কি পৈশাচি প্রাকৃতের সমস্ত অপপ্রয়োগ লাঞ্ছিত-পূর্ব্ব সীমান্তের শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আজও তাঁহাদের অন্তঃপুরে কথিত ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের অতি গুরুগম্ভীর শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চলিত কথা অপভ্রংশ প্রাকৃত। সেই কথায় কোথায়ও "ও" স্থলে "উ" (যথা "চোর" চুর, সোল স্থলে সুল, সাত স্থলে সুত), কোথায়ও বা উ স্থলে ও (যথা তুফান স্থলে তোফান), ট স্থলে ঠ (যথা ছোট স্থলে ছোঠ), ও স্থলে উ (যথা ঢোলের স্থলে ঢুল), ন স্থলে ল (যথা নাড়া স্থলে লাড়া), শ স্থলে হ (যথা শালা স্থলে হালা) ইত্যাদি নানারূপ প্রয়োগ দ্বারা দেখা যায় যে প্রাকৃত ভাষার গতির স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহাদের কথিত ভাষায় একটা স্থায়ী রকমের বিভিন্নতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি তাঁহারা সেই সকল প্রাকৃত ভাষার আনুগত্য স্বীকার করিয়াও এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের বিচিত্রমুখী গতি সত্ত্বেও সেই পণ্ডিতী যুগের জয়পতাকা উড়াইয়া রাখিয়াছেন। কথিত ভাষায় শব্দের প্রাকৃতরূপ তাঁহারা শতবার স্বীকার করিযাছেন, তথাপি দেবভাষার কতকগুলি চিহ্ন ভাষা হইতে মুছিয়া ফেলিতে স্বীকৃত হন নাই। কোন কোন স্থানে উচ্চারণদোষে তাঁহাদের সংস্কৃত দোষাবহ এমন কি উপহাসাস্পদ হয়—তথাপি সেই সকল শব্দ তাঁহারা ছাড়িবেন না। 'ভাত' কে 'অন্ন' বলিবেন, 'জুতো'কে 'পাদুকা', 'কাঠ'কে 'কাষ্ঠ', 'কাঁটাল'কে 'কণ্টকী', 'ঘাম'কে 'ঘর্ম্ম', 'চামড়া'কে 'চর্ম্ম', 'ঘি'কে 'ঘৃত' 'খাওয়া'কে 'ভক্ষণ', 'দেখা'কে 'দর্শন' 'বামুন'কে 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি সাধুভাষা তাঁহারা নিরন্তর কথোপকথনের ভাষায়ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কোন কোন স্থলে রাঢ়ের লোকেরা পূর্ব্বাঞ্চলের লোককে এজন্য ঠাট্টা করিয়া থাকেন। বিদ্রূপকারীরা একটা শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে "পূর্ব্বাঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে কখনই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে না, কারণ তাঁহারা 'শতায়ু হও' এই বলিতে যাইয়া 'হতায়ু হও' এই আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলেন।" আপনারা যদি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের "প্রবোধচন্দ্রিকা" এবং শত বৎসর পূর্ব্বের আর কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন সেই পালরাজত্বের 'পণ্ডিতী যুগ' যাহা গৌড়ীয় রীতি-অনুগ বলিয়া দণ্ড্যাচার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কি ভীষণ প্রভাব একসময়ে আমাদের বাঙ্গলাভাষার উপর পড়িয়াছিল। ইহার বহু উদাহরণ আপনারা আমার "Bengali Prose Style" নামক পুস্তকে পাইবেন। প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে একটি মাত্র উদাহরণ দেখাইতেছি—"অনভিব্যক্ত বর্ণাধ্বনি মাত্র রাজ্ঞা পরানাম্নী ভাষা যেমন অভিনব কুমারদের ভাষা তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পশ্যন্তি নামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্তমৎকিঞ্চিদ্বয়স্ক বালকবাণী।"

আর্য্যাবর্ত্তের আর কোন প্রাদেশিক ভাষার উপর গৌড়ীয় রীতির এতটা প্রভাব দেখা যায় না। যাঁহারা তাম্রলিপি ও শিলালেখ লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ গৌড়দেশেরই পণ্ডিত এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিরক্ষার্থ যে তাঁহারা অমনোযোগী ছিলেন না, তাহা এই সকল উদাহরণের দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে।

সেদিন আমাদের নটরাজ গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল নামক নাটকে একটি স্ত্রী-চরিত্রের মুখে যে ভাষার আড়ম্বর দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক কল্পনাপ্রসূত নহে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও যে গৌড়ীয় রীতির প্রভাব পড়িয়াছিল তাহার প্রমাণও অশিক্ষিত লোকের সাধুভাষা-ব্যবহারের চেষ্টায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। সেগুলি আর ভাষার অলঙ্কার বলিয়া গণ্য হইবার মতন নহে, তাহা বরঞ্চ ভাষার রোগ বলিয়া ধরা যায়। সেদিনও এক চাষা আমাকে বলিতেছিল, "বাবু, এবার আমাদের ক্ষেতে অসহ্য ধান হইয়াছে।" আর একজন তাহার জামাতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া বাহু প্রসারণপূর্ব্বক বলিয়াছিল, "দেখুন, আমায় উপর সে [illegible] পারে, কিন্তু আমার কন্যাকে সে মারিবে কেন? তাহার উপর এতটা অনুরাগ কি ভাল?"

পালাধিকারে বঙ্গীয় সমাজে এক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যদিও অশোকের সময় হইতে প্রকৃত গুণবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজদরবারে বিশেষরূপ সমাদৃত হইয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি গোঁড়া হিন্দুর দল এই সম্মানে প্রীত ছিলেন না। শুঙ্গ বংশের সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য অতিমাত্রায় প্রশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। অশোক ধর্ম্মমহামাত্রদের পদের সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণগণের কোপের ভাজন হইয়াছিলেন, যজ্ঞে পশুহননবিধি রহিত করিয়াও বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষপাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ সকল কথা ১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় আমরা কতকটা বিস্তারিত রূপে উল্লেখ করিয়াছি। পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্য-ধ্বজা উত্থাপিত করিয়া বৌদ্ধদিগের প্রতি ভীষণ

গুরুতর সামাজিক পরিবর্ত্তন।

প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্রাহ্মণদের বলবৃদ্ধি হইতেছিল, অন্ধ্ররাজগণও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃসমুত্থানের পরিপোষক হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এদিকে বৃহৎবঙ্গে পালরাজাদের সময়ে বৌদ্ধ-হাওয়া পুনরায় সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। তিব্বতের রাজা লাঃ লামা ইয়েসি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নেতা গারোয়ালের রাজার হস্তে উৎপীড়িত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ কুল-প্রদীপ।

এদিকে পালরাজাদের সময়ে নালন্দা, ওদন্তপুর, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বহু বৌদ্ধবিহার—জ্ঞান ও বিদ্যার প্রখর রশ্মি বিতরণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিয়াছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিব।

পালরাজগণ, বিশেষ করিয়া শেষের দিকের পালবংশের কতিপয় রাজা, প্রকৃত যোগ্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি সশ্রদ্ধ থাকিলেও তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মেরই পরিপোষক ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের ও দক্ষিণাপথের গোঁড়া ব্রাহ্মণের দল এদেশকে অভিশপ্ত মনে করিয়া ত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—এখানে জনসাধারণ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী ছিল এবং এদেশ বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল, সুতরাং যদিও কপিল মুনির আশ্রম এবং প্রাচীন শৈবধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক তীর্থ এখানে বিরাজ করিত—তথাপি পালাধিকারে নবোত্থিত ব্রাহ্মণগণ এই দেশকে ব্রাহ্মণদিগের বাসের অযোগ্য মনে করিয়া এদেশের সঙ্গে সমস্ত হিন্দু-সমাজের সম্বন্ধ ত্যাগ করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রাঢ় অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধপ্রাধান্য দেখিয়া পদ্মা ও বুড়িগঙ্গাকে গঙ্গার শাখা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত এবং ভগীরথ-খাত খালের গৌরব বাড়াইয়া ঐ দুইটি বৃহৎ নদীর জাতি মারিয়াছেন, তেমনই করিয়া পালাধিকারে ভারতের নবসৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য-শাসিত হিন্দুসমাজ বঙ্গ ও অপরাপর বৌদ্ধাধিকৃত স্থানসমূহ তাঁহাদের গণ্ডী হইতে বর্জ্জন করিলেন। ফলে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ বর্জ্জিত হইল। তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই সকল দেশে আসিলে হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—এই বিধি প্রচারিত হইল। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ এবং ভারতের বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রের বর্জ্জন দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্যলক্ষ্মী একরূপ বিতাড়িত হইলেন।

সামাজিক এই গুরুতর পরিবর্ত্তনের ফলে এই দেশ ব্রাহ্মণ-বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা এই পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি যে এদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দু কেন্দ্রে আশ্রয় লইয়া জাতিরক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, এম. এ., পি. আর. এস. মহাশয় তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। ৮৮ পৃষ্ঠায় সিংহল-প্রবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরের একটি প্রবন্ধের কতকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—ঐ প্রবন্ধটি কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে অতি স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে—দক্ষিণাপথের কানেড়ার লক্ষ লক্ষ কঙ্কণ ভাষাভাষী ব্রাহ্মণ বাঙ্গলাদেশ হইতে তথায় গিয়াছেন বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের

ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গলাদেশ ত্যাগ।

ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার অদ্ভুত নৈকট্য। এক্ষেত্রে এখনও ভালরূপ অনুসন্ধান চলে নাই; কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—পালাধিকারে গৌড়দেশের ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষের নানা-স্থানে গমন পূর্ব্বক তত্তৎ স্থানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং এই জন্য—

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি।"

—প্রভৃতি শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই জন্য শূররাজগণের পূর্ব্বপুরুষকে কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে এদেশে প্রোজ্জ্বল করিতে হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ-বিহার

পাল-রাজন্যবর্গের সময়ে জাতীয় উচ্চ শিক্ষা গৌরবের তুঙ্গশিখরে উঠিয়াছিল। কোথায় গেল সেই নালন্দা,* ওদন্তপুর (সং উদ্দণ্ডপুর), বিক্রমশিলা, জগদ্দল ও সুবর্ণ বিহার? এই যুগ বাঙ্গলা ইতিহাসের স্বর্ণযুগ;—ইহা স্থপতি ও কলাশিল্পের স্বর্ণযুগ—ইহা বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার স্বর্ণযুগ—এই যুগের গৌরবস্মৃতি বাঙ্গলাদেশকে চিরকাল উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া নালন্দা-বিহার গৌড়মণ্ডলের—তথা এশিয়ার—সর্ব্বপ্রধান বিদ্যাকেন্দ্র-রূপে বিরাজ করিতেছিল। বিহারে রাজগিরির ৭ মাইল উত্তরে বড়গাঁও বলিয়া যে পল্লী বিদ্যমান, তাহাই এক সময়ে নালন্দা-বিহারের গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। কথিত আছে পাঁচশত বণিক্ ১০ কোটী স্বর্ণমুদ্রা-মূল্যে বুদ্ধদেবের জন্য এক বিশাল আম্রকানন ক্রয় করেন। সেই আম্র-কাননে উত্তরকালে নালন্দা বিহারের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পালি সাহিত্যে মাঝে মাঝে 'নালো' গ্রামের উল্লেখ থাকিলেও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহা একটি অখ্যাত পল্লীমাত্র ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সিংহলাধিপ মেঘরাজ এইখানে একটি বড়রকমের বিহার-নির্ম্মাণের অনুমতি পাইয়াছিলেন, ৩৩০-৩৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আম্রবনে এই বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। জৈন ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, ৫০০ খৃঃ পূর্ব্বে এইস্থানে রাজা বিম্বিসারের

নালন্দা—১০ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রায় ক্রীত আম্রকানন।

* নালন্দা-বিহারের সমকালবর্ত্তী আরও কয়েকটী বৌদ্ধবিহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভাগলপুরের পাথরঘাটায় অবস্থিত বিক্রমশীল-বিহার, তন্মধ্যে অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়। [illegible]
[illegible]

রাজত্বকালে কোন জৈন সন্ন্যাসী একটি আশ্রম স্থাপন করেন—নালন্দা-বিহার তাহারই বিকাশ। লামা তারানাথের মতে অশোকই এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র নালন্দায় জন্মগ্রহণ করাতে এইস্থান বৌদ্ধতীর্থস্বরূপ গণ্য হইয়াছিল। খৃঃ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে নাগার্জ্জুন এবং আর্য্যদেব এই পল্লীতে স্থাপিত বিহারের অনুরাগী হইয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুনামক এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ মহাযান-প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রধর্ম্মের সম্যক শ্রীবৃদ্ধির জন্য এখানে ১০৮টি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৪০০ খৃঃ অব্দের সান্নিহিত কোন সময়ে বিখ্যাত চীন পর্য্যটক ফা-হায়েন এই বিহার পরিদর্শন করেন—তিনি পল্লীটিকে "নালো" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্রের সমাধিমঠ তিনি এইখানে দেখিয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন খড়্গবংশীয় রাজকুমার শীলভদ্র যখন নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউনসাঙ্গ এই বিহারে ১৫ মাস অবস্থান করিয়া সেই বিশ্ববিশ্রুত প্রাগুক্তবরের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধনির্ব্বাণের পর পাঁচজন নরপতি এইস্থানে পাঁচটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই পাঁচজন রাজা ছিলেন—শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য এবং বজ্র। উত্তরকালে ক্রমান্বয়ে বহু রাজন্যের মুক্তহস্ত দানশীলতা, আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধায়, এবং স্থপতি ও চারুশিল্পবিদ্‌গণের প্রচেষ্টায় নালন্দা-বিহার এরূপ একটা কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইল যে, ৬৩৭ খৃঃ অব্দে হিউনসাঙ্গ যখন ইহা প্রথম দর্শন করেন তখন ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই বিহারে বহু সহস্র সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত ছিল। তাঁহারা শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, তাঁহারা বিনয়ের সূত্রগুলি স্বজীবনে অতি কঠোরভাবে পালন করিয়া নরসমাজে আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, কিরূপে রাতদিন চলিয়া যাইত অনেক সময়ে তাঁহাদের তাহা খেয়াল থাকিত না। নালন্দা-বিহারের নাম এরূপ সম্মানের ছিল যে, কোনস্থানে প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায় পণ্ডিতগণ নালন্দা-বিহারে পাঠ করিয়াছেন, মাঝে মাঝে স্বার্থের জন্য এরূপ মিথ্যা পরিচয়ও দিতেন। যাঁহারা এই বিহারে পাঠ করিতে আসিতেন তাঁহারা অধিকাংশই দ্বারপণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া না দিতে পারিয়া প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন না। যাঁহারা আধুনিক ও প্রাচীন শাস্ত্রে উত্তমরূপে ব্যুৎপন্ন না থাকিতেন, নালন্দা-বিহার তাঁহাদিগকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিতেন না। প্রত্যেক ১০ জন আবেদনকারীর মধ্যে দুই তিনজন মাত্র গৃহীত হইতেন, বাকী প্রার্থীরা ফিরিয়া যাইতেন। হিউনসাঙ্গ যখন নালন্দায় ছিলেন তখন যে সকল পণ্ডিতচূড়ামণি সেই বিহার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই কয়েকটি নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য—শীলভদ্র, জ্ঞানচন্দ্র, জিনমিত্র, স্থিরমতি, গুণমতি, চন্দ্রপাল এবং ধর্ম্মপাল।

ক্রমিক ইতিহাস।

শ্রীবিষ্ণুকৃত ১০৮টি মন্দির।

হিউনসাঙ্গের সময়কার নালন্দায় অধ্যাপকগণ।

অপর একজন চীনপর্য্যটক দীর্ঘকাল এই বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন (৬৭৩-৬৮৪ খৃঃ)। তাঁহার নাম ইৎচিং। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন (৬৭৩ খৃঃ) নালন্দা-বিহারে আটটি বৃহৎ পাঠাগার এবং তাহা ছাড়া ৩০০ প্রকোষ্ঠ ছিল। এই সকল প্রকোষ্ঠে ৩০০০এর অধিক শ্রমণ বাস করিতেন। রাজগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ২০০ সমৃদ্ধ গ্রাম দিয়াছিলেন। ৪৫০ খৃঃ হইতে নালন্দা-বিহারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ হুন রাজা মিহিরকুলের সমকালবর্ত্তী (৫১৫ খৃঃ রাজত্ব আরম্ভ) বালাদিত্য এইস্থানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আরও তিনজন রাজা তথায় বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শক্রাদিত্য ৪৫০ খৃঃ অব্দে 'আদি বিহার' স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু মন্দিরগাত্রে যে সকল শিলালিপি ছিল তাহা হইতে জানা যায়, পাল রাজারাই ইহার সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, এই রাজাদের অনেকগুলি রাজধানী ছিল, যথা—মগধ, বিলাসপুর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি। গোপাল, মহীপাল, বালাদিত্য, নরপাল, রামপাল এবং গোবিন্দপাল এই বিশাল বিহারকে অকুণ্ঠ ও মুক্তহস্ত ব্যয়ের দ্বারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

ইৎচিং।

নালন্দা বিহার ৩০০০ ফুট প্রসারিত উচ্চভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। ইহার সম্মুখে বড়গাঁয়ের সুদর্শন হ্রদগুলির নীলজলে কুমুদ-কহ্লার সুরভি বিতরণ করিত। নালন্দার প্রধান বিহারটির আয়তন ছিল ১৬০০×৪০০ ফুট। চতুষ্পার্শ্বে আর ৬টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বিহার, সহচরীরা যেরূপ রাজকুমারীকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই প্রধান বিহারকে মণ্ডিত করিয়াছিল। বালাদিত্য রাজার মঠ নালন্দার সর্ব্বোচ্চ দর্শনীয় বস্তু ছিল। ইহার চূড়া ৩০০ ফুট উচ্চে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল। এই সুবিশাল এবং উচ্চ মঠের চতুর্দ্দিকে শ্রীবিষ্ণুর ১০৮টি মঠ পদ্মের ১০৮টি দলের মত দেখাইত। ইহার বক্তৃতামঞ্চগুলির ঊর্দ্ধে প্রসারিত অদ্ভুত রাক্ষস-মুখ কারুকার্য্য, বিচিত্রবর্ণে অনুরঞ্জিত অলিন্দ, আরক্ত চুনীর জমকাল স্তম্ভ এবং নানারূপ কারুখচিত উজ্জ্বল রেলিংগুলির প্রশংসা হিউনসাঙের মুখে যেন ধরে না। আজ অজন্তা, ইলোরা ও হস্তিগুহার যে বিচিত্র ছবি দেখিয়া জগতের কারুশিল্পিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছেন, এবং যাহা বিধাতার ক্রোধ ও ভিন্নধর্ম্মীদের অত্যাচার হইতে বনজঙ্গলের একান্ত নিভৃতে থাকিয়া কথঞ্চিৎ ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত তথা সমস্ত এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধকেন্দ্র, বিশ্ববিজয়ী সম্রাটদের মুক্তহস্ত দানশীলতায় পুষ্ট নালন্দা-বিহারের চিত্র ও স্থাপত্যের নিদর্শন যে সেগুলি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল তাহা কি আমাদের ভাবা স্বাভাবিক নহে? আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ভগবান্ নরলীলার সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকৃতি তাঁহার নিরুপম শিল্পকলার সহস্র সহস্র কুসুম ও কোরকচিহ্ন বনেজঙ্গলে সৃষ্টি করিয়া দিবসান্তে নির্ম্মম হস্তে ধ্বংস করিয়া ফেলেন, এই ভাবেই আর্য্যাবর্ত্তে শিল্পীর শিল্প, স্থপতির স্থাপত্য ধ্বংস পাইয়াছে, তাহার জন্য দোষী করিব কাহাকে?

স্থাপত্য ও চারুশিল্প।

শ্রমণ এবং অধ্যাপকদের গৃহ সাধারণতঃ চৌতল ছিল। নবতল গৃহও দুই একটি ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের সংযোগ এরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে যে, ডাক্তার স্পুনার বলিয়াছেন "আধুনিক জগতের কোন ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহই এই নালন্দার নির্ম্মাণ-কৌশলের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতে পারে না। ইটের সঙ্গে ইট এমনই সুচারুভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে, তাহাতে জোড়ার কোন চিহ্নই নাই। কানিংহাম এবং ব্রাডলি এই নালন্দার স্থপতি ও শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিয়াছেন—"জগতের কোন এক স্থানে এরূপ আশ্চর্য্য কলা ও স্থপতিশিল্পের এতগুলি নিদর্শন আমি দেখি নাই।" কানিংহামের মত পণ্ডিতের এই উক্তির মূল্য খুবই বেশী। অথচ তাঁহারা ভাঙ্গাচুরা কিছু উপকরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। হায় নালন্দা! বহুপূর্ব্বে হিউনসাঙ্গ বলিয়াছিলেন, "The monasteries of India are counted by myriads, but this is the most remarkable for grandeur and height." "ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র বিহার আছে, কিন্তু শোভা-সমৃদ্ধি ও উচ্চতায় নালন্দা-বিহারের তুলনা নাই।" নালন্দা-বিহার যেখানটায় ছিল, সে যায়গার নাম ছিল ধর্ম্মগঞ্জ। এই ধর্ম্মগঞ্জের তিনটি বিখ্যাত মন্দির ছিল—রত্নসাগর, রত্নবোধী এবং রত্নরঞ্জক। রত্নবোধী নবতল গৃহ ছিল। এই পুস্তকাগারে প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র, সমাজগুহ্য ও বহুবিধ দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। তুরস্ক অভিযানে এই রত্নবোধী ধ্বংস পায়—ও ইহার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার এক প্রান্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ৭৪০ খৃঃ অব্দে আমরা নালন্দার শেষ খ্যাতি শুনিতে পাই—তখন কমলশীল এই বিহারের তন্ত্রের উপাসক ছিলেন। বালাদিত্য-নির্ম্মিত তিনশত ফুট উচ্চ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত বিহারের উত্তরদিকে বুদ্ধের আশী ফুট উচ্চ একটি তাম্রমূর্ত্তি ছিল। মহারাজ অশোকের বংশধর রাজা পূর্ণবর্ম্মা ৬০৪ খৃষ্টাব্দে মূর্ত্তিটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইৎচিঙ্গের পর চেহং (Tche-hong) নামক আর একজন চীন ভিক্ষু নালন্দায় আসিয়াছিলেন। ৬৪০ খৃঃ অব্দে আলিয়ে-পো-মোনো (আর্য্যবর্ম্মা) ও হুই-য়ে (Hoei-ye) নামক দুইজন কোরিয়াবাসী ভিক্ষু নালন্দায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ স্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত হইতে থনমি ও অপর ছয়জন প্রধান ব্যক্তি নালন্দায় আসিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দশম শতাব্দীতে কি-য়ে (Ke-ye) নামক চীন ভিক্ষু নালন্দায় আসিয়াছিলেন। ইহাদের কথা ভারতবর্ষের কোন ইতিহাসে স্থান পায় নাই। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য বিদ্যা, ধর্ম্ম ও শিল্পের আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রের সম্বন্ধেও দেশের ইতিহাসলক্ষ্মী অতল বিস্মৃতি-সমুদ্রের তলে বসিয়া কোন ভাবী ডুবুরীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। হিউনসাঙ্গ নালন্দাবাসী ভিক্ষুদের আহার্য্যসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কৌতুকাবহ তালিকা দিয়াছেন :—

ধর্ম্মগঞ্জ।

প্রচুর পরিমাণে জম্বীরফল, সুপারি, কর্পূর, মগধের সুগন্ধ তণ্ডুল ও অন্যান্য দ্রব্য ইহারা পাইতেন। হিউনসাঙ্গের জন্য ব্যবস্থা ছিল—প্রত্যহ ২২০টি জম্বীরফল, ২০টি জাম, ২০টি খেজুর, আড়াইতোলা কর্পূর, কিছু মাখন, এক পোয়া তণ্ডুল, মাসে তিন 'রাশি'

তেন। নালন্দার ভিক্ষুগণ ঘোড়ায় চড়িতে পাইতেন না। কাঠের যানে বসিয়া বাহকদ্বারা নীত হইতেন।

যদি জম্বীরফল অর্থ বাতাপিলেবু হইয়া থাকে, হিউনসাঙ রোজ ২২০টি বাতাপিলেবু দিয়া কি করিতেন, তাহা ভাবিবার বিষয়—বোধ হয় সরবৎ প্রস্তুত করিয়া পান করিতেন। কিন্তু জম্বীর অর্থে বোধ হয় 'কালোজাম'।

নালন্দা-বিহার তখনও শ্রীহীন হয় নাই। শেষের দিকে (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর গোড়ায়) দুই বিহারেরই প্রতিষ্ঠা জোরে চলিতেছিল। বিক্রমশিলা-বিহার ৮১০ খৃঃ অব্দে বঙ্গাধিপ মহারাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। যদিও রাজচক্রবর্ত্তিগণের দানে নালন্দা-বিহার পুষ্ট হইয়াছিল—তথাপি নালন্দা সর্ব্বতোভাবে গণতান্ত্রিক ছিল। এখানে ছোট বড় কেহ ছিল না। যিনি পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ হইতেন, তিনিই ইহার পরিচালনার ভার লইতেন। রাজাদের কোন ইচ্ছা বা অনুমতি এক্ষেত্রে চলিত না। কিন্তু বিক্রমশিলা ছিল ঠিক রাজকীয় প্রতিষ্ঠান। রাজাই ইহার কর্ত্তা ছিলেন, এবং বিহারের সমস্ত পরিচালনার ভার তাঁহারই উপর ছিল এবং তাঁহারই ইঙ্গিতে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ইহাকে লোকে "রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়" বলিয়া জানিত। রাজা স্বয়ং পণ্ডিতদিগকে উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন, তথাপি তিব্বতীয় রাজদূত বিনয়ধর বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছেন—রাজা সভাগৃহে উপস্থিত হইলে ছোট বড় কোন শ্রমণই তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্ত দাঁড়াইতেন না। শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য-তেজের ইঁহারা প্রতীকস্বরূপ ছিলেন। "বিদ্বত্ত্ব নৃপত্ব" শ্লোক শুধু কথার কথা ছিল না—জীবনেও তাহা প্রতিফলিত হইত। জ্ঞানের এরূপ আদর বিশ্বের অন্ত কোথাও হইয়াছে কিনা জানি না। দীপঙ্করের সময়ে বিক্রমশিলার নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ শীর্ষস্থানীয় ছিলেন,—দীপঙ্করের গুরু আচার্য্য জিতারি, আচার্য্য রত্নবজ্র, আচার্য্য জ্ঞানশ্রীমিত্র ও আচার্য্য রত্নকীর্ত্তি।

বিক্রমশিলা—৮১০ খৃঃ।

"রাজকীয়" বিশ্ববিদ্যালয়।

দীপঙ্করের সময়ে আচার্য্যগণ।

বিক্রমশিলা যে পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ও সাধুর নামে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, যিনি বৌদ্ধজগতে বুদ্ধদেবের পরেই সম্মানিত, যিনি বাঙ্গালাদেশের নবম শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব-জনক জয়স্তম্ভস্বরূপ, যাঁহাকে আমরা অবিমৃষ্যতা ও মূর্খতার জন্ত এতকাল ভুলিয়াছিলাম—সেই আমাদের দুর্লভ দীপঙ্করকে আজ আমরা আমাদের বলিয়া জানিতে পারিয়াছি—পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকদের দ্বারা আমাদের জ্ঞাননেত্র প্রবুদ্ধ হওয়ার ফলে। এজন্ত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগকে আমরা ধন্তবাদ দিব। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দীপঙ্করের জীবনী সংক্ষেপে আলোচিত হইল।